CONDITIONS OF THE DOWNTRODDEN PEOPLE AS DEPICTED IN POST-INDEPENDENCE BENGALI FICTION- A CRITICAL STUDY

ABSTRACT

THESIS

SUBMITTED FOR THE AWARD OF THE DEGREE OF

Doctor of Philosophy

IN

BENGALI

By

SHRI ASHWINI KUMAR DAS

Under the Supervision of

DR. T.B. CHAKRABORTY

Ph.D., D. Litt.

T-7750

DEPARTMENT OF MODERN INDIAN LANGUAGES
ALIGARH MUSLIM UNIVERSITY
ALIGARH-202002, INDIA

2009

Maulana Azad Library
Aligarh Muslim University Aligarh
T-7750

স্বাধীনোত্তর পর্বে বাংলা উপন্যাস ও ছোট গল্পে অন্ত্যজ জীবন-
তত্ত্ব, তথ্য ও বিশ্লেষণাত্মক আলোচনা

গবেষক

শ্রী অশ্বিনী কুমার দাস, এম.এ.

গবেষণা পরিচালক

ডঃ তিমিরবরণ চক্রবর্তী, পি.এইচ.ডি., ডি.লিট.

আলিগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়ের
পি.এইচ.ডি. ডিগ্রির জন্য উপস্থাপিত
অভিসন্দর্ভ
২০০৯

গবেষণাকর্মের সংক্ষিপ্তসার

//সূচীপত্র//

পৃষ্ঠা-

* কথামুখ ১-৩

* ভূমিকার বদলে - ৪-৯

'অন্ত্যজ' কথাটির বিভিন্ন দিক ও পরিচয়

১. প্রথম অধ্যায় // ১০-১১

(এক) অন্ত্যজ জীবনের স্বরূপ সন্ধান ।

(দুই) আদি যুগের বাংলা সাহিত্য ঃ

ক) চর্যাপদ

খ) মৌখিক সাহিত্য

গ) শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্য ও অন্যান্য রচনাবলী ।

২. দ্বিতীয় অধ্যায় // ১২-১৩

স্বাধীনতা পূর্ব বাংলা কথাসাহিত্য ও অন্ত্যজ জীবন ঃ

ক) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

খ) শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

গ) মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়

ঘ) তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

ঙ) বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

চ) বনফুল (বলাই চাঁদ মুখোপাধ্যায়) প্রমুখ ।

৩. তৃতীয় অধ্যায় // ১৪-১৫

স্বাধীনোত্তর পর্বে বাংলা উপন্যাস ও অন্ত্যজ জীবন ঃ

(এক) তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় ঃ

ক)'হাঁসুলী বাঁকের উপকথা'

খ) 'নাগিনী কন্যার কাহিনী'।

(দুই) বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় ঃ

ক) 'ইছামতী' উপন্যাস।

(তিন) সমরেশ বসু ঃ

ক) 'উত্তরঙ্গ'

খ) 'গঙ্গা'

গ) 'মহাকালের রথের ঘোড়া'।

(চার) মহাশ্বেতা দেবী ঃ

ক) 'কবি বন্দ্যঘটী গাঞির জীবন ও মৃত্যু'

খ) 'অরণ্যের অধিকার' ।

পৃষ্ঠা-

(পাঁচ) অদ্বৈত মল্লবর্মণ ঃ
ক)'তিতাস একটি নদীর নাম' ঃ একটি স্বতন্ত্র পদক্ষেপ

(ছয়) সতীনাথ ভাদুড়ী ঃ
ক) 'ঢোঁড়াই চরিত মানস' ।

৪. চতুর্থ অধ্যায় // ১৬-১৮
(এক) স্বাধীনোত্তর পর্বে বাংলা ছোটগল্প ও অন্ত্যজ জীবন ঃ
ক) সামাজিক প্রেক্ষিতে
খ) রাজনৈতিক প্রেক্ষিতে
গ) অর্থনৈতিক প্রেক্ষিতে ।

(দুই) তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছোট গল্প ঃ বিভিন্ন দৃষ্টিকোণে ঃ
ক) ব্যক্তি জীবনাশ্রিত
খ) পরিবারাশ্রিত
গ) ধর্মাশ্রিত
ঘ) চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যাশ্রিত।

(তিন) নরেন্দ্রনাথ মিত্রের ছোট গল্প ঃ বিভিন্ন দৃষ্টিকোণে ঃ
ক) ব্যক্তি জীবনাশ্রিত
খ) পরিবারাশ্রিত
গ) চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যাশ্রিত
ঘ) আর্থ-সমাজাশ্রিত
ঙ) সমাজ-বৈষম্যমূলক
চ) সংস্কৃতি ভিত্তিক।

(চার) মনোজ বসুর ছোট গল্প ঃ বিভিন্ন দৃষ্টিকোণে ঃ
ক) ব্যক্তি জীবনাশ্রিত
খ) পরিবারাশ্রিত
গ) অর্থ ও সমস্যাশ্রিত
ঘ) চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যাশ্রিত
ঙ) পটভূমি ভিত্তিক।

(পাঁচ) রমা পদ চৌধুরীর ছোট গল্প ঃ বিভিন্ন দৃষ্টিকোণে ঃ
ক) ব্যক্তি জীবনাশ্রিত
খ) পরিবারাশ্রিত
গ) গোষ্ঠী জীবনাশ্রিত
ঘ) ধর্মাশ্রিত
ঙ) চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যাশ্রিত
চ) পটভূমি ভিত্তিক
ছ) আর্থ-সমাজাশ্রিত
জ) সমাজ-বৈষম্যমূলক
ঝ) বিশ্বাস ও সংস্কার ভিত্তিক।

পৃষ্ঠা-

(ছয়) সমরেশ বসুর ছোট গল্প ঃ বিভিন্ন দৃষ্টিকোণে ঃ

ক) ব্যক্তি জীবনাশ্রিত

খ) পরিবারাশ্রিত

গ) অর্থ ও সমস্যাশ্রিত

ঘ) চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যাশ্রিত

ঙ) পটভূমি ভিত্তিক

চ) আর্থ-সমাজাশ্রিত

ছ) সমাজ-বৈষম্যমূলক

জ) বিশ্বাস ও সংস্কার ভিত্তিক।

(সাত) সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজের ছোট গল্প ঃ বিভিন্ন দৃষ্টিকোণে ঃ

ক) ব্যক্তি জীবনাশ্রিত

খ) পরিবারাশ্রিত

গ) ধর্মাশ্রিত

ঘ) চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যাশ্রিত

ঙ) পটভূমি ভিত্তিক

চ) আর্থ-সমাজাশ্রিত

ছ) বিশ্বাস ও সংস্কার ভিত্তিক।

(আট) দেবেশ রায়ের ছোট গল্প ঃ বিভিন্ন দৃষ্টি কোণে ঃ

ক) ব্যক্তি জীবনাশ্রিত

খ) পরিবারাশ্রিত

গ) অর্থ ও সমস্যাশ্রিত

ঘ) চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যাশ্রিত

ঙ) পটভূমি ভিত্তিক

চ) আর্থ-সমাজাশ্রিত।

(নয়) মহাশ্বেতা দেবীর ছোট গল্প ঃ বিভিন্ন দৃষ্টি কোণে ঃ

ক) ব্যক্তি জীবনাশ্রিত

খ) পরিবারাশ্রিত

গ) গোষ্ঠী জীবনাশ্রিত

ঘ) ধর্মাশ্রিত

ঙ) চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যাশ্রিত

চ) পটভূমি ভিত্তিক

ছ) আর্থ-সমাজাশ্রিত

জ) সমাজ-বৈষম্যমূলক

ঝ) বিশ্বাস ও সংস্কার ভিত্তিক।

পৃষ্ঠা-

৫.পঞ্চম অধ্যায় // ১৯-২০

অন্যান্য উল্লেখযোগ্য ছোট গল্পকার ঃ

ক) সতীনাথ ভাদুড়ী

খ) অমিয়ভূষণ মজুমদার

গ) সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

ঘ) শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়

ঙ) অসীম রায়

চ) আবুল বাশার

ছ) প্রফুল্ল রায়

জ) অমর মিত্র।

* কথাবন্ধ ২১-২৮

*** *** *** *** **** ****

কথামুখ

কথামুখ

আধুনিক বাংলা উপন্যাস ও ছোটগল্প সাহিত্যশৈলী নিঃসন্দেহে বঙ্কিম চন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথের হাতেই বিকাশ লাভ করে খুব স্বল্প সময়ের মধ্যেই বিষয় ও বৈচিত্র্যের ব্যাপকতায়, রীতি প্রকরণের অভিনব আঙ্গিকতায় সমৃদ্ধি লাভ করে বর্তমানের বাংলা কথাসাহিত্যের আঙ্গিনাকে সমৃদ্ধশালী করে তুলেছে।

রবীন্দ্র ছোটগল্পে সাধারণভাবে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মানুষের জীবনরূপ পেলেও উচ্চবিত্ত এবং অন্ত্যজ শ্রেণীর মানুষের জীবনের কথাও উপেক্ষিত হয়নি। সত্যিকারে বলতে গেলে বলা যায় যে সাহিত্যের উৎসই হোল জীবন। মহান সাহিত্যকার রূপ এবং রং সংগ্রহ করে নেন সমসাময়িক জীবন থেকেই। তাই বাংলা কথাসাহিত্য তার উন্মেষকাল থেকেই সমাজের প্রায় সর্বশ্রেণীর মানুষের বহু বিচিত্র জীবন রূপকে উদ্ভাসিত করে তুলেছে বহু বিচিত্র ইন্দ্রধনুচ্ছটায়।

সমাজের নিম্নবিত্ত এবং অন্ত্যজ শ্রেণীর মানুষ রবীন্দ্র যুগ থেকে যে বাংলা ছোটগল্পে স্থান করে নিয়েছে তার প্রমাণ রবীন্দ্রনাথের 'শাস্তি' ছোটগল্পটি। ছিদাম রুই এবং দুখীরাম রুই-দু'ভাইয়ের স্বাভাবিক জীবন, তাদের দু'বউয়ের দৈনন্দিন কলহ, ঘটনার আকস্মিকতায় বড় বউয়ের খুন হয়ে যাওয়া এবং ছোট বউ চন্দরার স্বামীর প্রতি ক্ষমাহীন প্রতিহিংসা গ্রহণ একেবারে সমাজের অন্ত্যজ শ্রেণীর মানুষের নিখুঁত জীবন চিত্রকে তুলে ধরেছেন। রবীন্দ্রনাথের 'খোকাবাবুর প্রত্যাবর্তন'ছোট গল্পটির রাইচরণ চরিত্রটির কথাও প্রসঙ্গক্রমে এসে যায়। অন্ত্যজ শ্রেণীর মানুষটিকে মনুষত্বের মহিমায় শ্রেষ্ঠত্বের আসনে অধিষ্ঠিত করেছেন গল্পকার। রবীন্দ্রনাথের আরো অনেক ছোটগল্পে অন্ত্যজ শ্রেণী বা সমাজের দরিদ্রপীড়িত সমাজের প্রতিনিধি হিসাবে অনেক চরিত্র চিত্রিত হয়েছে। 'মাল্যদান' গল্পে কুড়ানী, 'সুভা' গল্পে সুভা, 'ক্ষুধিত পাষাণ' গল্পের মেহের আলি প্রভৃতি চরিত্রের নাম বর্তমান প্রসঙ্গে উল্লেখ করতে হয়। 'কাবুলীওয়ালা' গল্পে রহমত চরিত্রটিও এখানে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য, কেননা এখানে বাঙালী পরিবারের গৃহকর্তার পিতৃহৃদয়ের সঙ্গে বিদেশী কাবুলিওয়ালার পিতৃহৃদয় মিলে মিশে একাকার হয়ে গেছে ।

রবীন্দ্র যুগেই রবীন্দ্র শিষ্য প্রভাতকুমারের একাধিক ছোটগল্পে এবং শরৎ চন্দ্রের 'মহেশ' ও 'অভাগীর স্বর্গ' ছোটগল্প দুটিতে বাংলার অন্ত্যজ শ্রেণীর নিখুঁত চিত্র মর্মস্পর্শী হয়ে ফুটে উঠেছে। মহেশকে কেন্দ্র করে হিন্দু প্রধান দরিদ্র মুসলমান ভাগচাষী গফুরের জীবন যন্ত্রণাকে এক চিরন্তন রূপ দিয়েছেন গল্পকার শরৎচন্দ্র। 'অভাগীর স্বর্গ' গল্পে কাঙালীর মা, রসিক বাঘের পরিত্যক্ত স্ত্রী অভাগীর মৃত্যুর পর আগুনে পুড়ে স্বর্গে যাবার ইচ্ছা পূরণে অন্ত্যজ শ্রেণীর স্বাভাবিক মনোবাসনাকে ঔদ্ধত্য প্রকাশের ধারণা উচ্চ শ্রেণীর মানুষের দ্বারা যেভাবে নিন্দিত হয়েছে, তার চিত্রায়ণ তুলনাহীন। শরৎচন্দ্র সমাজের অন্ত্যজ শ্রেণীর অবহেলিত, উপেক্ষিত, লাঞ্ছিত শ্রেণীর মানুষদের মাঝখান থেকেই অভাগী, কাঙালী, গফুর, আমিনা প্রভৃতি চরিত্রগুলি তুলে এনেছেন।

শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়ের ' নারীমেধ', 'নারীর মন' প্রভৃতি ছোট গল্পে কয়লাখনি অঞ্চলে আদিম আদিবাসী সাঁওতাল শ্রমিকদের জীবনযাত্রার একান্ত বাস্তব চিত্র পরিবেশিত হয়েছে। কল্লোল গোষ্ঠীর প্রেমেন্দ্র মিত্র, অচিন্ত্য কুমার সেনগুপ্ত, বুদ্ধদেব বসু প্রভৃতি গল্পকারের বিচিত্র ধর্মী ছোট গল্পের অনেকগুলিতে সমাজের উপেক্ষিত, হতশ্রী মানব গোষ্ঠীর জীবন চিত্র রূপ পেয়েছে। প্রেমিন্দ্র মিত্রের ছোট গল্পের অন্যতম বিশিষ্ট বৈশিষ্ট্যই হল দুস্থ নিম্ন-মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মানুষের জীবন যাত্রার ক্লান্তি, অবসাদ, আত্ম প্রবঞ্চনা এবং বিফলতার চিত্র। উদাহারণ স্বরূপ তাঁর 'মৃত্তিকা' ও 'ধূলিধূসর' গল্প গ্রন্থ দুটির একাধিক গল্পের কথা বর্তমান প্রসঙ্গে আলোচনা করা যায়। অচিন্ত্য কুমার সেনগুপ্তের বিখ্যাত গল্প গ্রন্থ 'টুটাফুটায়' জীবনের কুৎসিত দারিদ্রপিষ্ট, বিদ্রোহ-যুদ্ধ-পাপ-পিচ্ছিল পথের চিত্রণ অতি অপূর্ব ভঙ্গিতে ধরা পড়েছে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ- উত্তরকালে বাংলা উপন্যাস ও ছোট গল্পকারেরা আরো অনেক বেশি সমাজ সচেতন হয়ে পড়লেন। যুদ্ধের বিভীষিকা, ভারতের খন্ডিত স্বাধীনতা লাভ, দেশ বিভাগের কুফল, কঠোর বাস্তবের সংঘাত, সমাজের অতি দ্রুত অবক্ষয় প্রভৃতি বাংলা উপন্যাস ও ছোট গল্পে রূপ পেতে লাগল। এই সময়ের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখ করতে হয় মানিক ও তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম। ফ্রয়েডীয় মনস্তত্ত্বের অনুসারী মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় জীবনের কুটিল বিকৃত দিক গুলিকে তার লেখা উপন্যাস ও ছোট গল্পের ক্ষুদ্র পরিসরে তুলে ধরেছেন । তাঁর 'প্রাগৈতিহাসিক', 'সরীসৃপ' প্রভৃতি ছোট গল্পগুলি এবং 'পদ্মা নদীর মাঝি' উপন্যাসটি এক্ষত্রে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর বহু বিচিত্র উপন্যাস ও ছোট গল্পে গ্রাম বাংলার অন্ত্যজ শ্রেণীর মানুষের বিচিত্র জীবনকে অপরূপভাবে রূপ দান করেছেন। বৈষ্ণব-বৈষ্ণবী, বাউরী-বাগদী, কাহার-বেদে, সাপুড়ে প্রভৃতি অন্ত্যজ শ্রেণীর বিভিন্ন গোষ্ঠী তাঁর কথা সাহিত্যে বিবৃত হয়েছে অত্যন্ত মুন্সিয়ানার সঙ্গে।

সাম্প্রতিককালের বাংলা কথা সাহিত্য অসংখ্য ঔপন্যাসিক ও ছোট গল্পকারেরা অন্ত্যজ জীবনকে অবলম্বন করে বহু বিচিত্র ও নব-নব রূপায়ণে বাংলা কথা সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করে চলেছেন। প্রতিনিধি স্থানীয় লেখকদের হাতে অন্ত্যজ শ্রেণীর জীবন যাত্রা, জীবনচর্চা তথা জীবন যন্ত্রণা, অত্যন্ত বিশ্বস্ততার সঙ্গে রূপ লাভ করেছে। প্রসঙ্গক্রমে বনফুল, সমরেশ বসু, সমরেশ ঘোষ, সুবোধ ঘোষ, মানবেন্দ্র পাল, নীহার রঞ্জন রায়, শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়, আশাপূর্ণা দেবী, প্রতিভা বসু, মহাশ্বেতা দেবী, বাণী রায় প্রভৃতি বহু উল্লেখযোগ্য নাম স্মরণ করতে হয়।

বলাবাহুল্য, বাংলা সাহিত্যের এই অবহেলিত অথচ অমূল্য সম্পদের দিকটি সাহিত্যের গবেষকদের দ্বারা বিশেষভাবে আলোচিত হয় নি। কিছু কিছু উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ বা কিছু মূল্যবান প্রবন্ধ অথবা নিবন্ধ যে লেখা হয় নি তা নয়, তবে গবেষণার আকারে অথবা গবেষণামূলক বিশেষ উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ যে উক্ত বিষয় নিয়ে লেখা হয় নি, সেকথা বললে হয়তো কোনো ভুল বলা হয় না। তাই আমার বর্তমান গবেষণার বিষয়বস্তুটি এ'ব্যাপারে এক নতুন পদক্ষেপ এবং তাই এ'ক্ষেত্রে আমার এই গবেষণাকর্মটি মৌলিকতার দাবি করতে পারে।

ভূমিকার বদলে

বিষয় নির্বাচনের কারণ ও গুরুত্ব

আমার গবেষণাকর্মের বিষয় ঃ স্বাধীনোত্তরপর্বে বাংলা উপন্যাস ও ছোটগল্পে অন্ত্যজ জীবন। এই বিষয়টি নিয়ে বাংলা সাহিত্যে বিশেষ কোন উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ প্রকাশিত হয় নি; উক্ত বিষয় নিয়ে কিছু কিছু প্রবন্ধ এবং গ্রন্থ প্রকাশিত হলেও তা গবেষণামূলক নয় বলেই মনে করি। ভারতবর্ষ অর্থাৎ আমাদের দেশ স্বাধনতা লাভ করেছে ১৯৪৭ সালে, কিন্তু স্বাধীনতা প্রাপ্তীর বাষট্টি বছর পরেও সমাজ থেকে অস্পৃশ্যতা মুছে যায়নি। সেই অস্পৃশ্য বা অন্ত্যজ শ্রেণীর মানুষেরা উঁচু শ্রেণীর মানুষদের কাছে এখনও ঘৃণার পাত্রই হয়ে আছে। এই অন্ত্যজ শ্রেণীর একটি বিশাল অংশ, স্বাধীনোত্তরপর্বের উপন্যাস ও ছোটগল্পে এসেছে যারা নানাভাবে সমাজে উপেক্ষিত, উৎপীড়িত এবং বঞ্চিত। এই দলিত শ্রেণীর মানুষদের নিয়ে একালে আমাদের চিন্তা ভাবনার অন্ত নেই। আর বাংলা কথা সাহিত্যে তাদের স্থান কেমন আছে তা জানতে আমার কৌতূহলও আছে। আমাদের বঙ্গীয় সমাজে এবং দেশে যারা 'শুধু দিলে, পেলেনা কিছুই'; যারা অখ্যাত ও অবজ্ঞাত, যারা ধনবানদের সুখ ও সমৃদ্ধির জন্যে বারবার নির্যাতিত ও লাঞ্ছিত হয়ে আসছে, স্বাধীনোত্তরপর্বে বাংলা উপন্যাস ও ছোটগল্পে তাদের সামাজিক অবস্থান কেমন আছে, তাদের জীবনাযাত্রাই বা কিভাবে নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে, অধিকাংশ উচ্চবর্ণীয় কথা সাহিত্যিকদের দৃষ্টিতে তাদের চরিত্র, বৃত্তি, অর্থনৈতিক অবস্থা ও তাদের জীবনের বিভিন্ন দিক কীভাবে প্রতিভাত হয়েছে - সে বিষয়ে অনুসন্ধান করার একটি প্রবল আগ্রহ আমার বহু বহুদিনের । জানি, এ বিষয়ে বাংলা সাহিত্যে তথ্যের ও তত্ত্বের অপ্রতুলতা আছে। তবুও নানা কথাসাহিত্যিকদের কথাসাহিত্যে অন্ত্যজ সম্প্রদায়ের যতটুকু তথ্য পাব তা তুলে ধরার প্রয়াশেই আমি বই বর্তমান গবেষণাকর্মে ব্রতী হয়েছি।

গবেষণা কর্মের নামকরণ ও অন্ত্যজ শব্দের নানা অর্থ

এখন 'স্বাধীনোত্তরপূর্বে বাংলা উপন্যাস ও ছোট গল্পে অন্ত্যজ জীবন' - গবেষণাকর্মের এই নামকরণ সম্পর্কে আমাদের বক্তব্য পরিস্ফুট করছি। স্বাধীনোত্তর পর্বে বাংলা কথাসাহিত্য বলতে স্বাধীনতা পরবর্তী বাংলা সাহিত্যের অন্তর্গত উপন্যাস ও ছোট গল্পগুলিকে বুঝেছি। আর 'অন্ত্যজ' বলতে সমাজের নিম্নস্তরের অস্পৃশ্য অবজ্ঞাত মূলত দরিদ্র 'সবার পিছে সবার নিচে সর্বহারাদের'ই বুঝেছি। তবুও মনে রাখতে হবে 'অন্ত্যজ' শব্দের আক্ষরিক অর্থ ও পরবর্তী সময়ে তার সংকীর্ণ অর্থ-ব্যঞ্জনা। আক্ষরিকভাবে অন্ত্য=অন্ত+জ, জন্মা (যে জন্মে)= অন্ত্যজ। ব্রাহ্মণাদি তিন বর্ণ বিরাট পুরুষের (ঋগবেদ) দেহ থেকে জন্মের পর শেষজাত-চতুর্থ বর্ণ শূদ্রই হল অন্ত্যজ। এই 'শূদ্র' অর্থে কিন্তু কোন ঘৃণার কথা নেই - কারণ পবিত্র বিরাট-পুরুষের সকল অঙ্গই তো পবিত্র। কিন্তু পরবর্তী সময়ে অন্ত্য (শূদ্র) থেকে জ (জাত) অর্থাৎ শূদ্রের ঔরসে উচ্চবর্ণের স্ত্রীর গর্ভে প্রতিলোমজ সন্তানদের বলা হতে লাগল অন্ত্যজ। তখন থেকে 'অন্ত্যজ' শব্দের প্রতি সমাজের অন্য

তিনবর্ণের অবজ্ঞা লক্ষ্য করা গেল। স্মৃতি শাস্ত্রে বিধান দেওয়া হল যে শাস্ত্র সম্মত সবর্ণ এবং অসবর্ণ বিবাহের পর সমাজিক প্রথা লঙ্ঘনের ফলে ভ্রষ্ট-সংস্রবের সন্তানরাই অন্ত্যজ। আবার 'অন্ত্য' অর্থে নীচ, তাই নীচ কুলে যার জন্ম সেই নীচাশয়, অধম ব্যক্তিই অন্ত্যজ।

অন্তেবাসী, ব্রাত্য ও দলিত

সমাজের তথাকথিত নিম্নবর্ণের অস্পৃশ্য মানুষদের সাধারণত 'অন্তোবাসী' ও বলা হত। কিন্তু বর্তমানে গ্রামের শেষে বা নগর প্রান্তবাসী 'চন্ডাল' শ্রেণীর অন্ত্যজদের বলা হয় 'অন্তেবাসী'

শুধু চন্ডালদের ক্ষেত্রেই শব্দটি প্রযোজ্য বলে আমরা বর্তমানে আলোচনায় 'অন্তেবাসী' কথাটিকে ব্যবহার করব না। কিন্তু ' অন্ত্যজ' শব্দের পরিবর্তে আমরা বর্তমান আলোচনায় ' 'ব্রাত্য' শব্দটির প্রয়োগ করব। প্রাচীন বৈদিক ধারার আর্য ভাষীরা সমাজরীতির দিক দিয়ে দুটি দলে বিভক্ত ছিল। "প্রথম দল যাযাবর ও প্রধান - নাম 'গ্রাম্য' এবং দ্বিতীয় দল, যাহাদের মর্যদা গ্রাম্যদের তুলনায় অনেক কম ছিল, তাহাদের নাম ছিল 'ব্রাত্য'। পরবর্তীকালে শব্দটির আসল অর্থ লোপ পাওয়ায় নিন্দার্থক অর্থ আসিয়া যায়, এবং তাহা হইতে ব্রতবাহ্য অর্থাৎ আর্য সংস্কৃতিচ্যুত এই মানে দাঁড়াইয়া যায়"।

ব্রত+য (হীনার্থে) - অর্থ, সংস্কারহীন যজ্ঞ –এই হল আক্ষরিক অর্থ। 'ব্রাত' অর্থাৎ সমূহ শব্দ থেকে মনু গায়ত্রীহীন ব্রাহ্মণকে বলেছেন 'ব্রাত্য'। অথর্ববেদ ব্রাত্যদের প্রশংসায় মুখর। এই বেদকে বলা হত ব্রাত্যদের বেদ। যজ্ঞোপবীতের কাল অতীত হয়ে গেলে সেই সাবিত্রী পতিত ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়-বৈশ্যরা 'ব্রাত্য' নামে অভিহিত হত। এরা আর্যদের কাছে নিন্দনীয়।

কিন্তু এ বিষয়ে ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার বলেছেন - "The Aryanization of Bengal may be said to have commenced in right earnest the closing centuries of the first millennium B.C." এতে দেখা যাচ্ছে যে, আর্যসমাজে যে দলের মর্যাদা কম ছিল সেই দলকেই প্রথমে 'ব্রাত্য' বলা হত। পরে গায়ত্রীহীন ব্রাহ্মণদেরই শুধু বলা হয়েছে 'ব্রাত্য'। আরো পরে সাবিত্রীপতিত ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যরা আর্যসংস্কৃতিচ্যুত হয়ে 'ব্রাত্য' নামে পরিচিতি লাভ করেছেন। এই ব্যাপক অর্থে আর্য-সংস্কৃতি থেকে শুধু চ্যুত নয়, যাদের সঙ্গে আর্য সংস্কৃতির কোনো সম্পর্ক নেই, সেইসব বর্ণ বা জাতিকেও 'ব্রাত্য' বলা চলে। আর তাই 'অন্ত্যজ' শব্দের পরিবর্তে 'ব্রাত্য' শব্দটির প্রয়োগে হয়তো ভুল হয় না। বর্তমানে ইংরাজী 'Depressed' বা 'Downtrodden'-এর বাংলা প্রতিশব্দ রূপে 'দলিত' কথাটির ব্যবহার করলে বোধ হয় কোন ভুল করা হয় না।

অন্ত্যজ জীবন নিয়ে গবেষণা ভিত্তিক দৃষ্টিভঙ্গি

আমাদের আলোচ্য বিষয় স্বাধীনোত্তর পর্বে বাংলা উপন্যাস ও ছোটগল্পে অন্ত্যজ জীবন। কিন্তু এ বিষয়টি আলোচনার পূর্বে আমাদের দেখে নিতে হবে ঠিক কোন্ সময় থেকে বাংলা সাহিত্যে অন্ত্যজ জীবনের স্বরূপ উদ্ঘাটিত হয়েছে, তা আলোচনা না করলে আমাদের আলোচনা

অসম্পূর্ণই থেকে যাবে। প্রাচীন বাংলা সাহিত্যে চর্যাগীতির রচনাকারগণ ছিলেন বেদ-বহির্ভূত সমাজের মানুষ। ডোম্বী, কামলী, শবর প্রভৃতি অধিকাংশই ছিলেন উচ্চবর্ণীয়দের চোখে অস্পৃশ্য ব্রাত্য। এঁদের রচনায় ডোম-ডোমনী, চন্ডালী, শুন্ডিনী, শবর-শবরী, ব্যাধ, জেলে, কাঠুরিয়া, ধুনুরী প্রভৃতি অস্পৃশ্যরা স্থান পয়েছেন। এঁদের জীবনের দিকে তাঁদের সাগ্রহ অনুরাগমূলক দৃষ্টি লক্ষ্য করা গেছে। অথচ সমাজের অভিজাত উচ্চবর্ণীয়েরা এঁদের স্পর্শ বাঁচিয়ে চলতেন।

"নগর বাহিরেঁ ডোম্বী তোহেরি কুড়িআ।
ছোই ছোই জাহ সো ব্রাহ্মণ-নাড়িয়া ॥"

- (কাহ্নপদ ৩৩ নং পদ)

এঁদের স্পর্শে সমাজ-জীবন যাতে কলুষিত না হয়, তারই জন্য নগরের বাইরে ব্রাহ্মণেরা তাঁদের বাসস্থান নিদিষ্ট করে দিতেন। কিন্তু এই অন্ত্যজ শ্রেণীর মধ্যেই বিদ্যা বুদ্ধিতে ও অধ্যাত্মজীবনবোধে উন্নত সিদ্ধাচার্যেরা ছিলেন। এঁরা শবর-শবরীর কথা তাঁদের সাহিত্যে বারবার এনেছেন। আর এই শবর-শবরী সম্পর্কে প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের এক বিশেষজ্ঞ অধ্যাপক বলেছেন ঃ

"রামায়ণে শবরী ধর্মপ্রাণা নারী, তন্ত্রে শবরী মহাশক্তি, বৌদ্ধমতে শবরী স্বয়ং বজ্রধর, শবরী নৈরাত্মা। চর্যাটীকা মতেও শবর বিষয়-বিহ্বল চিত্ত উন্মত্ত। সা এব পরিধর আর শবরী শবরস্য গৃহিনী জ্ঞানমুদ্রা আকারজা, অর্থাৎ নৈরামণি। দেহের শীর্ষ কমলে সহজ মহাসুখ চক্রে তাঁদের মিলন মহাসুখ।"

সমাজে শবর-শবরীর এই ভূমিকা নিঃসন্দেহে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। "কৃষি নিপুণ সৌন্দর্যভোগ-প্রবণ অথচ অধ্যাত্ম অনুভূতিসম্পন্ন এই জন গোষ্ঠী একদিন ছিলেন এ-দেশের কর্ম, রুচি ও জ্ঞানের নিয়ন্তা।"

তাই সাধারণভাবে এ-যুগের অন্ত্যজ মানুষদের প্রতি মুষ্টিমেয় উচ্চবর্ণীয়দের যতই অবজ্ঞা থাক, তারা এ-কালের সাধক সাহিত্যস্রষ্টাদের নিকট শ্রদ্ধা-সম্ভ্রমই লাভ করেছে।

মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে তথাকথিত নিম্নশ্রেণীর মানুষদের কথা থাকলেও তাদের সুখ-দঃখ ও জীবন কথা বিস্তারিতভাবে উচ্চাবর্ণীয় কবিগণ খুব কমই বলেছেন। ব্রাহ্মণ্য-সংস্কৃতি ও সামাজিক বর্ণবিন্যাস মধ্যযুগের জনগোষ্ঠীকে যেভাবে স্মৃতি শাসন জালে আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে ফেলেছিল, তাতে তাদের মনুষ্যত্ব তো স্বাধীনভাবে বিকশিত হতে পারে নি; পরন্তু সুস্থ সংস্কৃতি থেকে তাদের দূরে অবস্থান করতে বাধ্য করা হয়েছে। তবুও এ-যুগের কবিগণ বিশেষত 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে'র কবি বড়ু চন্ডীদাস, বিভিন্ন মঙ্গল কাব্যের কবিগণ, মৈমন সিংহ গীতিকা ও পূর্ববঙ্গগীতিকার রচয়িতারা অন্ত্যজ শ্রেণীর মানুষদের সাহিত্য থেকে নির্বাসিত করতে পারেননি। একথা সত্য যে তুর্কী আক্রমণের ফলস্বরূপ সমাজের বৃহত্তর অন্ত্যজ শ্রেণীর মানুষদের সঙ্গে সমন্বয় সাধনের প্রয়োজনে উচ্চবর্ণীয় সমাজ বিশেষভাবে সচেষ্ট হয়েছিলেন। আবার এ বিষয়ে রবীন্দ্রনাথ বলেন যে চন্ডী নিষাদ শবরদের দেবতা। আর যেহেতু দেশটাও অন্ত্যজ শ্রেণীর, সেইহেতু "এত দেশ থাকতে ব্রাহ্মণ কবি ব্যাধের মত অন্ত্যজ জাতিকে দিয়ে দেবীর পূজা- প্রচারের গান করিয়েছেন।"

তাই এ-যুগে ব্রাত্য মানুষদের মর্যাদাকে একেবারে ধূলিসাৎ কবিরা করেন নি। ব্যাধ-সন্তান কালকেতু যখন গুজরাট নগরী পত্তন করেছে, সেখানে নানা জাতি বাস করতে এলেও তাদের মধ্যে সাম্প্রদায়িক বিভেদের কথা আমরা পাই না। এ-সমাজ ব্যবস্থায় কায়েমী স্বার্থন্বেষী গোষ্ঠী মাথা চাড়া দিয়ে উঠতে পারে নি। বৃন্দাবন দাসের 'চেতন্য ভাগবত'- এ ব্রাহ্মণদের বৃত্তিকেই তো হেয় করতে দেখা যায়-

"প্রভু কহে সন্ধি কার্য জ্ঞান নাহি যার।
কলিযুগে ভট্টাচার্য পদবী তাহার॥"

এই মধ্যযুগে অন্ত্যজদের বৃত্তি গ্রহণে বর্ণ কোন বাধা হয়ে দাঁড়ায়নি। জীবনধারণের প্রয়োজনে বৃত্তি পরিবর্তনেরও স্বাধীনতা ছিল। মুকুন্দরামের চন্ডীমঙ্গল কাব্যে গোপ জাতির মানুষ পশুপালন বৃত্তি ত্যাগ করে কৃষিকর্মে নিযুক্ত হয়েছে দেখি -' পল্লব গোপ যৈসে পুরে কান্ধে ভার বিক্রী করে।' এই চন্ডীমঙ্গল কাব্যে দেখি তৈল-ব্যবসায়ী তিলি জাতি তেল বিক্রী ছেড়ে দিয়ে তৈল-পেষণ কর্মে নিযুক্ত হয়ে 'কলু' নামে পরিচিত হয়েছে - 'কলু নগরে পিড়ে ঘানী'। মধ্যযুগে অন্ত্যজ শ্রেণীর ভূস্বামিদেরও কথা পাই। অষ্টাদশ শতকে বাগদিরাজ শোভা সিংহ সামাজিক প্রতিষ্ঠালাভের জন্য দেবালয় তৈরী করেছিলেন। ব্রাহ্মণ কবিগণ এইসব অন্ত্যজ শ্রেণীর রাজা ও ভূস্বামীদের মহিমা কীর্তন করেছেন। শুধু শোভা সিংহই নয়, বিষ্ণুপুরের অন্ত্যজ শ্রেণীর রাজারাও সগৌরবে সমাজ শাসন করে গেছেন - অথচ উচ্চবর্গের মানুষ তার বিরোধিতা করেনি।

জ্ঞানার্জন বা শিক্ষার ক্ষেত্রে ব্রাহ্মণদের একচেটিয়া অধিকার থাকলেও অন্ত্যজ শ্রেণীর মানুষদের আগ্রহ ও জ্ঞান চর্চাকে তাঁরা অবজ্ঞা করেন নি। রামাই পন্ডিত ব্রাত্য হয়েও 'শূন্য পুরাণ' এবং অন্ত্যজ রামদাস আদক 'ধর্মমঙ্গল কাব্য' লিখেছেন। একালের পুঁথিতে এমন কিছু পদবী ও নাম মেলে যা অন্ত্যজ শ্রেণীর মানুষদেরই। তাই বুঝি, যুগী প্রভৃতি ব্রাত্য বা অন্ত্যজ মানুষদের এ কাজে ব্রতী হতে দেখা গেছে কিংবা তারা পুঁথির মালিক হয়ে অন্য উচ্চতর-বর্ণীয়দের দিয়ে তা লিখিয়ে নিয়েছেন। আবার শিক্ষার বিস্তারে মধ্যযুগে একটি সময়ে ডোম পন্ডিতদের পাঠশালাগুলিরও ভূমিকা ছিল। তবুও অন্ত্যজ শ্রেণীর মানুষেরা মধ্যযুগে নিজেদের সর্বক্ষেত্রে বিকশিত করে তোলার পূর্ণ স্বাধীনতা পায়নি একদল স্বার্থান্ধ উচ্চবর্ণীয়দের চক্রান্তে। তাই সমাজে অপাংক্তেয় ও দূরবর্তী হয়ে থাকার বিষয়টিকে অনিবার্য বিধিলিপি বলেই তারা মেনে নিয়েছিল। এর থেকে বেদনাদায়ক ঘটনা আর কি হতে পারে? আর তাই মুকুন্দরামের চন্ডীমঙ্গল কাব্যের কালকেতু এই দীনতা ও সংকোচ নিয়ে বলেছিল ঃ

"অতি নীচ কুলে জন্ম জাতি গো চোয়াড়।
কেহ না পরশে জল লোকে বলে রাড়॥
পুরোধা আমার হবে কেমনে ব্রাহ্মণ।
নীচ কি উত্তম হবে পাইলে বহু ধন।"

আধুনিক যুগে অর্থাৎ ঊনবিংশ শতাব্দীতে ইংরেজী শিক্ষিত বাঙ্গালী সমাজ সংস্কার মুক্তির

আদর্শে উদ্বুদ্ধ হল, যুক্তি ও বিচারবোধ দ্বারা চালিত হল। পরাধীনতার নাগপাশ থেকে মুক্ত হতে, শক্তিশালী ঐক্যবদ্ধ জাতি গঠনের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধ হল। সেই সাথে রাম মোহন রায় (১৭৭২-৭৪-১৮৩৩) বিদ্যাসাগর (১৮২০-১৮৯১), শ্রীরামকৃষ্ণ (১৮৩৩-১৮৮৬), বিবেকানন্দ (১৮৬১-১৯০২) প্রমুখ মনীষীর জাতি ধর্ম নির্বিশেষে মানুষের প্রতি ভালোবাসার প্রভাবে ব্রাত্যজন সম্পর্কে সামাজিক দৃষ্টি ভঙ্গি ক্রমশঃ পরিবর্তিত হল। এর প্রতিফলন পড়ল ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধের সাহিত্যে এবং ব্যাপকভাবে বিংশ শতাব্দীর সাহিত্যে।

বাংলা নাটকে, কাব্যে, উপন্যাসে অন্ত্যজ জীবনের রূপরেখা নানা ভাবে এই সময়ে অঙ্কিত হতে লাগল। নাটকের ক্ষেত্রে দেখি, মধুসূদনের (১৮২৪-১৮৭৩) 'বুড়ো শালিখের ঘাড়ে রোঁ' প্রহসনে (১৮৬০), দীনবন্ধু মিত্রের (১৮৩০-১৮৭৩) 'নীলদর্পন নাটকে' (১৮৬০), মীর মশারফ হোসেনের (১৮৪৮-১৯১২)'জমিদার দর্পণ' নাটকে, গিরিশচন্দ্রের (১৮৪৪-১৯১১) 'বিল্বমঙ্গল' নাটকে (১৮৮৮), বিজন ভট্টাচার্যের (১৯১৫-১৯৭৮)'নবান্ন' নাটকে (১৯৪৪), মন্মথ রায়ের(১৮১৯-১৯৮৮)'রাজপুরী' নাটকে অত্যাচারিত, অবহেলিত, ঘৃণ্য অন্ত্যজ শ্রেণীর মানুষের প্রতি লেখকদের সহানুভূতি প্রকাশিত।

কাব্য-কবিতার ক্ষেত্রে দেখি, রবীন্দ্রনাথের(১৮৬১-১৯৪১) 'দুইবিঘা জমি', 'পুরাতন ভৃত্য' কবিতায় অন্ত্যজ মানুষ কবি-সহানুভূতিপুষ্ঠ। রবীন্দ্রনাথেরই 'পুণশ্চ' কাব্যের(১৯৩২) 'মুক্তি', 'শুচি', 'স্নানযাত্রা' কবিতায় অন্ত্যজ মানুষ ধর্মপথের দিশারী হয়েছে। 'স্নানযাত্রা' কবিতায় সাধক পন্ডিতের-'অব্রাহ্মণ নও তুমি তাত' - উক্তি অন্ত্যজ মানুষ সম্পর্কে এ যুগের মানুষের দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তনের উল্লেখযোগ্য সাক্ষ্য। সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের (১৮৮২-১৯২২) 'মেথর', 'শূদ্র' কবিতায় এবং নজরুল ইসলামের (১৮৯৭-১৯৭৬) 'কুলিমজুর' কবিতায় অন্ত্যজ মানুষ মর্যাদায় আসীন।

বাংলা উপন্যাসের ক্ষেত্রে দেখি, আধুনিক কালে অন্ত্যজ মানুষ অন্ত্যজ জীবন-কেন্দ্রিক রচনায় যথেষ্ট মননশীলতার সঙ্গে ও বাস্তবতার সাথে সাযুজ্য রেখেই চিত্রিত হয়েছে। বরীন্দ্রনাথের 'গোরা' (১৯১০) উপন্যাসে গোরার চরঘোষপুর ভ্রমণের অনুষঙ্গে অন্ত্যজ মানুষের চিত্র লিপিবদ্ধ হয়েছে। শরৎচন্দ্রের(১৮৭৬-১৯৩৮) 'চরিত্রহীন'(১৯১৭), 'অরক্ষণীয়া' (১৯১৬), উপন্যাসে সমাজ-অবহেলিত অন্ত্যজ মানুষের প্রতি লেখকের সহৃদয়তা প্রকাশিত হয়েছে। বিভূতিভূষণের (১৮৯৪-১৯৫০)'আরণ্যক' (১৯৩৯) উপন্যাসে অসহায় গাঙ্গোতা-মাহাতো জীবনের কথা সহানুভূতিশীলতার সঙ্গে চিত্রিত হয়েছে।

বাংলা ছোটগল্পের ক্ষেত্রে দেখি, বাংলা ছোট গল্পের জন্মলগ্ন থেকে আজ পর্যন্ত প্রায় প্রত্যেক গল্পকারের গল্পেই অন্ত্যজ জীবনের কথা কম বেশি স্থান পেয়েছে। বাংলা ছোট গল্পের সার্থক স্রষ্টা রবীন্দনাথ ঠাকুর থেকে শুরু করে একালের ভগীরথ মিশ্র, অমর মিত্র, কিন্নর রায়, আপসার আমেদ পর্যন্ত সমস্ত লেখকই তাঁদের কোন না কোন গল্পের বিষয় হিসেবে অন্ত্যজ জীবনকে গ্রহণ করেছেন। প্রভাত কুমার মুখোপাধ্যায়ের (১৮৭৩-১৯৩২) 'হীরলাল' গল্পে হীরালাল ডোমের মনের সুন্দর সুকুমার বৃত্তি ও মানবিক সমানুভূতি প্রকাশিত। তারাশংকরের(১৮৯৮-১৯৭১) 'ডাকহরকরা'

গল্পের মেল-রানার দীনু ডোমের চারিত্রিক সততা ও মহানুভবতার পরিচয় গল্প-বিষয় হয়েছে। শরৎচন্দ্রের(১৮৭৬-১৯৩৮) 'বিলাসী' গল্পে মাল-জাতের মেয়ে বিলাসী মালোর অনন্য সাধারণ মহিমামন্ডিত প্রেম কাহিনী বর্ণিত।

ফলকথা, বিংশ শতাব্দীর বাংলা সাহিত্যের বিভিন্ন শাখায় অন্ত্যজ মানুষ এলো ব্যাপকভাবে। তারা পেল সত্যিকারের মানুষের মর্যাদা। তাদের প্রতি শতাব্দী-পুঞ্জিত অপমান, লাঞ্ছনা ও অত্যাচরের বিরুদ্ধে লেখকরা সোচ্চার হলেন। আর্থ-সামাজিক এই পটভূমির উপর দাঁড়িয়ে বর্তমান মূল গবেষণাকর্মে 'স্বাধীনোত্তর পর্বে বাংলা উপন্যাস ও ছোটগল্পে অন্ত্যজ জীবনের স্বরূপ' কে অনুসন্ধান করব।

প্রথম অধ্যায়

প্রথম অধ্যায়

এক: অন্ত্যজ জীবনের স্বরূপ সন্ধান

"পূর্বে আমরা 'অন্ত্যজ' শব্দটির মূল অর্থ ও পরবর্তীকালে তার অর্থ কীরূপ নিয়েছে, সে বিষয়ে আলোচনা করেছি। এখানে শুধু বলতে চাই যে, 'অন্ত্যজ' শব্দের আক্ষরিক অর্থ হল ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য-এই তিন বর্ণ জন্মের পর শেষজাত চতুর্থ বর্ণ শূদ্র। ঋক বেদের বিরাট পুরুষের বিভিন্ন অঙ্গজাত বর্ণগুলির মধ্যে শূদ্র তাঁর চরণ-দেশ থেকে শেষে জাত বলে ঘৃণ্য বা অবজ্ঞাত ছিল না। অনেক পরের অন্ত্য(শূদ্র) থেকে জাত অর্থাৎ শূদ্রের ঔরসে উচ্চবর্ণের স্ত্রীর গর্ভে 'প্রতিলোমজ' সন্তানদের 'অন্ত্যজ' বা 'চন্ডাল' বলা হল। শাস্ত্র সম্মত সবর্ণ এবং অসবর্ণ বিবাহের পর সামাজিক প্রথা লঙ্ঘন দ্বারা ভ্রষ্ট-সংস্রবের সন্তানদের অন্ত্যজ বলা হয়েছে স্মৃতি শাস্ত্রে। এখন ' অন্ত' শব্দের অর্থ 'নীচ' মনে করা হয় এবং নীচ কুলজাত, অধম নীচাশয়-অস্পৃশ্য ব্যক্তি 'অন্ত্যজ' নামে অভিহিত হয়।

আর্য সমাজের বাইরে যে সকল জাতি বেদবিহিত নিয়ম-নীতি মানেন না এবং যাঁদের উচ্চতর সংস্কৃতি বলতে কিছু নেই সেই অষ্ট্রিক গোষ্ঠীর কোল, ভীল, সাঁওতাল, শবর, কিরাত, কুরকু প্রভৃতি জাতিদের এবং বৈদিক যুগের দাস বা দস্যু, ব্রাত্য এবং নিষাদদেরও আমরা অন্ত্যজ অর্থে নীচজাতি ধরে নিয়ে এদেরও বুঝে থাকি। তাছাড়া,মোঙ্গলয়েড,গোষ্ঠীর কোচ প্রভৃতিও অন্ত্যজ শ্রেণীর অন্তর্গত।"

দুই: আদি যুগের বাংলা সাহিত্য

এই পর্বে, আদি যুগের বাংলা সাহিত্য অর্থাৎ চর্যাপদ, মৌখিক সাহিত্য বা লোকসাহিত্য, শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্য এবং মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্য – অনুবাদ সাহিত্য ও মঙ্গল কাব্যগুলি আলোচিত হয়েছে।

উপরোক্ত সাহিত্যে অন্ত্যজ জীবনের যে ছবি বর্ণিত হয়েছে তার একটা সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়ার চেষ্টা করেছি মূল গবেষণাকর্মে।

দ্বিতীয় অধ্যায়

দ্বিতীয় অধ্যায়

স্বাধীনতাপূর্ব বাংলা কথাসাহিত্য ও অন্ত্যজ জীবন

আধুনিক যুগের বাংলা সাহিত্য গড়ে ওঠেছিল কোলকাতার নগর জীবনকে কেন্দ্র করে। কবি সাহিত্যিকের দৃষ্টি ছিল কোলকাতার নাগরিক জীবনের প্রতি। কোলকাতা তখন আধুনিকতার পীঠস্থান । পাশ্চাত্য শিক্ষা-সংস্কৃতি এই সময়কে আচ্ছন্ন করেছে। পাশ্চাত্য সাহিত্যের প্রভাবে সৃষ্ট হয়েছে কাব্য উপন্যাসাদি ও ছোট গল্প।

বাংলা সাহিত্যে যথার্থ উপন্যাসের স্রষ্টা হলেন বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় যাঁকে 'সব্যসাচী' বলে আখ্যায়িত করা হয়। ১৮৬৫ সালে 'দুর্গেশনন্দিনী' উপন্যাস দিয়েই বাংলা সাহিত্যে উপন্যাসের জয়যাত্রা শুরু, কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র অন্ত্যজ শ্রেণীর মানুষদের নিয়ে উপন্যাস লেখেননি এবং ছোট গল্পও তিনি লেখেননি। বাংলা উপন্যাসের প্রথম শিল্পী যেমন বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, তেমনি ছোট গল্পের প্রবর্তক ও প্রথম শিল্পী হলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। ১৮৮৪-তে রবীন্দ্রনাথের 'ঘাটের কথা' ও 'রাজপথের কথা' দিয়ে বাংলা ছোট গল্পের জয়যাত্রা শুরু। অর্থাৎ উপন্যাসের জন্ম আগে, ১৮৬৫-তে এবং ছোট গল্পের জন্ম পরে, ১৮৮৪-তে। উপন্যাস ও ছোট গল্পের জন্মকালের ব্যবধান উনিশ বছর। কিন্তু বাংলা ছোট গল্পে অন্ত্যজ জীবনের উপস্থিতি প্রথম দেখতে পায় রবীন্দ্রনাথের 'শাস্তি' (১৩০০) গল্পে এবং তার পরে দেখতে পাই শরৎচন্দ্রের 'বিলাসী' (১৩২৫) ও 'অভাগীর স্বর্গ'(১৩২৯) গল্পদ্বয়ে; এই সময় কার আরো কথাসাহিত্যিক আছেন যাঁদের কথাসাহিত্য অন্ত্যজ শ্রেণীর মানুষদের নিয়ে লেখা। যেমন - তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'বাউল' (১৩৪০), 'ডাকহরকরা' (১৩৪৩), 'যাদুকরী' (১৩৪৮) 'নারী ও নাগিনী' (১৩৪১), 'স্থলপদ্ম' (১৩৩৫), 'চৌকিদার' (১৩৪৫) প্রভৃতি ছোট গল্প। বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'আমার ছাত্র', 'রাসুহাড়ি', প্রভৃতি ছোট গল্প এবং 'আরণ্যক' (১৩৩৯) উপন্যাসে অন্ত্যজ শ্রেণীর মানুষদের উপস্থিতি দেখতে পাই। বনফুলের 'বুধনি', 'প্রমাণ' প্রভৃতি ছোট গল্পে অন্ত্যজ মানুষদের কথা বর্ণিত হয়েছে। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়-এর 'প্রাগৈতিহাসিক' ছোট গল্প ও 'পদ্মনদীর মাঝি' (১৯৩৬) উপন্যাসে ও এই অন্ত্যজ শ্রেণীর মানুষের পুঙ্খানুপুঙ্খ চিত্র আছে। এছাড়া অন্যান্য অনেক কথা সাহিত্যিকের কথাসাহিত্যে অন্ত্যজ জীবনের ছবি দেখতে পাব। কিন্তু আমাদের আলোচ্য 'স্বাধীনোত্তর পূর্ব বাংলা কথা সাহিত্যে অন্ত্যজ জীবনের ছবি', তাই স্বাধীনতাপূর্ব বাংলা কথা সাহিত্য নিয়ে বিস্তারিত আলোচনায় যাব না। উপরিউক্ত ছোট গল্প ও উপন্যাস গুলি আলোচনা করেই স্বাধীনতা পূর্ববর্তী বাংলা কথা সাহিত্যে অন্ত্যজ জীবনের পুঙ্খানুপুঙ্খ চিত্র তুলে ধরার চেষ্টা করেছি এবং সেই ভিত্তিতে প্রয়োজনীয় আলোচনা করা হয়েছে মূল গবেষণাকর্মে।

তৃতীয় অধ্যায়

তৃতীয় অধ্যায়

স্বাধীনোত্তরপর্বে বাংলা উপন্যাস ও অন্ত্যজ জীবন

১৯৪৭ সালের ১৫ই আগষ্ট এলো বহু-কাঙ্ক্ষিত স্বাধীনতা। কিন্তু এই স্বাধীনতা অন্ত্যজ মানুষদের স্বাধীন করতে পারেনি। তাদের অবস্থা যে তিমিরে ছিল সেই তিমিরেই থেকে গেল। প্রভুর পরিবর্তন হল অর্থাৎ ইংরেজ চলে গেল, আর দেশের উচ্চবর্ণীয়েরা শোষণের জন্য প্রস্তুত হল। চিরকালই সমাজ এদের কাজে লাগিয়েছে, আর বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই প্রয়োজন ফুরিয়ে গেলে বর্জ্য-পদার্থের মতো ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছে। তাই ভারতবর্ষের স্বাধীনতা তথা বাংলার স্বাধীনতা অন্ত্যজদের স্বাধীন করেনি।

স্বাধীনতার সঙ্গে সঙ্গে হল দেশ ভাগ। দেশ ভাগের পর ওপার বাংলার গৃহহীন মানুষের স্রোত এপার বাংলায় ধাক্কা খেয়েছে ; খুঁজেছে বেঁচে থাকার ঠিকানা। যারা সঠিক ঠিকানা খুঁজে পেল না অর্থাৎ সমাজের স্তরবিন্য সে তারা যে পরিচয়ে পরিচিত ছিল - সে পরিচয় ঘুচে, তাদের মধ্যে অনেকেই নিক্ষিপ্ত হল সমাজের একেবারে নিচু স্তরে অন্ত্যজদের ভিড়ে সামিল হল। এও এক অভিনব সমস্যা । যার হদিশ পাব স্বাধিনোত্তরপর্বে বিভিন্ন ঔপন্যাসিকের উপন্যাসে ।

স্বাধীনোত্তরপর্বে কৃষি জমিতে গড়ে উঠেছে কলকারখানা, কৃষি কৌশলে এসেছে আধুনিকীকরণ। কৃষকেরা কৃষি শ্রমিকে পরিণত হয়েছে। গ্রামের মানুষ তাদের বংশগত পেশা ত্যাগ করে, দলে দলে কলকারখানা ও কয়লাখাদের শ্রমিকে পরিণত হয়েছে । গ্রামে যারা থেকে গেছে, সেই কৃষক ও ক্ষেত মজুরদের ওপরেও আছে নানান রকম জুলুম ও অত্যাচার । এই অত্যাচারের বিরুদ্ধে শুরু হয় কৃষক আন্দোলন। স্বাধীনতার পরিণতি অন্ত্যজ মানুষদের জীবনে কোনো সুখের বার্তা বহন করে আনেনি। আশা ছিল অনেক কিন্তু ফলাফল সেই তুলনায় শূন্য কিন্তু এই শূন্যতার মাঝেও যে অন্ত্যজ জীবনের মূল্যকে তুলে ধরা হয়েছে এবং তাদের জীবনে সামাজিক দৃষ্টি ভঙ্গির আলোকছটা প্রতিফলিত হয়েছে তার নিদর্শন আমরা দেখতে পাই স্বাধীনোত্তরপর্বে প্রতিষ্ঠিত লেখক এবং লেখিকার রচনায়। প্রসঙ্গক্রমে এই দিক গুলিকেই অর্থাৎ এই বিষয়ে আলোকপাত করতে গিয়ে মূল গবেষণাকর্মে আলোচিত হয়েছে তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'হাঁসুলী বাঁকের উপকথা' ও 'নাগিনী কন্যার কাহিনী', বিভূতি ভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'ইছামতী', সমরেশ বসুর 'উত্তরঙ্গ', 'গঙ্গা' ও 'মহাকালের রথের ঘোড়া', মহাশ্বেতা দেবীর 'অরণ্যের অধিকার' ও 'কবি বন্দ্য ঘটী গাঞির জীবন ও মৃত্যু', অদ্বৈত মল্লবর্মণের 'তিতাস একটি নদীর নাম' এবং সতীনাথ ভাদুড়ীর 'ঢোঁড়াই চরিত মানস'। উপরিল্লেখিত উপন্যাসগুলিকে অন্ত্যজ জীবনের সুখ-দুঃখের, হাসি-কান্নার ছবি কতটা জীবন্তভাবে ধরা পড়েছে, মূল গবেষণাকর্মে তার পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনার চেষ্টা করেছি।

চতুর্থ অধ্যায়

চতুর্থ অধ্যায়

স্বাধীনোত্তর পর্বে বাংলা ছোট গল্প ও অন্ত্যজ জীবন

রবীন্দ্রনাথ-প্রভাতকুমার-শরৎচন্দ্র বাংলা ছোটগল্পধারায় ব্যতিক্রম রূপে দেখা দিলেন কল্লোল ও বিচিত্রা গোষ্ঠীর লেখকরা। বাংলা ছোট গল্পে পালা বদলের সূচনা হয়েছে এঁদের লেখায়। 'তেলেনাপোতা আবিস্কার' (প্রেমেন্দ্র মিত্র), 'জলসা ঘর' (তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়), 'দুই বার রাজা' (অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত), 'প্রাগৈতিহাসিক' (মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়) : এই সব গল্প প্রমাণ করে সেদিন বাংলা ছোট গল্পের পালে লেগেছিল ঝোড়ো হাওয়া। শান্ত সুস্থিত নিরাপদ মূল্যবোধ ও জীবন-দৃষ্টির বন্ধন ছেড়ে অজানা বিক্ষুব্ধ জীবন সমুদ্রে বেরিয়ে পড়ার আহ্বান ছিল ঐ সময়কার গল্পে।

"কল্লোল-পরবর্তী পর্বের সূচনা দ্বিতীয় বিশ্ব সমরের আরম্ভকাল, শেষ স্বাধীনতা-প্রাপ্তি ও দেশ বিভাগ (১৯৩৯-৪৭)। অল্প বিস্তর এই দশটি (১৯৩৯-৪৭) বছর বাংলার সমাজে ও রাষ্ট্রে কালান্তরের পর্ব। মন্বন্তর, নিষ্প্রদীপ, বিমান হানা, কন্ট্রোল, রেশনিং, মিলিটারী সাপ্লাই, যুদ্ধকালীন কলকাতার সমাজ জীবনের অধোগতি, অর্থনৈতিক বিপর্যয়, নৈতিক মূল্যবোধের বিনষ্টি, দাঙ্গা, স্বাধীনতা প্রাপ্তি, দেশ বিভাগ ও উদ্বাস্তু-স্রোত। এই পর্বের মধ্যে দিয়ে এত বিপর্যয়কারী ঘটনা ঘটে গিয়েছে। এই পর্বে যাঁরা সাহিত্য রচনায় হাত দিয়েছেন, সাহিত্য চেতনা উন্মেষের সঙ্গে সঙ্গে এই আলোড়িত বিপর্যস্ত যুগের সঙ্গে তাঁদের প্রত্যক্ষ পরিচয় ঘটেছে। এই পর্বে সামাজিক বাতাবরণ অশান্ত, বিক্ষুব্ধ। এই বাতাবরণ তাঁদের দৃষ্টিকে কিছুটা ব্যাহত, তীক্ষ্ণ ও আবিল করে তুলেছে।

এই অস্থির স্বৈর বৃত্ত কাল তার সমস্ত বিক্ষোভ, সংশয়, অশান্তি ও সুতীক্ষ্ণ জীবন-জিজ্ঞাসার সাক্ষর রেখে গেছে এই পর্বের ছোট গল্প।"

স্বাধীনতা প্রাপ্তি মুহূর্তে যেসব গল্প লেখকের বয়স তিরিশের কাছাকাছি তাঁদের কাছে স্বাধীনতা এল বিবর্ণ অনুজ্জ্বল ধূসর দিনের ইঙ্গিত নিয়ে। তরুণ সূর্যের প্রত্যাশায় তাঁদের চিত্ত উন্মুখ হয়ে উঠেছিল, –একথা বলা যায় না। স্বভাবতই এঁরা কিছুটা হতাশ, বিশ্বাসরিক্ত, পরিবেশ সচেতন এবং বাস্তববাদী, কেননা এঁদের প্রায় সকলেই এসেছেন নিম্ন মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় থেকে।

স্বাধীনোত্তর পর্বে অন্ত্যজ শ্রেণীর মানুষদের নিয়ে প্রায় সব লেখকই কমবেশী গল্প লিখেছেন। এঁদের মধ্যে– তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, নরেন্দ্রনাথ মিত্র, কমল কুমার মজুমদার, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় নবেন্দু ঘোষ, সতীনাথ ভাদুড়ী, গজেন্দ্রকুমার মিত্র, মহাশ্বেতা দেবী, মনোজ বসু, রমাপদ চৌধুরী, সন্তোষ কুমার ঘোষ, বিমল কর, সমরেশ বসু, সমরেশ মজুমদার, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ, দিব্যেন্দু পালিত, সাধন চট্টোপাধ্যায়, ভগীরথ মিশ্র, আবুল বাশার, স্বপ্নময় চক্রবর্তী, কিন্নর রায় প্রমুখ সাহিত্যিকরা।

উপরোক্ত লেখকদের মধ্যে এই অধ্যায়ে দৃষ্টিকোণে যেসব গল্পকারদের গল্প আলোচনা করেছি, তাঁদের মধ্যে হলেন – তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, নরেন্দ্রনাথ মিত্র, মনোজ বসু, রমাপদ চৌধুরী, সমরেশ বসু, সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ, দেবেশ রায় এবং মহাশ্বেতা দেবী প্রমুখ।

পঞ্চম অধ্যায়

পঞ্চম অধ্যায়

সতীনাথ ভাদুড়ী ও অন্যান্য উল্লেখযোগ্য গল্পকার

এই অধ্যায়ে আলোচনা করেছি সতীনাথ ভাদুড়ীর 'ডাকাতের মা', 'আন্টা বাংলা' এবং 'রথের তলে', অমিয়ভূষণ মজুমদারের 'দুলারহিনদের উপকথা', সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের 'ফুল ও নারী', 'নাম নেই', ও 'মহা পৃথিবী', শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়ের 'পারাপার', লক্ষ্মণ মিস্ত্রির 'জীবন ও সময়', 'বোকা ডাক্তারের দুই রুগী', 'দখল', অসীম রায়ের 'লখিয়ার বাপ', 'ডনাপলা', আবুল বাশারের 'সুখেন গুঁই ও মুথা ঘাস', প্রফুল্ল রায়ের 'সাতঘরিয়া', ও 'বাঘ' এবং অমর মিত্রের 'মেলার দিকের ঘর', 'কোকিল' ও 'আত্মহনন' প্রভৃতি গল্প।

কথাবন্ধ

কথাবন্ধ

বর্তমান প্রসঙ্গটি গবেষণাকর্মের আলোচনার পেক্ষাপটের উপসংহার অংশ। কথাবন্ধ কথাটি উপসংহার হিসেবেই ধরা হয়েছে। সামগ্রিক আলোচনার প্রেক্ষাপটে অথবা মূল্যায়ণের প্রকৃত নির্যাসটুকুই এখানে প্রকাশ করা হয়েছে। স্বাধীনতা উত্তর সমকালীন ইতিহাসকে সামনে রেখে, বাংলা কথাসাহিত্যের (মূলত ঃ উপন্যাস ও ছোটগল্প) বিস্তৃত ক্ষেত্রে অন্ত্যজ সম্প্রদায়ের মানুষের জীবন পরিক্রমার শেষে গুরুত্বপূর্ণ প্রাপ্তীর একটি ধারণা এখানে বিন্যস্ত করা যেতে পারে-

ইতিহাসের সময় এবং বাংলা কথাসাহিত্যের সময় এক খাতে বয়ে না গেলেও ইতিহাসকে অস্বীকার করা যায় না। ইতিহাসের ঘটে যাওয়ার ঘটনার সঙ্গে সঙ্গে সমাজ বিবর্তন ঘটতে বাধ্য, আর অন্ত্যজদের জীবনের পালে লাগে সেই পরিবর্তনের হাওয়া; স্বাভাবিক জীবন-যাত্রায় আসে নানা সংঘাত। রাজনীতি-অর্থনীতি-সমাজ-সংস্কৃতিকে কেন্দ্র করে ঘটে যায় নানা ঘটনা ধারা।

স্বাধীনতার সমকাল বা তার আগে-পরের ইতিহাস যে ঘটনাধারাকে বহন করে নিয়ে গেছে, অন্ত্যজদের জীবনে তার প্রভাব তুলনারহিত। একে তো সমাজের পায়ের তলায় পিষ্ট,তারপর 'মরার উপর খাঁড়ার ঘা'- এর মত এই পরিবর্তনের ঝড়ঝাপটায় স্থান-কাল-পাত্র-সবই বদলে যায় - টিকে থাকার জায়গা, শোষণের পদ্ধতি, প্রভুত্বের স্বরূপ সব।

অর্থনৈতিক এবং সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গির বিচারে দেখা যায় যে, বেশির ভাগ ক্ষেত্রে অন্ত্যজ মানুষ উচ্চবর্ণীয় এবং ধনবান মানুষের দ্বারা শোষিত-অত্যাচারিত। তারা লাঞ্ছিত-নিপীড়িত। অনেকক্ষেত্রে বিনা কারণে তাদের উপর অমানুষিক অত্যাচার হয়েছে। আর সে অত্যাচার করেছে সমাজের উচ্চবর্ণের মানুষেরা। সমাজের উচ্চবিত্তীয় মানুষের কাছে অন্ত্যজ মানুষের জীবনের যেন কোনো মূল্যই নেই! কখনো বিনা কারণে, কখনো অতি সামান্য কারণে, সমাজের উপরতলার মানুষের দ্বারা অন্ত্যজদের লাঞ্ছিত হতে হয়েছেই, মৃত্যুর মতো চূড়ান্ত পরিণতিও প্রায়শই ঘটেছে। পুলিশ - প্রশাসনকে হাত করে, কিংবা নিজস্ব লেঠেল বাহিনীর সাহায্যে কিংবা প্রয়োজনবোধে উচ্চজাতের মানুষ নিজেরা সরাসরি অন্ত্যজদের উপর অত্যাচার-লাঞ্ছনা চালিয়েছে। বিপরীত দিকে অন্ত্যজ মানুষরা নীরবে, প্রতিবাদহীন ভাবে, এই সমস্ত অত্যাচার-নিপীড়ন-লাঞ্ছনাকে মেনে নিতে বাধ্য হয়েছে। উচ্চবর্ণ-শাসিত সমাজে এ ছাড়া তাদের অন্য কোনো পথ নেই বলেই তারা সব অত্যাচার সহ্য করেছে। হাজার হাজার বছর ধরে চলে আসা এই অত্যাচার-নিপীড়নকে যেন উচ্চবর্ণীয় মানুষ নিজেদের অধিকার বলে মনে করেছে।

সামাজিক-রাজনৈতিক-ধর্মীয় বিভিন্ন আন্দোলন এবং তাকে কেন্দ্র করে সামাজিক পালাবদল এক্ষেত্রে বড় রকমের কোনো পারিবর্তন আনতে পারেনি বলেই মনে হয়। ব্যতিক্রম হিসাবে দু'একটি ক্ষেত্রে অন্ত্যজ মানুষকে তাদের উপর নেমে আসা অত্যাচারের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে এবং প্রতিশোধ নিতে দেখা গেছে মাত্র। তবে অত্যাচারিত-লাঞ্ছিত এই মানুষগুলোর প্রতি কথা সাহিত্যিকদের সহানুভূতি প্রায়শই বর্ষিত। তাদের যন্ত্রণাকাতর হৃদয়ের করুণ আর্তি তাই মর্মস্পর্শী রূপ পেয়েছে।

এক কথায় অন্ত্যজদের জীবনের ইতিহাস যেন, উঁচু জাতের মানুষ কর্তৃক অন্ত্যজদের উপর অত্যাচার নিপীড়নের ইতিহাস, দীর্ঘশ্বাস ও হাহাকারের ইতিহাস যন্ত্রণাকাতর মানুষের যন্ত্রণা সহ্য করার ইতিহাস।

অন্ত্যজ জীবনাশ্রয়ী উপন্যাস ও ছোটগল্পগুলি বাংলা সাহিত্যের বিষয়-পরিধির বিস্তার ঘটিয়েছে এবং অজ্ঞাত অপরিচিত বহু বিচিত্র-মানব-মানবীর সঙ্গে আমাদের পরিচয় ঘটিয়েছে। বিচিত্র মতিগতির মানুষের রূপ চিত্রণের মাধ্যমে বাংলা ছোটগল্প ও উপন্যাসের চরিত্রশালা বহুল পরিমানে সমৃদ্ধ হয়েছে। সৎ ভালমানুষ থেকে শুরু করে ভন্ড-বদমাইস, সরল কিংবা জটিল রহস্যময় হৃদয়ের বহু বিচিত্র মানুষের কথায় এসব ক্ষেত্রে বাংলা কথাসাহিত্য মুখর হয়েছে।

দীর্ঘ আলোচনার পথ বেয়ে আসার সময় যে উপন্যাস ও ছোটগল্প গুলিকে চয়ন করেছি, তার মধ্যে থেকে অন্ত্যজ সম্প্রদায়ের মানুষের যে চেহারা বেরিয়ে আসে, তার বেশির ভাগটাই যেন সমাজ বিবর্তনের দমকা হাওয়ায় ভেসে যাওয়া ধূলিকনার মতো - যেভাবে ভেসে গেছে- দাশু ধান্নু, লখাইরা বা তিতাস পাড়ের মালো গোষ্ঠী বা কাহার পাড়ার কাহারেরা। পরিস্থিতির হাতের পুতুল এরা। এদের নিজস্ব কোনো চিন্তা ভাবনা যেন থাকতে পারে না, কোন অস্তিত্ব যেন এদের নেই, নেই অন্তরের 'আমির' উপস্থিতি। কারণটা এই নয় যে, ঔপন্যাসিক বা ছোটগল্পকার তাদের মনের দোরগোড়ায় পৌঁছাতে পারেননি। কারণটা এই যে, সমাজে তাদের কোনো মতে টিকে থাকতে হয়। তাদের ব্যক্তিগত ভালোলাগার মন্দলাগার ব্যাপারটি হয়ে পড়ে উপেক্ষিত - যেখানে তারা তাদের স্বাভাবিক অধিকারগুলি থেকেও বঞ্চিত। এই প্রসঙ্গে একটা দৃষ্টান্ত তুলে আনা যেতে পারে। কবি জীবনানন্দ দাশ তাঁর 'শ্রেষ্ঠ কবিতা' গ্রন্থের অন্তর্গত '১৯৪৬-৪৭' কবিতায় যখন ৪৬-এর বিপন্ন দরিদ্র মানুষগুলির কথা বলছেন, তখন একটি শব্দ ব্যবহার করেছেন- 'আধোঅধিকারিণী'। মরণের আগে এই 'আধোঅধিকারিণী'কে পেলে ভাল হত। এই 'আধোঅধিকারিণী' আপাতভাবে অর্ধাঙ্গিনীকে বোঝালেও 'আধো' কথাটির প্রয়োগ থেকে যে ব্যঞ্জনা বেজে ওঠে, তাতে মনে হয়, এই মানুষগুলি তাদের স্বাভাবিক প্রাপ্তিটুকুও সম্পূর্ণরূপে পায় না। প্রতিটি মুহূর্তে চলে বেঁচে থাকার লড়াই। এক্ষেত্রে আলাদাভাবে পছন্দমতো জীবনযাপনের কোনো প্রশ্নই ওঠে না। পরিস্থিতির চাপে, তার আত্মা ক্ষত-বিক্ষত হওয়ায় আগেই মরে যায়। ভিতরের 'আমির' কোনো পরিচয়ই পায় না তারা; বোঝে, সমাজের ব্যবহারের সামগ্রী তারা - হয়তো বা অজান্তেই ব্যবহৃত হয়ে যায়- যেমনভাবে ব্যবহৃত হয়েছে, রুহিতন, ঢোঁড়াইরা। সেইভাবেই একটা আপোস-মীমাংসাহীন ভাবেই তারা ব্যবহৃত হয় - মাটির ভাঁড়ের মতো। মহাকালের রথ টেনে নিয়ে যাওয়ার দায়িত্বটুকুই তাদের, কিন্তু কেন রথের যাত্রা শুরু হল, রথ কেমন করে পৌঁছাবে; কোথায় পৌঁছোবে - এ জানার অধিকার তাদের নেই। নিজেদের সুখ-দুঃখের অনুভূতি তাদের আলোচনায় ঠাঁই পায় না। যেখানে মানুষের ভালো মন্দকে যাঁচাই করার জন্য 'মন মহারাজ' বসে থাকেন, সেই আসনটা শূণ্যই থেকে যায়। ইতিহাসের স্রোতে ভেসে যায় তাদের দৈনন্দিন গৃহস্থালি । তাই বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই কথা সাহিত্যিক পৌঁছাতে পারেন না বা পৌঁছানের কথা ভাবেন না - সেই মানুষগুলির অন্তর মহলে, কিন্তু ভাবতে অবাক লাগে, এতকিছুর মধ্যেও কখনো কখনো কোন ফাঁক-ফোকর দিয়ে বেরিয়ে আসে তাদের অন্তর। দেখা

দেয় দুই আমির ঘাত-প্রতিঘাত। কখনো বা বাইরের 'আমি' অন্তরের 'আমি' আর বাইরে প্রতিকূলতার মোকাবিলায় বিধস্ত । আর এই আলোড়িত মনকে ছুঁয়ে যায় কথাসাহিত্যকের অনুভূতি - তুলে আনেন সেই অশিক্ষিত অসংস্কৃত, কুসংস্কারাবদ্ধ অন্ত্যজ কিছু মনের টানাপোড়নের অভিব্যক্তিকে।

পথটি বোধ হয় দেখিয়ে ছিলেন রবীন্দ্র নাথ স্বয়ং 'শাস্তি' গল্পের ছিদাম চন্দরার অসাধারণ মনোবিশ্লেষণের মধ্যে দিয়ে। ছিদাম এবং চন্দরা যে, 'কেহ কাহাকেও পরাস্ত করিতে পারিত না।' - এই জেদ এবং মানসিক জটিলতা, পরিবারে ঘটে যাওয়া দুর্ঘটনার সঙ্গে জড়িয়ে পড়ল এবং মরণের মধ্যে দিয়ে চন্দরা তার স্বামীকে যেন উপহাস করে গেল। অন্ত্যজ মানুষের মনোবিশ্লেষণ পাই মানিক বন্দোপাধ্যায়ের 'পদ্মা নদীর মাঝি' উপন্যাসে কুবের ও কপিলার সম্পর্কের জটিলতার মধ্যে। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের নিতাই কবিয়ালও কতই না অসম্ভব প্রতিকূলতার মধ্যে দিয়ে নিজের অস্তিত্বকে প্রমাণ করেছেন। সমাজের সমস্ত রকম বিদ্রুপকে তুচ্ছ করে আপন কবি প্রতিভায় ভাস্বর হয়েছে। শুধু তাই নয়, এই অন্ত্যজ মানুষটির জীবনে দুই নারীর (ঠাকুর ঝি ও বসন্ত) আবির্ভাবকে কেন্দ্র করে অসাধারণ মনোবিশ্লেষণ করেছেন লেখক। মনে পড়ে তারাশঙ্করের তারিণী মাঝিকে, মানুষের নিজেকে বাঁচানোর স্বাভাবিক প্রবণতায় সে তার প্রাণ প্রিয়া সুখীকে হত্যা করেছিল।

এই অভিসন্দর্ভে যে সকল কথা সাহিত্যিকের লেখনী অন্ত্যজ মানুষের অন্তরকে ছুঁয়ে যায় তার মধ্যে সমরেশ বসুর 'মহাকালের রথের ঘোড়া' উপন্যাসের কথা এই মুহূর্তে মনে পড়ে। 'মহাকালের রথের ঘোড়া'-র রুহিতন কুরমি রাজনীতির প্রত্যক্ষ যোদ্ধা হয়েও ব্যক্তি-আমিকে বিসর্জন দিতে পারে নি। কারাগারের পরিবেশে, সে অন্যমনস্ক হয়েছে, স্ত্রী মঙ্গলাও সন্তান বুধুয়া আর করমার কথা ভেবে; স্মরণ করেছে বিগত দিনের কথা আর ছটফট করেছে । সে জানে, এসব ভাবনা, তাকে ভাবতে নেই, তবুও মনে পড়ে মায়ের গাওয়া গানের কলি রাজনৈতিক জীবনের কর্মশেষে তিক্ত অভিজ্ঞতা নিয়ে ফিরে আসে তার আকস্মিক পারিবারিক শান্তির আশ্রয়ে। শরীরে কুষ্ঠ ব্যাধির চিহ্ন তার স্ত্রী মেনে নিতে পারে নি। জগতে প্রয়োজনহীন অবাঞ্ছিত হয়ে বেঁচে থাকতে চাই নি রুহিতন- ছুটি নিয়েছে জীবন থেকে।

'ঢোঁড়াই চরিত মানসে'র ঢোঁড়াই যখন অবহেলায় বেড়ে উঠেছিল তখন তার মনোজগতের পরিবর্তন অসাধারণ দক্ষতায় তুলে ধরেছেন ঔপন্যাসিক সতীনাথ ভাদুড়ী। একজন অন্ত্যজ কিশোর কেমনভাবে মানসিকভাবে বদলাচ্ছে- সে 'কনৈল' খেলার 'ঘুচ্চি' কাটে না কিন্তু 'মাতুম' গানে যোগ দেয়, 'যুগীরা' নাচের দলে যোগ দেয়, 'কর্মাধর্মায়' নাচের আসরে উপস্থিত থাকে। মেয়েদের সমন্ধে তার মনে কৌতূহল জন্মায়। রামিয়ার প্রতি আকর্ষণ অনুভব করে। নির্জনে বসে ভাবে, 'ছাই রঙের ডানা ওয়ালা বক গুলিকে সাদা বকরা নিশ্চয়ই দেখতে পারে না'। সমাজের চিরাচরিত উচ্চ-নিম্ন ভেদাভেদের প্রসঙ্গটি নিয়ে সে নিজের সঙ্গে আলোচনা করে। এই ধরণের কত কথা সে ভাবে। ঢোঁড়াইয়ের পছন্দ করা ভালোবাসা রামিয়াকেই সে বিয়ে করেছিল কিন্তু রামিয়ার কাছ থেকে প্রত্যাখ্যান লাভ করে ঢোঁড়াই পাড়ি জমায় বৃহত্তর জগতের উদ্দেশ্যে। তার প্রতিবেশ তাকে রাজনীতির দরবারে পৌঁছে দেয় সেখানে সে ব্যবহৃত হয় - আর স্বাভাবিক বুদ্ধি দিয়ে সে বুঝে নেয় জগতের ফাঁকি

গুলো। নিজেকে গুটিয়ে নিয়ে রামায়ণে মনোনিবেশ করে। কিন্তু আবার বাধা পড়ে সে, অসুস্থ অ্যান্টনিকে নিজের ছেলে ভেবে নিয়ে, সেই টানেই ফিরে আসে রামিয়া সীতাকে পাওয়ার আকাঙ্ক্ষায়। সারাটা রাস্তা মনে মনে রামিয়ার সঙ্গেই মান-অভিমানের পালা চলে। কিন্তু এবারেও সে ভুল বুঝেছে। নিঃসঙ্গ ঢোঁড়াই তার একমাত্র ভরসা স্থল রামায়ণের প্রতিও ভরসা হারায়। শুধু মনের মধ্যে থেকে যায়- হয়তো সেই বন্ধনের আকাঙ্ক্ষা-যদি সাগিয়ার সন্ধান মেলে।

তারাশঙ্করের 'হাঁসুলী বাঁকের উপকথা'র বনোয়ারী কাহার সমাজে মাতব্বর হয়ে কাহার সমাজকে ভেঙ্গে যেতে দেখেছিল, সেই সঙ্গে দেখেছিল তার ঘর ভেঙে যেতে। বনোয়ারীর মন জগতের অধিষ্ঠাত্রী দুই নারী কালশশী ও সুবাসী। একদিকে কাহার সমাজকে রক্ষা করতে গিয়ে পরাভূত, অন্যদিকে কালোশশী ঘটিত অপরাধবোধ বা সুবাসীকে কেন্দ্র করে করালীর কাছে পরাজিত হওয়ার অপমান - সবকিছু নিয়েই তার পতন ঘটেছে; মহাকাব্যের নায়কের মতো। প্রতিনিয়ত করালীর সঙ্গে সংঘাতের মধ্যে দিয়ে তার অসাধারণ মনোবিশ্লেষণ করেছেন ঔপন্যাসিক তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়। অসংস্কৃত কাহার নেতা বনোয়ারীর মনোজগতের এই দিকগুলি অনুপুঙ্খভাবে উঠে এসেছে এবং তার চরম অভিব্যক্তি ঘটেছে 'অরণ্য বানরের' মত আচরণের মধ্য দিয়ে।

মধ্যযুগের পেক্ষাপটে সেই যুগ মানসিকতার এক চুয়াড় যুবকের আশ্চর্যজনক ভাবে অক্ষর পরিচয় ঘটেছিল। সেই সঙ্গে সে উপলব্ধি করেছিল, সে কবিতা লিখতে চায়। অবুঝ মনের এই চাহিদা মেটাতে সে পূর্ব পরিচয় ও নাম বদলে কবি বন্দ্য ঘটী গাঞি এই পরিচয়ে পরিচিত হতে চেয়েছিল। এর জন্য তার কোন অপরাধ বোধ ছিল না। পাঁকে জন্ম হওয়াটাতো তার কোন অপরাধ নয়। ব্রাহ্মণরা দ্বীজ হয় কি করে। 'পাখ-পক্ষী' নাগ মুক্তা এরাও দ্বীজ হয় কি করে ! তাহলে তার দ্বীজত্ব প্রাপ্তি স্বীকৃত নয় কেন ! সমাজ এত কথা শুনতে রাজি নয়। বরং এর শাস্তি হাতীর পায়ের তলায় মৃত্যু। কারাগারে নিক্ষেপ করা হয় কবিকে। প্রেমের শক্তিতে পাণিপ্রার্থী ফুল্লরার টানে, কারাগার থেকে পালিয়ে আসে ফুল্লরার কাছে কিন্তু তার প্রেম অপমানিত হয়। ব্যর্থ জীবনের শেষ আশ্রয়, জন্মভূমি নিদয়ার জঙ্গল। মাতৃজঠরে ঢুকে গিয়ে নিশ্চিন্ত হতে চাইলেও নিজের মনের সঙ্গে যুদ্ধ করতে করতে, অন্তর সত্তার ইচ্ছাকে সম্পূর্ণভাবে অবদমন করে, বোঝে, জঙ্গলও তাকে ত্যাগ করেছে। চূয়াড় পরিচয়কে ত্যাগ করে কবি বন্দ্যঘটী পরিচয়ে পরিচিত হওয়ার ফলে, তার পুরানো পরিচয়ের জায়গাটি সে হারিয়েছে, অন্যদিকে যে পরিচয় সে আন্তরিকভাবে পরিচিত হতে চেয়েছিল- (তখনকার সমাজ ব্যবস্থায় অন্ত্যজ মানুষের স্বাভাবিক ইচ্ছা যদি তাকে উপরতলার মানুষদের সমগোত্রীয় করে তুলতে চায়, যদি প্রমাণ করতে চায়, যে মানসিক গঠনগত দিক থেকে তার সঙ্গে উঁচুতলার মানুষের তেমন কোন পার্থক্য নেই) - সে অন্যায় স্পর্ধার শাস্তি মৃত্যুদন্ড। তাই কবি অনুভব করলো - 'কুথাও ক্ষমা নাই' - যুগের পরিপন্থী এক মানসিকতার শিকার হতে হয়েছে তাকে। তার ভালোলাগার মানসিক প্রবৃত্তি, তার ভালোবাসার প্রতি বিশ্বাস, তার অন্তরের প্রেরণার সৃষ্টি সম্ভারের এত আয়োজন- তার চুয়াড়ী রক্তের দোষে নিঃশেষ হয়ে গেছে, তার সম্পূর্ণ অস্তিত্ব থেঁতলে গেছে, হাতীর পায়ের তলায়।

শরৎ চন্দ্রের 'অভাগীর স্বর্গ' গল্পে কাঙালী সমাজের উচ্চ বর্ণের শোষণের শিকার হয়েছে। বাউরির মেয়ে কাঙালীর মা ব্রাহ্মণ জমিদার গৃহিনীর অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়ার সমারোহ মুগ্ধ হয়ে নিজের জন্যও ঐরূপ চিতা সজ্জা কামনা করেছে। এই ইচ্ছাই করুণ দিবাস্বপ্নরূপে তার মনে বারবার আবর্তিত হয়েছে ও মৃত্যুকালে সে তার পুত্রকে তার জন্য উচ্চবর্ণসুলভ সৎকার-বিধি-পালনের নির্দেশ দিয়েছে। কিন্তু দরিদ্রের এই ইচ্ছা সমাজের প্রতিকূলতায় ও জমিদারী ব্যবস্থার হৃদয়হীন যান্ত্রিকতায় সার্থক হতে পারে না - প্রজ্জ্বলিত চিতার ধূমকুন্ডলী তার কল্পনা জগৎ ছেড়ে বাস্তবে রূপ পায়নি।

'তিতাস একটি নদীর নাম' উপন্যাসে কিশোর এবং তার স্ত্রী অনন্তর-মা কে ঘিরে এক জটিল সম্পর্ক গড়ে উঠেছে? উজানিগরে ফলা বাইতে যাওয়া, তরতাজা-প্রাণ কিশোর তার কিশোরী নববধূকে নিয়ে ফেরার পথে, ডাকাতের কবলে পড়ে। হৃত-সর্বস্ব কিশোর পরিস্থিতির এই চাপ সহ্য করতে না পেরে উন্মাদ হয়ে যায়। ঘটনাচক্রে কিশোরের সন্তান অনন্তকে নিয়ে কিশোরের স্ত্রী শ্বশুর বাড়ির দেশে ফিরে আসে, প্রতিবেশী কর্তৃক সাদরে গৃহীত হয়। স্বামীর প্রতি তার সদাসতর্ক দৃষ্টি থাকলেও, পরিচয় গোপন থাকে। এ এক বিচিত্র সম্পর্ক - যার একদিকে রয়েছে, এক সুস্থ-স্বাভাবিক নারী, যে পরিচয় গোপন রেখেছেন। অন্যদিকে এক উন্মাদ পুরুষ, যে ভালোবাসার তীব্রতার- জন্যই স্ত্রীকে হারানোর আঘাত সহ্য করতে না পেরে, সব স্মৃতি হারিয়েছে। অথচ, সেই ভালবাসার টানে যেদিন তার স্মৃতি ফিরে এল, স্ত্রীকে চিনতে পারল, সুস্থ হয়ে উঠল, সেদিনও তাদের পরিচয় কেউ জানল না; এক মর্মান্তিক মৃত্যু ঘটল দু'জনের।

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'আরণ্যক'-এ রাজপুত দেবী সিং-এর স্ত্রী কুন্তা বাঈজীর মেয়ে বলে জাতিচ্যুত। দেবী সিং নিজেও সর্বস্বান্ত অবস্থায় মারা যায়। যে কুন্তা কিংখাবের ঝালর দেওয়া পাল্‌কি চেপে কুশী ও কলবলিয়ার সঙ্গমে স্নান করতে যেত, বিকানীর মিছরী ছাড়া জল খেত না। সেই কুন্তা টক বুনো কুল পাড়তে গিয়ে, লাক্ষার ইজারদারের চাকরের হাতে অপদস্ত হয়; ম্যানেজার বাবুর পাতের ভাত খাওয়ার জন্য সাগ্রহে অপেক্ষা করে থাকে।

সত্যচরণ এই অরণ্য জগৎ থেকেই খুঁজে পেয়েছিলেন অনার্য রাজকন্যা ভানুমতীকে আর প্রাচীন অভিজাত বংশীয় বীর, অনার্য রাজাদের বংশধর ও সাঁওতাল বিদ্রোহের নেতা দোবরুপান্না বীরবর্দীকে। এই মুকুটহীন রাজার রাজ্য না থাকলেও তাঁর জংলী প্রজাদের কাছ থেকে রাজার সম্মান পেয়ে থাকেন। কিন্তু বাইরের জগতের খবর এঁরা রাখে না, তাই বলেন- 'এই জঙ্গলেই আমরা ভাল থাকি।' তিনি শুনেছেন, কলকাতা 'বড় ভারী জায়গা'। আবার ভানুমতীকে যখন সত্যচরণ জিজ্ঞাসা করে ভানুমতী ভারতবর্ষের নাম শুনেছে কিনা, তখন ভানুমতী আশ্চর্য হয়েছে এবং ভানুমতী জিজ্ঞাসা করেছে- 'ভারতবর্ষ কোন্‌দিকে'?

প্রফুল্ল রায়ের'সাতঘরিয়া' গল্পে অন্ত্যজ চাঁপিয়া চেয়েছিল ঘরবেঁধে সুখী জীবনযাপন করতে। কিন্তু তার সেই আশা কখনই পূরণ হয়নি। সামান্য সুখ ও নির্ভরতার খোঁজে সে বারে বারে নানা মরদের সঙ্গে ঘর বেঁধেছে। বারে বারেই তার ঘর ভেঙে গেছে। কোথাও সে সামান্যতম সুখের সন্ধান পায়নি। বরং পুরুষতান্ত্রিক সমাজে বিভিন্ন সময়ে লালসার বিষাক্ত পরশে সে ভীত থেকেছে।

যতদিন তার দেহে শক্তি ও লাবন্য ছিল, ততদিন পুরুষ তাকে ঘরে নিয়েছে। কিন্তু দৈহিক রুগ্নতার দিনে তাকে কেউ ঘরে নিতে চায়নি। সবার কাছে বাতিল হিসাবে গণ্য হয়ে সে চরম অবহেলায় হতাশার অতলান্তিক তলে হারিয়ে গেছে।

আমার বর্তমান গবেষণাকর্মের শিরোনামটি হল - 'স্বাধীনোত্তরপর্বে বাংলা উপন্যাস ও ছোটগল্পে অন্ত্যজ জীবন।' স্বভাবত কারণেই এই শিরোনামটিকে সামনে রেখে এবং এর বিষয় বস্তুর সঠিক মূল্যায়ণ করার চেষ্টা করেছি মূল গবেষণাকর্মে। প্রয়োজনবোধে যেমন বিষয় ভিত্তিক আলোচনা করেছি, আবার প্রয়োজনবোধে ব্যক্তিকেন্দ্রিক আলোচনাও করেছি। সঙ্গত কারণেই-তা বিষয়বস্তু ভিত্তিকই হোক অথবা ব্যক্তিকেন্দ্রিক ভিত্তিকই হোক - এর তত্ত্ব, তথ্য, বিশ্লেষণ, আঙ্গিক এবং নান্দনিক দৃষ্টিভঙ্গিরও আলোচনা করেছি। অতলান্ত সমুদ্রের মাঝ থেকে বিষয় বস্তুর (নামকরণের প্রেক্ষাপটে) যত মণি-মুক্তা-হীরা-জহরত-এর সন্ধান পেয়েছি, সেগুলোকে চুম্বকের আকারে মূল গবেষণাকর্মের প্রতিটি পরিচ্ছেদের পাতায় ধরে রাখার চেষ্টা করেছি।

বিন্দু বিন্দু জলে গড়ে উঠে সমুদ্র এবং তার প্রবাহ। বর্তমান গবেষণাকর্মটির প্রতিটি ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় তত্ত্ব, তথ্য এবং নিজের ব্যক্তিগত ধারণার স্পর্শমণির সাহোয্যে গড়ে তুলেছি আমার এই মূল গবেষণা পত্রটি।

অন্ত্যজ জীবন নিয়ে আলোচনা করা খুব একটা সহজ কাজ নয়। আমাদের এই বিশ্বসংসারে কোন কিছুরই অন্ত নেই, যা কিছু আছে তা হল পথ পরিক্রমা অথবা গতিময় জীবন; সে জীবন উচ্চশ্রেণীর অন্তর্গতই হোক আর নিম্নশ্রেণীর অন্তর্গতই হোক না কেন, - তার মূল্যয়ণ করা খুব একটা সহজ নয়। এই মহাবিশ্বের মহাকালের বুকে যদি উচ্চ শ্রেণীর অন্তর্গত জীবনের মূল্য থাকে, তাহলে অনুন্নত অথবা অন্ত্যজ জীবনের মূল্যকেও অস্বীকার করা যায় না, কেননা একে অপরের পরিপূরক - যেন চাঁদের এপিঠ আর ওপিঠ।

আলোচনা প্রসঙ্গে অন্ত্যজ শ্রেণী সম্বন্ধে তত্ত্ব এবং তথ্য ভিত্তিক আলোচনা করা হয়েছে তথা কথিত শিরোনামের প্রয়োজনে এবং স্বভাবতই সেই প্রয়োজনের তাগিদে বিভিন্ন কথা সাহিত্যিকের নাম এবং তাদের সৃষ্ট গ্রন্থের নাম উল্লেখ করেই মূল আলোচনা পর্বটি শেষ হয়েছে। কিন্তু এই আলোচনাই শেষ নয়, ভবিষ্যৎ অথবা আগামীকাল এবং ভাবীকালের বুকে হয়তো এই অন্ত্যজ জীবনের উপর আরো কত বিচিত্র ধরণের আলোচনা হবে তা বলা যায় না। কিন্তু পূর্বোক্ত আলোচনা বা উক্ত বিষয়ক গবেষণাকর্ম চলতেই থাকবে।

"সহজ কথা কইতে আমায় কহো যে,
সহজ কথা যায় না বলা সহজে"-

ঋষি কবির এই চিরসত্য বাণীটি মনে রেখেই আমি আমার মূল গবেষণাকর্মে ধৃত প্রতিটি অধ্যায় এবং সার্বিক আলোচনাটিকে নতুনভাবে, নতুন রূপে এবং নতুন দৃষ্টিভঙ্গিতে অতি সহজভাবে আলোচনা করেছি। আত্মার সঙ্গে আত্মার মিলন যদি আত্মীয়তা হয়, তাহলে যে কোনো আলোচনাই স্নেহসিক্ত, রসোজ্জ্বল এবং গভীরতর হয়। আমার বর্তমান মূল গবেষণাকর্মটি সেদিক দিয়ে কতখানি সার্থক

হয়েছে তা বলা সম্ভব না হলেও, এই গবেষণাকর্মটি যে মৌলিক, তা দাবি করা যায়। কথাবন্ধ অথবা উপসংহারের পরিবর্তে পূর্বোক্ত ব্যাপারটিকে মনের মণিকোঠায় আবদ্ধ রেখে আলোচনা অংশ শেষ করছি।

শ্রী অশ্বিনী কুমার দাস

তাং- ০৩/০৬/২০০৯

শ্রী অশ্বিনী কুমার দাস

CONDITIONS OF THE DOWNTRODDEN PEOPLE AS DEPICTED IN POST-INDEPENDENCE BENGALI FICTION- A CRITICAL STUDY

THESIS

SUBMITTED FOR THE AWARD OF THE DEGREE OF

Doctor of Philosophy

IN

BENGALI

By

SHRI ASHWINI KUMAR DAS

Under the Supervision of

DR. T.B. CHAKRABORTY

Ph.D., D. Litt.

DEPARTMENT OF MODERN INDIAN LANGUAGES
ALIGARH MUSLIM UNIVERSITY
ALIGARH-202002, INDIA

2009

Maulana Azad Library
Acc. No. T-7750
Aligarh Muslim University Aligarh

T7750

Department of Modern Indian Languages

(TELUGU, MALAYALAM, TAMIL, BENGALI, MARATHI & PUNJABI)

Aligarh Muslim University, Aligarh-202 002

Ref. No. ..... / MIL

Dated .....

CERTIFICATE

This to certify that the thesis entitled **'Conditions of the Downtrodden People as depicted in Post-Independence Bengali Fiction – A Critical Study'** submitted for the award of Ph.D. Degree in Bengali to the Department of Modern Indian Languages, Aligarh Muslim University, Aligarh has been completed by Ashwini Kumar Das under my supervision.

It is original in nature and I have permitted the candidate to submit it for the award of Ph.D. degree. He fulfils all the rules, regulations and the ordinance of this University.

Dr. T. B. Chakraborty
(Supervisor)

Dated : 03/06/2009

Modern Indian Languages

Aligarh Muslim University

Aligarh – 202002, U.P.

স্বাধীনোত্তর পর্বে বাংলা উপন্যাস ও ছোট গল্পে অন্ত্যজ জীবন-
তত্ত্ব, তথ্য ও বিশ্লেষণাত্মক আলোচনা

গবেষক

শ্রী অশ্বিনী কুমার দাস, এম.এ.

গবেষণা পরিচালক

ডঃ তিমিরবরণ চক্রবর্তী, পি.এইচ.ডি., ডি.লিট.

আলিগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়ের
পি.এইচ.ডি. ডিগ্রির জন্য উপস্থাপিত
অভিসন্দর্ভ
২০০৯

//সূচীপত্র//

পৃষ্ঠা-

* কথামুখ ১-৫

* ভূমিকার বদলে - ৬-১২

'অন্ত্যজ' কথাটির বিভিন্ন দিক ও পরিচয়

১. প্রথম অধ্যায় // ১৩-৩৩

(এক) অন্ত্যজ জীবনের স্বরূপ সন্ধান ।

(দুই) আদি যুগের বাংলা সাহিত্য ঃ

ক) চর্যাপদ

খ) মৌখিক সাহিত্য

গ) শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্য ও অন্যান্য রচনাবলী।

২. দ্বিতীয় অধ্যায় // ৩৪-৪৮

স্বাধীনতা পূর্ব বাংলা কথাসাহিত্য ও অন্ত্যজ জীবনঃ

ক) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

খ) শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

গ) মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়

ঘ) তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

ঙ) বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

চ) বনফুল (বলাই চাঁদ মুখোপাধ্যায়) প্রমুখ ।

৩. তৃতীয় অধ্যায় // ৪৯-১৫৬

স্বাধীনোত্তর পর্বে বাংলা উপন্যাস ও অন্ত্যজ জীবন ঃ

(এক) তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় ঃ

ক) 'হাঁসুলী বাঁকের উপকথা'

খ) 'নাগিনী কন্যার কাহিনী'।

(দুই) বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় ঃ

ক) 'ইছামতী' উপন্যাস।

(তিন) সমরেশ বসু ঃ

ক) 'উত্তরঙ্গ'

খ) 'গঙ্গা'

গ) 'মহাকালের রথের ঘোড়া'।

(চার) মহাশ্বেতা দেবী ঃ

ক) 'কবি বন্দ্যঘটী গাঞির জীবন ও মৃত্যু'

খ) 'অরণ্যের অধিকার' ।

পৃষ্ঠা-

(পাঁচ) অদ্বৈত মল্ল বর্মণ ঃ
ক)'তিতাস একটি নদীর নাম'ঃ একটি স্বতন্ত্র পদক্ষেপ

(ছয়) সতীনাথ ভাদুড়ী ঃ
ক) 'ঢোঁড়াই চরিত মানস' ।

৪. চতুর্থ অধ্যায় // ১৫৭-২৭২

(এক) স্বাধীনোত্তর পর্বে বাংলা ছোটগল্প ও অন্ত্যজ জীবন ঃ
ক) সামাজিক প্রেক্ষিতে
খ) রাজনৈতিক প্রেক্ষিতে
গ) অর্থনৈতিক প্রেক্ষিতে ।

(দুই) তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছোট গল্প ঃ বিভিন্ন দৃষ্টিকোণে ঃ
ক) ব্যক্তি জীবনাশ্রিত
খ) পরিবারাশ্রিত
গ) ধর্মাশ্রিত
ঘ) চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যাশ্রিত।

(তিন) নরেন্দ্র নাথ মিত্রের ছোট গল্প ঃ বিভিন্নদৃষ্টি কোণে ঃ
ক) ব্যক্তি জীবনাশ্রিত
খ) পরিবারাশ্রিত
গ) চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যাশ্রিত
ঘ) আর্থ-সমাজাশ্রিত
ঙ) সমাজ-বৈষম্যমূলক
চ) সংস্কৃতি ভিত্তিক।

(চার) মনোজ বসুর ছোট গল্প ঃ বিভিন্ন দৃষ্টিকোণে ঃ
ক) ব্যক্তি জীবনাশ্রিত
খ) পরিবারাশ্রিত
গ) অর্থ ও সমস্যাশ্রিত
ঘ) চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যাশ্রিত
ঙ) পটভূমি ভিত্তিক।

(পাঁচ) রমা পদ চৌধুরীর ছোট গল্প ঃ বিভিন্ন দৃষ্টিকোণে ঃ
ক) ব্যক্তি জীবনাশ্রিত
খ) পরিবারাশ্রিত
গ) গোষ্ঠী জীবনাশ্রিত
ঘ) ধর্মাশ্রিত
ঙ) চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যাশ্রিত
চ) পটভূমি ভিত্তিক
ছ) আর্থ-সমাজাশ্রিত
জ) সমাজ-বৈষম্যমূলক
ঝ) বিশ্বাস ও সংস্কার ভিত্তিক।

(ছয়) সমরেশ বসুর ছোট গল্প ঃ বিভিন্ন দৃষ্টিকোণে ঃ

ক) ব্যক্তি জীবনাশ্রিত
খ) পরিবারাশ্রিত
গ) অর্থ ও সমস্যাশ্রিত
ঘ) চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যাশ্রিত
ঙ) পটভূমি ভিত্তিক
চ) আর্থ-সমাজাশ্রিত
ছ) সমাজ-বৈষম্যমূলক
জ) বিশ্বাস ও সংস্কার ভিত্তিক।

(সাত) সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজের ছোট গল্প ঃ বিভিন্ন দৃষ্টিকোণে ঃ

ক) ব্যক্তি জীবনাশ্রিত
খ) পরিবারাশ্রিত
গ) ধর্মাশ্রিত
ঘ) চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যাশ্রিত
ঙ) পটভূমি ভিত্তিক
চ) আর্থ-সমাজাশ্রিত
ছ) বিশ্বাস ও সংস্কার ভিত্তিক।

(আট) দেবেশ রায়ের ছোট গল্প ঃ বিভিন্ন দৃষ্টিকোণে ঃ

ক) ব্যক্তি জীবনাশ্রিত
খ) পরিবারাশ্রিত
গ)অর্থও সমস্যাশ্রিত
ঘ) চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যাশ্রিত
ঙ) পটভূমি ভিত্তিক
চ) আর্থ-সমাজাশ্রিত।

(নয়) মহাশ্বেতা দেবীর ছোট গল্প ঃ বিভিন্ন দৃষ্টিকোণে ঃ

ক) ব্যক্তি জীবনাশ্রিত
খ) পরিবারাশ্রিত
গ) গোষ্ঠী জীবনাশ্রিত
ঘ) ধর্মাশ্রিত
ঙ) চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যাশ্রিত
চ) পটভূমি ভিত্তিক
ছ) আর্থ-সমাজাশ্রিত
জ) সমাজ-বৈষম্যমূলক
ঝ) বিশ্বাস ও সংস্কার ভিত্তিক।

পৃষ্ঠা-

৫.পঞ্চম অধ্যায় // ২৭৩-২৮৬

অন্যান্য উল্লেখযোগ্য ছোট গল্পকার ঃ

ক) সতীনাথ ভাদুড়ী

খ) অমিয়ভূষণ মজুমদার

গ) সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

ঘ) শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়

ঙ) অসীম রায়

চ) আবুল বাশার

ছ) প্রফুল্ল রায়

জ) অমর মিত্র।

* কথাবন্ধ ২৮৭-২৯৪

* গ্রন্থপঞ্জী ও পত্র-পত্রিকা ২৯৫-২৯৯

* সূত্র নির্দেশিকা ৩০০-৩০৭

* প্রয়োজনীয় চিঠি-পত্র ৩০৮-৩১৬

* প্রয়োজনীয় তথ্য ও মূল্যবান চিত্রাবলী ৩১৭-৩২৭

*** *** *** *** *** ***

কথামুখ

কথামুখ

আধুনিক বাংলা উপন্যাস ও ছোটগল্প সাহিত্যশৈলী নিঃসন্দেহে বঙ্কিম চন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথের হাতেই বিকাশ লাভ করে খুব স্বল্প সময়ের মধ্যেই বিষয় ও বৈচিত্র্যের ব্যাপকতায়, রীতি প্রকরণের অভিনব আঙ্গিকতায় সমৃদ্ধি লাভ করে বর্তমানের বাংলা কথাসাহিত্যের আঙ্গিনাকে সমৃদ্ধশালী করে তুলেছে।

রবীন্দ্র ছোটগল্পে সাধারণভাবে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মানুষের জীবনরূপ পেলেও উচ্চবিত্ত এবং অন্ত্যজ শ্রেণীর মানুষের জীবনের কথাও উপেক্ষিত হয়নি। সত্যিকারে বলতে গেলে বলা যায় যে সাহিত্যের উৎসই হোল জীবন। মহান সাহিত্যকার রূপ এবং রং সংগ্রহ করে নেন সমসাময়িক জীবন থেকেই। তাই বাংলা কথাসাহিত্য তার উন্মেষকাল থেকেই সমাজের প্রায় সর্বশ্রেণীর মানুষের বহু বিচিত্র জীবন রূপকে উদ্ভাসিত করে তুলেছে বহু বিচিত্র ইন্দ্রধনুচ্ছটায়।

সমাজের নিম্নবিত্ত এবং অন্ত্যজ শ্রেণীর মানুষ রবীন্দ্র যুগ থেকে যে বাংলা ছোটগল্পে স্থান করে নিয়েছে তার প্রমাণ রবীন্দ্রনাথের 'শাস্তি' ছোটগল্পটি। ছিদাম রুই এবং দুখীরাম রুই - দু'ভাইয়ের স্বাভাবিক জীবন, তাদের দু'বউয়ের দৈনন্দিন কলহ, ঘটনার আকস্মিকতায় বড় বউয়ের খুন হয়ে যাওয়া এবং ছোট বউ চন্দরার স্বামীর প্রতি ক্ষমাহীন প্রতিহিংসা গ্রহণ একেবারে সমাজের অন্ত্যজ শ্রেণীর মানুষের নিখুঁত জীবন চিত্রকে তুলে ধরেছেন। রবীন্দ্রনাথের 'খোকাবাবুর প্রত্যাবর্তন' ছোট গল্পটির রাইচরণ চরিত্রটির কথাও প্রসঙ্গক্রমে এসে যায়।অন্ত্যজ শ্রেণীর মানুষটিকে মনুষত্বের মহিমায় শ্রেষ্ঠত্বের আসনে অধিষ্ঠিত করেছেন গল্পকার। রবীন্দ্রনাথের আরো অনেক ছোটগল্পে অন্ত্যজ শ্রেণী বা সমাজের দরিদ্রপীড়িত সমাজের প্রতিনিধি হিসাবে অনেক চরিত্র চিত্রিত হয়েছে । 'মাল্যদান' গল্পে কুড়ানী, 'সুভা' গল্পে সুভা, 'ক্ষুধিত পাষাণ' গল্পের মেহের আলি প্রভৃতি চরিত্রের নাম বর্তমান প্রসঙ্গে উল্লেখ করতে হয়। 'কাবুলীওয়ালা' গল্পে রহমত চরিত্রটিও এখানে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য, কেননা এখানে বাঙালী পরিবারের গৃহকর্তার পিতৃহৃদয়ের সঙ্গে বিদেশী কাবুলিওয়ালার পিতৃহৃদয় মিলে মিশে একাকার হয়ে গেছে ।

রবীন্দ্র যুগেই রবীন্দ্র শিষ্য প্রভাতকুমারের একাধিক ছোটগল্পে এবং শরৎ চন্দ্রের 'মহেশ' ও 'অভাগীর স্বর্গ' ছোটগল্প দুটিতে বাংলার অন্ত্যজ শ্রেণীর নিখুঁত চিত্র মর্মস্পর্শী হয়ে ফুটে উঠেছে। মহেশকে কেন্দ্র করে হিন্দু প্রধান দরিদ্র মুসলমান ভাগচাষী গফুরের জীবন যন্ত্রণাকে এক চিরন্তন রূপ দিয়েছেন গল্পকার শরৎচন্দ্র । 'অভাগীর স্বর্গ' গল্পে কাঙালীর মা, রসিক বাঘের পরিত্যক্ত স্ত্রী অভাগীর মৃত্যুর পর আগুনে পুড়ে স্বর্গে যাবার ইচ্ছা পূরণে অন্ত্যজ শ্রেণীর স্বাভাবিক মনোবাসনাকে ঔদ্ধত্য প্রকাশের ধারণা উচ্চ শ্রেণীর মানুষের দ্বারা যেভাবে নিন্দিত হয়েছে, তার চিত্রায়ণ তুলনাহীন। শরৎচন্দ্র সমাজের অন্ত্যজ শ্রেণীর অবহেলিত, উপেক্ষিত, লাঞ্ছিত শ্রেণীর মানুষদের মাঝখান থেকেই অভাগী, কাঙালী, গফুর, আমিনা প্রভৃতি চরিত্রগুলি তুলে এনেছেন।

শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়ের ' নারীমেধ' , 'নারীর মন' প্রভৃতি ছোট গল্পে কয়লাখনি

অঞ্চলে আদিম আদিবাসী সাঁওতাল শ্রমিকদের জীবনযাত্রার একান্ত বাস্তব চিত্র পরিবেশিত হয়েছে। কল্লোল গোষ্ঠীর প্রেমেন্দ্র মিত্র, অতিন্ত্য কুমার সেনগুপ্ত, বুদ্ধদেব বসু প্রভৃতি গল্পকারের বিচিত্র ধর্মী ছোট গল্পের অনেকগুলিতে সমাজের উপেক্ষিত, হতশ্রী মানব গোষ্ঠীর জীবন চিত্র রূপ পেয়েছে। প্রেমিন্দ্র মিত্রের ছোট গল্পের অন্যতম বিশিষ্ট বৈশিষ্ট্যই হল দুস্থ নিম্ন-মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মানুষের জীবন যাত্রার ক্লান্তি, অবসাদ, আত্ম প্রবঞ্চনা এবং বিফলতার চিত্র। উদাহারণ স্বরূপ তাঁর 'মৃত্তিকা' ও 'ধূলিধূসর' গল্প গ্রন্থ দুটির একাধিক গল্পের কথা বর্তমান প্রসঙ্গে আলোচনা করা যায়। অচিন্ত্য কুমার সেনগুপ্তের বিখ্যাত গল্প গ্রন্থ 'টুটাফুটায়' জীবনের কুৎসিত দারিদ্রপিষ্ট, বিদ্রোহ-যুদ্ধ-পাপ-পিচ্ছিল পথের চিত্রণ অতি অপূর্ব ভঙ্গিতে ধরা পড়েছে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ- উত্তরকালে বাংলা উপন্যাস ও ছোট গল্পকারেরা আরো অনেক বেশি সমাজ সচেতন হয়ে পড়লেন। যুদ্ধের বিভীষিকা, ভারতের খন্ডিত স্বাধীনতা লাভ, দেশ বিভাগের কুফল, কঠোর বাস্তবের সংঘাত, সমাজের অতি দ্রুত অবক্ষয় প্রভৃতি বাংলা উপন্যাস ও ছোট গল্পে রূপ পেতে লাগল। এই সময়ের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখ করতে হয় মানিক ও তারাঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম। ফ্রয়েডীয় মনস্তত্ত্বের অনুসারী মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় জীবনের কুটিল বিকৃত দিক গুলিকে তাঁর লেখা উপন্যাস ও ছোট গল্পের ক্ষুদ্র পরিসরে তুলে ধরেছেন । তাঁর 'প্রাগৈতিহাসিক', 'সরীসৃপ' প্রভৃতি ছোট গল্পগুলি এবং 'পদ্মা নদীর মাঝি' উপন্যাসটি এক্ষত্রে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর বহু বিচিত্র উপন্যাস ও ছোট গল্পে গ্রাম বাংলার অন্ত্যজ শ্রেণীর মানুষের বিচিত্র জীবনকে অপরূপভাবে রূপ দান করেছেন। বৈষ্ণব-বৈষ্ণবী, বাউরী-বাগদী, কাহার-বেদে, সাপুড়ে প্রভৃতি অন্ত্যজ শ্রেণীর বিভিন্ন গোষ্ঠী তাঁর কথা সাহিত্যে বিবৃত হয়েছে অত্যন্ত মুন্সিয়ানার সঙ্গে।

সাম্প্রতিককালের বাংলা কথা সাহিত্য অসংখ্য ঔপন্যাসিক ও ছোট গল্পকারেরা অন্ত্যজ জীবনকে অবলম্বন করে বহু বিচিত্র ও নব-নব রূপায়ণে বাংলা কথা সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করে চলেছেন। প্রতিনিধি স্থানীয় লেখকদের হাতে অন্ত্যজ শ্রেণীর জীবন যাত্রা, জীবনচর্চা তথা জীবন যন্ত্রণা, অত্যন্ত বিশ্বস্ততার সঙ্গে রূপ লাভ করেছে। প্রসঙ্গক্রমে বনফুল, সমরেশ বসু, সমরেশ ঘোষ, সুবোধ ঘোষ, মানবেন্দ্র পাল, নীহার রঞ্জন রায়, শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়, আশাপূর্ণাদেবী, প্রতিভা বসু, মহাশ্বেতা দেবী, বাণী রায় প্রভৃতি বহু উল্লেখযোগ্য নাম স্মরণ করতে হয়।

বলাবাহুল্য, বাংলা সাহিত্যের এই অবহেলিত অথচ অমূল্য সম্পদের দিকটি সাহিত্যের গবেষকদের দ্বারা বিশেষভাবে আলোচিত হয় নি। কিছু কিছু উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ বা কিছু মূল্যবান প্রবন্ধ অথবা নিবন্ধ যে লেখা হয় নি তা নয়, তবে গবেষণার আকারে অথবা গবেষণামূলক বিশেষ উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ যে উক্ত বিষয় নিয়ে লেখা হয় নি, সেকথা বললে হয়তো কোনো ভুল বলা হয় না। তাই আমার বর্তমান গবেষণার বিষয়বস্তুটি এ'ব্যাপারে এক নতুন পদক্ষেপ এবং তাই এ'ক্ষেত্রে আমার এই গবেষণাকর্মটি মৌলিকতার দাবি করতে পারে।

বর্তমান গবেষণাকর্মটি সুসম্পন্ন করতে অনেকে অনেক রকম ভাবে আমাকে সাহায্য

ও উৎসাহিত করেছেন। সকলের কথা উল্লেখ করা সম্ভব না হলেও এঁদের মধ্যে কিছু নাম এখানে উল্লেখ করতেই হয়।

প্রথমেই ঋণ স্বীকার করতে হয় বিভাগীয় অধ্যক্ষ শ্রী তিমিরবরণ চক্রবর্তী মহাশয়ের। উনি আমার বর্তমান গবেষণাকর্মের তত্ত্বাবধায়ক। ওনার সান্নিধ্যে থেকে সময়ে-অসময়ে এবং সদা-সর্বদায় আমি যে জ্ঞান লাভ করেছি সেকথা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। ওনার স্নেহসিক্ত ভালোবাসা এবং পথপ্রদর্শনা না পেলে এই বিরাট কর্মযজ্ঞসম আমার এই গবেষণাকর্মটি কখনোই সুসম্পন্ন হোত না। তিনি আমার প্রণম্য।

এর পর উল্লেখ করতে হয় মাতৃসমা কাকীমা - শ্রদ্ধেয়া মায়া চক্রবর্তীর কথা। তাঁর সার্বিক সহযোগিতা এবং উৎসাহ না পেলে আমার বর্তমান গবেষণাকর্মটি হয়তো অসমাপ্তই থেকে যেত। তিনিও আমার প্রণম্যা ।

এরপর উল্লেখ করতে হয় অধ্যাপক শেখ মস্তানের কথা। গবেষনাকর্মের প্রতিটি ক্ষেত্রে ওনার সার্বিক সহযোগিতা কখনোই ভুলবার নয়। এই প্রসঙ্গে অধ্যাপক প্রদোৎ ঘোষ এবং অধ্যাপক নারায়ণ চন্দ্র সাউ-এর কথাও উল্লেখ করতে হয়। এঁদের সহযোগিতা এবং উৎসাহদান আমার গবেষণাকর্মকে অনেকখানি এগিয়ে নিয়ে গেছে।

পিতামাতার ঋণ সদা-সর্বদাই অপরিশোধ্য। পিতা শ্যামাপদ দাস এবং মাতা আরতি দাসের অকৃপণ আশীর্বাদ আমার গবেষণাকর্মের দিশারী স্বরূপ কাজ করেছে। স্ত্রী ববিতা দাস এবং কন্যা সঞ্চারী দাসের আন্তরিক অনুপ্রেরণাও আমার বর্তমান গবেষণাকর্মটিকে পরিপুষ্ট করেছে।

গবেষণাকর্মের ক্ষেত্র-সমীক্ষণ কাজের সময় যে সমস্ত গ্রন্থাগারের সাহায্য পেয়েছি তাদের ঋণও অপরিশোধ্য। বর্তমান প্রসঙ্গে প্রতিটি নাম উল্লেখ করা সম্ভব না হলেও কিছু গ্রন্থাগার-এর নাম উল্লেখ করতেই হয়।

এদের মধ্যে-

১) জাতীয় গ্রন্থাগার, কোলকাতা।

২) বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, কোলকাতা।

৩) সাহিত্য একাদেমি, নতুন দিল্লী।

৪) কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার, দিল্লী বিশ্ব বিদ্যালয় , নতুন দিল্লী।

৫) মানিকচক শহর গ্রন্থাগার, মালদা।

৬) মালদা কলেজ গ্রন্থাগার, মালদা।

৭) অধ্যাপক তিমিরবরণ চক্রবর্তী মহাশয়ের ব্যক্তিগত গ্রন্থাগার।

৮) অধ্যাপক প্রদ্যোৎ ঘোষ মহাশয়ের ব্যক্তিগত গ্রন্থাগার।

গবেষণাকর্মটিকে ত্বরিত করতে সার্বিকভাবে যারা আমাকে উৎসাহদান করেছে তাদের মধ্যে ভগ্নীসমা আমিনাদি, মহম্মদ ইসমাইল, নাজমুল হুসেন, আতাউল ইসলাম, আনন্দ কুমার দাস, সন্তোষ কুমার মন্ডল, অশোক কুমার দাস প্রভৃতির কথা উল্লেখযোগ্য ।

মাতাপিতা, প্রিয় শিক্ষক, প্রিয় বন্ধু-বান্ধব- প্রভৃতির আশীর্বাদ, আন্তরিক ভালোবাসা, অকৃপণ স্নেহ এবং সার্বিক উৎসাহে আমার বর্তমান গবেষণাকর্মটি সুসম্পন্ন হয়েছে। ফলাফলের ভার অভিজ্ঞ পরীক্ষক এবং ভাবীকালের হাতে।

শ্রী অশ্বিনী কুমার দাস

তাং- ০৩/০৬/২০০৯

শ্রী অশ্বিনী কুমার দাস

ভূমিকার বদলে

ভূমিকার বদলে

বিষয় নির্বাচনের কারণ ও গুরুত্ব

আমার গবেষণাকর্মের বিষয় ঃ স্বাধীনোত্তরপর্বে বাংলা উপন্যাস ও ছোটগল্পে অন্ত্যজ জীবন। এই বিষয়টি নিয়ে বাংলা সাহিত্যে বিশেষ কোন উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ প্রকাশিত হয় নি; উক্ত বিষয় নিয়ে কিছু কিছু প্রবন্ধ এবং গ্রন্থ প্রকাশিত হলেও তা গবেষণামূলক নয় বলেই মনে করি। ভারতবর্ষ অর্থাৎ আমাদের দেশ স্বাধীনতা লাভ করেছে ১৯৪৭ সালে, কিন্তু স্বাধীনতা প্রাপ্তীর বাষট্টি বছর পরেও সমাজ থেকে অস্পৃশ্যতা মুছে যায়নি। সেই অস্পৃশ্য বা অন্ত্যজ শ্রেণীর মানুষেরা উঁচু শ্রেণীর মানুষদের কাছে এখনও ঘৃণার পাত্রই হয়ে আছে। এই অন্ত্যজ শ্রেণীর একটি বিশাল অংশ, স্বাধীনোত্তরপর্বের উপন্যাস ও ছোটগল্পে এসেছে যারা নানাভাবে সমাজে উপেক্ষিত, উৎপীড়িত এবং বঞ্চিত। এই দলিত শ্রেণীর মানুষদের নিয়ে একালে আমাদের চিন্তা ভাবনার অন্ত নেই। আর বাংলা কথা সাহিত্যে তাদের স্থান কেমন আছে তা জানতে আমার কৌতূহলও আছে। আমাদের বঙ্গীয় সমাজে এবং দেশে যারা 'শুধু দিলে, পেলেনা কিছুই'; যারা অখ্যাত ও অবজ্ঞাত, যারা ধনবানদের সুখ ও সমৃদ্ধির জন্যে বারবার নির্যাতিত ও লাঞ্ছিত হয়ে আসছে, স্বাধীনোত্তরপর্বে বাংলা উপন্যাস ও ছোটগল্পে তাদের সামাজিক অবস্থান কেমন আছে, তাদের জীবনাযাত্রাই বা কিভাবে নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে, অধিকাংশ উচ্চবর্ণীয় কথা সাহিত্যিকদের দৃষ্টিতে তাদের চরিত্র, বৃত্তি, অর্থনৈতিক অবস্থা ও তাদের জীবনের বিভিন্ন দিক কীভাবে প্রতিভাত হয়েছে - সে বিষয়ে অনুসন্ধান করার একটি প্রবল আগ্রহ আমার বহু বহুদিনের । জানি, এ বিষয়ে বাংলা সাহিত্যে তথ্যের ও তত্ত্বের অপ্রতুলতা আছে। তবুও নানা কথা সাহিত্যিকদের কথা সাহিত্যে অন্ত্যজ সম্প্রদায়ের যতটুকু তথ্য পাব তা তুলে ধরার প্রয়াশেই আমি বই বর্তমান গবেষণাকর্মে ব্রতী হয়েছি।

গবেষণাকর্মের নাম করণ ও অন্ত্যজ শব্দের নানা অর্থ

এখন 'স্বাধীনোত্তরপূর্বে বাংলা উপন্যাস ও ছোট গল্পে অন্ত্যজ জীবন' - গবেষণাকর্মের এই নামকরণ সম্পর্কে আমাদের বক্তব্য পরিস্ফুট করছি। স্বাধীনোত্তর পর্বে বাংলা কথাসাহিত্য বলতে স্বাধীনতা পরবর্তী বাংলা সাহিত্যের অন্তর্গত উপন্যাস ও ছোট গল্পগুলিকে বুঝেছি। আর 'অন্ত্যজ' বলতে সমাজের নিম্নস্তরের অস্পৃশ্য অবজ্ঞাত মূলত দরিদ্র 'সবার পিছে সবার নিচে সর্বহারাদের'ই বুঝেছি। তবুও মনে রাখতে হবে 'অন্ত্যজ' শব্দের আক্ষরিক অর্থ ও পরবর্তী সময়ে তার সংকীর্ণ অর্থ-ব্যঞ্জনা। আক্ষরিকভাবে অন্ত্য=অন্ত+জ, জন্মা (যে জন্মে)= অন্ত্যজ। ব্রাহ্মণাদি তিন বর্ণ বিরাট পুরুষের (ঋগ্‌বেদ) দেহ থেকে জন্মের পর শেষজাত -চতুর্থ বর্ণ শূদ্রই হল অন্ত্যজ। এই 'শূদ্র' অর্থে কিন্তু কোন ঘৃণার কথা নেই - কারণ পবিত্র বিরাট-পুরুষের সকল অঙ্গই তো পবিত্র। কিন্তু

পরবর্তীসময়ে অন্ত্য (শূদ্র) থেকে জ (জাত) অর্থাৎ শূদ্রের ঔরসে উচ্চবর্ণের স্ত্রীর গর্ভে প্রতিলোমজ সন্তানদের বলা হতে লাগল অন্ত্যজ। তখন থেকে ' অন্ত্যজ' শব্দের প্রতি সমাজের অন্য তিনবর্ণের অবজ্ঞা লক্ষ্য করা গেল। স্মৃতি শাস্ত্রে বিধান দেওয়া হল যে শাস্ত্র সম্মত সবর্ণ এবং অসবর্ণ বিবাহের পর সমাজিক প্রথা লঙ্ঘনের ফলে ভ্রষ্ট-সংস্রবের সন্তানরাই অন্ত্যজ। আবার 'অন্ত্য' অর্থে নীচ, তাই নীচ কুলে যার জন্ম সেই নীচাশয়, অধম ব্যক্তিই অন্ত্যজ।[১]

অন্তেবাসী, ব্রাত্য ও দলিত

সমাজের তথাকথিত নিম্নবর্ণের অস্পৃশ্য মানুষদের সাধারণত 'অন্তোবাসী'[২] ও বলা হত। কিন্তু বর্তমানে গ্রামের শেষে বা নগর প্রান্তবাসী 'চন্ডাল' শ্রেণীর অন্ত্যজদের বলা হয় 'অন্তেবাসী'[৩]।

শুধু চন্ডালদের ক্ষেত্রেই শব্দটি প্রযোজ্য বলে আমরা বর্তমানে আলোচনায় 'অন্তেবাসী' কথাটিকে ব্যবহার করব না। কিন্তু 'অন্ত্যজ' শব্দের পরিবর্তে আমরা বর্তমান আলোচনায় 'ব্রাত্য' শব্দটির প্রয়োগ করব। প্রাচীন বৈদিক ধারার আর্য ভাষীরা সমাজরীতির দিক দিয়ে দুটি দলে বিভক্ত ছিল। "প্রথম দল যাযাবর ও প্রধান- নাম 'গ্রাম্য' এবং দ্বিতীয় দল, যাহাদের মর্যদা গ্রাম্যদের তুলনায় অনেক কম ছিল, তাহাদের নাম ছিল 'ব্রাত্য'। পরবর্তীকালে শব্দটির আসল অর্থ লোপ পাওয়ায় নিন্দার্থক অর্থ আসিয়া যায়, এবং তাহা হইতে ব্রতবাহ্য অর্থাৎ আর্য সংস্কৃতিচ্যুত এই মানে দাঁড়াইয়া যায়"।[৪]

ব্রত+য (হীনার্থে) - অর্থ, সংস্কারহীন যজ্ঞ- এই হল আক্ষরিক অর্থ। 'ব্রাত' অর্থাৎ সমূহ শব্দ থেকে মনু গায়ত্রীহীন ব্রাহ্মণকে বলেছেন 'ব্রাত্য'। অথর্ববেদ ব্রাত্যদের প্রশংসায় মুখর। এই বেদকে বলা হত ব্রাত্যদের বেদ। যজ্ঞোপবীতের কাল অতীত হয়ে গেলে সেই সাবিত্রী পতিত ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়-বৈশ্যরা 'ব্রাত্য' নামে অভিহিত হত। এরা আর্যদের কাছে নিন্দনীয়।[৫]

কিন্তু এ বিষয়ে ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার বলেছেন - "The Aryanization of Bengal may be said to have commenced in right earnest the closing centuries of the first millennium B.C."[৬] এতে দেখা যাচ্ছে যে, আর্যসমাজে যে দলের মর্যদা কম ছিল সেই দলকেই প্রথমে ' ব্রাত্য' বলা হত। পরে গায়ত্রীহীন ব্রাহ্মণদেরই শুধু বলা হয়েছে 'ব্রাত্য'। আরো পরে সাবিত্রীপতিত ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যরা আর্যসংস্কৃতিচ্যুত হয়ে ' ব্রাত্য' নামে পরিচিতি লাভ করেছেন। এই ব্যাপক অর্থে আর্য-সংস্কৃতিক থেকে শুধু চ্যুত নয়, যাদের সঙ্গে আর্যসংস্কৃতির কোনো সম্পর্ক নেই, সেইসব বর্ণ বা জাতিকেও 'ব্রাত্য' বলা চলে। আর তাই 'অন্ত্যজ' শব্দের পরিবর্তে 'ব্রাত্য' শব্দটির প্রয়োগে হয়তো ভুল হয় না। বর্তমানে ইংরাজী 'Depressed' বা 'Downtrodden'-এর বাংলা প্রতিশব্দ রূপে 'দলিত' কথাটির ব্যবহার করলে বোধ হয় কোন ভুল করা হয় না।

অন্ত্যজ জীবন নিয়ে গবেষণাভিত্তিক দৃষ্টি ভঙ্গি

আমাদের আলোচ্য বিষয় স্বাধীনোত্তর পর্বে বাংলা উপন্যাস ও ছোটগল্পে অন্ত্যজ জীবন। কিন্তু এ বিষয়টি আলোচনার পূর্বে আমাদের দেখে নিতে হবে ঠিক কোন্ সময় থেকে বাংলা

সাহিত্যে অন্ত্যজ জীবনের স্বরূপ উদ্‌ঘাটিত হয়েছে, তা আলোচনা না করলে আমাদের আলোচনা অসম্পূর্ণই থেকে যাবে। প্রাচীন বাংলা সাহিত্যে চর্যাগীতির রচনাকারগণ ছিলেন বেদ-বহির্ভূত সমাজের মানুষ। ডোম্বী, কামলী, শবর প্রভৃতি অধিকাংশই ছিলেন উচ্চবর্ণীয়দের চোখে অস্পৃশ্য ব্রাত্য। এঁদের রচনায় ডোম-ডোমনী, চন্ডালী, শুন্ডিনী, শবর-শবরী, ব্যাধ, জেলে, কাঠুরিয়া, ধুনুরী প্রভৃতি অস্পৃশ্যরা স্থান পয়েছেন। এঁদের জীবনের দিকে তাঁদের সাগ্রহ অনুরাগমূলক দৃষ্টি লক্ষ্য করা গেছে। অথচ সমাজের অভিজাত উচ্চবর্ণীয়েরা এঁদের স্পর্শ বাঁচিয়ে চলতেন।

"নগর বাহিরেঁ ডোম্বী তোহেরি কুড়িআ।
ছোই ছোই জাহ সো ব্রাহ্মণ-নাড়িয়া ॥"

- (কাহ্নপদ ৩৩ নং পদ)

এঁদের স্পর্শে সমাজ-জীবন যাতে কলুষিত না হয়, তারই জন্য নগরের বাইরে ব্রাহ্মণেরা তাঁদের বাসস্থান নিদিষ্ট করে দিতেন। কিন্তু এই অন্ত্যজ শ্রেণীর মধ্যেই বিদ্যা বুদ্ধিতে ও অধ্যাত্মজীবনবোধে উন্নত সিদ্ধাচার্যেরা ছিলেন। এঁরা শবর-শবরীর কথা তাঁদের সাহিত্যে বারবার এনেছেন। আর এই শবর-শবরী সম্পর্কে প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের এক বিশেষজ্ঞ অধ্যাপক বলেছেন ঃ-

" রামায়ণে শবরী ধর্মপ্রাণা নারী, তন্ত্রে শবরী মহাশক্তি, বৌদ্ধমতে শবরী স্বয়ং বজ্রধর, শবরী নৈরাত্মা। চর্যাটীকা মতেও শবর বিষয়-বিহ্বল চিত্ত উন্মত্ত। সা এব পরিধর আর শবরী শবরস্য গৃহিনী জ্ঞানমুদ্রা আকারজা, অর্থাৎ নৈরামণি। দেহের শীর্ষ কমলে সহজ মহাসুখ চক্রে তাঁদের মিলন মহাসুখ।"[৭]

সমাজে শবর-শবরীর এই ভূমিকা নিঃসন্দেহে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। "কৃষি নিপুণ সৌন্দর্যভোগ-প্রবণ অথচ অধ্যাত্ম অনুভূতিসম্পন্ন এই জন গোষ্ঠী একদিন ছিলেন এ-দেশের কর্ম, রুচি ও জ্ঞানের নিয়ন্তা।"[৮]

তাই সাধারণভাবে এ-যুগের অন্ত্যজ মানুষদের প্রতি মুষ্টিমেয় উচ্চবর্ণীয়দের যতই অবজ্ঞা থাক, তারা এ-কালের সাধক সাহিত্যস্রষ্টাদের নিকট শ্রদ্ধা-সম্ভ্রমই লাভ করেছে।

মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে তথাকথিত নিম্নশ্রেণীর মানুষদের কথা থাকলেও তাদের সুখ-দঃখ ও জীবন কথা বিস্তারিতভাবে উচ্চাবর্ণীয় কবিগণ খুব কমই বলেছেন। ব্রাহ্মণ্য-সংস্কৃতি ও সামাজিক বর্ণবিন্যাস মধ্যযুগের জনগোষ্ঠীকে যেভাবে স্মৃতি শাসন জালে আষ্টেপৃষ্টে বেঁধে ফেলেছিল, তাতে তাদের মনুষ্যত্ব তো স্বাধীনভাবে বিকশিত হতে পারে নি; পরন্তু সুস্থ সংস্কৃতি থেকে তাদের দূরে অবস্থান করতে বাধ্য করা হয়েছে। তবুও এ-যুগের কবিগণ বিশেষত 'শ্রী কৃষ্ণ কীর্তনে'র কবি বড়ু চন্ডীদাস, বিভিন্ন মঙ্গল কাব্যের কবিগণ, মৈমন সিংহ গীতিকা ও পূর্ববঙ্গগীতিকার রচয়িতারা অন্ত্যজ শ্রেণীর মানুষদের সাহিত্য থেকে নির্বাসিত করতে পারেননি। একথা সত্য যে তুর্কীআক্রমণের ফলস্বরূপ সমাজের বৃহত্তর অন্ত্যজ শ্রেণীর মানুষদের সঙ্গে সমন্বয়সাধনের প্রয়োজনে উচ্চবর্ণীয় সমাজ বিশেষভাবে সচেষ্ট হয়েছিলেন । আবার এ বিষয়ে রবীন্দ্রনাথ বলেন যে চন্ডী নিষাদ শবরদের দেবতা। আর যেহেতু দেশটাও অন্ত্যজ শ্রেণীর, সেইহেতু " এত দেশ থাকতে ব্রাহ্মণ কবি ব্যাধের

মত অন্ত্যজ জাতিকে দিয়ে দেবীর পূজা- প্রচারের গান করিয়েছেন ।" [৯]

তাই এ-যুগে ব্রাত্য মানুষদের মর্যাদাকে একেবারে ধূলিসাৎ কবিরা করেন নি। ব্যাধ-সন্তান কালকেতু যখন গুজরাট নগরী পত্তন করেছে, সেখানে নানা জাতি বাস করতে এলেও তাদের মধ্যে সাম্প্রদায়িক বিভেদের কথা আমরা পাই না। এ-সমাজ ব্যবস্থায় কায়েমী স্বার্থান্বেষী গোষ্ঠী মাথা চাড়া দিয়ে উঠতে পারে নি। বৃন্দাবন দাসের 'চেতন্য ভাগবত'- এ ব্রাহ্মণদের বৃত্তিকেই তো হেয় করতে দেখা যায়-

"প্রভু কহে সন্ধি কার্য জ্ঞান নাহি যার।
কলিযুগে ভট্টাচার্য পদবী তাহার॥" [১০]

এই মধ্যযুগে অন্ত্যজদের বৃত্তি গ্রহণে বর্ণ কোন বাধা হয়ে দাঁড়ায়নি। জীবনধারণের প্রয়োজনে বৃত্তি পরিবর্তনেরও স্বাধীনতা ছিল। মুকুন্দরামের চন্ডীমঙ্গল কাব্যে গোপ জাতির মানুষ পশুপালন বৃত্তি ত্যাগ করে কৃষিকর্মে নিযুক্ত হয়েছে দেখি -'পল্লব গোপ যৈসে পুরে কান্ধে ভার বিক্রী করে।' এই চন্ডীমঙ্গল কাব্যে দেখি তৈল-ব্যবসায়ী তিলি জাতি তেল বিক্রী ছেড়ে দিয়ে তৈল-পেষণ কর্মে নিযুক্ত হয়ে 'কলু' নামে পরিচিত হয়েছে- 'কলু নগরে পিড়ে ঘানী'। মধ্যযুগে অন্ত্যজ শ্রেণীর ভূস্বামিদেরও কথা পাই। অষ্টাদশ শতকে বাগদিরাজ শোভা সিংহ সামাজিক প্রতিষ্ঠালাভের জন্য দেবালয় তৈরী করেছিলেন। ব্রাহ্মণ কবিগণ এইসব অন্ত্যজ শ্রেণীর রাজা ও ভূস্বামীদের মহিমাকীর্তন করেছেন। শুধু শোভা সিংহই নয়, বিষ্ণুপুরের অন্ত্যজশ্রেণীর রাজারাও সগৌরবে সমাজ শাসন করে গেছেন - অথচ উচ্চবর্গের মানুষ তার বিরোধিতা করেনি।

জ্ঞানার্জন বা শিক্ষার ক্ষেত্রে ব্রাহ্মণদের একচেটিয়া অধিকার থাকলেও অন্ত্যজ শ্রেণীর মানুষদের আগ্রহ ও জ্ঞান চর্চাকে তাঁরা অবজ্ঞা করেন নি। রামাই পন্ডিত ব্রাত্য হয়েও 'শূন্য পুরাণ' এবং অন্ত্যজ রামদাস আদক 'ধর্মমঙ্গল কাব্য' লিখেছেন। একালের পুঁথিতে এমন কিছু পদবী ও নাম মেলে যা অন্ত্যজ শ্রেণীর মানুষদেরই। তাই বুঝি, যুগী প্রভৃতি ব্রাত্য বা অন্ত্যজ মানুষদের এ কাজে ব্রতী হতে দেখা গেছে কিংবা তারা পুঁথির মালিক হয়ে অন্য উচ্চতর-বর্ণীয়দের দিয়ে তা লিখিয়ে নিয়েছেন। আবার শিক্ষার বিস্তারে মধ্যযুগে একটি সময়ে ডোম পন্ডিতদের পাঠশালাগুলিরও ভূমিকা ছিল। তবুও অন্ত্যজ শ্রেণীর মানুষেরা মধ্যযুগে নিজেদের সর্বক্ষেত্রে বিকশিত করে তোলার পূর্ণ স্বাধীনতা পায়নি একদল স্বার্থান্ধ উচ্চবর্ণীয়দের চক্রান্তে। তাই সমাজে অপাংক্তেয় ও দূরবর্তী হয়ে থাকার বিষয়টিকে অনিবার্য বিধিলিপি বলেই তারা মেনে নিয়েছিল। এর থেকে বেদনাদায়ক ঘটনা আর কি হতে পারে? আর তাই মুকুন্দরামের চন্ডীমঙ্গল কাব্যের কালকেতু এই দীনতা ও সংকোচ নিয়ে বলেছিল ঃ

"অতি নীচ কুলে জন্ম জাতি গো চোয়াড় ।
কেহ না পরশে জল লোকে বলে রাড় ॥
পুরোধা আমার হবে কেমনে ব্রাহ্মণ।
নীচ কি উত্তম হবে পাইলে বহু ধন।" [১১]

আধুনিক যুগে অর্থাৎ ঊনবিংশ শতাব্দীতে ইংরেজী শিক্ষিত বাঙ্গালী সমাজ সংস্কার মুক্তির আদর্শে উদ্বুদ্ধ হল, যুক্তি ও বিচারবোধ দ্বারা চালিত হল। পরাধীনতার নাগপাশ থেকে মুক্ত হতে, শক্তিশালী ঐক্যবদ্ধ জাতি গঠনের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধ হল। সেই সাথে রাম মোহন রায় (১৭৭২-৭৪ - ১৮৩৩) বিদ্যাসাগর (১৮২০-১৮৯১), শ্রী রামকৃষ্ণ (১৮৩৩-১৮৮৬), বিবেকানন্দ (১৮৬১-১৯০২) প্রমুখ মনীষীর জাতি ধর্ম নির্বিশেষে মানুষের প্রতি ভালোবাসার প্রভাবে ব্রাত্যজন সম্পর্কে সামাজিক দৃষ্টি ভঙ্গি ক্রমশঃ পরিবর্তিত হল। এর প্রতিফলন পড়ল ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধের সাহিত্যে এবং ব্যাপকভাবে বিংশ শতাব্দীর সাহিত্যে।

বাংলা নাটকে, কাব্যে, উপন্যাসে অন্ত্যজ জীবনের রূপরেখা নানা ভাবে এই সময়ে অঙ্কিত হতে লাগল। নাটকের ক্ষেত্রে দেখি, মধুসূদনের (১৮২৪-১৮৭৩) 'বুড়ো শালিখের ঘাড়ে রোঁ' (১৮৬০) প্রহসনে, দীনবন্ধু মিত্রের (১৮৩০-১৮৭৩) 'নীলদর্পন নাটকে '(১৮৬০), মীর মশারফ হোসেনের(১৮৪৮-১৯১২)'জমিদার দর্পণ' নাটকে, গিরিশচন্দ্রের (১৮৪৪-১৯১১) 'বিল্বমঙ্গল' নাটকে(১৮৮৮), বিজন ভট্টাচার্যের(১৯১৫-১৯৭৮)'নবান্ন' নাটকে (১৯৪৪), মন্মথ রায়ের(১৮১৯-১৯৮৮)'রাজপুরী' নাটকে অত্যাচারিত, অবহেলিত, ঘৃণ্য অন্ত্যজ শ্রেণীর মানুষের প্রতি লেখকদের সহানুভূতি প্রকাশিত।

কাব্য-কবিতার ক্ষেত্রে দেখি, রবীন্দ্রনাথের(১৮৬১-১৯৪১) 'দুইবিঘা জমি', 'পুরাতন ভৃত্য' কবিতায় অন্ত্যজ মানুষ কবি-সহানুভূতিপুষ্ট। রবীন্দ্রনাথেরই 'পুণশ্চ' কাব্যের(১৯৩২) 'মুক্তি', 'শুচি', 'স্নানযাত্রা' কবিতায় অন্ত্যজ মানুষ ধর্মপথের দিশারী হয়েছে। ' স্নানযাত্রা' কবিতায় সাধক পন্ডিতের- 'অব্রাহ্মণ নও তুমি তাত' - উক্তি অন্ত্যজ মানুষ সম্পর্কে এ যুগের মানুষের দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তনের উল্লেখযোগ্য সাক্ষ্য। সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের (১৮৮২-১৯২২) 'মেথর', 'শূদ্র' কবিতায় এবং নজরুল ইসলামের (১৮৯৭-১৯৭৬) ' কুলিমজুর' কবিতায় অন্ত্যজ মানুষ মর্যাদায় অসীন।

বাংলা উপন্যাসের ক্ষেত্রে দেখি, আধুনিক কালে অন্ত্যজ মানুষ অন্ত্যজ জীবন-কেন্দ্রিক রচনায় যথেষ্ট মননশীলতার সঙ্গে ও বাস্তবতার সাথে সাযুজ্য রেখেই চিত্রিত হয়েছে। বরীন্দ্রনাথের 'গোরা' (১৯১০) উপন্যাসে গোরার চরঘোষপুর ভ্রমণের অনুষঙ্গে অন্ত্যজ মানুষের চিত্র লিপিবদ্ধ হয়েছে। শরৎচন্দ্রের(১৮৭৬-১৯৩৮) 'চরিত্রহীন'(১৯১৭), 'অরক্ষণীয়া' (১৯১৬), উপন্যাসে সমাজ-অবহেলিত অন্ত্যজ মানুষের প্রতি লেখকের সহৃদয়তা প্রকাশিত হয়েছে। বিভূতিভূষণের (১৮৯৪-১৯৫০)'আরণ্যক' (১৯৩৯) উপন্যাসে অসহায় গাঙ্গোতা-মাহাতো জীবনের কথা সহানুভুতিশীলতার সঙ্গে চিত্রিত হয়েছে।

বাংলা ছোটগল্পের ক্ষেত্রে দেখি, বাংলা ছোট গল্পের জন্মলগ্ন থেকে আজ পর্যন্ত প্রায় প্রত্যেক গল্পকারের গল্পেই অন্ত্যজ জীবনের কথা কম বেশি স্থান পেয়েছে। বাংলা ছোট গল্পের সার্থক স্রষ্টা রবীন্দনাথ ঠাকুর থেকে শুরু করে একালের ভগীরথ মিশ্র, অমর মিত্র, কিন্নর রায়, আপসার আমেদ পর্যন্ত সমস্ত লেখকই তাঁদের কোন না কোন গল্পের বিষয় হিসেবে অন্ত্যজ জীবনকে গ্রহণ করেছেন। প্রভাত কুমার মুখোপাধ্যায়ের (১৮৭৩-১৯৩২) 'হীরলাল' গল্পে হীরালাল ডোমের মনের সুন্দর সুকুমার

বৃত্তি ও মানবিক সমানুভূতি প্রকাশিত। তারাশংকরের(১৮৯৮-১৯৭১) 'ডাকহরকরা' গল্পের মেল-রানার দীনু ডোমের চারিত্রিক সততা ও মহানুভবতার পরিচয় গল্প-বিষয় হয়েছে। শরৎচন্দ্রের(১৮৭৬-১৯৩৮) 'বিলাসী' গল্পে মাল- জাতের মেয়ে বিলাসী মালোর অনন্য সাধারণ মহিমামন্ডিত প্রেম কাহিনী বর্ণিত।

ফলকথা, বিংশ শতাব্দীর বাংলা সাহিত্যের বিভিন্ন শাখায় অন্ত্যজ মানুষ এলো ব্যাপকভাবে। তারা পেল সত্যিকারের মানুষের মর্যাদা। তাদের প্রতি শতাব্দী-পুঞ্জিত অপমান, লাঞ্ছনা ও অত্যাচরের বিরুদ্ধে লেখকরা সোচ্চার হলেন। আর্থ-সামাজিক এই পটভূমির উপর দাঁড়িয়ে বর্তমান গবেষণা 'স্বাধীনোত্তর পর্বে বাংলা উপন্যাস ও ছোটগল্পে অন্ত্যজ জীবনের স্বরূপ' কে অনুসন্ধান করব।

প্রথম অধ্যায়

প্রথম অধ্যায়

(এক) অন্ত্যজ জীবনের স্বরূপ সন্ধান

"পূর্বে আমরা 'অন্ত্যজ' শব্দটির মূল অর্থ ও পরবর্তীকালে তার অর্থ কীরূপ নিয়েছে, সে বিষয়ে আলোচনা করেছি। এখানে শুধু বলতে চাই যে 'অন্ত্যজ' শব্দের আক্ষরিক অর্থ হল ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য-এই তিন বর্ণ জন্মের পর শেষজাত চতুর্থ বর্ণ শূদ্র। ঋক বেদের বিরাট পুরুষের বিভিন্ন অঙ্গজাত বর্ণগুলির মধ্যে শূদ্র তাঁর চরণ-দেশ থেকে শেষে-জাত বলে ঘৃণ্য বা অবজ্ঞাত ছিল না। অনেক পরের অন্ত্য(শূদ্র) থেকে জাত অর্থাৎ শূদ্রের ঔরসে উচ্চবর্ণের স্ত্রীর গর্ভে 'প্রতিলোমজ' সন্তানদের 'অন্ত্যজ' বা ' চন্ডাল' বলা হল। শাস্ত্র সম্মত সবর্ণ এবং অসবর্ণ বিবাহের পর সামাজিক প্রথা লঙ্ঘন দ্বারা ভ্রষ্ট-সৎস্রবের সন্তানদের অন্ত্যজ বলা হয়েছে স্মৃতি শাস্ত্রে। এখন ' অন্ত' শব্দের অর্থ 'নীচ' মনে করা হয় এবং নীচ কুলজাত, অধম নীচাশয়-অস্পৃশ্য ব্যক্তি 'অন্ত্যজ' নামে অভিহিত হয়।

আর্য সমাজের বাইরে যে সকল জাতি বেদবিহিত নিয়ম-নীতি মানেন না এবং যাঁদের উচ্চতর সংস্কৃতি বলতে কিছু নেই সেই অষ্ট্রিক গোষ্ঠীর কোল, ভীল, সাঁওতাল, শবর, কিরাত, কুরকু প্রভৃতি জাতিদের এবং বৈদিক যুগের দাস বা দস্যু, ব্রাত্য এবং নিষাদদেরও আমরা অন্ত্যজ অর্থে নীচজাতি ধরে নিয়ে এদেরও বুঝে থাকি। তাছাড়া, মোঙ্গলয়েড,গোষ্ঠীর কোচ প্রভৃতিও অন্ত্যজ শ্রেণীর অন্তর্গত।"[১২]

(দুই) আদিযুগের বাংলা সাহিত্য

ক) চর্যাপদ

আমাদের বাংলা ভাষার আদিম নিদর্শন গ্রন্থ চর্যাগীতির ভাব ও ভাষা বাঙালীরই। মহামোহপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় - নেপালের রাজদরবার থেকে পাওয়া চর্যাগীতি, 'হাজার বছরের পুরাণ বাঙ্গালা ভাষায় বৌদ্ধগান ও দোহা' নামে যে গ্রন্থ সম্পাদনা করে(১৩১৬) প্রকাশ করেছেন, তার মধ্যে 'দোহাকোষ' ও 'ডাকার্ণব' গন্থ ও ছিল। কিন্তু পরে ডঃ সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ পন্ডিত ব্যক্তি বলেছেন যে প্রথম পুথি চর্যাচর্যাবিনিশ্চয় নামটি শুদ্ধ নয়, প্রকৃত শুদ্ধ নাম চর্যাশ্চর্য বিনিশ্চয়ঃ। এই ভাষাবিজ্ঞানীরা বলেছিলেন যে 'দোহাকোষ' অবহট্‌ঠ ভাষায় লেখা। কিন্তু চর্যাগীতির ভাষা একেবারে প্রাচীন বাংলা - এতে পশ্চিমবাংলার কথ্য ভাষার স্পর্শ আছে। অবশ্য এর ভাষাতে অবহট্‌ঠের কমবেশী ও মগহী, ভোজপুরী এবং ওড়িয়া ভাষার অল্পস্বল্প ছোঁয়াচ আছে। সে যাই হোক, চর্যাগীতি ও দোহাকোষ দুটির পুঁথি মিলেছিল নেপাল রাজদরবার থেকে। তত্ত্বসাধনার পারিভাষিক শব্দে পূর্ণ, রূপক উৎপ্রেক্ষাময়, রসময় এই স্থানগুলির মধ্যে সাধন-সঙ্কেতের ব্যঞ্জনা আছে। এগুলির যে বাইরের অর্থ, তাতেই বাংলা সাহিত্যের পরিচয় আছে।

প্রাক্-আধুনিক বাংলা সাহিত্যের আদিযুগের সর্বাপেক্ষা নির্ভরযোগ্য ও প্রাচীনতম গ্রন্থ হল চর্যাগীতি। খ্রীষ্টীয় দশক থেকে দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যে এই সংকলন গ্রন্থের গানগুলি লিখিত হয়েছিল বলে বিভিন্ন ভাষা বিজ্ঞানী ও সাহিত্যের ঐতিহাসিকগণ মনে করেছেন। [১৩]

এই গানগুলি রচনার সময় এ-দেশে ছিল পালরাজাদের রাজত্ব। তাঁদের পৃষ্ঠপোষকতায় নবজাত বাংলা ভাষায় গীতিকবিতার আকারে বৌদ্ধ-সহজিয়াদের কতকগুলি গান রচিত হয়। এগুলি 'চর্যাগীতি' নামে পরিচিতি। পালরাজাদের পরে দ্বাদশ শতকে সেন-রাজত্ব প্রতিষ্ঠত হলে বাংলাভাষা ও সাহিত্য রাজদরবারের আনুকূল্য থেকে বঞ্চিত হয়ে লোকজীবনকে আশ্রয় করে এবং তা শ্রেণীহীন বৌদ্ধ, বর্ণহীন শৈব, অন্তপুরের মহিলা, অধম শূদ্র এবং শবর চন্ডাল-পুলিন্দ প্রভৃতির মধ্যে তার ধারা প্রবাহিত হয়ে চলে । চর্যাগীতি ছাড়া একালের অন্য সাহিত্য লৌকিক বলেই মৌখিক। এই কারণে ছড়া, কথা ও গানের আকারে ও তার কিছু নিদর্শন বাংলার লোক-সাহিত্যে অনেকখানি পরিবর্তিত আকারে প্রচলিত আছে। প্রথমেই চর্যাগীতিগুলির মধ্যে যে তত্ত্বকথা আছে, তা অতি সংক্ষেপে আলোচনা করা যেতে পারে।

বজ্রযান, সহজযান ইত্যাদি সাধনপদ্ধতি মহাযান বৌদ্ধ ধর্মসাধনার বিবর্তিত রূপ। হীনযানী সাধন পদ্ধতি থেকে মহাযানী সাধন পদ্ধতি স্বতন্ত্র। হীনযানীদের মতো এঁদের চরম লক্ষ্য নির্বাণ নয়-বুদ্ধত্বলাভ। এঁদের দর্শন প্রত্যেক সত্তার মধ্যেই বুদ্ধত্বের অর্থ হল বোধিচিত্তলাভ এবং বোধিচিত্ত হচ্ছে শূন্যতা ও করুণার একটি সমন্বিত রূপ। মূল বৌদ্ধ বৌদ্ধ নিয়মগুলিকে অনেকাংশে শিথিল করার ফলে এই ধর্মের মধ্যে আরও নানা অবৌদ্ধ ধর্মমত এসে মিশতে পেরেছিল। এতে ক্রমশঃ তন্ত্রও এসে প্রবেশ করল - ফলে দেখা দিল মন্ত্রযান, বজ্রযান, সহজযান, কালচক্রযান ইত্যাদি মতবাদ। বজ্রযানের পর সহজযানী মত দেখা দেয়। এতে পূজা, দেবদেবীর মূর্তি, আচার-অনুষ্ঠান মুদ্রা প্রভৃতি যা বজ্রযানী মতবাদে আছে, এখানে তা নেই। গুরু প্রদর্শিত পথে দেহ সাধনার মধ্য দিয়ে ব্যক্তিগত সিদ্ধিলাভের কথা এই মতবাদে লক্ষণীয়। চর্যাগীতিগুলিতে এঁদের সাধনা ও মতবাদই সাহিত্যরূপ লাভ করেছে। [১৪]

যাইহোক, এখন চর্যাগীতির মধ্যে প্রতিফলিত অন্ত্যজ জীবনের যে চিত্র পাওয়া যায়, আমরা তার আলোচনা করব। চর্যাগীতিগুলিতে মহযানী বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের বিবর্তন ক্রমে জাত সহজিয়া-বজ্রযানীদের গুহ্যায়িত দেহ-সাধনার কথা আছে। কিন্তু এই গুহ্য-সাধনার কথা হেঁয়ালিপূর্ণ ভাষায় বলতে গিয়ে বৌদ্ধ সিদ্ধাচার্যগণ পদগুলিতে যে সব উপমা, রূপক, উৎপ্রেক্ষা ইত্যাদি অলংকার প্রয়োগ করেছেন বা চিত্র উপস্থাপিত করেছেন তা সবই লোকজীবন থেকে সংগৃহীত। লোক-সমাজজীবনের এই সব অলংকার-চিত্রের মধ্য দিয়ে সেকালের মানুষদের বিশেষত নিম্নশ্রেণীর অন্ত্যজদের জীবন-পরিচয় সুন্দরভাবে ফুটে উঠেছে। আর এদেশে আর্য আগমনের পূর্বে কোল-অষ্ট্রিক-দ্রাবিড় ও মোঙ্গলয়েড, গোষ্ঠীর অনার্য জাতি বাস করত এবং তার মধ্যে কোলদের ছিল প্রাধান্য। এই আদিম কোলগণের মধ্য শবর, শুন্ডী, ডোম, চন্ডাল প্রভৃতি চর্যগীতির যুগে সমাজের একটি বৃহৎ অংশ অধিকার করেছিল । চর্যাকারগণের শিক্ষা ও সংস্কৃতি যে উচ্চ ছিল চর্যাগীতিতেই

তার প্রমাণ আছে। এঁরা সাধনার সূক্ষ্মতত্ত্ব প্রকাশ করতে গিয়ে বারবার এই শবর-শুন্ডী-ডোম চন্ডালদের কথা, তাদের জীনযাত্রা ও চরিত্রের কথা এই জন্যেই বেশি করে বলেছেন। সেকালের যে সমাজব্যবস্থা ছিল , তাতে এই সকল আদিম জাতিগুলি সভ্য নাগরিক জীবন থেকে দূরেই ছিল এবং পরে এরাই সমাজের নিম্নস্তরে ভিড় করে।

চর্যাগীতির অন্তর্গত শবরদের বাস ছিল বড় বড় পাহাড়ের উত্তুঙ্গ শিখরে-

" বরগিরিসহর উত্তুঙ্গমুনি সবরেঁ জহি কিঅ বাস" (কাহ্নপাদ-১৯ নং)

শবরপাদর ২৬ নং গানে অন্ত্যজ এই শবর শবরীদের পার্বত্য-জীবন-যাত্রার সুন্দর বর্ণনা আছে। পদকর্তা শবর নিজেও হয়তো অন্ত্যজ শবর ছিলেন। চর্যায় বলা হয়েছে-

"উঁচা উঁচা পাবত তঁহি বসই সবরী বালী।
মোরঙ্গী পীচ্ছ পরহিণ সবরী গীবত গুঞ্জরী মালী ॥
উমতো সবরো পাগল সবরো মা কর গুলী গুহাড়া তোহৌরি।
নিঅ ঘরণী নামে সহজ সুন্দারী ॥
নানা তরুবর মৌউলিল রে গঅণত লাগেলী ডালী।
একেলী সবরী এ বণ হিন্ডই কণ বজ্রকন্ডলধারী ॥
তিঅ ধাউ খাট পাড়িলা সবরো মহাসুহে সেজি ছাইলী ॥
সবরো ভুজঙ্গ নৈরমণি দায়ী পেক্ষ রাতি পোহাইলী ॥
হিও তাঁ বোলা মহাসুহে কাপুর খাই।
সুন নৈরামণি কণ্ঠে লইয়া মহাসুহে রাতি পোহাই ॥
গুরবাক পুঞ্চআ বিন্ধ নিঅ মণে বাণে।
একে শরসন্ধানেঁ বিন্ধহ বিন্ধহ পরমণিবাণেঁ ॥
উমত সবরো গুরু আস রোষে।
গিরিবর-সিহর-সন্ধি পইসন্তে সবরো লোড়িব কইসেঁ ॥"(শবর পাদ, ২৬ নং পদ)

এর আক্ষরিক অর্থ ঃ- "উঁচা উঁচা পর্বত, সেখানে বাস করে শবরী বালিকা, ময়ূরের পুচ্ছ পরিধানে শবরী, গলায় গুঞ্জার মালা। ওগো উন্মত্ত শবর, ওগো পাগল শবর, গোলে ভুল করিও না, দোহাই তোমার - আমি তোমারই গৃহিণী, নামে সহজ সুন্দরী। নানা তরুবর মুকুলিত হইল, গগনে লাগিল ডাল, একেলা শবরী, এ বনে ঘুরিয়া বেরায়, কর্ণকুন্ডল বজ্রধারণ করিয়া। তিন ধাতুর খাট পাড়িল শবর, মহাসুখে বিছাইল শয্যা । শবর ভুজঙ্গ ও নৈরাত্মা স্ত্রী উভয়ে প্রেমের রাতি পোহায়, হৃদয় তাম্বুল মহাসুখে কর্পূর খায়, শূন্য নৈরামণি (নৈরাত্মা) কণ্ঠে লইয়া মহাসুখে রাত্রি পোহায়। গুরু বাক্য ধনু, নিজ মনে রূপ বাণের দ্বারা বিদ্ধ, এক শর সন্ধানে পরম নির্বাণ বোঁধ। উন্মত্ত শবর গুরুরোষে, গিরিবরের শিখর সন্ধিতে করিতেছে প্রবেশ, শবর আবার ফিরিবে কি করিয়া?" [১৫]

অন্ত্যজদের জীবন

এর তত্ত্বকথা গুলিকে পাশ কাটিয়ে আমরা শবরদের জীবন কথা সম্বন্ধে যে ধারণা করতে পারি তা হল - জনবসতি থেকে দূরে উচ্চ পর্বতে বাস করে শবর-শবরী । শবরী গলায় পড়ে গুঞ্জার মালা, ময়ূরের পাখা জড়ায়, কোমরে ও কানে পড়ে কুন্ডল। উন্মত্ত শবর নেশার ঝোঁকে শবরীকে ভুলে যায়, তখন শবরী তাকে ডেকে এনে আবার ঘর সামলায়। তাদের সুখের শয়ন কুড়ে ঘরের খাটিয়ায়, সেখানেই তাদের নিবিড় মিলন। পান আর কর্পূর তাদের পূর্বরাগের উপাদান। শরধনু নিয়ে শিকার তাদের জীবিকা। কোন কোন দিন শবর রাগ করে অনেক দূরে চলে যায়, তখন শবরী একাকিনী তাকে খুঁজে বেড়ায়। শবর-শবরীর জীবন যাত্রা নিয়ে এই শবর পাদ আরও একটি পদ লিখেছেন ৫০ নং চর্যাগীতি। কিছু কিছু অংশ বর্জন করে প্রাসঙ্গিক অংশের উদ্ধৃতিটি নিম্নরূপ--

" গঅণত গঅণত তইলা বাড়ী হিঞ্চে করাড়ী।
কণ্ঠে নৈরামণি বলি জাগন্তে উপাড়ী ॥
.....
হেরি সে মোর তইলা বাড়ী খসমে সমতুলা ।
সুকড়এ সে রে কপাসু ফুটিলা ॥
.....
কঙ্গুচিনা পাকেলা রে সবর-সবরী মাতেলা।
অনুদিন শবরো কিম্পি না চেবই মহাসুহেঁ ভোলা ॥
চারিবাসে গড়িলা রে দিআ চঞ্চালী।
তহিঁ তোলি শবরো ডাহ কএলা কান্দই সগুণ শিআলী।" (শবর পাদ,৫০ নং)

এর অর্থ ঃ- গগনে গগনে বাড়িগুলি লগ্ন। হৃদয় কুঠারে তাকে উপড়ে ফেললে কণ্ঠে নৈরামণি শবরী বালিকা জাগে। আবার সে গগন-সৎলগ্ন বাড়ি আকাশের সমতুল্য, তাতে কি সুন্দর কার্পাস ফুল ফুটেছে। ...কাগনী পেকে উঠেছে - তাতে মেতে উঠেছে শবর-শবরী। অনুদিন শবর একটু জাগে না - মহাসুখে সে ভোর হয়ে আছে। চারপাশে বাঁশের কঞ্চিদিয়ে (বেড়া) তৈরী করল, তাতে ভুলে শবর সব দাহ করল, শকুন-শিয়াল সব কাঁদে।" [১৬]

এ পদটিরও তত্ত্বকথার অন্তরালে শবরদের যে সাধারণ পরিচয় আছে তা হল- পাহাড়ের উপর প্রায় আকাশের নিকটবর্তী হল শবর- শবরীর বাড়ি। বাড়ির চারিদিকে কাপাসের ফুল। কাগনী নামক ধান ছিল তাদের প্রিয় খাদ্য। বাঁশের কঞ্চির বেড়া দিয়ে এই ধানকে তারা রক্ষা করত। পার্বত্য-মাঠে শকুন-শিয়ালের উপদ্রব থেকে শস্যকে তাদের রক্ষা করতে হত। জনবসতি থেকে দূরে, পাহাড়ের উপর শবরদের বাসের কথা আর একটি চর্যাগীতিতেও পাই- "টালত মোর ঘর নাহি পরিবেশি" - ঢিলাতে আমার ঘর, প্রতিবেশী নেই। (ঢেণ্ঢণপাদ ৩৩ নং)

চর্যাপদের মধ্যে যে জীবনধারা ও সমাজের চিত্র পাই তা মূলতঃ দরিদ্র ব্রাত্য নিম্নশ্রেণীর মানুষদেরই। কিন্তু প্রাচীন যুগের অন্ত্যজ শ্রেণীর মানুষদের জীবন চিত্রকে অনেকখানি সম্পূর্ণভাবে পেতে গেলে যদি শুধুমাত্র চর্চা গীতির উপর নির্ভর করি, তাহলে আমাদের এতক্ষণের আলোচনায় যথেষ্ট। কিন্তু আরও একটু বিস্তারিত জানতে গেলে অমাদের নির্ভর করতে হবে সমকালীন সংস্কৃত ও প্রাকৃত অপভ্রংশ সাহিত্য, বাংলার স্মৃতি সাহিত্য, বৃহদ্ধর্ম পুরাণ, ব্রহ্ম বৈবর্ত পুরাণ দোঁহাকোষ, সদুক্তি কর্ণামৃতের অন্তর্গত কিছু কিছু শ্লোক, রামচরিত ও পবন দূতের মত কাব্য প্রভৃতি গ্রন্থের উপরেও। ডঃ নীহার রঞ্জন রায় বলেছেন- " গ্রন্থগুলিতে কোন সুসংবদ্ধ নিয়মিত বিবরণ কিছু নাই, কোন বিশেষ দিক সম্বন্ধে পূর্ণাঙ্গ চিত্রও নাই,তবু এই সব গ্রন্থের ইতস্তত উল্লিখিত তথ্যাদি একত্র করিলে মোটামুটি একটা ছবি ধরতে পারা হয়তো খুব কঠিন নয়।"[১৭]

এগুলি বাংলা ভাষায় লিখিত নয়- তাই প্রাচীন বাংলা সাহিত্যে-ধৃত অন্ত্যজ জীবন বললে এগুলিতে উল্লিখিত বিষয় স্থান হয়তো পাবে না। তবু এ-বিষয়ে ডঃ শশীভূষণ দাসগুপ্ত একটি মূল্যবান কথা বলেছেন। তাঁর সেই কথা মনে রাখলেই এগুলিতে প্রতিফলিত অন্ত্যজ জীবন পরিচয়কে গ্রহণ করা চলে। তিনি বলেন - "এখানে বাংলা সাহিত্য কথাটি আমি ' বাংলা ভাষায় লিখিত সাহিত্য'-এই সংকীর্ণ অর্থে গ্রহণ না করিয়া 'বাঙলার সাহিত্য' অর্থাৎ বাংলাদেশে বাঙালী কবিগণ কর্তৃক একই কবি মানস লইয়া লিখিত সাহিত্য এই অর্থে গ্রহণ করিয়াছি।"[১৮]

ডঃ সুকুমার সেন ও তাঁর 'প্রাচীন বাংলা সাহিত্য' নামক পুস্তিকায় প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের পরিচয় দিতে গিয়ে সংস্কৃত, প্রকৃত-অপভ্রংশ সাহিত্য ও প্রাকৃত পৈঙ্গল গ্রন্থের ওপরও নির্ভর করেছেন।

খ) মৌখিক লোকসাহিত্য - নানা রকম ছড়া ডাক ও খোনার বচন এবং প্রবাদ প্রবচন

বাংলা সহিত্যে প্রাচীনতম লিখিত নিদর্শনরূপে আমরা সর্বজন স্বীকৃত 'চর্যাগীতি' কেই গ্রহণ করেছি এবং ৯৫০ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ১২০০ খ্রীষ্টাব্দ তার মধ্যে লিখিত এই সাহিত্যে অন্ত্যজ- জীবনের পরিচয় বিস্তারিতভাবেই দিয়েছি। কিন্তু একথাও ভুললে চলবে না যে আমাদের মৌখিক সাহিত্যের অর্থাৎ লোক সাহিত্যের ধারাটিও অতি প্রাচীন। বহু বৎসর ব্যাপী লোক মুখে বিবর্তিত হয়ে এ সাহিত্যের ভাষা বহু ক্ষেত্রেই পরিবর্তিত হয়েছে। তবুও এ-সাহিত্যের মধ্যেও অন্ত্যজ-জীবনের নানা চিত্র ও তা পুর্ণাঙ্গ না হলেও (অনেক সময়) আমরা পাচ্ছি।

ছড়াগুলির মধ্যে কিছু সংখ্যক ছড়া ত্রয়োদশ ও চর্তুদশ শতকে রচিত হয়েছিল বলে পন্ডিতেরা অনুমান করেছেন। বড় ধরণের কোন রচনা অবশ্য এসময়ে রচিত হয়েছিল বলে মনে হয় না। পরবর্তীকালে সাহিত্যের নানা দিক লক্ষ্য করে পন্ডিতেরা অনুমান করেছেন মনসার কাহিনী, ধর্মের কাহিনী, চন্ডীর কাহিনী ইত্যাদি দেশীয় জিনিস এবং রামায়ণ ও কৃষ্ণলীলার কাহিনী প্রভৃতি পৌরাণিক জিনিস পাঁচালীর আকারে অথবা গানের আকারে গ্রামের কোন উৎসব বা দেব পূজা উপলক্ষ্যে বাদ্য ও নৃত্যসহ গীত হত। অবশ্য ধর্ম বা অধ্যাত্ম-ভাবনা বর্জিত সম্পূর্ণ লৌকিক ছড়া ও গান যে চর্যাগীতির বহু পূর্বেই প্রচলিত ছিল এবং সেই প্রবাহ ধরে পরবর্তী সময়ে অন্যান্য রচনার বিষয়বস্তু

হয়ে উঠে আজকের সাহিত্যেও সমভাবে প্রবাহিত হচ্ছে সে কথা বলতেই হয়। সংস্কৃত ও প্রাকৃত ভাষার রচনায় মিলেছে এমন কিছু গল্প-কাহিনী যেগুলি আরো বহু পূর্ব থেকে চলে আসছিল। নবম-দশম শতকে এগুলি যে জনপ্রিয় ছিল পাহাড়পুরের মন্দিরের ভিত্তিতে উৎকীর্ণ পঞ্চতন্ত্রের নানা গল্পে তার প্রমাণ মেলে।

রামায়ণ-মহাভারত-এর কাহিনী ও কৃষ্ণলীলার গান রাজসভায় প্রচলিত ছিল ভদ্রসাহিত্যে সংস্কৃত ভাষায়। কিন্তু সমাজের নিম্ন স্তরের 'লোক'- সাহিত্যে দেশীয় ভাষাকে অবলম্বন করে কৃষ্ণের ব্রজলীলা এবং মনসা-চন্ডী ও ধর্ম দেবতার মহিমা বিষয়ক কাহিনী প্রচলিত ছিল। ডঃ সুকুমার সেন ভাষা-তত্ত্বের দিক দিয়ে অনুমান করেছে কানু বা কানাই(কৃষ্ণ), রাই(রাধিকা), আয়ান(অভিমন্যু), গোই বা গুঁই(গোপি বা গোপিকা), ফুল্লরা, খুল্লনা(ক্ষুদ্র), লহনা(লোভনা),বেহুলা (বিধুরা) ইত্যাদি নামগুলির তদ্ভব রূপই মিলেছে। এর থেকে তাঁর অনুমান যে "শেষের সব কাহিনী ধারাবাহিকভাবে প্রাকৃত অপভ্রংশ-অবহট্‌ঠ ও প্রাচীন বাঙ্গালার মধ্য দিয়াই আসিয়াছে।" [১৯]

প্রবাদ

একথা ঠিক যে খনার বচন, ডাকের কথা এবং প্রবাদ-প্রবচন এ -যুগেও ছিল, কিন্তু তাদের সংখ্যা অত্যন্ত কম। আমাদের হাতে সেই প্রাচীনতম নিদর্শন এককথায় নেই বললেই চলে। 'চর্যাগীতির' মতো আমাদের প্রাচীনতম লিখিত সাহিত্যে কিছু কিছু প্রবাদের অস্তিত্ব লক্ষ্য করা যায় । যেমন-

ক)"আপনা মাসেঁ হরিণা বৈরী "। (ভুসুকু)

খ) "দুহিল দুধু নাহি বেন্টে সামাঅ"(সরহ) ইত্যাদি।

প্রবাদের মধ্যে বাঙালীর বাঙালীয়ানার পরিচয়ে শুধু উচ্চ বর্ণীয়দের জীবন-চিত্রই ফোটে না- সমস্ত বাঙালী তা সে নিম্নস্তরের অন্ত্যজ হলেও তাদের জীবন পরিচয় ও এতে মেলে। এগুলি ঠিক খাঁটি সাহিত্য নয়, তবে সাহিত্যের নিকটবর্তী। প্রবাদ সম্পর্কে অত্যন্ত মূল্যবান আলোচনা করেছেন ডঃ সুশীল কুমার দে তাঁর 'বাঙলা প্রবাদ' গ্রন্থে। তিনি প্রবাদ সম্পর্কে বলেছেন, "ইহার রসপ্রেরণা আসিয়াছে, দেশের আলো, জল, বায়ু, হইতে, জাতির চেতনা হইতে। উচ্চ ভাবুকতা ও কল্পনা ব্যতিরেকেও এগুলি রসসম্পৃক্ত হইয়া উঠে।"[২০]

মধ্যযুগের সকল কবির কাব্যেই প্রবাদ-প্রবচনের প্রয়োগ দেখি।

ছড়া

ছড়া কিন্তু প্রবাদের থেকে অনেকটা সাহিত্যের নিকটবর্তী। রবীন্দ্রনাথ ছড়া সম্পর্কে যে মূল্যবান আলোচনা করে দিয়েছেন তাঁর 'ছেলে ভুলানো ছড়া' প্রবন্ধে তাতে এবিষয়ে এখন আমরা খুবই অবহিত হয়েছি। ছড়ার মধ্য দিয়ে এবং প্রবাদের মধ্য দিয়ে বাঙালীর বস্তু নিষ্ঠ টুকরো জগৎ ফুটে উঠেছে - অস্ফুট ও অতিন্দ্রীয় জগৎ নয়, যা প্রকৃত ও প্রত্যক্ষ,বাঙ্গালীর সেই রস- জীবন এতে ধরা পড়েছে । এবং তা উচ্চবর্ণীয় ও নিম্নবর্ণীয় নিরপেক্ষ ভাবেই।

ডাক ও খনার বচন

ডঃ দীনেশ চন্দ্র সেন বলেছেন যে, ডাক ও খনার বচন রচনার সময় এদেশে বৌদ্ধ প্রভাব সম্পূর্ণরূপে লুপ্ত হয়নি। এগুলিতে পুস্করিণী খনন, পথ-নির্মাণ, বৃক্ষরোপণ ইত্যাদি লোক কল্যাণ মূলক ধর্ম যে অবশ্যই পালনীয়, তা বলা হয়েছে, কিন্তু অধ্যাত্মভাবের কথা নেই। খনার বচন বহু প্রচলিত বলে তার ভাষা সরল ও সহজ হয়ে গেছে, কিন্তু ডাকের বচন তেমন প্রচারিত না হওয়ায় সেগুলির ভাষায় প্রাচীনত্ব রয়ে গেছে। কথিত আছে যে 'ডাক' নামক জনৈক গোপ ডাকের বচন প্রণয়ন করেছেন।

ডাক ও খনা দুয়েরই জীবন অন্ধকারাছন্ন অবস্থায় রয়েছে। অসমীয়া সাহিত্যের বুরুঞ্জী লেখক অসমের 'লোহি ডাঙারা' নামক স্থানে ডাকের বাসস্থান ছিল বলে দাবী করেছেন। বাংলার 'ডাক' সম্পর্কে বলা হয়েছে তিনি গোপ জাতীয়, কিন্তু অসমীয়া ডাক 'কুম্ভকার'। ডঃ দীনেশ চন্দ্র সেন ব্যক্তিগত ভাবে অনুমান করেছেন যে,ডাকের বচনগুলি কোন ব্যক্তি বিশেষের রচনা নয়। 'ডাক' অর্থে প্রচলিত বাক্য ও হতে পারে প্রকৃতপক্ষে ডাকের বচন বলতে যা বোঝায় তা হল কোন একটা ধারণা অথবা রীতি অথবা কোন প্রচলিত উক্তি যা বহুকাল ধরে সমাজের মানুষের মুখে মুখে প্রচারিত হয়ে আসছে। তাই তাঁর সিদ্ধান্ত "কালিদাস ও গোপাল ভাঁড় যেমন বাংলা পাড়া গাঁয়ের সমস্ত রসিকতা একচেটিয়া করিয়া রাখিয়াছেন,বঙ্গদেশের জ্ঞানেও সেইরূপ সেকালে ডাক ও খনা নাম ধেয় প্রকৃত কিংবা কল্পিত ব্যক্তিদ্বয় একাধিকার স্থাপন করিয়াছিলেন।" [২১]

"খনা ও ডাকের বচনে আমরা দু-রকম মন্তব্য পাই। খনা কৃষক ও গ্রহাচার্যের নজির। ডাকের বচনে জ্যোতিষ ও ক্ষেত্র তত্ত্বের কথা আছে সত্য, কিন্তু তাহাতে মানব চরিত্রের সংখ্যা বেশি"। [২২]

প্রয়োজনের ভিত্তিতে কয়েকটি ডাক ও খনার বচনের কথা উল্লেখ করা যায়ঃ

ডাকের বচন

ক) ডাঙ্গা লিড়ান বান্ধন আলি।
তাতে দিও নানা শালী ॥

খ)যে দেয় ভাত শালা পানী শালী।
সে না যায় যমের বাড়ি ॥

গ) স্বর্ণ ভূমি কন্যা দান।
বলে ডাক স্বর্গে স্থান ॥

ঘ) ভাল দ্রব্য যখন পাব।
কালিকারে তুলিয়া না থোব ॥
দধি দুগ্ধ করিয়া ভোগ।

ঔষধ দিয়া খন্ডাব রোগ ॥
বলে ডাক এই সংসার ।
আপনা মইলে কিসের আর ॥

খনার বচন

ক) খাটে খাটায় লাভের গাঁতি।
তার অর্ধেক কাঁধে ছাতি ॥
ঘরে বসে পুছে বাত।
তার ভাগ্যে হাভাত ॥

খ) খনা ডেকে বোলে যান ।
রোদে ধান ছায়ায় পান ॥

গ) দাতার নারিকেল, বখিলের বাঁশ।
কমে না বাড়ে না বার মাস ॥

ঘ) দিনে রোদ রাতে জল।
তাতে বাড়ে ধানের বল ॥
কার্তিকের উনজলে ।
খনা বলে দুন বলে ॥

ডাক

ক) ঘরে আখা বাইরে রাঁধে।
অল্প কেশ ফুলাইয়া বাঁধে ॥
ঘন ঘন চাই উলটি ঘাড়।
ডাক বলে এ - নারী ঘর উজাড় ॥

খ) নিয়োড়ে জোখড়ি দূরে যায়।
পথিক দেখিতে আউরে চায় ॥
পর সম্ভাষে বাটে থিকে।
ডাক বলে এ নারী ঘরে না টিকে ॥

গ) কাখে কলসি পানীকে যায়।
হেট মুন্ডে কাকহো না চায় ॥
যেন যায় তেন আইসে ।
বলে ডাক গৃহিনী সেই সে ॥

একদা আমাদের দেশের সাধারণ ও অন্ত্যজ শ্রেণীর চাষী-বউরা তো বটেই, সাধারণ ভদ্রজন ও এই সব বচন কণ্ঠস্থ করেছিলেন। তখনকার দিনে চাষীরা মাথার ঘাম পায়ে ফেলে চাষ করত, ঘরে ফসল তুলে আনতো, চাষের পূর্বে বৃষ্টির জলের জন্য আকাশের দিকে তারা চেয়ে থাকত। কখন্ কোন্ সময় বৃষ্টি হতে পারে, কোন্ সময়ের বৃষ্টিতে ভালো ফসল হবে ইত্যাদি। মোটকথা চাষ সংক্রান্ত জ্ঞান তাদের খুব স্পষ্ট ছিল। আবার মানব চরিত্র বিশেষ করে স্ত্রী চরিত্র সম্পর্কেও তাঁদের জ্ঞানের স্বচ্ছতা কিছু কম ছিল না। ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে লোকচরিত্র জ্ঞান ও প্রাকৃতিক জগৎ ও নক্ষত্রলোক সম্পর্কে তাদের অনেকের জ্ঞান খুবই স্বচ্ছ হত। এই জ্ঞানেরই পরিচয় রয়েছে ডাক ও খনার বচনের মধ্যে।

আমাদের উদ্ধৃত খনার বচনে দেখছি যে, যে চাষী নিজে খাটে ও অন্যকেও খাটায়, তার লাভ হয় যথেষ্ট, আর যে ঘরে বসে থেকে শুধু কথা বলে কাজ করায় মজুরদের, তার ভাত জোটে না। পানের চাষ করতে গেলে ছায়ার দরকার,রৌদ্রে তার সমূহ ক্ষতি, অথচ ধানের পক্ষে রৌদ্রের প্রয়োজন আছে। দিনের বেলা যে মাঠের ধান রোদ্দুর পায় এবং রাত্রে আকাশের বৃষ্টি পায় সে ধান খুবই স্পষ্ট ও প্রচুর হয়ে থাকে। কার্ত্তিক মাসে বৃষ্টি কম হলেই ধানের ফসল দ্বিগুণ হয়।

পূর্বে কতগুলি ডাকের বচন উদ্ধৃত করা হয়েছে। সেগুলির মধ্যে একটি বচনে ডাঙাকে পরিস্কার করে জমিতে আল বাঁধবার কথা আছে। তার পর তাতে শালীধানের চারা রোপন করলে ভালো ফসল পাওয়া যাবে বলা হয়েছে। যে মানুষকে শালীধানের চালের ভাত ও জল খাওয়ায় সে যমকেও ভয় করে না। সোনা, জমি ও কন্যা দান করলে স্বর্গেই স্থান হয় (অবশ্যই উপযুক্ত পাত্রে)। ভালো জিনিস কালকের জন্য না রেখে আজই খেয়ে নেওয়া ভালো। দই-দুধ খেতে হবে, ঔষধ খেয়ে রোগ সারাতে হবে। কারণ সংসারে মরলেই সবশেষ, মারা গেলে কেউ কারো নয়।এখানে অনেকখানি চার্বাকপন্থীয় মনোভাব লক্ষ্য করা যায়।

ডাকের বচনে লোকচরিত্রজ্ঞান বিশেষ করে ঘরের বউ সম্পর্কে উক্তি লক্ষণীয়। ঘরের মধ্যে উনুন থাকা সত্ত্বেও যে বধূ বাইরে রান্না করে, যার অল্পচুল কিন্তু ফুলিয়ে বাঁধে, এবং ঘন ঘন ঘাড় উলটে চায়-তেমন নারী ঘরের সর্বনাশ বলে ডাক মনে করেন। আবার নিকটে পুকুর থাকা সত্ত্বেও যে-নারী দূরে যায়, পথিক দেখলে আড় চোখে চায়, পথের মধ্যে পরপুরুষের সঙ্গে কথা বলে- তেমন নারী ঘরে টেকে না। আর যে-নারী কাঁখে কলসী নিয়ে জলকে যায় মাথা নত করে,কারো দিকে চাইনা, যেমন যাই ঠিক তেমনি ফিরে আসে-এমন নারীই যথার্থ গৃহিণী ডাকের বচনে।

খনার বচন (জ্যোতিশ রত্নাকর) থেকে শস্য ফলন ও গৃহস্থালীর প্রচুর জ্ঞান আমাদের জন্মে। প্রকৃতির নিকট এবং মানুষের সঙ্গে ঘনিষ্টভাবে মিশেই এই সকল অর্জিত জ্ঞানের কথা ডাক ও খনার বচনে মিলবে।

একদিকে যেমন ডাক ও খনার বচনে সকল শ্রেণীর বাঙালীর গৃহস্থালী ও চাষের ব্যাপারে সতর্ক হয়ে চলার শিক্ষা আছে, তেমনি কতগুলি ব্যাপারে জ্যোতিষেও বিশ্বাসী হতে বলেছেন এই বচনগুলি। হাঁচি, টিকটিকির শব্দের তখন মানুষ অস্থির হয়ে থাকত - বারবার পঞ্জিকার নির্দেশও

মেনে চলত। কাক-মুখে জ্যোতিষের কথা শুনে কাজের ফল স্থির করত তারা । জ্যোতিষে বিশ্বাস অবশ্য তাদের চলার পথে সব সময় কল্যাণপ্রসূত হত না।

সে যাইহোক, ছড়া এবং ডাক ও খনার বচনের প্রভাব সেকালের অন্ত্যজ শ্রেণীর মানুষদের চলার পথে যথেষ্ট সহায়তা করছিল।

গ) শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্য ও অন্যান্য রচনাবলী

শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্য

" ১২০২ খ্রীঃ তুর্কী আক্রমণোত্তর বঙ্গদেশে দেড়শত বৎসর এক অন্ধাকরময় যুগ চলেছিল। এই সময় বাংলা সাহিত্যের কোন কিছুই রচিত হয়নি, বরং বাংলার সংস্কৃতি বিপর্যস্ত হয়ে চলেছিল। তারপর কিছু উদারচেতা সুলতানদের দেশ শাসনে ধীরে ধীরে দেড়শত বৎসর পরে সাহিত্য সৃষ্টির অনুকূল আবহাওয়া সৃষ্টি হতে থাকে। ঠিক এইরকম অবস্থায় অধিকাংশ পন্ডিতদের বিচারে বাংলা ১৩৮৫ খ্রীঃ নাগাদ বড়ু চন্ডীদাসের ভণিতায় 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' কাব্য রচিত হয়। বাংলা সাহিত্যের চর্যাগীতির পরেই এই প্রাচীন গ্রন্থটির উল্লেখ করতে হয়। 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' কাব্যটিতে নূতন কাব্যরীতি লক্ষ্য করা যায়। আমাদের ধারণা, এ-কাব্য গোষ্ঠী-সংকীর্ণতাকে ত্যাগ করে সর্বজনীন হয়ে ওঠে লৌকিক আদর্শকে অবলম্বন করার জন্যে। এ-কাব্যের কবি সংস্কৃতজ্ঞ সুপন্ডিত, কিন্তু পূর্ব-সাহিত্যের অনুকরণ তাঁর লক্ষ্য ছিল না। পল্লীর অনাড়ম্বর পরিবেশের দিকে তাকিয়ে গ্রাম্যরুচির অনুকূল ও জনগণকে আনন্দ-দান করার জন্য কবির এ কাব্য সৃষ্টি। তাঁর পূর্ববর্তী সংস্কৃত কবি জয়দেব 'গীতগোবিন্দ' কাব্য একদিকে যেমন 'হরিস্মরণ' করেছেন, অন্যদিকে তেমনি 'বিলাসকলা কুতূহল' - এর কথাও বিস্মৃত হননি । কিন্তু বড়ু চন্ডীদাস এ দুয়ের কোনটির ওপরই গুরুত্ব দেননি। তিনি সমকালীন বাস্তব জীবনের ছিলেন রূপকার। নামেই এখানে কৃষ্ণের কাহিনী আছে, কিন্তু তার অন্ত রালে সে কালের অরাজকতার মধ্যে অসহায়া নারীর ওপর প্রবল অত্যাচারের কথাই এখানে প্রবাহিত হয়ে চলেছে বলে আমাদের অনুমান।" [২৩]

বড়ু চন্ডীদাসের 'শ্রী কৃষ্ণকীর্তন '- এ আছে পালাবদ্ধ কাহিনী । এই কাহিনী তেরোটি খন্ডে বিভক্ত। প্রথম খন্ডটির নাম 'জন্ম খন্ড', এতে আছে শ্রী কৃষ্ণ কংস ইত্যাদি অত্যাচারী পাষন্ডদের দমন ও ভূভার হরণের জন্যে পৃথিবীতে অবতীর্ণ হয়েছেন। আবার লক্ষ্মীদেবী গোকুলে সাগর ও পদ্মাদেবীর কন্যা হয়ে জন্মেছেন। বৈষ্ণবেরা বলেন যে শ্রী কৃষ্ণ নিজের হ্লাদিনী সত্তার রস উপভোগের জন্য মানবরূপে অবতীর্ণ হয়েছেন- সেকথা কিন্তু 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' - এ নেই। দ্বিতীয় খন্ডটির নাম 'তাম্বুল খন্ড'। এখানে দেখি শ্রীকৃষ্ণ রাধার অনুরূপ রূপ - লাবণ্যের কথা শুনে তাকে ভোগ করতে চাইছেন। রাধার মায়ের পিসী চড়াই বুড়ীর মাধ্যমে শ্রীকৃষ্ণ তাম্বুল পাঠিয়ে নিজের রমণেচ্ছা পূরণের কথা বলছেন। বৈষ্ণব পদাবলীতে পূর্বরাগের মধ্য দিয়ে যে ভাবে প্রণয় সঞ্চারের কথা বলা হয়েছে এখানে তা দেখা যায় না সুবল-শ্রীদাম বা কোন সখীও এখানে দৌত্য করছে না- পরিবর্তে একজন

জরতী বুড়ি দৌত্য করছে। শ্বেতচামর- কেশা, কোটর-গত-নয়না এই বড়ায়ির আবির্ভাব কাহিনীতে রসাভাসের সৃষ্টি করেছে। শুধু তাই নয়, কাব্যের মধ্যে যাকে 'গ্রাম্যতা দোষ' বলে, তাও দেখা দিয়েছে।

একাব্যের প্রধান চরিত্র কৃষ্ণ তাই খাঁটি পৌরাণিক চরিত্র নয়। নিম্নশ্রেণীর ব্রাত্য সমাজেরই এক কামার্ত যুবককেই এই আখ্যান কাব্যের নায়ক করা হয়েছে। নির্মম প্রতিহিংসা পরায়ণ ও উৎপীড়ক এই কৃষ্ণ পৌরাণিক ভক্তবৎসল বাঞ্ছাকল্পতরু দেবতা নন। পুরাণের কৃষ্ণ ভক্তিস্বরূপিণী কৃষ্ণগতপ্রাণা 'হ্লাদিনী' নয় এ রাধা। ইনি বিবাহিতা কিন্তু নীতি বিগর্হিত প্রেম-বিরোধিনী কৃষ্ণদ্বেষিণী ও ধর্ষিতা এক কন্যা। কোন ক্রমেই এঁকে লক্ষ্মীর অবতার বলে মনে করা চলে না। পৌরাণিক রাস লীলায় প্রেমিক-প্রেমিকার মুখ্য বিষয় যে মিলন, তা এখানে প্রেমহীন নিষ্ঠুর বলাৎকার মাত্র। শুধু তাই নয় অল্পায়তনে এখানে দেবর্ষি নারদের যে দুর্গতি দেখানো হয়েছে তা রসিকতায় চূড়ান্ত। যাইহোক, এ কাব্যের কাহিনীর নায়ক-নায়িকাকে বাহ্যত গোপজাতির অন্তর্গত করা হলেও তাঁরা কিন্তু ঠিক গোপ জাতি ভুক্ত বলে মনে হয় না। সমাজের আরও নিম্নস্তরের অন্ত্যজ দুই নরনারী বলে আমাদের মনে হয়। কারণ, এ কৃষ্ণ রাধাকে 'ছিনারী' বলে সম্মোধন করেছেন ('ছিনারী' পামরী নাগরী রাধাকে পাতসি মায়া' কিংবা 'নহসি মাউলানী রাধা সম্বন্ধে শালী ')। এমনকি তাকে মেরে যম ঘরেও পাঠাতে চান কৃষ্ণ-"তবে ত্যজি মারিআঁ পাঠাওঁ যমঘর"। রাধা ও কম যান না। তিনি ঘুষি তুলে বলেন ঃ "মাগু কিলে কিলাইয়া মারিব তোহ্মা বাটে"। এ সকলই নিম্ন শ্রেনীর অন্ত্যজ জনগণেরই রীতি ও ভাষা । তাছাড়া দান খন্ডে রাধা বলেছেন চন্ডাল কৃষ্ণ। তাঁর ওপর বলপ্রয়োগ করছে-"দিঠিত পড়িলে বাঘত হও লাজ" ।

ভাগ্নে হয়ে তার এই ধরণের আচরণ নিরক্ষর রুচিহীন তথাকথিত নিম্নশ্রেণীর সমাজেই সম্ভব। এ-কাব্যে কৃষ্ণ ও রাধার ব্যবহার এবং তাঁদের উক্তি- প্রত্যুক্তি এমনই যে বিদ্যাপতি ও গোবিন্দ দাসের রাধা-কৃষ্ণের তার কোন মিল হয় না।এ কাব্যে রাধা বড়ায়ির গালে চড় মারতেও প্রয়োজনে পারেন। কৃষ্ণের গোঁয়ার্তুমি,রাধাকে সব সময় ভীতি-প্রদর্শন ও কুৎসিত ভাষার সম্মোধন আমাদের পীড়িত করে।

রাধার বয়স একাব্যে বলা হয়েছে দশ কি এগারো। শুধু মাত্র গোপ-সমাজেই এখন অল্প বয়সে মেয়েদের বিবাহের রীতি ছিল না, নিম্নশ্রেণীর অন্ত্যজ- বর্ণের সমাজেও তার চল ছিল। বড়াই চরিত্র সৃষ্টিতে বড়ু চন্ডীদাস প্রাচীন কাম- শাস্ত্রাদিতে নির্দিষ্ট দূতী বা কুট্টিনী চরিত্রের অনুকরণ করেননি। বড়াই এ - কাব্যে সখী, দূতী কুট্টনী ও অভিভাবিকা। কখনো সে স্নেহশীলা আবার কখনো প্রতিশোধ পরায়ণা। বড়াই হল রাধার মা পদুমার পিসী। রাধাকে দেখা শোনা করার ভার ছিল তার ওপর । অত্যন্ত বৃদ্ধা এই বড়াই -

"শেত চামড় সম কেশে ।
কপাল ভাঙ্গিল দুইপাশে ॥
ভ্রূহি চূনরেখা যেহ্ন দেখি ।
কোটর বাটুল দুঈ আঁখি ॥ "

রাধা এবং কৃষ্ণ দুই-ই তার স্নেহের পাত্রী ও পাত্র। রাধার প্রতি কৃষ্ণের কাম-বিহ্বলতা এবং তার জন্য কৃষ্ণের বিবাহিতা রাধার সঙ্গে প্রেম-প্রস্তাব-স্বরূপ ফুল ও তাম্বুল রাধার নিকট নিয়ে যাওয়া প্রভৃতি অধিকাংশ ঘটনা সংঘটনের মূলে এই বড়াই। নৌকাখন্ডের ঘটনাটি তারই পরিকল্পনা। রাধাকে দীর্ঘদিন না দেখার ফলে ব্যাকুল কৃষ্ণকে সন্তুষ্ট করার জন্য বড়াই রাধার মাকে সম্মত করিয়ে দধি ও দুগ্ধ বিক্রয়ের স্থলে মিথ্যা কথায় সে রাধাকে কৃষ্ণের নিকট আনে। রাধা ও কৃষ্ণ দুজনেই নানাভাবে বড়াই-এর সাহায্য নিয়েছেন। বড়াই-এর কথাতেই কৃষ্ণ বাণ খন্ডে রাধাকে পুষ্পবাণে সম্মোহিত করেন। রাধার এমন অবস্থা দেখে বড়াই কৃষ্ণকে তিরস্কার করে। বড়াই-এর অভিশাপের ভয়ে কৃষ্ণ রাধার চেতনা ফিরিয়ে আনেন। বংশীখন্ডে রাধার প্রতি স্নেহময়ী বড়াইকে দেখি। রাধার চোখের জল দেখে কৃষ্ণের সন্ধানে সে বৃন্দাবনে যায়। বড়াইকে কবি রাধা ও কৃষ্ণের আত্মীয়া করে যখন তুলেছেন, তখন তাকে বাহ্যত গোপনারীই বলতেই হয়। কিন্তু তার আচরণ লৌকিক সমাজের নিম্নশ্রেণীর নারীর মতোই।

'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' কাব্যে আরো কিছু অন্ত্যজ বর্ণের জাতির কথা কবি বলেছেন-যেমন তেলী, যূগী ও ব্যাধের কথা। এই দৃষ্টান্তগুলি থেকে তখনকার দীনের সংস্কার বিশ্বাস জানা যায়। যেমন -

"কান্ধে কুরুআ দেআ তেলী আগে জাএ।"

কিংবা দানখন্ডে-

"ঘরের বাইরে হৈতেঁ তেলিনী তেল বিচিতেঁ
কাল কাক রএ সুখাএ গাছের ডালে।
আগে সুনা ঘটে নারী হাঁচী জিটিহো না বারী
চলিলোঁ তাহার উচিত পাঁও ফলে।"

অর্থাৎ, ঘরের থেকে বের হতে দেখলাম তেলিনী তেল বেচতে চলেছে, শুকনো ডালে বসে কাক ডাকছে, শূন্য কলসী নিয়ে নারীরা চলেছে। এসব উপেক্ষা করে চলে এলাম। হাঁচি টিকটিকিও কিন্তু মানলাম না। তার উচিত ফল পেলাম। তেলেনীরা অন্ত্যজ। তাদের তেল বেচতে যাওয়ার দৃশ্য দেখা অশুভ। এই সংস্কার ছিল রাধার মধ্যে বলা হয়েছে।

নিম্নবর্ণের অর্থাৎ অন্ত্যজ শ্রেণীর মানুষদের নির্দিষ্ট পেশাগুলি উচ্চবর্ণের মানুষদের চোখে হীন বলে বিবেচিত হয়েছে। একজন ব্যাধকে হঠাৎ পথে দেখা, একজন রঞ্জককে কাপড় ধুতে যেতে দেখা, কাঠুরিয়ার কাষ্ঠভারবহন চোখে দেখা এবং তেলীর তেল বিক্রির জন্য হাঁক শোনা- যাত্রার সময় অশুভ বলে মনে করা হয়। এমনকি ভিক্ষাপাত্র হাতে যোগিনী দেখাও যাত্রার সময়ে ভালো নয়। এই ধরণের লোকবিশ্বাস সৃষ্টির মূলে অন্ত্যজ শ্রেণীর মানুষের প্রতি ঘৃণাই সক্রিয় ছিল। আবার পূর্ণকলসে হাত দেওয়া, গুরুর আসনে বসা, মাটিতে জলের দাগ দেওয়া এবং ভাঙা কুলোর বাতাস - এগুলিও প্রাচীন লোক বিশ্বাসে অশুভ ব্যাপার।

বড়ু চন্ডীদাস লোক কাহিনী থেকে প্রচুর উপাদান সংগ্রহ করেছেন। এবং নিজেরও কল্পিত অনেক ঘটনা যুক্ত করে 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' কাব্যকে সম্পূর্ণতা দান করেছেন। পুরাণের সাহায্যও তিনি

নিয়েছেন কিন্তু সে সকল তথ্যের পরিমাণ খুব বেশী নয়। লৌকিক গ্রাম্য-কাহিনীর ওপর নির্ভর করতে গিয়েই করি অন্ত্যজ জীবন থেকেও উপাদান সংগ্রহ করেছেন বলেই আমাদের ধারণা। কবির লৌকিক জীবনের ওপর নির্ভরশীলতাকে বোঝাতে গিয়ে আমরা একজন এই গ্রন্থের সম্পাদক অধ্যাপকের বক্তব্য উদ্ধৃত করছিঃ-

"শ্রীকৃষ্ণ কীর্তনের কবি পুরাণ কাহিনী হইতে কাব্যের কিছু কিছু উপাদান গ্রহণ করলেও সমকালে প্রচলিত বিভিন্ন অপৌরাণিক গ্রাম্য কাহিনীর প্রতিই কবির অধিকতর পক্ষপাত। বলাচলে পুরাণের একটি সংক্ষিপ্ত কাঠামোর উপর কবি তাঁহার বৃহৎ কাহিনী কাব্য রচনা করিয়াছেন। বহু অপৌরাণিক কাহিনীর সমাবেশে পৌরাণিক গুরুত্ব হয়তো ক্ষুন্ন হইয়াছে, কিন্তু কাব্যরস তাহাতে তরল হইয়া যায় নাই। তাম্বুল-খন্ডে কৃষ্ণের প্রেম প্রস্তাব স্বরূপ তাম্বুলাদি প্রেরণ,দানখন্ডে কৃষ্ণের দানী সাজিয়া রাধার নিকট মহাদান গ্রহণ, নৌকাখন্ডে যমুনাপারকরণ ও জলমধ্যে রাধার সহিত মিলন, ভারখন্ডে কৃষ্ণের মজুরিয়া সাজিয়া রাধার দধি-দুগ্ধের পসার বহন, ছত্রখন্ডে, রাধার মাথায় ছত্রধারণ, যমুনা খন্ডে বিভিন্ন, সখী ও রাধাসহ কৃষ্ণের জলকেলি, হারখন্ডে কৃষ্ণ কর্তৃক রাধার হার অপহরণ, বানখন্ডে কৃষ্ণের পুষ্পবাণ নিক্ষেপণ, বংশীখন্ডে রাধা কর্তৃক কৃষ্ণের বাশী অপহরণ ও মিথ্যাচরণ প্রভৃতি ঘটনা কোন পুরাণের অন্তর্গত নয়। এগুলির কিছু কিছু কবির স্বকপোলকল্পিত এবং অধিকাংশই প্রচলিত লোককাহিনী হইতে সংগৃহীত।" [২৪]

'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' কাব্যে রন্ধনের যে বর্ণনা পাই, তা শুধুমাত্র গোপ সমাজেরই মেয়েদের রান্না এমন মনে করা চলে না। কৃষ্ণের বাঁশীর শুনে রাধার রান্নায় সব ভুল হয়ে গেছে।

"আম্বল ব্যঞ্জনে মো বেশোআর দিলোঁ ।
সাকে দিলোঁ কানাসোআঁ পাণী।
তা শুনিয়া ঘৃতে মো পরলা বলি আঁ
ভাজিলোঁ এ কাঁচা গুআ।" [২৫]

অর্থাৎ, রাধা বলেছেন, 'তাম্বল-ব্যঞ্জনে দিলাম মালমশলা আর শাকের হাঁড়িতে এমন জল ঢালিলাম যে কানা পর্যন্ত ভর্তি হয়ে গেল। কৃষ্ণের বাঁশির শব্দ শুনে পটল মনে করে, এই দেখো কাঁচা সুপুরি দিয়ে ভেজে ফেলেছি।

'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' কাব্যে কয়েকটি বৃত্তির মানুষের কথা আছে যার মধ্যে অন্ত্যজ মানুষও আছে। এ- বিষয়ে একজন ঐতিহাসিকের বক্তব্যঃ "শ্রী কৃষ্ণকীর্তনে আচারিজ(আচার্য, দৈবজ্ঞ) সগুনী (ব্যাধ বা শকুনশাস্ত্রবিদ) ঝালিয়া (ঐন্দ্রজালিক) ও বাদিয়া (সাপুড়ে) প্রভৃতির উল্লেখ আছে। এগুলি কেবলমাত্র ব্যক্তিগত বৃত্তি অথবা বৃত্তিগত জাতি নির্দেশ করিতেছে কিনা তাহা বুঝা যায় না।" [২৬]

আচার্য বা দৈবজ্ঞকে বাদ দিলে অন্যান্য বৃত্তির মানুষেরা যে অন্ত্যজবর্ণের একথা বলাই বাহুল্য। এখানে নমঃ শূদ্র, তেলী, গারুড়ী (বিষবৈদ্য), কান্ডারী(মাঝি) প্রভৃতি আরো কিছু অন্ত্যজ শ্রেণীর জাতি-সম্প্রদায়-এর কথা আছে।

সেকালের সমাজের যে চিত্র 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' কাব্যে দেখি, তা যে শুধুমাত্র গোপ-সমাজেরই এমন মনে করা চলে না। বাল্য বিবাহ প্রাচীন বাংলার সমাজে প্রচলিত রীতি এবং অন্ত্যজ শ্রেণীর সমাজে তো তা ছিলই, আর এই কারণে এ-কাব্যের রাধা এগারো বৎসর বয়সেরও বহু পূর্বে থেকে আইহনের সংসারে রয়েছে, সে-কথা পাই।

একথা সত্য যে সেকালে সব শ্রেণীর স্ত্রীলোকই যে ঘরের বাইরে হাটে-বাজারে বা অন্যান্য গৃহস্থ ঘরে জিনিস বিক্রয় করতে যেত তা নয়, কিন্তু ব্যবসায় বা জীবিকার প্রয়োজনে তথাকথিত নিম্নশ্রেণীর মানুষেরা যে বাড়ির বাইরে যেত, গোপীচাঁদের কাহিনীতে তা দেখেছি, এখানে রাধা ও অন্যান্য গোপীরা দুধ বিক্রয়ের জন্য বের হয়েছে। মথুরার হাটে রাধাকে দুধ বিক্রয় করতে যাওয়া তাঁর শাশুড়ী বন্ধ করলে বড়াই- এর কথায় অন্যান্য বধূর শাশুড়ীরা তাদের বধূদের পাঠাতে সম্মত হয় এবং রাধার শাশুড়ীকে এক ঘরে করে- 'তোমার ঘরত অন্নপাণি না খাইব'। এই একঘরে করার প্রথা শুধুমাত্র গোপ-সমাজে প্রচলিত একটি দন্ড নয় - তথাকথিত অন্ত্যজ সমাজেও এ- রীতির চল ছিল বললে ভুল হয় না। মন্ত্রতন্ত্রে বিশ্বাস যে সেকালে সব জাতির মধ্যে, বিশেষত তথাকথিত নিম্নশ্রেণীর মধ্যে ছিল তার প্রমাণ পাই বাণখন্ডে অচৈতন্য রাধাকে যখন কৃষ্ণ জাগ্রত করে তোলেন-

"ধেয়ান করিআঁ করেঁ ঝাড়ে বনমালী ।
ধীরে ধীরে গাঅ খানি তোলে চন্দ্রাবলী ॥"

'শ্রী কৃষ্ণকীর্তন' কাব্যকে শুক্ল ধামালী কাব্যের অন্তর্গত করেছিলেন একদা ডঃ দীনেশ চন্দ্র সেন; কিন্তু তিনি এ কাব্যের 'বংশী খন্ডে'র ও 'বিরহ' অংশের ভাবের সমুন্নয়ন লক্ষ্য করে এ-কে বিখ্যাত পদাবলীকার চন্ডীদাসের রচনা বলে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। আমরা ডঃ সেনের প্রথম ধারণাটির সঙ্গে একমত । ডঃ দীনেশচন্দ্র সেনের এই অভিমতটি যে আমাদের বক্তব্যের পরিপোষক, তা একটু খানি বিশদ করা যেতে পারে। ঐতিহাসিকদের মতে দ্বাদশ থেকে চতুর্দশ শতক পর্যন্ত বাংলা ও উড়িষ্যায় এক নৈতিক দুর্গতি দেখা দেয়। জয়দেবের 'গীতগোবিন্দ' এর রুচি অশালীন। ব্যক্তিগত জীবনে ও পদ্মাবতী নামে এক সেবাদাসী ছিলেন তাঁর সঙ্গিনী। ইনি যে লক্ষ্মণ সেনের সভায় নৃত্য করতেন তার প্রমাণ মেলে 'সেক শুভোদয়া' গ্রন্থে। দ্বাদশ শতকের তাম্রশাসন গুলিতে পরনারীর প্রতি আসক্তির জয় ঘোষিত হয়েছে। লক্ষ্মণ সেন কলিঙ্গ-রমণীর প্রেম লাভ করেছিলেন বলে তাম্রশাসনের কবি তাঁকে প্রশংসাপত্র দিয়েছেন। দ্বাদশ শতকের তন্ত্রাদির বিশেষ অনুশীলনের ফলে স্ত্রী - পুরুষের মধ্যে শালীনতা ও সংযম অনেকখানি হ্রাস পেয়েছিল। তাই দ্বাদশ শতকের পরে জনসাধারণের মধ্যে ঘোর রুচি-বিকার দেখা দেয়। ডঃ দীনেশ চন্দ্র সেনের কথায়-

"সেই সময় হইতে আগত এক শ্রেণীর গান আমরা রংপুর, কোচবিহার প্রভৃতি অঞ্চলে পাইতেছি- তাহার নাম কৃষ্ণধামালী; ইহা দুই শ্রেণীতে বিভক্ত, এক শ্রেণীর নাম "আসল" ও অপর শ্রেণীর নাম "শুকুল" (শুক্ল)। আসল ধামালী গ্রামের বাহিরে গীত হইয়া থাকে, তাহা এত অশ্রাব্য যে

গ্রামের জনসাধারণের রাধাকৃষ্ণ প্রেমের কাহিনী শুনিবার তৃষ্ণা এক সময়ে মিটাইয়া দিত তাহাতে সন্দেহ নাই- প্রাচীন রাজ বংশী জাতি এবং যোগীরা বাংলা দেশের নানা স্থানে সেই প্রাচীন গীতিকা এখনও রক্ষা করিয়া আসিয়াছেন।... কিন্তু " শুক্ল" ধামালীকে সুন্দর করিয়া সাধু ভাষায় প্রবর্তিত করিয়া কবিত্বমন্ডিত করিয়া চন্ডীদাস শ্রীকৃষ্ণকীর্তন লিখিয়াছিলেন ।"[২৭]

এই শুক্ল ধামালী-গান যে রাজবংশী ও যুগী সম্প্রদায় এখনো রক্ষা করে চলেছেন বলে ডঃ দীনেশ চন্দ্র সেন মনে করেছেন, তাঁরা কিন্তু অন্ত্যজ শ্রেণীর মানুষ। ধামালী গান, সে কৃষ্ণ ধামালী বা শুক্ল ধমালী যাই হোক না কেন, রাধাকৃষ্ণ প্রেমের কাহিনী শোনার তৃষ্ণা মিটে যেত জনসাধারণের এই গানেই। আর এ-গানে যে সমাজ-চিত্র ফুটে উঠেছে, তা উচ্চচর্ণীয়দের নয় - নিম্ন শ্রেণীর দরিদ্র নারীর উপর শক্তিমান পুরুষের বলাৎকার।

'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' কাব্য-এর মধ্যে মূল কাহিনীতেই যে অন্ত্যজ-জীবনের ছবি আছে, সেটি অন্য একটি দিক থেকেও দেখানো চলে। এ-কাব্যের মূল কাহিনী 'ভাগবত' থেকে অনেকখানি গৃহীত এবং কোথাও এর মধ্যে 'গীতবোবিন্দ' কাব্যের প্রত্যক্ষ প্রভাব থাকলেও প্রসিদ্ধ সাহিত্যের ঐতিহাসিক ডঃ অসিতকুমার বন্দোপাধ্যায় মনে করেন, "ইহাতে পুরাণোক্ত লীলাবর্ণনা অপেক্ষা সম্ভবতঃ, গ্রামীণ সমাজে প্রচলিত অপৌরাণিক কাহিনীর প্রতি অত্যধিক গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে।"[২৮]

ডঃ বন্দোপাধ্যায় আরো অনুমান করেছেন,"পৌরানিক কৃষ্ণলীলার পাশেই আর একটি গ্রামীণ কৃষ্ণকথা প্রচলিত ছিল, যাহাতে কৃষ্ণকে গ্রাম্য গোপনন্দন ও মাতুলনীয় রূপমুগ্ধ রূপে চিত্রিত করা হইয়াছে"। [২৯]

একথা বলতেই হয় যে বড়ু চন্ডীদাস সুপন্ডিত ও পুরাণ অভিজ্ঞ হলেও বাংলার প্রচলিত লৌকিক কৃষ্ণকথা থেকেই তিনি 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' কাব্যের মূল কাহিনীর উপাদান সংগ্রহ করেছিলেন। এ-কাব্যেরও অনেক পূর্বে রচিত 'প্রাকৃত পৈঙ্গল' - এর মধ্যে কৃষ্ণ কথার কবিতা পাওয়া যায়। যেমন -

" অরে রে বাহিহি কাহ্ন নাব ছোড়ি ডগম গকুগতি ন দেহি।
তুঁই এখনই সন্তার দেই জো চাহসি সে লোহি ॥"

অর্থাৎ ওরে কৃষ্ণ,(তুমি) নৌকা বাহিতেছ। ডগমগ (অর্থাৎ নৌকার টলমলানি) ছাড়, দুর্গতি দিও না। তুমি এখনই পার করিয়া দিয়া যা চাও, তা লও। তাই কোন পন্ডিত মনে করেন যে এ-কাব্য "মূলতঃ লোক-জীবনাদর্শের ওপরেই প্রতিষ্ঠিত"। কিংবা "আসল কথা হচ্ছে শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যে রাধা এবং কৃষ্ণ একান্তভাবেই বাংলার লোকায়ত জীবনের প্রেমিক এবং প্রেমিকা - ভোগ কামনা বাসনাময় আসক্তিতে পরিপূর্ণ একান্ত ভাবেই পল্লীর মানবধর্মী"- তখন তা সত্য বলেই মনে হয়।

বাংলার লোকায়ত সমাজে অতি প্রাচীন কাল থেকে যে 'ঝুমুর' গান প্রচলিত আছে, তাই 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' কাব্যে শক্তিশালী কবির হাতে পড়ে কিরূপ 'নাট গীতে' রূপলাভ করেছে তা নিয়েও অনেক পন্ডিত মূল্যবান আলোচনা করেছেন। এই 'ঝুমুর' গান কিন্তু প্রকৃত পক্ষে একটি অঞ্চলের আদিবাসী সমাজে প্রচলিত লৌকিক প্রেমসংগীত। ছোটনাগপুরের সমাজে প্রচলিত লৌকিক প্রেম

সংগীত। ছোটনাগপুরের পূর্ব সীমান্তবর্তী ভূখন্ড ক্রমশ বিস্তৃত হয়ে পশ্চিমবঙ্গের পশ্চিম সীমান্তবর্তী অঞ্চলের সঙ্গে মিশেছে। এই বিশেষ অঞ্চলে সহজ-সরল লৌকিক প্রেম-গান আদিবাসী সমাজে একদা প্রচলিত ছিল । পরে এই গানে বৈষ্ণব ধর্মের প্রভাব পড়ে ও তার মধ্যে রাধা কৃষ্ণের নাম প্রবেশ করে। এ-বিষয়ে বিশেষজ্ঞ একজন অধ্যাপক ডঃ সুভাষ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন- "এই রাধা ও কৃষ্ণের নাম সমন্বিত যে লোকসংগীতগুলি বাংলা দক্ষিণ-পশ্চিম সীমান্ত অঞ্চলে প্রচলিত আছে, সেগুলি ঝুমুর নামে পরিচিত।" [৩০]

ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য প্রমুখ অনেকেই মনে করেন যে রাধা-কৃষ্ণ সম্পর্কিত এই ঝুমুর গানগুলি "পরবতীকালের লোক কবি বড়ু চন্ডীদাস তাঁর প্রতিভার দ্বারা গ্রন্থিত করে 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' রূপে প্রকাশ করে ছিলেন।"

তাই অন্ত্যজ আদিবাসীদেরই 'ঝুমুর' পরবর্তী সময়ে লৌকিক প্রেম কাহিনীর দ্বারা প্রভাবিত হয়ে রাধাকৃষ্ণ ঝুমুরে পরিবর্তিত হয়েছে। আরো পরে তা পালা ঝুমুরের মধ্য দিয়ে প্রতিভাবাবান শক্তিমান বৈষ্ণব কবির লেখনীতে সুগ্রথিত হয়ে 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' কাব্যের জন্ম দিয়েছে।

মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে অন্ত্যজ জীবনে

মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে ধর্মের আশ্রয়ে মানবজীবনের কথা বর্ণিত হয়েছে আর সেই মানুষগুলির বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই সমাজে চির অবহেলিত মানব সম্প্রদায়। মধ্যযুগের বিরাট ব্যাপ্তির মধ্যে- মঙ্গল কাব্য, অনুবাদ সাহিত্য, লোককথা ও গীতিকা, বৈষ্ণব সাহিত্য, মুসলমানি সাহিত্য- খুঁজলে এই ধরণের বহু চরিত্রের সন্ধান মিলবে; আর তার মধ্যে থেকেই মধ্যযুগের সমাজজীবনে অন্ত্যজ মানুষের চেহারাটা উঠে আসবে; সেই জাতের বিচার,বর্ণ ভেদাভেদের চিত্র মিলবে। মূল আলোচনার ভূমিকা হিসাবে কতকগুলি গুরুত্বপূর্ণ দৃষ্টান্ত একটু ছুঁয়ে ছুঁয়ে যাবার চেষ্টা করব।

কৃত্তিবাসী 'রামায়ণে' নিষাদরাজ গুহকের প্রসঙ্গটি উল্লেখযোগ্য, এখানে আর্য-অনার্য মিলন সংঘটিত হয়েছে। অন্ত্যজ মানুষেরা চিরকালই দাস হয়ে সেবা করতে অভ্যস্থ আর ভদ্র সম্প্রদায় তাদের কার্যসিদ্ধির জন্য কাজে লাগাতে অভ্যস্থ। এই অভ্যাস বহুদিন ধরে চলে আসছে সমাজে। তাই রাচন্দ্রের সঙ্গে গুহকের মিতালীর পশ্চাতে ওই ধরণের কারণ বিদ্যমান ছিল ।

"রামায়ণ কেবল নরচন্দ্রমা রামাদির কাহিনী নয়, অনভিজাত বহু হেয়জাতি ও অনার্য গোষ্ঠীর কথাও এই মহাকাব্যে আছে। রামভক্ত চন্ডাল নিষাদরাজ গুহকের সঙ্গে তাই রামের মৈত্রীবন্ধন এবং সীতা উদ্ধারে বনবাসী অনার্য- কৌমান্তর্গত নানা গোষ্ঠীর বানরদের সাথেও সখ্য স্থাপন ও তাদের সাহায্য গ্রহণ। "[৩১]

সাধারণ মানুষের প্রতি মধ্যযুগের কবিদের সহানুভূতি লক্ষ্য করবার মতো। কৃত্তিবাসের গুহক তাই বলতে পেরেছে-

"চন্ডাল বলিয়া যদি ঘৃণা কর মনে।
পতিত পাবন নাম তবে কি কারণে।" [৩২]

-এ অনুযোগ খুবই স্বভাবিক 'পতিত পাবন' নারায়ণের অবতার প্রসঙ্গ। তাই রামকে বলতে হয় -

"যেই তুমি সেই আমি বলেন শ্রীরাম।
গুহ বলে ঘুচাইতে পারি নিজ নাম ॥
শ্রীরামের জগতে হইল ঠাকুরালি।
প্রথমে করেন রাম চন্ডালে মিতালী ॥" [৩৩]

মহাভারতে দাস দুহিতা মৎস্যগন্ধা সত্যবতী পরাশর মুনির বরে, শুধু পদ্মগন্ধা হননি, তাঁর গর্ভেই চন্দ্র বংশের পরবর্তী রাজাদের জন্ম। আর এর জন্য মুনিকে তুষ্ট করতে ব্যাসদেবকে জন্ম দিতে হয়েছিল তাঁকে, কুমারী অবস্থায়। যদিও মুনির বরাভয় ছিল-

"অনূঢ়া আছহ তুমি প্রথম যৌবনে।
যদি এই রূপে থাক আমার বচনে ॥
বলিলা, তোমার জন্ম কৈবর্তের ঘরে।
মহারাজ বিবাহ করিবে মোর বরে ॥[৩৪]

যৌনাকাঙ্ক্ষা চরিতার্থতার জন্য যেমন বরদানে দাস কন্যাকে রাজরানীতে পরিণত করা হয়েছিল, তেমনি আবার যমরাজকে অভিশপ্ত হয়ে শূদ্রযোনি প্রাপ্ত হয়ে বিদুর রূপে জন্মগ্রহণ করতে হয়েছিল। এছাড়া আছে একালব্যের অমানুষিক গুরুদক্ষিণার কথা,সারথিপুত্র অপবাদের জন্য কর্ণর অপমানের কথা।

শিবের কৃষক রূপে এবং দুর্গার বাগদিনী রূপ ধারণ মধ্যযুগের 'শিবায়ণ' কাব্যে লক্ষ্য করা যায়। "আর্যেতর অষ্ট্রিক গোষ্ঠী ভুক্ত আদি বঙ্গ বাসীদের সমাজ যখন মূলতঃ বৃষ্টিনির্ভর ছিল, তখন সেই দূরাস্তৃত অতীতের কৃষক সমাজে যে ধরণের কৃষি দেবতার পরিকল্পনা হয়েছিল। বহুশতাব্দী পরেও তার ক্ষীণ ধ্বংসাবশেষ এ দেশে বজায় ছিল। পরবর্তীকালে পৌরাণিক শিব ও আদিম কৃষি সংস্কৃতির কোনও অমার্জিত স্থূল দেবতাকে সংমিশ্রিত করে শিবায়ণ কাহিনীগুলি গড়ে উঠেছিল।" [৩৫]

মঙ্গলকাব্য গুলিতে অনার্যকুল থেকে আগত দেবতা স্বর্গের গদি পাওয়ার জন্য কিভাবে প্রয়াস চালিয়ে গেছেন। দেবতা হিসাবে অলৌকিক শক্তির অধিকারী হলেও অন্ত্যজ মানুষদের পূজিত বলে, ভদ্রসমাজে তাঁদের প্রতিপত্তি নেই আর ভদ্রসমাজে তাঁকে মেনে না নিলে, স্বর্গেও তাঁর ঠাঁই নেই। মঙ্গল কাব্যগুলিতে প্রায় সর্বক্ষেত্রেই স্বর্গে প্রতিষ্ঠা পাওয়ার জন্য এই ধরণের সংগ্রাম লক্ষ্য করা যায়। একটা বিশেষ রাজনৈতিক অরাজকতার সময় একটা জাতির ভাঙন রুখতে, প্রয়োজনের তাগিদে, উচ্চবর্ণও অন্ত্যজ সমাজের কাছাকাছি এসেছিল। তাই মঙ্গলকাব্যে অনার্য দেবতা, আর্য দেবতায় রূপান্তরিত হওয়ার কথা ভাবতে পেরেছে। কিন্তু তার জন্য অনেক বিদ্রোহ করতে হয়েছে।

কারণ সমাজে উচ্চ-নীচ ভেদাভেদ, ছুৎমার্গের ব্যাপারটি ভালভাবেই বজায় ছিল। বিজয়গুপ্তের

মনাসমঙ্গল ডোমনারীর ছদ্মবেশে শিবকে ছলনা করার পর চন্ডী বলেছেন-

"খাইলা ডোমের অন্ন, তোরে ছোঁবে কে।...."

দেবী মনসা তাঁর সহচরী অন্ত্যজ সমাজের ধোপানী নেতার সহায়তায় অন্ত্যজ সমাজে প্রথমে পূজা প্রচার করেছেন। চাষী, জেলে, রাখাল, জেলে মাঝি - এই অন্ত্যজ শ্রেণীর সমাজে প্রতিষ্ঠা পাওয়ার পর তাঁকে বিত্তশালী সমাজের কথা ভাবতে হয়েছে।

চন্ডীমঙ্গল কাব্যে আখেটিক খন্ডে পাওয়া যায় অন্ত্যজ নায়ক নায়িকা কালকেতু ফুল্লরাকে। কবিকঙ্কন ব্যাধ জীবনের পরিবেশে তাঁর নায়ক কালকেতুর মধ্যে একাধারে দ্বৈত ভূমিকার রূপায়ণে যথেষ্ট দক্ষতা দেখিয়েছেন। এখানে দেবী চন্ডীর স্বর্গে উত্তরণের মতো, তাঁর বরপুত্র কালকেতুরও অন্ত্যজ ব্যাধ জীবন থেকে উত্তরণ ঘটেছে। এবারে সমাজ তাকে কিভাবে গ্রহণ করবে! আত্মসচেতন কালকেতু নিজেই সে প্রশ্ন তুলেছে। তবে দেবীর অলৌকিক কৃপায় ব্যাধ কালকেতু যেমন রাতারাতি বড়লোক হয়ে গেছে, তেমনি জাত পাতের বাধাও দূরীভূত হয়েছে, দেবী তাকে আশ্বাস দিয়েছেন-

" অম্বিকা বলেন কিছু ব্যাধের নন্দনে।
পবিত্র হইলে মোর পদ-দরশনে ॥
লইবে তোমার ধন উত্তম ব্রাহ্মণ।
এতেক বলিয়া চন্ডী করিলা গমন ॥"[৩৬]

তা সত্ত্বেও অন্ত্যজ কালকেতুকে মাঝে মধ্যে আঘাত সইতে হয়। কালকেতু রাজা হলেও অন্ত্যজ সমাজ থেকে উঠে এসেছে। তাই ভদ্রসমাজ থেকে আগত ভাঁড়ুদত্ত কালকেতুর উদ্দেশ্যে বলার সাহস রাখে ঃ

"হরিদত্তের বেটা হই জয়দত্তের নাতি।
হাটে লয়্যা বেচাইব বীরের ঘোড়া হাতী ॥
তবে সুশাসিত হবে গুজরাট ধরা ।
পুনর্বার হাটে মাংস বেচিবে ফুল্লরা ॥"[৩৭]

-এ হল বর্ণশাসিত সমাজের এক ধরণের ঔদ্ধত্য। কবিকঙ্কন তাঁর ব্যক্তিজীবনে সবলের পীড়ন সহ্য করেছিলেন। কালকেতুর গুজরাট নগর পত্তনের মধ্য দিয়ে যেন একটা সুস্থ সমাজব্যবস্থা গড়ে তুলতে চেয়েছেন তিনি। মধ্যযুগের সমাজব্যবস্থায়, জাতের বিচারের কথা মনে রেখে নগর নির্মাণে সকল জাতির থাকবার সুব্যবস্থা করতে হয়েছে-কালকেতুকে ।

"সেই সঙ্গে কালকেতুর আশ্বাস -

আমার নগরে বৈস যত ইচ্ছা চাষ চষ
তিন সন বহি দিহ কর ।
হালপ্রতি দিবে তঙ্কা কারে না করিহ শঙ্কা

পাট্টায় নিশান মোর ধর ॥

নাহিক বাউড়ি দেড়ি রয়্যা বস্যা দিবে কড়ি

ডিহিদার নাহি দিব দেশে।

সেলামী বাঁশগাড়ি নানা বারে যত কড়ি

নাহি নিব গুজরাট বাসে ॥ ...

যত বৈসে দ্বিজবর কার নাহি নিব কর

চাষভূমি বাড়ি দিব দান।

হইয়া ব্রাহ্মণে দাস পূরিব সবার আশ

জনে জনে সাধিব সম্মান ॥ " [৩৮]

এর মধ্য দিয়ে মুকুন্দরামের সমাজচেতনার দিকটি ধরা পড়েছে। মধ্যযুগের সমাজব্যবস্থায় অনার্যব্যাধ রাজা হলেও তার সামাজিক অবস্থানের কথা মনে রেখেছে এবং ব্রাহ্মণের প্রতি তার সম্মান প্রদর্শন করে কিভাবে সুশাসন চালান যায়, তার চিত্র ধরা পড়েছে।

ধর্মঠাকুরের পূজার আদি পুরোহিত হিসাবে প্রচারিত আছে রামাই পন্ডিতের নাম। তাঁর সম্বন্ধে প্রচলিত একটি কাহিনী থেকে জানা যায়, তিনি তাঁর পুত্রকে অভিশাপ দিয়েছিলেন- ' হইবি ডোমের পুরোহিত'। "এ কাহিনী থেকে দেখা যাচ্ছে রামাইয়ের পুত্র থেকেই ধর্মপূজকগণ ডোমের পুরোহিত হয়ে গিয়েছিলেন। " [৩৯]

বোঝায় যায় সমাজে তখন অভিশাপ মানেই নিম্নকূলে জন্ম গ্রহণ। এই সূত্র ধরেই বোধ হয় ধর্মঠাকুরের ডোম পূজকের উৎপত্তি।

" যাঁহারা ধর্মঠাকুরের পূজা করিয়া থাকেন, তাঁহারা সাধারণতঃ ব্রাহ্মণ নহেন,- ডোম জাতি ভুক্ত লোকই প্রধানতঃ এই দেবতার পূজারী হইয়া থাকেন। পূজারীদিগের উপাধি পন্ডিত, তাঁহারা দেয়াসী বা দেবাংশী বলিয়াও পরিচিত। ... যে গ্রামে ব্রাহ্মণের প্রাধান্য, সেখানে বাৎসরিক পূজানুষ্ঠানের সময় বর্তমান ব্রাহ্মণ পুরোহিত নিয়োগ করা হইয়া থাকে। কিন্তু তথাপি দেয়াসীরাও দেবতার উপর নিজেদের কর্তৃত্ব ত্যাগ করেন না। দেবতার নামে তুক তাক ওষধ ও মাদুলী দেয়াসীই দিয়া থাকেন,- একমাত্র পূজা করা ব্যতীত ব্রাহ্মণ পুরোহিতের দেবতার উপর আর কোনও অধিকার নাই। দেয়াসী সাধারণত; দেবতার বাৎসরিক সেবক ও তত্ত্বাবধায়ক রূপেই কার্য করিয়া থাকেন। ডোম ব্যতিত ও বর্তমানে কোনও কোনও জায়গায় অন্যান্য অস্পৃশ্য শ্রেণীর লোকও ধর্মঠাকুরের দেয়াসী হইয়া থাকেন। কিন্তু ডোম পন্ডিতদিগের এই কার্যে বিশেষ অধিকার আছে বলিয়া মনে করা হয়। মানভূম জেলায় একটি প্রচলিত কথা আছে,- 'আর কোথাও জায়গা পেলে না, শেষে ডোমের বাড়ীতে উঠলে গিয়ে ধর্মরাজঠাকুর! ব্রাহ্মণগণ যেমন উপবীত ধারণ করেন, তেমনি ধর্মরাজ ঠাকুরের ডোম পূজারীগণ তাম্র ধারণ করেন। তাম্র ধারণ অর্থ, বাহুতে তামার তাগা ও হাতে আংটি ধারণ করা। তাম্র ধারণ না করিলে কেহই ধর্মঠাকুরের পুরোহিত হইতে পারে না। ব্রাহ্মণের তাম্র দীক্ষার প্রয়োজন হয় না।"[৪০]

ধর্মমঙ্গলের কাহিনীতে আছে ডোম সমাজের চিত্র যারা অন্ত্যজ সম্প্রদায় ভুক্ত। লাউসেনের সেনাপতি কালু ডোম এবং তার লখাই ডোমনী-চরিত্রগুলি অপূর্ব দক্ষতার পরিচায়ক। "নিম্নশ্রেণীর চরিত্রগুলিই ধর্মমঙ্গলের কবিদিগের বাস্তব অভিজ্ঞতার উপর ভিত্তি করিয়া রচিত। শৌর্য বীর্যে, কর্তব্যজ্ঞানে, ধর্মবুদ্ধিতে তাহাদের যে কোনও দিক দিয়া কোন অভাব নেই, বৈষম্যমূলক সমাজে প্রতিষ্ঠিত থাকিয়াও সেই যুগের ব্রাহ্মণ কবিগণ ইহা উপলব্ধি করিতে পরিয়াছিলেন। তাঁহাদের এই সমুন্নত ও উদার মানবচরিত্রের পরিকল্পনাই ধর্মমঙ্গল কাব্যগুলি রাঢ়ের জাতীয় কাব্য হিসাবে সার্থকতার কারণ।" [৪১]

মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা হল ১৬ শতাব্দীতে মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেবের অবির্ভাব। বঙ্গদেশে তুর্কী আক্রমণের প্রত্যক্ষ প্রভাবে একটা বিপর্যস্ত অবস্থার মধ্যে ধর্মীয় ও সামাজিক ভাঙন রোধ করতে আর্য-অনার্য মিলন প্রচেষ্টা লক্ষ্য করা গিয়েছিল এবং এই সাংস্কৃতিক মিলনই মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করেছিল। পরবর্তীকালে শ্রীচৈতন্যের সর্বধর্ম সমন্বয়ী মানবতার মন্ত্র, সকল মানুষকে একই বাতাবরণে ঢাকার চেষ্টা করেছিল। যাঁর পদ পরিমলের আশায় 'সুরাসুর' সকলেই ধেয়ে আসে, সেখানে উচ্চ-নীচ, স্ত্রী-পুরুষ, জাত-বেজাত কোন কিছুর ভেদাভেদ নেই। অন্ত্যজ মানুষের কাছে এ এক পরম আশ্রয়। কৃষ্ণের নাম শ্রবণ করলে চন্ডাল, চন্ডাল থাকে না, অশুচিও শুচিবদ্ধ হয়ে ওঠে। এ এক প্রবল ধর্মীয় আন্দোলন, যা বাঙালীর সমাজজীবনেও আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। চৈতন্য পরবর্তী বাংলা সাহিত্যে তার প্রভাব অপরীসীম।

"বাংলাদেশে পাল যুগ হইতে ব্রাহ্মণ ও ব্রাহ্মণেতর শ্রেণী সম্প্রদায়ের যে বিন্যাসরীতি অনুসৃত হইয়াছিল, স্মৃতি সংহিতা যাহাকে গঠন ও পোষণ করিয়াছে, চৈতন্য যুগে আসিয়া তাহাতে বিশেষ পরিবর্তনের সূচনা হইল। বৈষ্ণব গোস্বামীগণ নূতন করিয়া বৈষ্ণব স্মৃতি রচনায় প্রস্তুত হইলে সমাজে ব্রাহ্মণ-অব্রাহ্মণ সংস্কারের প্রাচীরে ফাটল ধরিল। একদিকে যেমন সমাজের অভ্যন্তরে এই রূপ একটা পরিবর্তনের ধারা ছুটিয়া আসিল, (তেমনি পরিব্রাজক চৈতন্যদেবের প্রভাবে বাঙালীর ভৌগলিক সংকীর্ণতাও ক্রমে ক্রমে হ্রাস পাইল)।" [৪২]

অষ্টাদশ শতাব্দীতে যুগসন্ধিক্ষণের কবি রায়গুণাকর ভারতচন্দ্র তাঁর ঈশ্বরী পাটনীর মুখ দিয়ে দেবী অন্নপূর্ণার কাছ থেকে একটি বর প্রার্থনা করেছিলেন- 'আমার সন্তান যেন থাকে দুধে ভাতে'। মধ্যযুগে ধর্মীয় বাতাবরণে যখন দেবদেবীদের অলৌকিক ক্ষমতা মানুষকে দুঃখ-কষ্ট-লাঞ্ছনার হাত থেকে রক্ষা করেছে, তখন ঈশ্বরী পাটনী তার এই সামান্য প্রার্থনার ফল পেয়েছিল অফুরন্তভাবে। মধ্যযুগের দেবদেবীর আওতার বাইরে এসে গেলে দুধে-ভাতে থাকার স্বপ্নও দেখতে পারেনা অন্ত্যজ সমাজের মানুষ। দুধে-ভাতের স্বপ্ন যে দেখতে পারে না অন্ত্যজ মানুষ তারই এক প্রকৃষ্ঠ উদাহারণ পূর্বোক্ত চরণটি।

দ্বিতীয় অধ্যায়

স্বাধীনতাপূর্ব বাংলা কথাসাহিত্য ও অন্ত্যজ জীবন

দ্বিতীয় অধ্যায়

স্বাধীনতাপূর্ব বাংলা কথাসাহিত্য ও অন্ত্যজ জীবন

আধুনিক যুগের বাংলা সাহিত্য গড়ে ওঠেছিল কোলকাতার নগর জীবনকে কেন্দ্র করে। কবি সাহিত্যিকের দৃষ্টি ছিল কোলকাতার নাগরিক জীবনের প্রতি। কোলকাতা তখন আধুনিকতার পীঠস্থান। পাশ্চাত্য শিক্ষা-সংস্কৃতি এই সময়কে আচ্ছন্ন করেছে। পাশ্চাত্য সাহিত্যের প্রভাবে সৃষ্ট হয়েছে কাব্য উপন্যাসাদি ও ছোট গল্প।

বাংলা সাহিত্যে যথার্থ উপন্যাসের স্রষ্টা হলেন বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় যাঁকে 'সব্যসাচী ' বলে আখ্যায়িত করা হয়। ১৮৬৫ সালে 'দূর্গেশনন্দিনী' উপন্যাস দিয়েই বাংলা সাহিত্যে উপন্যাসের জয়যাত্রা শুরু, কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র অন্ত্যজ শ্রেণীর মানুষদের নিয়ে উপন্যাস লেখেন নি এবং ছোট গল্পও তিনি লেখেননি। বাংলা উপন্যাসের প্রথম শিল্পী যেমন বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় , তেমনি ছোট গল্পের প্রবর্তক ও প্রথম শিল্পী হলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। ১৮৮৪-তে রবীন্দ্রনাথের ' ঘাটের কথা' ও 'রাজপথের কথা' দিয়ে বাংলা ছোট গল্পের জয়যাত্রা শুরু। অর্থাৎ উপন্যাসের জন্ম আগে, ১৮৬৫তে এবং ছোট গল্পের জন্ম পরে, ১৮৮৪-তে। উপন্যাস ও ছোট গল্পের জন্মকালের ব্যবধান উনিশ বছর। কিন্তু বাংলা ছোট গল্পে অন্ত্যজ জীবনের উপস্থিতি প্রথম দেখতে পায় রবীন্দ্রনাথের 'শাস্তি ' (১৩০০) গল্পে এবং তার পরে দেখতে পাই শরৎচন্দ্রের 'বিলাসী' (১৩২৫) ও 'অভাগীর স্বর্গ' (১৩২৯) গল্পদ্বয়ে ; এই সময় কার আরো কথাসাহিত্যিক আছেন যাঁদের কথাসাহিত্য অন্ত্যজ শ্রেণীর মানুষদের নিয়ে লেখা। যেমন - তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'বাউল' (১৩৪০), 'ডাকহরকরা' (১৩৪৩) 'যাদুকরী' (১৩৪৮),'নারী ও নাগিনী'(১৩৪১), 'স্থলপদ্ম' (১৩৩৫), 'চৌকিদার' (১৩৪৫) প্রভৃতি ছোট গল্প । বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'আমার ছাত্র', 'রাসুহাড়ি' প্রভৃতি ছোট গল্প এবং 'আরণ্যক' (১৩৩৯) উপন্যাসে অন্ত্যজ শ্রেণীর মানুষদের উপস্থিতি দেখতে পাই। বনফুলের 'বুধনি', 'প্রমাণ' প্রভৃতি ছোট গল্পে অন্ত্যজ মানুষদের কথা বর্ণিত হয়েছে। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় এর 'প্রাগৈতিহাসিক' ছোট গল্প ও 'পদ্মনদীর মাঝি' (১৯৩৬) উপন্যাসে ও এই অন্ত্যজ শ্রেণীর মানুষের পুঙ্খানুপুঙ্খ চিত্র আছে। এছাড়া অন্যান্য অনেক কথাসাহিত্যিকের কথসাহিত্যে অন্ত্যজ জীবনের ছবি দেখতে পাব। কিন্তু আমাদের আলোচ্য 'স্বাধীনোত্তর পূর্ব বাংলা কথাসাহিত্যে অন্ত্যজ জীবনের ছবি' , তাই স্বাধীনতাপূর্ব বাংলা কথা সাহিত্য নিয়ে বিস্তারিত আলোচনায় যাব না। উপরিউক্ত ছোট গল্প ও উপন্যাস গুলি আলোচনা করেই স্বাধীনতা পূর্ববর্ত্তী বাংলা কথা সাহিত্যে অন্ত্যজ জীবনের পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা ও পর্যালোচনার ইতি টানব ।

ক) রবীন্দ্রনাথের ' শাস্তি' গল্পের বিদ্রোহিনী চন্দরা

রবীন্দ্রনাথের হাতেই সৃষ্টি পদ্মাপারের গ্রাম বাংলার অন্ত্যজ মানুষের গল্প 'শাস্তি'। সেখানে অন্ত্যজ মানুষের জীবন সংগ্রামের চিত্রই শুধু নেই, এরা যে মানুষ, তার মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণও

আছে। তাই 'শাস্তি' গল্পটির উল্লেখ করতে হল, বিশেষ ভাবে - 'শাস্তি' গল্প পাঠ করার পর মনে বিস্ময় জাগে - চন্দরা নাম্মী ছিদামের 'মুষ্টিমেয় স্ত্রীটুকু' কোন শক্তিতে সকলকে জব্দ করে, ফাঁসির দড়ি গলায় পড়ল ! কোন শক্তিতে জোর গলায় স্বামীর উদ্দেশ্যে বলতে পারল" আমি তোমাকে ছাড়িয়া আমার এই নবযৌবন লইয়া ফাঁসি কাঠকে বরণ করিলাম - আমার ইহ জন্মের শেষ বন্ধন তাহার সহিত।" এই অন্ত্যজ শ্রেণীর মধ্যে থেকে উঠে আসা অশিক্ষিত গ্রাম্য বধূটির অসীম কৌতূহল - কিন্তু সেই কৌতূহল কতটুকু মেটাতে পেরেছে। জানার পিপাসা তার রয়েই গেছে মনের মধ্যে। তার পরিহাস - রসিক সূক্ষ্ম মনটিকে তার স্বামীও বোঝেনি । সমাজ শাসকের পদামত নিম্ন বর্গের সমাজের, আবার পুরুষ মানুষের পদানত স্ত্রী- জাতি। চন্দরা সেই অন্ত্যজ শ্রেণীর সমাজে অধিষ্ঠিত থেকেও স্বামীর শাসন উপেক্ষা করেছে; সেই বিদ্রোহ করেছে। তার দৃঢ় ব্যক্তিত্ব তাকে তার সংকল্পের আসন থেকে টলাতে পারেনি। স্বামী কে যখন তার তার রাক্ষস বলে মনে হয়েছে , তখন স্বামীর হাত থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য আকুল হয়ে ওঠেছে। কিন্তু একজন গ্রাম্য বধূর পক্ষে স্বামীর ঘর ত্যাগ করলে সমাজে তার স্থান কোথায় ! সমস্ত কিছুকে উপেক্ষা করে এই অভিমানিনী নারী মৃত্যুর ফাঁস গলায় পড়েছে। যখন মরণ তার শিয়রে প্রতীক্ষা করছে, তখন স্বামীর উদ্দেশ্যে জোর গলায় বলতে পেরেছে - 'মরণ'! - এখানে ও যেন তার সেই সূক্ষ্ম পরিহাস- রসিক মনটির সন্ধান মেলে । রবীন্দ্রনাথ যেভাবে ছিদাম ও চন্দরার দাম্পত্য সমস্যাকে তুলে ধরেছেন - তা বিস্ময়কর। যে ছিদাম ভাইকে বাঁচাতে স্ত্রীর প্রতি দোষারোপের পর নিজের মনকে সান্তনা দেওয়ার জন্য ভেবেছিল -" বউ গেলে বউ পাইব, কিন্তু আমার ভাই ফাঁসি গেলে আর তো ভাই পাইব না।"- সেই ছিদামকে আদালতের পরিবেশে স্বপ্নাচ্ছন্ন দেখা যায় । ছিদামের প্রথম আচরণটি তার নিজের চরিত্রের সঙ্গে বেশ মানিয়ে যায় কিন্তু ছিদামের রোম্যান্টিক ভাবনা তাকে তার সামাজিক স্তর থেকে অনেকটা উপরে তুলে দেয় ।

খ)শরৎচন্দ্রের 'বিলাসী' ও 'অভাগীর স্বর্গ' গল্পে যথাক্রমে বিলাসী ও কাঙালী চরিত্র

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'বিলাসী' গল্পে মাল-জাতের মেয়ে বিলাসী মালর অনন্য সাধারণ মহিমামন্ডিত প্রেম কাহিনী বর্ণিত। প্রেম ও প্রেমাস্পদের জন্য বিলাসী শারীরিক ভাবে যেমন লাঞ্ছিত হয়েছে, তেমনী প্রেমাস্পদের জন্য অনায়াসে জীবন-বির্সজন পর্যন্ত ও দিয়েছে। একটি শ্বাপদ-সঙ্কুল বাগানে বাস করে স্বজন - পরিজনহীন উচ্চবংশজাত যুবক মৃত্যুঞ্জয়। সেই শ্বপদসঙ্কুল ভীতি জনক পরিবেশকে উপেক্ষা করে মারাত্মক রকমেরঅসুস্থ মৃত্যুঞ্জয়ের সেবার ভার নেয় মাল-কন্যা বিলাসী। সেবার সূত্রে আসে প্রেম। গল্পকথক ন্যাড়ার মনে হয়েছে, বিলাসীর এই সেবাকর্ম তার অন্ত-র্নিহিত নারী সত্তার শক্তিতে ভরপুর, যা একশ বছর স্বামী -স্ত্রী রূপে বাস করেও অনেক নারী অর্জন করতে পারেনা । বিলাসীর প্রেমকে মূল্য দিয়ে তার বাবা দুজনের নিকা পড়িয়ে দিয়েছে । কিন্তু ভদ্র সমাজের কাছে এটা অনাচার। তারা এই অনাচার সহ্য করল না। বিলাসীকে শারীরিক ভাবে লাঞ্ছিত করে তাড়িয়ে দেওয়া হল। কিন্তু বিলাসীর প্রেম গভীর, সে মৃত্যুঞ্জয়কে নিয়ে উঠল মালো পাড়ায়।

মৃত্যুঞ্জয় জাত পালটে মাল হয়। সুখেই চলছিল বিলাসীর জীবন, কিন্তু একদিন অকটা বাড়িতে সাপ ধরতে গিয়ে সাপের কামড়ে মারা গেল মৃত্যুঞ্জয় । স্বামী-বিয়োগ-ব্যথা বিলাসীর বুকে প্রচন্দ আঘাত হানল। সে এক সপ্তাহের মধ্যে আত্মহত্যা করে প্রেমাস্পদহীন পৃথিবী থেকে বিদায় নিল ঃ

"একদিন গিয়া শুনিলাম, ঘরে তো বিষের অভাব ছিলনা, বিলাসী আত্মহত্যা করিয়া মরিয়াছে।"

(বিলাসী ঃ শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়)

- প্রেম ও প্রেমাস্পদের জন্য এই প্রাণ বিসর্জন বিলাসীকে অনন্য করেছে। অন্ত্যজ শ্রেণীর মানুষদের হয়ে প্রেমের জন্য এই ধরণের ত্যাগ স্বীকারের দৃষ্টান্ত খুব একটা দেখা যায় না।

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'অভাগীর স্বর্গ' গল্পের বিষয় হয়েছে দুলে বধূ, কাঙালীর মার ধর্ম বিশ্বাস কেন্দ্রিক মৃত্যু- চিন্তার কথা। গল্পে দেখি, কাঙালীর মা অভাগীর মনের বড় সাধ এই যে, তাদের সমাজ প্রথানুযায়ী মুখে নুড়ো জ্বেলে মটিতে না পুঁতে, তাকে যেন মুখুজ্জে গিন্নির মতো দাহ করা হয় । মুখুজ্জে গিন্নির মহা সমারোহের অন্ত্যেষ্টি অনুষ্টান দেখে তার মনে এমন সাধ জেগেছে । মুখুজ্জে গিন্নির সৎকার-অনুষ্ঠান দেখতে দেখতে তার মনে হয়েছে, চিতার ধোঁয়ার মধ্যে যেন আকাশ থেকে একটা রথ নেমে এসেছে - আর ঐ রথে চড়ে গিন্নিমা স্বর্গে গেছে । তার মনে হয়েছে প্রকৃত সতী লক্ষ্মীরা এমনই স্বামীর পদধুলি মাথায় নিয়ে, ছেলের হাতের আগুন নিয়ে স্বর্গে যায় । অভাগীর মনের মধ্যেও এরকম আচার সংস্কার পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা জেগেছে।

" তার আকাশ জোড়া ধূঁয়ো তো ধূঁয়ো নয় বাবা, সেই তো স্বর্গের রথ । কাঙালীচরণ, বাবা আমার। - কেন মা ? তোর হাতের আগুন যদি পাই বাবা, বামুন মা'র মত আমিও সগ্যে যেতে পাবো । " (অভাগীর স্বর্গ ঃ শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়)

এর পর অভাগী জ্বরে পড়ল এবং মারা গেল। মারা যাবার আগে সে তার এই ইচ্ছার কথা সবাইকে বলেও গেল । সেই মতো তার স্বামী রসিক বাঘ অন্তিম সময়ে পায়ের ধুলো দিল । কিন্তু অন্ত্যজ মানুষ অভাগীর শেষ ইচ্ছাটা পূর্ণ হল না। কেননা, দাহ করার জন্য কাঠ রসিক বাঘ ও এবং তার ছেলে কাঙালী জোগাড় করতে পারলনা। সামন্তবাদী শোষণের অত্যাচারে নিজেদের জমিতে পোতা গাছ কাঠতে গিয়ে তারা লাঞ্ছিত হল - অপমানিত হল । অভাগীকে তাই পোড়ানো গেল না। তাদের সামজে প্রচলিত ধর্ম প্রথা অনুযায়ী মুখে নুড়ো জ্বেলে তাকে পুঁতে দেওয়া হল। নুড়ো জ্বালানোর খড়ের গোছা থেকে যে স্বল্প ধোঁয়া বের হচ্ছিল তার দিকে অপলক চেয়ে থেকেও কাঙালী স্বর্গ থেকে নেমে আসা কোন রথকেই দেখতে পেলনা। অতৃপ্ত ধর্ম বিশ্বাসের ট্রাজেডিতে নিমজ্জিত হয় কাঙালী - দরিদ্র অসহায় কাঙালী।

গ) 'প্রাগৈতিহাসিক' এবং 'পদ্মানদীর মাঝি' অন্ত্যজ শ্রেণীর মানুষের দু'ধরণের চিত্র

শরৎ সাহিত্য সমাজ সমালোচনার মধ্যে দিয়ে অন্ত্যজ শ্রেণীর মানুষের প্রতি সহানুভূতির দিকটি পরিচালিত হয়। পরবর্তী কালে 'কল্লোল' (প্রথম প্রকাশ ১৯২৩) গোষ্ঠীর লেখকেরা বাংলা

সাহিত্য আনতে চেয়েছিলেন নতুন স্রোত। তাঁরা নিচু তলার মানুষের কথা বলতে চেয়েছিলেন। কিন্তু নিচুতলার অন্ত্যজ শ্রেণীর মানুষের জীবনের উপর পড়েছিল রোমান্সের আলো। এর ফলে তাঁদের লেখার মধ্যে যে মানুষগুলি উঠে এসেছিল, তারা যেন আপন দেশের আপন মাটির সত্যিকারের মানুষ নয়। যার নিদর্শন শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়ের কয়লাকুঠির গল্পে রয়েছে।

" কথা সাহিত্যে গণতান্ত্রিক চেতনা এসেছে সত্য, - অতি নগণ্য মানুষ - বেকার মধ্যবিত্ত যুবক থেকে পথের ভিখারী, নগণ্য বস্তি বাসী, কুলি মজুর সাহিত্যের বিষয় হয়েছে একথা ঠিক, কিন্তু কল্লোল গোষ্ঠীর লেখকেদের রচনায় সামাজিক পটভূমিতে এই সব ব্যক্তির সমস্যা যেমন ফোটেনি,সমাজ নিরপেক্ষ ব্যক্তি কেন্দ্রিক কাহিনীই তাদের কল্পনাকে অধিকতর উদ্বেজিত করেছে।"[৪৩]

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের গল্প উপন্যাসে অন্ত্যজ শ্রেণীর মানুষের জীবনের নির্মম বাস্তবতার দিকটি ধরা পড়েছে। অন্ত্যজ মানুষের জীবন নিয়ে তাঁর অসাধারণ একটি গল্প 'প্রাগৈতিহাসিক'। এখানে একদিকে মানুষের আদিম প্রবৃত্তির কথা ও যেমন বলা হয়েছে, অন্যদিকে তেমনী দারিদ্রের কথা বলা হয়েছে; যে দারিদ্র মানুষকে চোর, ডাকাত, গুন্ডাতে পরিণত করেছে। ভিখুর ব্যবসা ডাকাতি করা, প্রয়োজন হলে সে খুনও করতে পারে, সেই ভিখু ডাকাতি করতে গিয়ে বর্শার খোঁচায় তার একটি হাত জখম হয়। পুলিশের হাত থেকে বাঁচার জন্য বনের মধ্যে পশুর মতো জীবনযাপন করে "সে কিছুতেই মরিবে না। বনের পশু যে অবস্থায় বাঁচে না সেই অবস্থায়, মানুষ সে বাঁচিবেই।" [৪৪]

অবশেষে তার সেই শুকিয়ে যাওয়া হাতটাই হয়ে ওঠে তার ভিক্ষার বিজ্ঞাপন। ভিক্ষার রোজগারে ক্রমশ, তার শরীরের শক্তি ফিরে আসে, নিঃসঙ্গ জীবনে নারীসঙ্গ কামনায় সে ভিখারিনী পাঁচীকে লাভ করতে চায়। পাঁচীও বোঝে তার পায়ের 'ঘা' টি তার বেঁচে থাকার পক্ষে কতখানি জরুরী। তাই ভিখুর উদ্দেশ্যে সেয়ানা পাঁচী বলে ওঠে - " দুদিন বাদে মোরে যখন তুই খেদাইয়া দিবি, ঘা মুই তখন পামু কোথায় নে ? "[৪৫] অন্ত্যজ মানুষের জীবনের এই চিত্র মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ই আঁকতে পেরেছেন।

সমাজের নিচু তলার অন্ত্যজ শ্রেণীর মানুষকে নিয়ে লেখা মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের এক অসাধারণ উপন্যাস 'পদ্মানদীর মাঝি'। পদ্মনদীর মাঝি একাধারে জেলে মাঝিদের জীবন সংগ্রামের ছবি - যাদের একজন হল কুবের। কুবেরের শরীর ভালো না থাকলেও তাকে মাছ ধরতে যেতে হবে। সারা রাত মাছ ধরতে হবে। রোদ বৃষ্টি ঝড় ঠান্ডা কোন কিছুতেই কাহিল হলে চলবে না। কুবেরের একমাত্র ভরসা পদ্মার মাছ। অখিল সাহার পুকুরটা এবার সে জমা নিতে পারেনি। সুতারাং পদ্মার মাছের ওপর নির্ভর না করে উপায় নেই। এই নির্ভরতাও তার খুব একটা জোরাল নয়। কারণ উপযুক্ত জাল বা নৌকা তার নেই। ধনঞ্জয় বা যদুর সঙ্গে সারাবছর তাকে ভাগে মজুরী খাটতে হবে। আবার ইলিশের মরসুম চলে গেলে পদ্মা কৃপণ হয়ে যায়। তখন নদীর মালিককে খাজনা দিয়ে হাজার টাকা দামের জাল পাততে পারে যারা, তাদের স্থান ছেড়ে দিয়ে এতবড় পদ্মার বুকে জীবিকা অর্জন করা কুবেরের মতো গরীব জেলের পক্ষে দুঃসাধ্য ব্যাপার। ধনঞ্জয় ও যদুর

জোড়াতালি দেওয়া ব্যবস্থ্যায় যে মাছ পড়ে তার দু- তিন আনা ভাগে কারো সংসার চলে না । উপার্জন হয় শুধু ইলিশের সময় - " শরীর থাক আর যাক , এসময় একটা রাত্রেও ঘরে বসিয়া থাকিলে কুবেরের চলিবে না ।" [৪৬]

জাহাজ ঘাটে যেখানে মাছ বেচা কেনা হয় , সেখানেও ঝামেলা । চালানবাবু মাছ গোনার সঙ্গে সঙ্গে একশো মাছ পিছু পাঁচটা মাছ প্যাকিং বাক্সে চালান করে , শেতলবাবু ওৎ পেতে থাকে কুবেরের কাছ থেকে ফাঁকি মেরে মাছ সংগ্রহের আশায় । কুবেরের অনুপস্থিতির সুযোগে ধনঞ্জয়ও ফাঁকি দেওয়ার ব্যবস্থা করে রাখে । কিন্তু প্রতবাদ করার কোন উপায় নেই -

" গরীবের মধ্যে সে গরীব , ছোট লোকের মধ্যে আরও বেশী ছোটলোক । এমন ভাবে তাহাকে বঞ্চিত করিবার অধিকারটা সকলের তাই প্রথার মতো , সামাজিক ও ধর্ম সম্পর্কীয় দশটা নিয়মের মতো , অসংকোচে গ্রহণ করিয়াছে সে । " [৪৭]

পদ্মা পারের জেলে পাড়ার মানুষ গুলির জীবিকা হল মাছ ধরা , নয়তো মাঝিগিরি , কোন মতে একটা সংকীর্ণ পরিধির মধ্যে মাথা গুঁজে থাকতে হয় ।

" দিন কাটিয়া যায় । জীবন অতিবাহিত হয় । ঋতুচক্রে সময় পাক খায় , পদ্মার ভাঙন ধরা তীরে মাটি ধ্বসিতে থাকে,পদ্মার বুকে জল ভেদ করিয়া জাগিয়া উঠে চর , অর্ধ-শতাব্দীর বিস্তীর্ণ চর পদ্মার জলে আবার বিলীন হইয়া যায় । জেলে পাড়ার ঘরে শিশুর ক্রন্দন কোনও দিন বন্ধ হয় না। ক্ষুধা তৃষ্ণার দেবতা , হাসি কান্নার দেবতা , অন্ধকার আত্মার দেবতা , ইহাদের পূজা কোনও দিন সাঙ্গ হয় না। এদিকে গ্রামের ব্রাহ্মণ ও ব্রাহ্মণেতর ভদ্র মানুষগুলি তাহাদের দূরে ঠেলিয়া রাখে, ওদিকে প্রকৃতির কালবৈশাখী তাহাদের ধ্বংস করিতে চায় , বর্ষার জল ঘরে ঢোকে , শীতের আঘাত হাড়ে গিয়া বাজে কন কন । আসে রোগ। আসে শোক । টিকিয়া থাকার নির্মম অনমনীয় প্রয়োজনে নিজেদের মধ্যে রেষারেষি করিয়া তাহারা হয়রান হয় । জন্মের অভ্যর্থনা এখানে গম্ভীর, নিরুৎসব, বিষন্ন । জীবনের স্বাদ এখানে শুধু ক্ষুধা ও পিপাসায় , কাম ও মমতায় , স্বার্থ সংকীর্ণতায় , আর দেশী মদে। তালের রস গাঁজিয়া যে মদ হয়, ক্ষুধার অম্ল পচিয়া যে মদ হয় , ঈশ্বর থাকেন ওই গ্রামে, ভদ্র পল্লীতে । এখানে তাঁহাকে খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে না । " [৪৮]

তাই হোসেন মিয়ার ময়নাদ্বীপ সম্বন্ধে সংশয় থাকলেও, কুবেরদের শেষ পর্যন্ত সে দিকেই পা বাড়াতে হয় ।

ঘ)তারাশংকরের চেতনায় অন্ত্যজ শ্রেণীর মানুষের দু'একটি নিদর্শন

তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায় এর গল্প উপন্যাসে অন্ত্যজ শ্রেণীর মানুষেরা তাদের বিচিত্র সমস্যা নিয়ে ভিড় করে এসেছে। তাঁর 'চৈতালী ঘূর্ণি'তে অন্ত্যজ মানুষের মর্মান্তিক পরিণতি ঘটেছে। ঔপনিবেশিক ভারতবর্ষে অন্ত্যজ শ্রেণী মানুষের এক গরুত্বপূর্ণ সমস্যা ভূমিহীন কৃষকের শ্রমিকে রূপান্তর। 'চৈতালী ঘূর্ণি 'তে তার ভয়াবহ চিত্র আঁকা হয়েছে। "পাড়া গাঁয়ের দুঃখে - কষ্টে, জমিদারের অত্যাচারে নাস্তানাবুদ হয়ে, স্ত্রীর হাত ধরে গাঁ ছেড়ে বেরিয়ে এসে গোষ্ঠ শেষে এক

কারাখানায় কুলির কাজ নিলে । সেখানকার নিদারুণ অত্যাচার থেকে বাঁচবার জন্যে বাবুদের কথা শুনে কতকগুলি কুলির সঙ্গে সে ধর্মঘট করলে । শেষ পর্যন্ত পেটের দায়ে নিজেদের মধ্যে মারামারি করে হাতুড়ির ঘায়ে গোষ্ঠ প্রাণ হারাল । বাবুদের Self Consciousness জাগাবার চেষ্টা , ধর্মঘট প্রভৃতি করা আপততঃ চৈত্র প্রান্তরের ঘূর্ণির মতোই ক্ষীণ আর ক্ষণস্থায়ী হলেও লেখকের বিশ্বাস চৈতালির ক্ষীণ ঘূর্ণি অগ্রদূত কাল বৈশাখীর ।" [৪৯]

তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায়ের গল্প উপন্যাসে অন্ত্যজ শ্রেণীর চরিত্রের ছড়াছড়ি । এই সব মানুষ গুলির প্রতি তারাশংকরের অসাধারণ মমতা । তাঁর 'ধাত্রী দেবতা' উপন্যাসের সেই ডোমবধূটি যাকে কলেরার হাত থেকে বাঁচিয়ে ছিল শিবনাথ- পরবর্তী কালে সরকারী বকশীশ অগ্রাহ্য করে , গোয়েন্দা পুলিশের সম্বন্ধে সতর্ক করে সে, শিবনাথকে । শিবনাথের ঘরের আর্মসগুলো সে অনায়াসে ময়লার বালতির মধ্যে লুকিয়ে বেরিয়ে পড়ে । তার মুখে শোনা যায় - "আমরা ছোট লোক বলে কি আমাদের ধর্ম্ম ভয় ও নাই বাবু ?" [৫০] "শিবনাথ নিষ্পলক দৃষ্টিতে .... ওই নীচ জাতির অস্পৃশ্য বৃত্তি ধারিণী মেয়েটির দিকে চাহিয়া রহিল ।" [৫১]

তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'ডাকহরকরা' গল্পের মেল-রানার দীনু ডোমের চারিত্রিক সততা ও মহানুভবতার পরিচয় গল্প বিষয় হয়েছে । দীনু আমদপুর- হরিহরপুরের মেল - রানার । কঠিন কর্তব্য নিষ্ঠার সঙ্গে সে টাকা-চিঠি-খবর বয়ে আনেন । তার ছেলে বাউন্ডুলে প্রকৃতির নেতাই বাবার কাছ থেকে টাকা ছিনতাই করতে চায় । সে একদিন গভীর রাতে দীনুর যাত্রাপথে লুকিয়ে থেকে দীনুর মাথায় লাঠির আঘাত হানে । রক্তাক্ত দীনু তবু টাকা ছাড়ে না । সে ছেলেকে ধিক্কার দেয়। নেতাই সুবিধা করতে না পেরে সে রাতেই পালিয়ে যায় । আদালতে দীনু সব স্বীকার করে। ছেলের নাম বলে দেয় । ধন্য ধন্য পড়ে যায় তার নামে। সরকারী পুরস্কার পায় দীনু । - অর্থ লাঞ্ছিত অন্ত্যজ জীবনে এ অনন্য সততা ও মহানুভবতার নজির । একদিকে সন্তান অন্যদিকে সততা । দু'য়ের মধ্যে দীনু সততাকে আশ্রয় করেছে । যদিও এই সূত্রেই তার জীবনে নেমে এসেছে বিপর্যয় । গল্পে দেখি , দেশ থেকে পালিয়ে নেতাই আফ্রিকা গেছে । সেখানে এক জাহাজ কোম্পানিতে কর্মরত অবস্থায় তার মৃত্যু হয়েছে। জাহাজ কোম্পানীটি নেতাইয়ের প্রাপ্য টাকা দীনুর নামে মানি অর্ডার ও মৃত্যুসংবাদ পাঠিয়েছে । এই সংবাদে দীনু ভেঙে পড়েছে । হাজার প্রলোভন ও ঝড় - ঝঞ্ঝাতে যে দীনু দ্বায়িত্ব সচেতন থেকেছে, তার বোধে এখন এল এক মারাত্মক অনুভূতি ঃ

> "থাকিতে থাকিতে অকস্মাৎ তাহার মনে হইল, উঃ, এমন সংবাদ এই দীর্ঘকাল ধরিয়া নিত্য নিত্য কত সে বহিয়া আনিয়াছে ।"
>
> (ডাক হরকরা ঃ বন্দ্যোপাধ্যায় তারাশঙ্কর)

দীনু হত চকিত হল । সে কাজে জবাব দিল ঃ 'আমি আর কাজ করব না বাবু , কাজে জবাব দিলাম।' সততার মূল্যে এহেন গভীর ট্র্যাজিক পরিণতি এলেও দীনু ডোম অক্ষয় মহানুভবতার উদাহরণ ।

তারাশংকরের 'যাদুকরী' গল্পে এক বাজিকর - যাযাবর তরুণীর মানবিক সহানুভূতির ও

ব্যক্তিক মহানুভবতার প্রকাশ পেয়েছে । নিতান্ত মানবিক ধর্মের কারণে সে দারোগার হাতে ধরা পড়ার হাত থেকে শশী ডোমের জামাইকে বাঁচিয়েছে । গ্রামে গ্রামে নাচ দেখানো , খেলা দেখানো এই যাদুকরীর পেশা । সঙ্গে তুক-তাক বশীকরণের মন্ত্রতন্ত্র ও সে জানে । মুখুজ্জেও বাঁড়ুজ্জে বাড়ির বর - বধূকে সে মিলিয়ে দেয় । স্বামী সোহাগ বঞ্চিতা গৃহিনীকে এলাচ- মন্ত্র দিয়ে বশীকরণের কৌশল শেখায় যাদুকরী । এহেন যাদুকরী থানায় নাচ দেখাতে এসে জেনে ফেলে , ভরতপু থেকে খবর পেয়ে দারোগা এসেছে ডোমপাড়ার শশী ডোমের জামাইকে ' অ্যারেষ্ট ' করতে । এই খবর জানার সঙ্গে সঙ্গে মানবিক সহানুভূতিতে তৎপর হয়ে ওঠে যাদুকরী । সে সোজা ডোম পাড়ায় এসে শশীর ঘরে ঢোকে । জামাইকে তার সঙ্গী বাজিকর সাজিয়ে গ্রামের বাইরে নিয়ে যায় । পুলিশের চোখের ওপর দিয়ে ।

" গ্রামের প্রান্তে নকল বাজিকরকে বিদায় দিয়া বাজিকরী বলিল , - চললাম লাগর । এইবার চল্যা যাও সোজা । " (যাদুকরী ঃ বন্দ্যোপাধ্যায় তারাশঙ্কর)

তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'রসকলি' গল্পটি ভেকধারী বোষ্টুমী ধোপা-কন্যা মঞ্জুরীর জীবনের প্রেম ব্যর্থতার করুণ মেদুর কাহিনী । মঞ্জরী রামদাস মোহান্তের ভাইপো পুলিনের সঙ্গে রসকলি পাতিয়েছিল । একসাথে মানুষ তারা । ছোট বেলায় খেলাচ্ছলে একে অপরকে যে ভালোবেসেছিল, যৌবনে তার পূর্ণ প্রকাশ ঘটে । দুজনের বিয়েও ঠিক হয় ঃ

" রামদাস শেষে রাজী হইল , বেশ মঞ্জরীর সঙ্গেই পুলিনের বিবাহ হোক । "

(রসকলি ঃ বন্দ্যোপাধ্যায় তারাশংকর)

প্রেমে-আবেগে-মমতায় প্রস্তুত ছিল মঞ্জরী। কিন্তু তার আশা পূর্ণ হল না। এ সময়ে হঠাৎ করে রামদাসের এক সয়মকার প্রেমিকার-বোষ্টুমী শ্রীমতি তার মেয়ে গোপিনীকে নিয়ে হাজির হয়। তখন রামদাস পুলিনকে গোপিনীর সাথেই বিয়ে দেয়। গোপিনীকে পেয়ে পুলিন মঞ্জরীকে ভুলে গেল। পাহাড় প্রমাণ বেদনাকে বুকে চেপে মঞ্জরী সব কিছু মেনে নিল। কিন্তু গোপিনী তার প্রতি দুর্ব্যবহার করায় সে কিছুটা প্রতিশোধপ্রাণা হয়ে পুলিন কে নতুন করে পেতে চাইল । পুলিন তার দিকে ঝুঁকে পড়ল এ সময়ে। পরম যত্নে সে পুলিনকে নিজের ঘরে আশ্রয় দিয়েছে । পুরানো প্রেম নতুন করে জেগেছে ঃ-

" কৌতুকে গ্রীবা বাঁকাইয়া খানিকক্ষণ পুলিনের নত-লজ্জিত মুখের উপর উজ্জ্বল দৃষ্টি হানিয়া সহসা মঞ্জরী তাহার মুখ পুলিনের কানের কাছে লইয়া গিয়া কাহিল, আমি তো তোমারই গো।"

কিন্তু এ ক্ষণিকের চিত্র। মনের সম্পূর্ণ বিপরীতে গিয়ে পুলিন ও গোপিনীর মিলন ঘটাতে হয় তাকেই। সুখের তৃপ্তি তার ভাগ্যে নেই । গোপিনীর হাতেই নিজ প্রেমাস্পদ পুলিনকে তুলে দিয়ে, শূন্য হৃদয়ে তীব্র হাহাকার নিয়ে চিরন্তন প্রেমের ধাম বৃন্দাবনের পথে পা বাড়াতে হয়েছে তাকে। প্রেম ব্যর্থ মঞ্জরী না পাওয়ার গ্লানিমাতে শুকিয়ে গেছে ।

তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'বাউল' গল্পের বিষয় হয়েছে অর্থ বাসনা ও অর্থ লালসার মোহপঙ্কে নিমজ্জিত এক বাউলের করুণ পরিণতির কাহিনী। চির উদাসীন, সংসারের প্রতি

আসক্তিহীন বা গৃহবিবাগী এক সন্ন্যাসী কেমন করে গুপ্ত অর্থ সংগ্রহের মোহে মেতে উঠে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ল তার ক্রম উন্মোচনই হল 'বাউল ' গল্পটির বিষয় । বিশ ত্রিশ বছরের ঘরছাড়া বাউল উলাপুরে শ্যামসায়র দিঘির পাড়ে আস্তানা গেড়েই মোহাবিষ্ট হল । পাড়ের মাটি খোঁড়া খুঁড়ি করতে গিয়ে হঠাৎ করেই একদিন জমিদারের পরিত্যক্ত এই ভিটেতে কিছু রৌপ্য- মুদ্রা খুঁজে পেল সে । সাদা চকচকে মুদ্রা । লোভ এসে আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে ফেলে বাউলকে । এর পর থেকে শুরু হয় রাতের অন্ধকারে শাবল হাতে মুদ্রা খোঁজার গোপন অভিসার । সায়রের সমস্ত পার তন্নতন্ন করে করে ঘুরে বেড়ায় সে । আর এই পথেই এল তার মৃত্যু । রাতের আঁধারে এক বিষধর ফণীর আক্রমণে মৃত্যু হল বাউলের । - লোভের চাপ চাপ কামনার তলায় চাপা পড়ল বাউল - ধর্ম , সংসার অনাশক্তির অদম্য ইচ্ছা । আসলে যেন বিষাক্ত ফণী নয় , লোভ এসেই তার জীবন লীলা সাঙ্গ করে দিল ।

তারাশংকরের 'নারী ও নাগিনী' গল্পের বিষয় হয়েছে এক সাপুড়ে পরিবারের দাম্পত্য প্রেমের এক নিষ্ঠতা এবং একই সঙ্গে প্রেম-ঈর্ষা। গল্পে দেখি, সাঁপুড়ে খোঁড়া শেখ ও তার স্ত্রী যোবেদার সুখী দাম্পত্য সম্পর্কের মাঝখানে প্রতি দ্বন্দ্বিনীর ভূমিকা নিয়েছে একটি শিশু উদয়নাগ সাপিনী । খোঁড়া শেখ ও যোবেদার প্রেমময় জীবনে এই সাপিনী , খোঁড়া শেখ যার নাম দিয়েছে বিবি , যেন নিয়তির ভূমিকা নিয়েছে । বিবির প্রতি অদ্ভুত মমতা বোধ করে খোঁড়া তার অনেকটা 'প্যাশনের' মতো ঃ

"হাসিয়া খোঁড়া বলিল, বিশ্বাস নাই ওদের বিষ দাঁতকে। নইলে ওরাও তো ভালবাসে যোবেদা।... বলিয়া সে সাপটির ঠোঁট দুইটা চাপিয়া ধরিয়া তাহার মুখে একটা চুমু খাইয়া বসিল।"

(নারী ও নাগিনী ঃ বন্দ্যোপাধ্যায় তারাশঙ্কর)

স্ত্রী লিঙ্গ সাপের প্রতি স্বামীর এমন ব্যবহারকে মোটেই ভাল মনে মেনে নেয় না যোবেদা । কিন্তু সাপিনীটি এখন খোঁড়া শেখকে যাদু করেছে। সে বিবিকে নিয়েই মেতে ওঠে । সে তার নাকে একটা সোনার মিনি পরিয়ে দিয়ে তার মাথায় সিদুঁর তুলে যোবেদাকে জানায়, বিবিকে খোঁড়া নিকা করেছে, বিবি যোবেদার সতীন । স্বামী প্রেম ভাগ হয়ে যেতে দেখে যোবেদা ঈর্ষাপরায়ণ হয়ে পড়ে। সাপিনী বিবি হয় তার চক্ষু শূল । সাপিনীটির যৌন মিলনের সময় এলে খোঁড়া তাকে ছেড়ে দেয় চলে যায় বিবি । বিষাদাক্রান্ত হয়ে পড়ে খোঁড়ার মন প্রাণ, যোবেদা প্রেমে - আদরে স্বামীকে খুশি করতে গিয়ে ব্যর্থ হয় । তাদের প্রেম - মধুরতার মধ্যে যেন ফাটল ধরে । এমন পরিস্থিতিতে বিবি আবার ফিরে আসায় যোবেদা তাকে ঘুঁটে ছুঁড়ে মেরে তাড়িয়ে দেয় । বিচিত্র সুন্দর উদয়নাগ শিশুটি চলে যায় তখন কার মতো , কিন্তু রাত্রের আধাঁরে এসে সে যোবেদাকে দংশন করে । যোবেদা মারা যায় । প্রচন্ড ক্ষুদ্ধ হলেও খোঁড়া শেখ কিন্তু বিবিকে প্রাণে মারে না । তাকে আবার ছেড়ে দেয় সে । যোবেদার জন্য হতাশায় সে ফকিরি গ্রহণ করে । তবে বিবির প্রতি তার অদ্ভুত মমতায় একটুও ভাটা পড়েনি ।

"বিবিকে খোঁড়া বধ করিতে পারে নাই । তাহাকে সে ছাড়িয়া দিয়াছিল । বলিয়াছিল, শুধু

তোর দোষ কি, মেয়ে জাতের স্বভাবই ওই। যোবেদাও তোকে দেখতে পারতনা।"

(নারী ও নাগিনী ঃ বন্দ্যোপাধ্যায় তারাশঙ্কর)

- সাপিনীর প্রতি খোঁড়ার 'প্যাশনের' মতো প্রবল এই আকর্ষণের জন্যই বিনষ্ট হল একটি পরিবার। তাদের প্রেম ও সুখী জীবনের ইতি ঘটল এই সাপিনীর কারণেই । নারী ও নাগিনীর মধ্যেকার প্রেম- সংগ্রামে নারী পরাজিত হল - বিনষ্ট হল ।

তারাশংকরের 'চৌকিদার' গল্পে বাগদি পরিবারের বিপর্যয়ের বিষন্ন পরিণতির কাহিনী গল্পের বিষয় হয়েছে । চিতুরা গ্রামের চৌকিদার বনোয়ারী ওরফে ব্যানোও কমলির সংসার ভেঙে গেছে ব্যানোর যুক্তি বুদ্ধিহীন মাত্রতিরিক্ত সন্দেহ-বাতিক-গ্রস্ততার কারণে। এমননিতেই ব্যানো কমলির সংসার ছিল সুখের । হাসিতে-আমোদে-প্রেমে তাদের সংসার চলছিল বেশ সুন্দর ভাবে । কিন্তু চৌকিদারি প্রাপ্তীর দিন থেকে ব্যানো অন্য মানুষ হয়ে গেল । হঠাৎ করেই তার মনে হল গ্রামের সমস্ত মানুষের সম্পদের সেই রক্ষাকর্তা । তার মনে অদ্ভুত বিশ্বাস জন্মাল যে - রাতে শুধু চোর নয় মানুষের মনের সাপও বেরিয়ে পড়ে । আর সেই সাপের বিষ ছোবলে জর্জরিত হয়ে গেল সে নিজে, জর্জরিত হল তার সংসার । বনোয়ারী তখন থেকে সমস্ত মানুষকেই সন্দেহ করতে লাগল। এমনকি তার স্ত্রী কমলিকেও । সে প্রত্যহ রাতে 'রোদ' দিতে বেরোনোর আগে নিজেই বাইরে থেকে ঘরের শিকল দিয়ে যেত । অথচ একদিন রোদ সেরে বাড়িতে ঢোকার মুখেই তার যেন মনে হল, বউ কমলি ঘর থেকে বেরিয়ে যাচ্ছে । সন্দেহের সাপ দংশন করল ব্যানোকে । এই সন্দেহ-দংশনই ভেঙে দিল তার সুখের সংসারকে। স্ত্রী কমলির কোন যুক্তি না শুনে সে তাকে পরিত্যাগ করল পরদিন। বিচ্ছেদের করুণ রাগিনীতে কেঁদে উঠল একটি অন্ত্যজ সংসার ।

ঙ) বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'রাসুহাড়ি', 'বরো বাগদিনী' ও 'আমার ছাত্র' ছোটগল্প ও 'আরণ্যক' উপন্যাসে অন্ত্যজ জীবনের ছবি

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'রাসুহাড়ি' গল্পে অন্ত্যজ মানুষের প্রতি উঁচুতলার মানুষের সহানুভূতির কথা চিত্রিত । রাসুহাড়ি যশোহরের এক ব্রাহ্মণ বাড়ির গৃহভৃত্য ছিল । সে ঐ ব্রাহ্মণ বাড়ির একটি গোরু চুরি করে পালিয়ে যায় । এই ঘটনার চৌদ্দ বছর পর যখন সে ধরা পড়ে তখন শাস্তির বদলে বাড়ির সকলের সহানুভূতি পেয়েছে । শুধুমাত্র তাই নয়, ঐ চুরির ঘটনাকে বিচ্ছিন্ন হিসাবে দেখে বাড়ির গিন্নি মমতা ও কোমলতা দেখিয়ে তাকে পুনরায় ঘরে নিয়েছে ঃ

"মা চোখ মুছতে মুছতে বললেন, আয় বাবা রাসু, ভাত দিই গে, রান্নাঘরের উঠোনে চল - তোমারও অদেষ্ট, আমাদেরও অদৃষ্ট ... ।"

- গল্পে অন্ত্যজ মানুষের প্রতি এই যে গভীর মমতা ও সহানুভূতির চিত্র, তা নিতান্ত ব্যতিক্রমী দৃষ্টান্ত ।

বিভূতিভূষণ 'বরো বাগদিনী ' গল্পের বিষয় সমাজের বিধবা রমণী বরোবাগদিনীর দারিদ্র

লাঞ্ছিত জীবন কাহিনী । তার দারিদ্র এত বেশী প্রকট যে পরিধানের জন্য সামান্য এক টুকরো কাপড়ও তার নেই । গরীবের মধ্যে বরো আরো গরীব । ঝি-গিরি করে তার পেট চলত । কিন্তু শতচ্ছিন্ন কাপড়ে ইজ্জত ঢাকে না বলে ঝি-বৃত্তির কাজও ছেড়ে দিতে হয়েছে । গ্রামের প্রান্তে প্রায় জনহীন অঞ্চলে ছোট্ট ছেলেকে নিয়ে তার বাস । তার ওপর একদিন রাতে তার ঘরে ঘটে বাঘের আক্রমণ । বাঘ তার ছাগল ধরেছে । বরো মনে করেছে তার ছেলেকেই বাঘ কামড়ে ধরেছে । ফলে কাস্তে বটি নিয়ে বরো বাঘের সঙ্গে লড়াইতে নামে । এবং বটির কোপে সে বাঘটাকে হত্যা করে । পরের দিন বরোর উঠোনে গ্রামের লোক ভেঙ্গে পড়ে । কিন্তু বরোর বিপদ অন্যত্র। বাঘের সঙ্গে লড়াইয়ে তার শতছিন্ন কাপড়টা পরিধানের অযোগ্য হয়ে পড়েছে । সে বাধ্য হয়েছে পরের কাপড় চেয়ে এনে পরতে ঃ

"এ পরের কাপড় , ওরা আজই চেয়ে নিয়ে যাবে এখন-বেরুতি পারব না বস্তর বিনে ।"

(বরো বাগদিনী ঃ বন্দ্যোপাধ্যায়)

সবাই যখন বাঘ দেখতে ব্যস্ত , তখন বরো নিজের অসীম দারিদ্রের চিন্তায় মগ্ন , বরোবাগদিনী দারিদ্র লাঞ্ছিত জীবনের মূর্ত প্রতীক । সামান্য এক টুকরো বস্ত্র প্রাপ্তির অধিকার থেকেও বঞ্চিত করেছে তাকে এ সমাজ ।

বিভূতিভূষণের 'আমার ছাত্র' গল্পে অতি সরল , সাধাসিধে ভালোমানুষ, গণেশ মুচির দারিদ্র লাঞ্ছিত জীবনের ছবি ও মর্মান্তিক ট্রাজিক পরিণতির কাহিনী বিধৃত । গ্রামের এক ব্রাহ্মণ-এর বাড়িতে কৃষাণের কাজ করে গণেশ মুচি , সেই সঙ্গে সমস্ত ব্রাহ্মণ পাড়ার মানুষের ফাইফরমাস ও বেগার খেটে বেড়ায় সে । এই সব কাজের বিনিময়ে সে কোন রকমের মজুরী তো পায়ই না বরং কোন কোন ক্ষেত্রে শারীরিকভাবে লাঞ্ছিত হতে হয় তাকে । কিন্তু কিছুরতেই মুখে রা কাড়ে না গনেশ । বরং তার ওপরে যে হাজারো অত্যচার-অবিচার হয় , গল্প কথকের কাছ থেকে সামান্য কটি ইংরেজী শব্দ শেখার গরিমায় ও উদারতায় তা গণেশ ভুলে যায় । ক্রমে দেহে বৃদ্ধত্ব এলে ব্রাহ্মণ পাড়ায় গণেশের কদর ফুরিয়ে যায় । কেউ তাকে ডাকে না, কেউ সামান্য সাহায্যও দেয় না। চরম দারিদ্রের মধ্যে রাখালি করে কায়ক্লেশে দিন চলে যায় তার । অবহেলার অতল তলে তলিয়ে যেতে যেতে একদিন মৃত্যুর কোলে বিশ্রান্তি লাভ করে গণেশ মুচি । অন্ত্যজ জীবনের ওপর অমানবিক ব্যবহারের জ্বলন্ত উদাহরণ গণেশ মুচি । স্বার্থস্ববর্স্ব উচ্চ শ্রেণীর সমাজ অন্ত্যজ মানুষের কাছ থেকে তার শ্রমের সবটুকু নিংড়ে নেয়, তার বিনিময়ে দেয় - মৃত্যুর আঁধার ।

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'আরণ্যক' উপন্যাসে শুধু যে অন্ত্যজ শ্রেণীর মানুষেরই পরিচয় পাওয়া যায়, তাই নয় , অন্ত্যজ শ্রেণীর মানুষের ইতিহাস চর্চার প্রসঙ্গটিও এই উপন্যাসে উত্থাপিত হয়েছে ।

"মানুষের সত্যিকার ইতিহাস কোথায় লেখা আছে ? জগতের বড় বড় ঐতিহাসিকগণ যুদ্ধ বিগ্রহের বঞ্চনায় সম্রাট সম্রাজ্ঞী সেনাপতি মন্ত্রীদের সোনালী পোশাকের জাঁকজমকে দরিদ্র গৃহস্থের

কথা ভুলে গিয়েছেন । পথের ধারে আমগাছে তাদের পুঁটুলি বাঁধা ছাতু কবে ফুরিয়ে গেল , কবে তার শিশুপুত্র প্রথম পাখী দেখে সানন্দে মুগ্ধ হয়ে ডাগর শিশু চোখে চেয়েছিল , সন্ধ্যায় ঘোড়ার হাট থেকে ঘোড়া কিনে এনে পল্লীর মধ্যবিত্ত ছেলে তার মায়ের মনে কোথায় ঢেউ বইয়েছিল, দু হাজার বছরের ইতিহাসে সে সব কথা লেখা নেই - থাকলেও বড় কম ।...

কিন্তু আরও সুক্ষ্ম আরও তুচ্ছ জিনিসের ইতিহাস চাই । আজকের তুচ্ছতা হাজার বছর পরের মহাসম্পদ । মানুষ মানুষের বুকের কথা শুনতে চায় । কোটি কোটি মানুষ প্রলয় স্রোতে ভাসছে, ভবিষ্যতের সত্যিকার ইতিহাস হবে এই কাহিনী মানুষের মনের ইতিহাস, তার প্রাণের ইতিহাস ।" [৫২]

'আরণ্যক' - এর এক জায়গায় বিভূতিভূষণের এই ইতিহাস চিন্তার পরিচয় আছে । " বুঝি না কেন এক এক জাতির মধ্যে সভ্যতার কি বীজ লুক্কায়িত থাকে , তাহারা যতদিন যায় তত উন্নতি করে - আবার অন্য জাতি হাজার বছর ধরিয়াও সেই এক স্থানে স্থানুবৎ নিশ্চল হইয়া থাকে ? বর্বর আর্যজাতি চার-পাঁচ হাজার বছরের মধ্যে বেদ, উপনিষদ, পুরাণ, কাব্য , জ্যোতির্বিদ্যা, জ্যামিতি, চরক - সুশ্রুত লিখিল , দেশ জয় করিল ; সাম্রাজ্য পত্তন করিল, ভেনাস দ্য মিলোর মূর্তি, পার্থেনন, তাজমহল, কোলো ক্যাথিড্রাল গড়িল, দরবাড়ী কানাড়াও ফিফথ সিমফোনির সৃষ্টি করিল - এরোপ্লেন, জাহাজ, রেলগাড়ি, বেতার, বিদ্যুৎ আবিস্কার করিল - অথচ পাপুয়া নিউগিনি , অস্ট্রেলিয়ার আদিম অধিবাসীরা , আমাদের দেশের ওই মুন্ডা, কোল , নাগা , কুকিগন যেখানে সেখানেই কেন রহিয়াছে এই পাঁচ হাজার বছর ?" [৫৩]

পূর্ণিয়া জেলার জঙ্গল মহাল , সত্যচরণের চোখ দিয়ে দেখা এখানকার অতি দরিদ্র মানুষ গুলির জীবনকাহিনী হল 'আরণ্যক' । গাঙ্গোতা জাতির নকছেদী ভকত তার পরিবার নিয়ে শীতের দিনে, শীত নিবারণের জন্য, টালকরা কলাইয়ের ভূসির মধ্যে আশ্রয় নেয় । এই গরীব মানুষ গুলো ভাত খেতে পায় না, কলাইয়ের ছাতু আর মকাইয়ের ছাতু খেয়ে বাঁচে। ভাত খাওয়ার অর্থ ভোজ । আর এই ভোজের খবর জানতে পারলে বহু দূর থেকে এসে জমায়েত হয় । লেখক একস্থানে বলছেন -

"বাংলাদেশ যতই গরীব হোক , এদের দেশের সাধারণ লোকদের তুলনায় বাংলাদেশের গরীব লোকেও অনেক বেশী অবস্থাপন্ন অতি গরীব অবস্থায়ও কোন বাঙালী ছেলে চীনার দানা কখনও খাইবে না, খুশী হওয়া তো দূরের কথা ।" [৫৪] অথচ সামান্য চীনা ঘাসের দানা হাতে পাওয়ার পর বিশুয়ার মুখে খুশীর হাসি দেখেছিলেন সত্যচরণ ।

রাজপুত দেবী সিং-এর স্ত্রী 'কুন্তা' বাঈজীর মেয়ে বলে জাতি চ্যুত । দেবী সিং নিজেও সর্বস্বান্ত অবস্থায় মারা যায় । যে কুন্তা কিংখাবের ঝালর দেওয়া পালকি চেপে কুশী ও কলবলিয়ার সঙ্গমে স্নান করতে যেত, বিকানীর মিছরী ছাড়া জল খেত না, সেই কুন্তা টক বুনো কুল পাড়তে গিয়ে, লাক্ষার ইজারদারের চাকরের হাতে অপদস্ত হয় ; ম্যানেজার বাবুর পাতের ভাত খাওয়ার জন্য সাগ্রহে অপেক্ষা করে থাকে ।

সত্যচরণ এই অরণ্য জগৎ থেকেই খুঁজে পেয়েছিলেন অনার্য রাজকন্যা ভানুমতীকে, আর

প্রাচীন অভিজাত বংশীয় বীর অনার্য রাজাদের বংশধর ও সাঁওতাল বিদ্রোহের নেতা দোবরু পান্না বীরবর্দীকে । এই মুকুটহীন রাজার রাজ্য না থাকলেও তার জংলী প্রজাদের কাছ থেকে রাজার সম্মান পেয়ে থাকেন । কিন্তু বাইরের জগতের খবর এরা রাখেন না, তাই বলেন - 'এই জঙ্গলেই আমরা থাকি ভাল' । তিনি শুনেছেন কোলকাতা 'রড় ভারী জায়গা' ।

অনার্যদের প্রতি আর্যসংস্কৃতির অবহেলা ও বিস্মরণের প্রসঙ্গটি লেখক এখানে সহানুভূতির সঙ্গে তুলে ধরেছেন । এদের 'অশিক্ষিত পটু' হস্তনির্মিত গুহাভ্যন্তরস্থিত রাজপ্রাসাদ, রাজসমাধি,রাজ্যের সীমানা নির্দেশক বিকট মুখ খোদাই করা খাম্বাগুলি এবং তাদের সমাধিস্থলে প্রাচীনত্ব - তাদের চূর্ণায়মান অস্থি কঙ্কালের রেখার লেখা ইতিহাসের সাক্ষ্য বহন করে। সেই ইতিহাসের বিস্মরণই লেখকের কাছে ' ইতিহাসের বিরাট ট্রাজেডি ' বলে মনে হয়েছে । বিভূতিভূষণ তার স্মৃতির রেখায় বলেছিলেন -

"এই জঙ্গলের জীবন নিয়ে একটা কিছু লিখবো - একাটা কঠিন শৌর্য্যপূর্ণ, গতিশীল, ব্রাত্য জীবনের ছবি ।"[৫৫]

সেই বাত্য বা অন্ত্যজ জীবনেরই ছবি এঁকেছেন বিভূতিভূষণ তার 'আরণ্যক' -এ রাজা দোবরু পান্নার সমাধিতে শ্রদ্ধা জানাতে গিয়ে সত্যচরণের মনে হয়েছে "আর্যজাতির বংশধরের এই বোধ হয় প্রথম সম্মান আনার্য রাজসমাধির উদ্দেশ্যে ।"

বিভূতিভূষণ তাঁর 'আরণ্যক' উপন্যাসে যে সকল নিম্নবর্গের বা অন্ত্যজ জীবনের ছবি একেঁছেন - তারা আদিম আরণ্যক জীবনেই অভ্যস্থ। তাদের পৃথিবী সম্বন্ধে কোন ধারণা নেই। তাই ভানুমতীর পৃথিবীতে ভারতবর্ষ বলে কোনো জায়গা নেই । ভারতবর্ষ নাম শুনে তার প্রশ্ন 'ভারতবর্ষ কোন দিকে ?'

চ) বনফুল (বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়)

অনু ছোট গল্পকার বন ফুল ডাক্তারী পেশা সূত্রে সমাজের উচুঁ ও নিচুতলা সমস্ত রকমের মানুষের সঙ্গে মিশেছেন এবং তাঁর এই অভিজ্ঞতা দিয়ে তিনি প্রচুর গল্প লিখেছেন । ব্রাত্য বা অন্ত্যজ জীবন নিয়েও অনেক গল্প তিনি লিখেছেন - যেমন - 'বুধনী ' গল্পে অসভ্য বর্বর জাতির যুবক বিল্টুর আদিম প্রেম - পিপাসার কথা চিত্রিত । আদি বাসী -গুহাবাসী রমণী বুধনীকে দেখে বিল্টু তার প্রেমে উন্মও হয়ে যায়। শেষ পর্যন্ত বুধনীকে বিল্টু বিয়েও করে । সর্বসময় সে স্ত্রী বধুনীকে আঁকড়ে থাকে। তাদের একটি শিশু সন্তান এ সময় জন্মায় । ফলে খানিকটা জাগতিক নিয়মে সন্তানটি মাতা-বুধনীর অনেক খানি মনোযোগ ও সময় দখল করে । এখানেই বর্বর বিল্টুর আদিম প্রেম হিংস্র হয়ে ওঠে । বুধনীকে শুধুমাত্র একার করে পাওয়ার জন্য সে শিশুটিকে হত্যা করে। সেই অপরাধে বিল্টুর ফাঁসি হয় । কিন্তু ফাঁসির মঞ্চে ও বিল্টুর মুখে একটাই চিৎকার - 'বুধনী'। তার আদিম প্রেমের প্রচন্ডতায় স্ত্রী বুধনীকে ছাড়া অন্য কিছু বোঝে না ঃ

"সে মৃত্যুর পূর্বক্ষণ পর্যন্ত চিৎকার করিয়া গেল - বুধনী - বুধনী -বুধনী । ভগবানের নামটাও

পর্যন্ত করিল না ।" (বুধনী ঃ বনফুল)

বিল্টুর এ প্রেম উন্মত্ততায় ভরা , হিংস্রতার পর্যায়ে উন্নীত । যে প্রেম নিজের শিশু - সন্তানের জন্য ও জায়গা ছাড়ে না , বরং তাকে হত্যা করে সে প্রেম আদিম জীবনের ও পর পারে হিংস্রতার জগতে বর্তমান । আদিমতায় , উন্মত্ততায় তা সর্বগ্রাসী ।

বনফুলের 'প্রমাণ ' গল্পটিতে এক কুৎসিত দর্শন মেছুনি বুড়ির অপত্য সহানুভূতি ও বাৎসল্যই যেন প্রকাশিত । প্রবীন ডাক্তার ঘন শ্যাম সেন প্রত্যহ বুড়ির কাছ থেকে মাছ কেনেন। একদিন বড় বড় চিতল বা রুই মাছের বদলেবুড়ি তাকে কুচো মাছ দেয় । আর সেই মাছ খেতে গিয়ে কাঁটা ফোটে ডাক্তারের গলাতে । গলার ডাক্তার হাজরা সেই কাঁটা বের করে দিয়েছে । তার পর বুড়ির বিরুদ্ধে নানা রকম ষড়যন্ত্রের অভিযোগ আনা হতে থাকে । কেউ বলে বুড়ির মাছ পচা ছিল , যেহেতু ডাক্তার সেনের সঙ্গে হেল্‌থ অফিসারের ভাব আছে , সেহেতু বুড়ি তাকে পচা মাছ গছাতে না পেরে ছোট মাছ দিয়ে হিতৈষী সেজেছে - বুড়িটা আসলে বদ । কিন্তু ডাক্তার ঘনশ্যাম সেন অন্য কথা বলে । তার বিশ্বাস বুড়িটা সত্যই ভালো । এই আলোচনার মাঝখানে বুড়ি একটি বড় রুই মাছ এনে হাজির হয় ঃ -

" বেটা বুঝতে পারছি আজ তোর খাওয়া হয় নি । এবেলা বড় রুই মাছ এসেছিল বাজারে। খুব টাটকা । তোর জন্যে তাই নিয়ে এলাম এক সের ।"

(প্রমাণ ঃ বনফুল)

বুড়ির বিরুদ্ধে যে সব আভিযোগ আনা হচ্ছিল তা খন্ডিত হল এবারে । ভেঙে গেল মধ্য বিত্তের স্বার্থ চিন্তার মুখোশ । অন্ত্যজ মানুষ মেছুনি বুড়ি অপার অপত্য স্নেহের মূর্তি মতী প্রমাণ হিসেবে এখানে জীবন্ত হয়ে উঠল ।

অনুসন্ধান করতে গেলে আরো বহু চরিত্রের সন্ধান মিলবে । এখানে কয়েকটি দৃষ্টান্ত তুলে এনে বাংলা সাহিত্য চিন্তায় অন্ত্যজ মানুষের চরিত্রানুশীলনের ধারাটিকে বুঝে নেওয়ার চেষ্টা করা গেল । মূল বিষয় " স্বাধীনোত্তর পর্বে বাংলা কথা সাহিত্যে অন্ত্যজ জীবন " - এই আলেচনার ক্ষেত্রে বিভিন্ন দৃষ্টি কোণ থেকে বিষয় টিকে দেখতে হবে । আমাদের সমাজ কাঠামোর বিচিত্র সমস্যা বহুল অন্ত্যজ মানুষের জীবন যাত্রা । গল্প , উপন্যাসেও পড়েছে এর প্রভাব । বলাবাহুল্য , গল্প ও উপন্যাসের মধ্যে যখন অন্ত্যজ মানুষের জীবন খুঁজি তখন গল্পও উপন্যাসই বলে দেয় অন্ত্যজ মানুষের বিবিধ সমস্যা - জর্জরিত দিক গুলির কথা । বিভিন্ন গল্পে ও বিভিন্ন উপন্যাসে বিভিন্ন সমস্যা উঠে এসেছে । প্রত্যেক লেখকেরই দৃষ্টিভঙ্গী আলাদা ।

আলোচ্য উপন্যাস ও ছোট গল্প গুলিতে অন্ত্যজ শ্রেণীর মানুষকে দু ভাবে পাওয়া যাচ্ছে - প্রধান চরিত্র রূপে এবং অপ্রধান চরিত্র রূপে অর্থাৎ একদিকে অন্ত্যজ জীবন প্রধান উপন্যাস ও ছোটগল্প , অন্যদিকে অপ্রধান চরিত্র রূপে উপন্যাসে ও ছোট গল্পে অন্ত্যজ জীবনের অবস্থান ।

অন্ত্যজ জীবন প্রধান ছোট গল্প ও উপন্যাস গুলিতে অন্ত্যজ জীবনের সমস্যাকে দুটি ভাগে

ভাগ করলে দেখা যায় - একদিকে আশা-নৈরাশ্যের দোলায় আন্দোলিত জীবনালেখ্য , অন্য দিকে সংঘাতময় জীবন যাত্রা। সংঘাত ময় জীবনের দুটি রূপ-প্রতিকূল শক্তির কাছে অসহায় আত্ম সমর্পণ এবং বিদ্রোহ । এই বিদ্রোহের তিন রকম ফলাফল লক্ষ্য করা যায় - মরণ বাঁচন সংগ্রাম , সংঘাত শেষে আত্ম সমর্পণ , মানসিক ভাবে জয়লাভ বা আশাবাদ ।

যে উপন্যাস ও ছোটগল্পে অন্ত্যজ জীবনের মানুষ অপ্রধান চরিত্ররূপে রয়েছে, সেই উপন্যাস ও ছোটগল্প গুলিতে অন্ত্যজ জীবনের দুরকম চিত্র পাওয়া যায় -জীবনের ঘাত প্রতিঘাত নিয়ে ঘটনাস্রোতে ভেসে যাওয়া আর টুকরো টুকরো প্রতিবাদ চিত্র ।

গল্পকার ও ঔপন্যাসিকের দৃষ্টিতে অন্ত্যজদের উক্ত জীবন যে ভাবে উদ্ভাসিত হয়েছে তাহল কেউ দূর থেকে দেখেছেন , কেউ কাছ থেকে দেখেছেন, কেউ তাদেরই একজন হয়ে দেখেছেন, এই দেখার তারতম্যে অন্ত্যজদের জীবন সমস্যা কি ভাবে উদ্ভাসিত হয়েছে লক্ষ্য করার বিষয় ।

তৃতীয় অধ্যায়

স্বাধীনোত্তরপর্বে বাংলা উপন্যাস ও অন্ত্যজ জীবন

তৃতীয় অধ্যায়

স্বাধীনোত্তর পর্বে বাংলা উপন্যাস ও অন্ত্যজ জীবন

১৯৪৭ সালের ১৫ই আগষ্ট এলো বহু-কাঙ্ক্ষিত স্বাধীনতা । কিন্তু এই স্বাধীনতা অন্ত্যজ মানুষদের স্বাধীন করতে পারেনি । তাদের অবস্থা যে তিমিরে ছিল সেই তিমিরেই থেকে গেল। প্রভুর পরিবর্তন হল অর্থাৎ ইংরেজ চলে গেল , আর দেশের উচ্চবর্ণীয়েরা শোষণের জন্য প্রস্তুত হল। চিরকালই সমাজ এদের কাজে লাগিয়েছে , আর বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই প্রয়োজন ফুরিয়ে গেলে বর্জ্য - পদার্থের মতো ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছে । তাই ভারতবর্ষের স্বাধীনতা তথা বাংলার স্বাধীনতা অন্ত্যজদের স্বাধীন করেনি ।

স্বাধীনতার সঙ্গে সঙ্গে হল দেশ ভাগ । দেশ ভাগের পর ওপার বাংলার গৃহহীন মানুষের স্রোত এপার বাংলায় ধাক্কা খেয়েছে ; খুঁজেছে বেঁচে থাকার ঠিকানা । যারা সঠিক ঠিকানা খুঁজে পেলনা অর্থাৎ সমাজের স্তরবিন্যাসে তারা যে পরিচয়ে পরিচিত ছিল - সে পরিচয় ঘুচে , তাদের মধ্যে অনেকেই নিক্ষিপ্ত হল সমাজের একেবারে নিচু স্তরে অন্ত্যজদের ভিড়ে সামিল হল । এও এক অভিনব সমস্যা । যার হদিশ পাব স্বাধীনোত্তরপর্বে বিভিন্ন ঔপন্যাসিকের উপন্যাসে ।

স্বাধীনোত্তরপর্বে কৃষি জমিতে গড়ে উঠেছে কলকারখানা, কৃষি কৌশলে এসেছে আধুনিকীকরণ। কৃষকেরা কৃষি শ্রমিকে পরিণত হয়েছে । গ্রামের মানুষ তাদের বংশগত পেশা ত্যাগ করে , দলে দলে কলকারখানা ও কয়লাখাদের শ্রমিকে পরিণত হয়েছে । গ্রামে যারা থেকে গেছে , সেই কৃষক ও ক্ষেত মজুরদের ওপরেও আছে নানান রকম জুলুম ও অত্যাচার । এই অত্যাচারের বিরুদ্ধে শুরু হয় কৃষক আন্দোলন । স্বাধীনতার পরিণতি অন্ত্যজ মানুষদের জীবনে কোনো সুখের বার্তা বহন করে আনেনি । আশা ছিল অনেক কিন্তু ফলাফল সেই তুলনায় শূন্য, কিন্তু এই শূন্যতার মাঝেও যে অন্ত্যজ জীবনের মূল্যকে তুলে ধরা হয়েছে এবং তাদের জীবনে সামাজিক দৃষ্টি ভঙ্গির আলোকছটা প্রতিফলিত হয়েছে তার নিদর্শন আমরা দেখতে পাই স্বাধীনোত্তরপর্বে প্রতিষ্ঠিত লেখক এবং লেখিকার রচনায় । প্রসঙ্গক্রমে এই দিক গুলিকেই অর্থাৎ এই বিষয়ে আলোকপাত করতে গিয়ে বর্তমান অংশটির ধারাবাহিক অবতারণা করা হয়েছে ।

এক) তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৯৮-১৯৭১)

বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্রের পরে যে তিন বন্দ্যোপাধ্যায় বাংলা কথা সাহিত্যে আলোড়ন তুলেছিলেন তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায় তাদের মধ্যে বিশিষ্টতম। দীর্ঘ পঁয়তাল্লিশ (১৯২৬-৭১) বছরের একটানা সাহিত্য চর্চায় তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায় যে নিষ্ঠা, একাগ্রতা, জীবনী শক্তি ও স্থিতধী জীবন বোধের পরিচয় দিয়েছেন তা সুলভ নয়। বাংলা কথা সাহিত্যের নেতৃত্বভার

সহজেই তাঁর উপর বর্তেছে . তিনি আমাদের অস্থির সংশয় বিক্ষুব্ধ অবিশ্বাসী যুগের প্রধান কথাশিল্পী । তাঁর সাহিত্য চর্চার কাল আধুনিক ভারতবর্ষের যুগান্তরের কাল। পুরনো বিশ্বাস ও মূল্যবোধের অবসান , নতুন বিশ্বাস ও মূল্যবোধের আবির্ভাব ঘটেছে এই কালে । এই অর্ধ শতাব্দীর সকল তরঙ্গ বিক্ষোভ তারাশংকরের গল্প-উপন্যাসকে স্পর্শ করেছে, কিন্তু তাদের দ্বারা লেখক গ্রস্ত হননি ,এক অবনাশী ভারত চেতনা ও শান্ত স্থিতধী সংশয়মুক্ত জীবনবোধে তিনি দৃঢ়- প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। এই প্রতিষ্ঠাভূমি থেকে তারাশংকর কখনো বিচ্যুত হননি বলেই অনেক পরিবর্তনের ঝড় ঝাপটা পেরিয়ে আত্মরক্ষা করতে পেরেছেন, যুগের প্রতিনিধিস্থানীয় শিল্পী হতে পেরেছেন ।

তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায়ের আদর্শবাদ, ঐতিহ্য ও অধ্যাত্মাশ্রয়ী সংস্কারের প্রতি আনুগত্য, ভারতচেতনা, মানবপ্রেম আজ আমাদের কাছে - অস্থির সংশয়ী অবিশ্বাসীকালের মানুষদের কাছে - ঈষৎ দূরবর্তী বলে মনে হয় । কিন্তু এই শতাব্দীর চতুর্থ-পঞ্চম দশকে বাংলা কথাসাহিত্য তারাশংকরের রচনার মধ্য দিয়ে নবজন্ম লাভ করেছিল , একথা বিস্মৃত হতে পারিনা । চল্লিশের যুগে রবীন্দ্র প্রয়াণোত্তর বাংলা সাহিত্য নতুন একটি প্রতিমা নির্মাণে ব্যাপৃত হয়েছিল - সেদিন সে প্রতিমার প্রাণ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন তারাশংকর ; এ সত্য কিছুতেই ভোলা যায় না । তারাশংকর এমন এক জগৎ সৃষ্টি করেছিলেন যেখানে পরিচিত ধর্মাশ্রয়ী লোকসংস্কৃতি কেন্দ্রিক জীবনকে ও অপরিচিত অন্ত্যজ ব্রাত্য জীবনকে ঠাঁই দিয়েছিলেন , রাঢ় দেশের ভৌগলিক সীমানার মধ্যে সমগ্র দেশকে প্রত্যক্ষ করেছিলেন , মানবতাবোধের সঙ্গে অস্তিক্য বুদ্ধিকে মেলাতে পেরেছিলেন , বৃহতের আকাঙ্ক্ষায় গান রচেছিলেন 'জীবন এত ছোট কোন' ; জীবনের ধ্রুব আর্দশের সন্ধানে কোন দিন বিশ্বাস হারাননি , শেষ পর্যন্ত আস্থা রেখেছিলেন এক আদর্শ রঞ্জিত ভবিষ্যতের স্বপ্নে । তারাশংকর আধুনিক কালের জীবনশিল্পী , সমাজের ক্রনিক্লার পরিচিত জীবনের রূপকার ।

তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপন্যাসের বৈশিষ্ট্য

ক) উপন্যাস রচনায় তারাশংকরের একটা ধ্রুপদী বা ক্ল্যাসিক আদর্শ ছিল সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই । অর্থাৎ আধুনিক সময়ের উপযোগী হবার জন্য সমসাময়িক বিপর্যয়ের চিত্র গুলি উপন্যাসে স্থাপনের প্রয়োজন তিনি বোধ করেননি । জীবনসম্বন্ধে একটি বিশেষ দৃষ্টি ভঙ্গি থেকেই উপন্যাসের কলেবর অনেক সময়ই দীর্ঘ হয়ে পড়েছে, সে বিষয়ে ভাবিত হওয়ার প্রয়োজন তিনি বোধ করেছেন বলে মনে হয় না । নিজে গান্ধীবাদী রাজনীতি করতেন , উপন্যাসে ও তার প্রভাবও খুব গভীরভাবে পড়েছে বলে মনে হয় না ।

খ) তারাশংকরকে অনেকেই আঞ্চলিক উপন্যাসের পথিকৃৎ মনে করেন , কারণ রাঢ়ের একটি বিশেষ অঞ্চলকে অবলম্বন করেই তিনি তাঁর উল্লেখযোগ্য উপন্যাসগুলি রচনা করেছেন , এর মধ্যে পরিপূরক ত্রয়ী বা ট্রিলজি উপন্যাসও এমন ভাবে এঁকেছেন যে , সমগ্র রাঢ় অঞ্চলই তাঁর কলমে জীবন্ত হয়ে উঠেছে ।

গ) আঞ্চলিক মানুষের জীবন বৃত্তান্ত রচনা করার জন্য তাদের মুখের আঞ্চলিক ভাষাও

তারাশংকর গ্রহণ করেছেন । এবিষয়ে , অর্থাৎ এই ভাষা বৃহত্তম পাঠক- সাধারণের বোধগম্য হবে কিনা , এ সম্বন্ধে কিছুটা দ্বিধাও অস্বস্তি তারাশংকরের ছিল । কিন্তু রীবন্দ্রনাথের কাছে সমর্থন পেয়ে এ বিষয়ে সংশয় তাঁর দূর হয় এবং অসংকোচে এই ভাষা তিনি ব্যবহার করতে থাকেন । অবশ্য উত্তরপর্বে তাঁর উপন্যাস যখন বেশির ভাগই নগরকেন্দ্রিক হয়ে আসে , তখন আঞ্চলিক ভাষা ব্যবহারের প্রয়োজন তাঁর আর ঘটেনি ।

প্রাক্ স্বাধীনতা পর্বের সমস্যা , সদ্যপ্রাপ্ত স্বাধীনতা ও স্বাধীনতা পরবর্তী কালের সুবিধা - অসুবিধা ভরা জটিলতা, তারাশংকরের 'হাঁসুলী বাঁকের উপকথা' ও 'নগিনী কন্যার কাহিনী' উপন্যাসদ্বয়কে আচ্ছন্ন করেছে । আর উপন্যাসে বিধৃত অন্ত্যজ জীবনে এর প্রভাব পড়েছে সন্দেহ নেই ।

স্বাধীনতার জন্য দীর্ঘ আন্দোলনের পর,যে স্বাধীনতার স্বাদ পাওয়া গেল তারাশংকরের রচিত 'হাঁসুলী বাঁকের উপকথা' ও 'নাগিনী কন্যার কাহিনী' উপন্যাসে বিধৃত অন্ত্যজ শ্রেণীর মানুষের জীবনে তা অবশ্যই প্রভাব ফেলেছে। তাদের ব্যক্তিগত সুখ-দুঃখ, আশা-আকাঙ্ক্ষার পাশাপাশি তাদের সামগ্রিক জীবনযাত্রাকে ঔপন্যাসিক কোন দিক থেকে , কেমন ভাবে তুলে ধরেছে - সেটাও আমাদের লক্ষ্য রাখতে হবে ।

সমাজে যখন কোন বিপ্লব ঘটে, সে সামাজিক অর্থনীতিক- রাজনৈতিক, যাইহোক না কেন , এর ধকল অন্ত্যজ শ্রেণীর মানুষেরা সহ্য করে , এর প্রভাব এদের মধ্যে পড়ে , এরা হয়তো কোন আশাকে বুকে নিয়ে , সেই বিশ্বাসে এগিয়ে আসে । কিন্তু সমস্যার সমাধানে দেখা যায় - তাদের অবস্থার তেমন কোন পরিবর্তনই হয় নি । চিরকালই সমাজ এদের প্রয়োজনে কাজে লাগিয়েছে , আর বেশির ভাগ ক্ষেত্রে প্রয়োজন ফুরিয়ে গেলে বর্জ্য -পদার্থের মতো ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছে । তাই ভারতবর্ষের স্বাধীনতা উপরিল্লিখত উপন্যাসদ্বয়ে অন্ত্যজ শ্রেণীর মানুষকে স্বাধীন করেনি । ইংরেজ চলে গেলেও, এদেশে এদের প্রভুর কোন অভাব নেই । প্রভুর দল এদের শোষণ করবার জন্য সর্বদাই প্রস্তুত।

ক) হাঁসুলী বাঁকের উপকথা

হাঁসুলী বাঁকের পরিচয় ঃ

"হাঁসুলী বাঁকের ঘন জঙ্গলের মধ্যে রাত্রে কেউ শিস দিচ্ছে। দেবতা কি যক্ষ কি রক্ষ বোঝা যাচ্ছে না , সকলে সন্ত্রস্ত হয়ে উঠেছে । বিশেষ করে কাহারেরা"- উপকথার শুরু এই ভাবেই।

"বর্ষাকালে সবুজ মাটিকে বেড় দিয়ে পাহাড়িয়া কোপাইয়ের গিরিমাটি গোলা জল ভরা নদীর বাঁকটিকে দেখে মনে হয় , শ্যামলা মেয়ের গলার সোনার হাঁসুলী ; কার্ত্তিক- অগ্রহায়ণ মাসে জল যখন পরিষ্কার সাদা হয়ে আসে তখন মনে হয় রূপোর হাঁসুলী ।" "কোপাই নদী ঠিক যেন কাহার কন্যে।"

কোপাই নদী এবং হাঁসুলী বাঁকের প্রকৃতির সঙ্গে অন্ত্যজ শ্রেণীর কাহারদের এতটাই একাত্মতা। কাহারেরা তাদের প্রাচীন সংস্কার ও বিশ্বাস নিয়েই পড়ে আছে। এ জগৎ, আলাদা জগৎ। তাদের ঐতিহ্য, তাদের অন্ধবিশ্বাস, তাদের রীতি-নীতি-আদব-কায়দা, তাদের সংস্কার নিয়ে গড়া এই জগৎ ; যেখানে আধুনিক সভ্যতার আলোক এসে, পৌঁছোয়নি । এই আদিম পদ্ধতিতে জীবনধারণকারী অন্ত্যজ কাহার জীবনেও একদিন সভ্যতার আলো সে পৌঁছাল । সেই আলো যে এনে দিল, সে এই কাহারদেরই ছেলে করালী ।

তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায় হাঁসুলী বাঁকের কোলে গড়ে উঠা অন্ত্যজ শ্রেণীর কাহারদের জীবনধারায় স্বাভিকতা, বিশ্বাস, সংস্কারে গড়া মূল্যবোধ গুলিকে বিনষ্ট হতে দেখেছেন । কাহার জীবনের সেই দিকগুলো ধরে রেখেছিল কাহার সমাজের মাতব্বর বনোয়ারী । কিন্তু কালের রথচক্রতলে সব গুঁড়িয়ে গেছে - হেরে গেছে বনোয়ারী , তার প্রতিদ্বন্দ্বী ভবিষ্যতের মাতব্বর করালীর কাছে ।

হাসুলীবাঁকের উপকথা, কাহারদের জীবনকথা । সেই জীবন - মানুষ , প্রকৃতি, বিধির বিধান, আচার - বিচার , ধর্মসংস্কার দিয়ে গড়া । এই উপন্যাস উপকথা, না ইতিহাস সেই নিয়ে দ্বন্দ্ব আছে -

" ইহা ইতিহাস নহে , উপকথা । ইহার জীবন যাত্রা অতি প্রাকৃতের ঘন কুহেলিকামন্ডিত ; পৌরানিক কল্পনা , অলৌকিক সংস্কার ও বিশ্বাস , প্রাচীন কিংবদন্তী ও আখ্যান , সদ্য অতীতের ঘটনা প্রতিফলিত জীবন দর্শন - এ সমস্তই প্রাত্যহিক জীবনের রন্ধ্রেরন্ধ্রে, গভীর ভাবে অনুপ্রবিষ্ট। হাঁসুলী বাঁকের কাহারদের জীবন দর্শন অপরিবতর্নীয় ভাবে স্থিরীকৃত - কাহারদের জীবনে যাহা কিছু ব্যতিক্রম ও বিপর্যয় , যাহা কিছু আকস্মিক ও অসাধারণ সবই দেবলীলা, অদৃশ্য - শক্তির দুর্বোধ্য অভিপ্রায় হইতে উৎক্ষিপ্ত ।... অশীতিপর বৃদ্ধা সুচাঁদ এই দৈবশক্তির অধিকারিণী ও ব্যাখ্যাত্রী; হাঁসুলীবাঁকের জন্মবৃত্তান্ত, উহার অতীত কাহিনী, উহার কৈশোর ও প্রথম যৌবনের সমস্ত উদ্ভট কল্পনা ও অপ্রাকৃত অভিজ্ঞতা পারললৌকিক জগৎ হইতে অভ্যাগত প্রতিটি ধ্বনি ও স্পর্শ , দেবতার - রোষ ও প্রসাদের প্রতিটি নিদর্শন তাহার স্মৃতির ঐতিহাসিক আধারে অখন্ড সমগ্রতায় ও প্রথম অনুভূতির গাঢ় বর্ণলেপে অবিস্মরণীয়ভাবে রক্ষিত । সেই এই সম্প্রদায়ের Prophet বা অধ্যাত্মলোকের সহিত যোগাযোগ রক্ষার সেতু ।" [৫৬]

একথা ঠিক যে , হাঁসুলীবাঁকের ইতিহাস নয় , উপকথাই আলোচিত । সুচাঁদের গালগল্পের মধ্যে দিয়ে যে ইতিহাস ধরা পড়েছে , তাকে ইতিহাস বলা যায় না । সে ইতিহাস , উপকথার সংস্পর্শে সত্যতা হারিয়েছে । উপকথার উপর দিয়ে কাল প্রবাহ বয়ে গেছে - সেই কালের পরিবর্তনে, ইতিহাসের তরঙ্গাঘাত উপকথার কূলে কূলে ধাক্কা দিয়ে গেছে বাববার এবং উপকথাকে ভাসিয়ে নিয়ে গেছে ইতিহাসের স্রোতধারা।

"তারাশংকর এখানে অনিবার্য কাল চেতনার পরিচয় দিয়েছেন । দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধের সঙ্গে সঙ্গে এসেছে অনেক পাপ , ব্যভিচার, অন্যায়, তাতে সন্দেহ নেই । কিন্তু সেই সঙ্গেই এসেছে আধুনিককাল - শিল্পায়নের (ইনডাসস্ট্রিয়ালিজেশন) অনিবার্য প্রভাব পড়েছে বাংলার গ্রামে-গঞ্জে।

কৃষি নির্ভর গ্রাম সামাজ নির্ভর সংকীর্ণ গোষ্ঠী জীবন ভেঙে যাচ্ছে , দেখা দিচ্ছে আধুনিককাল যেখানে গোষ্ঠীর শাসনকে অগ্রাহ্য করে ব্যক্তি মাথা তুলে দাঁড়ায় , ভেঙে যায় পুরনো মূল্যবোধ , সমাজ সংহতি , প্রাচীনের প্রতি নিষ্ঠা ।" [৫৭]

আসলে কাহার জীবনে উপকথা ও ইতিহাস - দুটোই সত্য । অন্ত্যজ শ্রেণীর কাহারদের উপকথাময় নিস্তরঙ্গ জীবনে এসেছে , মহাকালের অমোঘ বার্তা । কালের পরিবর্তন তাদের জীবনে সৃষ্টি করেছে অভিঘাত । উপকথা ও ইতিহাসর সংঘাত- এর প্রভাব উপন্যাসটিতে ধরা পড়েছে বিভিন্নরূপে , অন্ত্যজ শ্রেণীর কাহারদের জীবনালেখ্য , তাদের জীবনের সংঘাত, জীবন ধারার পরিবর্তন , বিদ্রোহ , আত্ম সমর্পণ , জয়- পরাজয় , আশা- নৈরাশ্যের -পরিপ্রেক্ষিতেই উপন্যাসটিকে পর্যবেক্ষণ করে লেখকের চেতনা প্রবাহের মধ্য দিয়ে অন্ত্যজ শ্রেণীর মানুষদের অবস্থান সম্বন্ধে খতিয়ে দেখার চেষ্টা করা যাবে ।

উপকথার পটভূমি - ইতিহাস

'হাঁসুলীবাঁকের উপকথা' উপন্যাসে মূল আলোচ্য অন্ত্যজ শ্রেণীর কাহার সমাজের কথা । এই উপন্যাসে উপকথার ইতিহাসের তিনটি স্তর দেখা যায় –

ক) নীলকরদের যুগ ও কাহার সমাজ

অন্ত্যজ শ্রেণীর মানুষ কাহারকুলের অতীত বৃত্তান্ত -যার বেশীর ভাগটাই সুচাঁদের মুখে শোনা, আর কিছুটা চৌধুরীদের বাড়ীর পুরনো কাগজে নিদর্শন স্বরূপ বিদ্যমান। কিভাবে নীলকর সাহেবরা চলে গিয়ে সামন্ততান্ত্রিক সমাজ গড়ে উঠল, তার একটা ক্ষীণ ইতিহাস এখানে পাওয়া যায়। সুচাঁদকে এই পরিবর্তনের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ দ্রষ্টা হিসাবে ধরা যায়। সুচাঁদের গল্প বলার ভিত্তিতে সে কালের কিছু সংবাদ একালের কাহারেরা জানতে পারে চৌধুরীদের উইয়ে - খাওয়া কাগজের স্তুপের মধ্যে থেকে -

"গোটা বাঁশবাদি - মৌজাটাই ছিল পতিত ভূমি। এখানে কোন পুকুর ও ছিলনা, বসতি ও ছিলনা। জাঙল গ্রামে মোট মাট দশঘর বাস্তুর উল্লেখ পাওয়া যায়। সবাই তারা ছিল সদ্‌গোপ। ১২৫০ সালের কাগজে দেখা যায় এই নতুন জমা পত্তন - নীলকর শ্রীযুক্ত মেস্তর জেনকিন্স সাহেবের নামে। সেই জমার মধ্যেই সেই জাঙলের যাবতীয় পতিতভূমি, তার সঙ্গে গোটা বাঁশবাদি মৌজাটাই প্রায় অন্তর্ভুক্ত হয়ে গিয়েছে।...বাঁশবাদী মৌজা বন্দোবস্ত নিয়ে সাহেবরাই ওখানে পুকুর কাটায় এবং বাঁশবাদীর সমস্ত পতিতকে নীলচাষের জন্য হাঁসিল করে তোলে। সেই হাঁসিল করার জন্যই এই কাহার পাড়ার লোকেরা বাঁশবাদীতে আসে । এসেছিল অনেক লোক। তার মধ্যে এই কাহার ঘরই এখানে বসবাস করে কয়েক জন পেয়েছিল কুঠীবাড়ীর চাকরি, লাঠি নিয়ে ঘুরত, ফিরত, আবার দরকার মতো সাহেব মহাশয়দের ঘরদোরে কাজ করত, এজন্য তাদের জমি দেওয়া হয়েছিল এবংএখানকার প্রচলিত রীতি অনুযায়ী চব্বিশ ঘন্টার কাজের জন্য চাকরানভোগী হিসাবে খেতাব পেয়েছিল - অষ্টপ্রহরী বা আটপৌরে।" [৫৮]

কাহারেরা নীলকর সাহেবদের ডানহাত ছিল । সাহেবরা অসময়ে তাদের সাহায্য করত। সুচাঁদের কথায় সে কথা স্পষ্ট । নদীতে বান এসেছিল যখন কাহার পাড়া ডুবত , তখন তাদের ভেলায় করে নিয়ে যাওয়া হত কুঠিবাড়িতে, চাল- ডাল দিয়ে খিচড়ির ব্যবস্থাও করত । ঘর ভাঙলে খরচ দিত । 'কাহারেরা ছিল পাহাড়ের আড়ালে' । কুঠীতে ১৬ জন পালকি বেহারাকে ২৪ ঘন্টা হাজির থাকতে হত । সাহেবরা তাদের দশবিঘে জমি আর বাস্তুভিটে দিয়েছিল। তার মধ্যে দু-বিঘে, পাঁচ -বিঘে নীলের চাষ করতে হত । দাঙ্গার সময় অর্থাৎ কোন ও ভদ্দশুদ্দুরের জমিতে নীল বোনার সময় কাহারেরা সর্বতো ভাবে সাহায্যে করত । পাকাধান কেটে জমি তছনছ করে নীলচাষ করতে হত । ধান যে যা আনত , সে তাই পেত । তাছাড়াও ছিল বকশিশ ।

এই সময় থেকেই কাহারদের ঘরে রূপ বাসা বাঁধে। সুচাঁদ ফর্সা , তার মেয়ে বসন্ত খুব ফর্সা না হলেও বসন্তর মেয়ে পাখি 'হলুদমণি পাখি' । চৌধুরীদের অকাল মৃত ছেলের সঙ্গে পাখির মুখের আশ্চর্য মিল পায় কাহাররা।

কাহাররা সহেবদের আমলে দুভাগে ভাগ হয়েছিল - পরমেরা লাঠি নিয়ে আটপৌরে হয়েছিল আর বনওয়ারীরা পালকি কাঁধে নিয়ে কাহার হয়েছিল । বর্তমানে তারা চাষবাস করে । আর মাঝে মধ্যে এরা রায় বেশে নাচ নাচে আর ওরা পালকি বয় । সাহেবরা নায়েব ছিলেন চৌধুরী কর্তার বাবা। সুচাঁদের কথা মতো - এঁকেই কর্তাবাবা দয়া করেছিলেন। অবশ্য " চন্দন পুরের ভদ্রলোকেরা বলেও কথাটা নেহাতই কাহার -দের রচনা করা উপকথা । আসলকথা নীল কুঠি সব জায়গায় যেমন ভাবে উঠেছে- এখানেও তেমন ভাবে উঠেছে , তবে কোপাইয়ের বান আর কুঠি উঠা ঘটেছে ।[৫৯]

সাহেব কোম্পানীর সম্পত্তি জলের দামে পেয়েছিলেন চৌধুরীরা । এই হল হাঁসুলী বাঁকের ইতিহাস। কাহারেরা কিন্তু এই ইতিহাস মানে না । ইতিহাসের সঙ্গে বাবার মাহাত্ম্য যুক্ত করে যে কিংবদন্তী চলে আসছে - সুচাঁদের মুখে শোনা সেই উপকথায় বিশ্বাসী এরা বাবার মাহাত্ম্য কীর্তন করতে গিয়ে বুড়ী কোপাইয়ের পেলয় বানের গল্প বলে । সেই 'পেলয়' বানে যখন সাহেবদের নীল কুঠী ডুবে গিয়েছিল , সেই সময় সাহেব আর মেম গাছে আশ্রয় নিয়েছিল । চৌধুরীও আশ্রয় নিয়েছিল একটি গাছে । এমন সময় -

> " পঞ্চ শব্দের বাদ্যি বাজিয়ে নদীর বুক আলোয় আলোকীন্নী করে এক বিয়ে সাদীর নৌকোয় এসে লাগল হাঁসুলীবাঁকের দহের মাথায় ।" [৬০]

সাহেব দেখে জলে নামল কিন্তু সবাই কর্তার ছলনা । তিনি থান থেকে বেরিয়ে এলেন –

> "এই ন্যাড়ামাথা, ধবধব করছে রঙ গলায় রুদ্রাক্ষি , এই পৈতে , পরনে লাল কাপড় , পায়ে খড়ম । " [৬১]

তিনি সাহেবকে নিষেধ করেছিলেন নৌকা ধরতে কিন্তু সাহেব মানেননি । তাই সাহেব ও মেম 'ঘুরণচাকিতে' পাক খেয়ে তলিয়ে গেল । কর্তা চৌধুরীকে ডেকে সেই নৌকা সমর্পণ করলেন।

এই কাহিনী অংশে উপকথার সঙ্গে ক্ষীণ ইতিহাস মিশে রয়েছে । যার থেকে বোঝা যায় ইতিহাসের পটপরিবর্তন হাঁসুলী বাঁকের অন্ত্যজ শ্রেণীর মানুষের সমাজ জীবনেও ছাপ ফেলেছে।

অন্ত্যজ মানুষ চিরকালই শাসক সম্প্রদায়ের পায়ের তলায় পিষ্ট । তাই নীলকুঠির অবসানের পর-সামন্ত প্রভুর অধীনে তাদের বিপন্নতাবোধের ধরণ আলাদা। নীলকরের অত্যাচার অন্যরকম -'বামুন নাই , কায়েত নাই , সদ্‌গোপ নাই - সব এক হাল ।'

খ) সামন্ত তান্ত্রিক যুগ ও কাহার সমাজ

সামন্ত প্রভুদের পায়ের তলায় কাহারকুলের মাতব্বর বনোয়ারীর অবস্থান । রাজনীতির পালাবদলে সঙ্গে সঙ্গে অন্ত্যজ কাহারদেরও জীবন ধারায় পরিবর্তন সূচীত হয়েছে । যে বনোযারীদের বৃত্তি ছিল পালকি বওযা তারা এখন সামন্ততান্ত্রিক সমাজের সদগোপ প্রভুর অধীনে সামান্য প্রজা বনোযারী এখন পালকি বওযা ছেড়ে মেজকর্তার মোট বয় মাঝে মাঝে । সেই জন্য ইতিহাসে পট পরিবর্তন বা রাজনৈতিক পালাবদল - যাই বলি না কেন, কাহারদের জীবনযাত্রায় পরিবর্তন এসেছে । অবশ্য হাঁসুলী বাঁকের বছর ঘোরে কালারুদ্দুরের চরকপাটায় । কালের পরিবর্তন কিভাবে ঘটেছে ,সে জানে ' কোপাই বেটি ' আজ যেখানে 'দহ ' কাল সেখানে 'চর ' । কালের পরিবর্তনের কথা জানে বাবা ঠাকুরের শিমূল বৃক্ষটি । সে যেন অনেক কিছুর সাক্ষী । এমনই হয় অশিক্ষিত বর্বর মানুষের সময়ের হিসাব । যেমন ভাবে সাঁওতাল দোবরু পান্না বীরবর্দী ('আরন্যক' ঃ বিভুতিভুষণ বন্দ্যোপাধ্যায়) প্রাচীন বটবৃক্ষ দিয়ে তাদের বংসের প্রাচীনত্ব মেপেছিল । আসলে ইতিহাসও যেমন তাদের উপেক্ষা করে, সেই রকম তারা তাদের অশিক্ষা নিয়ে শিক্ষিত জনের লেখা ইতিহাসকে উপেক্ষা করে।

কোপাইয়ের 'মনন্তরার' বানে দেশ ডুবে গেল । অন্ত্যজ কাহাররা হয়ে পড়ল অনাথ। কেউ নিজের গ্রামে মরল, কেউ ভিন্ন গ্রামে মরল, কেউ বাঁচল । যারা বাঁচল তারা ফিরে এসে পথের ভিখারিতে পরিণত হল । চৌধুরীরা তাদের ভিটে জমি সবই দখল করল। শুধু দয়া করে ফিরিয়ে দিল তাদের ভিটে । অবশেষে মা 'দুগ্‌গা' ও 'কত্তা'র দয়ায় চৌধুরীরা তাদের বলল - 'চাষে বাসে খাটতে, কৃষেণ মান্দেরী করতে।' কিন্তু সদ্ গোপেরা কাহারদের প্রজা রাখতে নারাজ। যেহেতু তারা নীলকরের অধীনে নীলচাষ করেছে ; ধান কেটে নিয়ে গেছে ; কখনো চাষের কাজ করেনি। তবু চৌধুরীদের কথায় ছেলে ছোকরাদের রাখল রাখাল মাহিন্দার । তখন থেকে আট পৌরে পাড়ায় চোরের দল গড়ে উঠল । অন্ত্যজ কাহারেরা চাষ বাসে মন দিল । সেও এক অত্যাচারের কাহিনী । পুলিশি অত্যাচার গাঁয়ে কারোকে রেহাই দিত না । পরে ঘোষেরা তদ্বির করে থানায় থেকে নাম কাটিয়ে আনে । বনোয়ারীর বাবা অন্ত্যজ কাহারদের দিয়ে প্রতিজ্ঞা করিয়ে নেয় - তারা আর চুরি করবে না বনোয়ারী মাতব্বর হয়ে সেই প্রতিজ্ঞা রক্ষা করে চলেছে ।

বনোয়ারীর মনিব ঘোষেরা , বনোয়ারীর বাবার আমলে সাধারণ গৃহস্থ ছিল ।পিতৃ বিয়োগের পর ঘোষেদের দুঃস্থ অবস্থায় , বনোয়ারীর বাবা, মা তাদের সর্বতো ভাবে সাহায্যে করতেন । পরে চৌধুরীদের রমরমা অবস্থায় তারা চৌধুরীদের কাছ থেকে একটা জোত কেনেন । ঘোষ গিন্নি বনোয়ারীর বাবা তারিনীকে বড় ছেলের মতো মনে করতেন । তার আদেশে , সেই জমির ভাগ পেল

তারিনী। তখন থেকেই বনোয়ারীর বাড়িতে হাল বলদ । কিন্তু ঘোষ কর্তার মৃত্যুর পর বনোয়ারীর আর আগের মতো সম্মান নেই, সরাসরি বাড়ির মধ্যে প্রবেশাধিকার নেই ; বড় ঘোষকে উপদেশ দেওয়ার অধিকার নেই।

সামন্ততান্ত্রিক সমাজের প্রতিনিধি এখানে চৌধুরী এবং পরে ঘোষেরা । কাহার মাতব্বর বনোয়ারী এই সমাজতন্ত্রের অনুগত । সামন্ততান্ত্রিক সমাজে , গরীব প্রজাদের উপর জোরজুলুম ও অত্যাচারের কিছু দৃশ্য এখানে চোখে পড়ে। বনোয়ারীর পরিবারের সঙ্গে ঘোষবাড়ির সম্পর্ক ছিন্ন হয়েছে । বনোয়ারীর বাড়ির সাহায্য নিয়ে ঘোষদের একটা সময় কেটেছে । কিন্তু ঘোষদের বাড় বাড়ন্ত-এর দিনে-বনোয়ারীকে তারা হেনস্থা করে । এক সময়ের পালকিবাহক বনোয়ারীর মাঝে মধ্যে ডাক পড়ে , ঘোষবাড়ির মোট বইবার জন্য ।

প্রজাদের প্রতি সদ্‌গোপ প্রভুদের ব্যবহারও উল্লেখ করবার মত। রতনের মনিব হেঁদো মন্ডল , গালি দিয়ে ছাড়া কথা বলে না , অকথ্য অত্যচার করে , মানুষ বলে জ্ঞান করেনা । কিন্তু রতন মনিবের পক্ষ নিয়েই কথা বলে -যেহেতু বিপদের দিনে মনিবই রক্ষা কর্তা । তাই রতন , প্রহ্লাদ , পানুরা মনিবের মার মুখ বুঁজে সহ্য করতে অভ্যস্ত । এটাও অন্ত্যজ মানুষের এক ধরণের অসহায় আত্মসমর্পণ ।

তবে যুগ পরিবর্তনে সঙ্গে সঙ্গে সদ্‌গোপদের সঙ্গে অন্ত্যজ কাহার প্রজাদের সম্পর্কের ক্ষেত্রেও একটু পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায় - সুচাঁদের সঙ্গে হেঁদো মন্ডলের কথোপকথনের মধ্যে দিয়ে। অন্ত্যজ কাহারেদের মালিক সদ্‌গোপরা হুঁকোয় তামাক খেতে খেতে কৃষাণদেরও দেয় । সুচাঁদ কলকেটা নিয়ে পিছন ফিরে বসে । কাহারকুলের এই প্রাচীনা হেঁদো মন্ডলকে তেমন ভয় পায় না ; বরং গল্প জমাবার চেষ্টা করে - ' তোমরা আর কোদাল ধরবা না, লয় ?' সে মনে করিয়ে দেয় , হেঁদো মন্ডলের বাবা , নিজে কোদাল ধরে লম্বা বাঁকুড়ি কাটত । হেঁদো মন্ডলও এক সময় মাটি কেটেছে নিজের হাতে । 'ভূশন্ডীকাক ' সুচাঁদ সবই জানে । এ পরিবর্তন যে কাহারদেরও হয়েছে সে কথা হেঁদো মন্ডলও জানায় - কাহারেরা বর্তমানে আর মরা কুকুর ,বিড়াল ফেলে না,মরা গরু কাঁধে বয় না। নর্দমাও পরিষ্কার করে না বলেছে । বনোয়ারী জানিয়েছে - ' উহুঁ মুদ্দোফরাস মেথরের কাজ করব কেনে ? ' সুচাঁদের কথাও সত্যি ।

> " কিছুকাল অর্থাৎ বিশ - পঁচিশ বৎসর আগেও এই সব মন্ডল মহাশয়েরা পুরোপুরি চাষী ছিলেন । জমি কাটাইয়ের কাজ থেকে আরম্ভ ক'রে চাষের কাজ পর্যন্ত কৃষাণ মাহিন্দার এবং মজুরদের সঙ্গে নিজেরাও প্রত্যেক কাজটি করে যেতেন , তাতে অপমান বোধ করতেন না । এই বিশ - পঁচিশ বৎসরের মধ্যে এমন ওলট পালট হল যে , সদ্‌গোপ মহাশয়েরা এখন আধাবাবু হয়ে উঠেছেন ।"[৬২]

প্রবীন সুচাঁদ এই ধরণের পরিবর্তন সমর্থন করে না । তার প্রতিবাদ - 'বাপ, পিতামোর আমল থেকে করে আসছিল , করবি না কেনে...? ' প্রহ্লাদের কথাতে ও বনোয়ারীর কথার সমর্থন মেলে - ' জাঙলের সদ্‌গোপ মশায়রা পিরান গায়ে দিতে শিখলে , বামুনদের মরা কাঁধে করে গঙ্গা

তীরে নিয়ে যেত, তা ছাড়লে । আমরাই বা এসকল কম্ম করব কেনে ?" বনোয়ারী ও প্রহ্লাদের কণ্ঠে হালকা বিদ্রোহের সুর ।

পানুর কথায় প্রকাশ পায় , সদগোপরা কিভাবে কৃষাণদের ঠকিয়ে নেয় - তাদের ঋণ কোনদিন কমে না ; বরং বাড়তেই থাকে । এই শোষণের হাত থেকে রেহাই পেয়েছে করালী - সে চন্দনপুর 'অ্যাললাইন' - এর শ্রমিকের খাতায় নাম লিখিয়েছেন নগদ মাইনেতে খাটে । সে যখন সদম্ভে বলতে পারে - 'মারো ঝাড়ু চাষের মুখে ।'

কাহার মাতব্বর বনোয়ারী যখন পাপস্খলনের জন্য গাজনের কন্টকের পাটায় শোয়- তখন বাবাঠাকুরের কাছে তার অসহায় প্রার্থনা 'শিবো হে , আসছে জন্মে উচ্চকুলে জন্ম দিয়ো ।' শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যয়ের সৃষ্ট ' নয়ানছাতি ' 'রামায়ণ ' পাঠ করে পুণ্য অর্জন করতে পারে নি বলে - এই প্রার্থনাই জানিয়েছিল । নীচ কুল জাত সকল অন্ত্যজ মানুষেরই বোধ হয় এই প্রার্থনা !

এরা সকল অত্যাচার মুখ বুজে সহ্য করে - কুলমর্যাদা , শিক্ষা - সংস্কৃতি , ধনসম্পদ - এই সকল অধিকার থেকে বঞ্চিত মানুষ - এই সকল কিছুর অধিকারী ক্ষমতাবানদের কাছে নিজেদের বিকিয়ে বসে আছে । বনোয়ারীর আত্ম সমীক্ষায় অবগত হওয়া যায় - " আশ্চর্য করবি লক্ষ্মীমন্তকে, মা লক্ষ্মী মনিবের ঘরে ঢুকবেন , মনিবের উঠানে মায়ের পায়ের ধুলো , অবশ্যই পড়বে , তাই কুড়িয়ে মাথায় করে আনবি , তাতেই তোর ' সোও গুষ্ঠী'র প্যাট ভরবে ।" [৬৩]

চৌধুরীরা পতিত ডাঙাটা বিক্রি করলেন চন্দনপুরের বাবুদের । এই জমির ভাগ হল - কিছু জমি প্রজা বিলি , সেলামী আর খাজনা নেবেন । জাঙলের মোড়লরা সেসব জমি নেবেন যা পড়ে থাকবে - তার থেকে পাবে বনোয়ারীরা । তবে সন কড়ারী খাজনার শর্তে । " প্রথম দু'বছর বা তিন বছর খাজনা নেবেন না , তারপরে চলবে পুরো খাজনা । এগারো বছরের বছর জমি হবে জমিদারের । কারণ বারো বছর হলেই নাকি তার স্বত্ব হয় । এগারো বছরের পর আর একটা বন্দোবস্ত হবে আর দশ বছরের জন্য । " [৬৪]

পতিত জমিকে চাষের উপযুক্ত করে নিয়ে - পুরোপুরি দখল নেওয়া - প্রজারা চাষ করবে , খাজনা দেবে - জমিদারের সঙ্গে বনিয়ে থাকবে - কারুর কিছু বলার নেই এও প্রজাপীড়নের আর এক চিত্র ।

গ) ধনতন্ত্র ও কাহার সমাজ

ধনতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় সমাজ - কাঠামো বদলে যাচ্ছে। বড় বড় ব্যবসায়ীরা তাদের ব্যবসায়ীরা তাদের ব্যবসায়ের যন্ত্র বানাচ্ছে সাধারণ মানুষকে। কৃষক পরিণত হচ্ছে শ্রমিকে। মানুষের 'পেটের জ্বালাই এদের কলের স্টীম ' উৎপন্ন করছে । কাহার কুলেরই কুল ছাড়া , সৃষ্টি ছাড়া করালীচরণের মধ্যস্থতায় কাহার সমাজে এই পরিবর্তন সূচিত হচ্ছে । এর থেকে মোটামুটি একটা ধারণা করা যায় যে , হাঁসুলী বাঁকের ইতিহাসের অতীত কালের প্রতিনিধি সুচাঁদ, বর্তমান কালের প্রতিনিধি বনোওয়ারী ও ভবিষ্যতের প্রতিনিধি করালী। ধনতন্ত্রের আবির্ভাব গ্রামীণ কৃষি

ভিত্তিক সমাজের ওপর চরম আঘাত হানে । কাহার সমাজে আসে পরিবর্তন । এই পরিবর্তনের ধাক্কা এখানে করালী চরিত্রকে আশ্রয় করে , গ্রাম জীবনে ঢুকে পড়ে । নতুন মন্ত্রে দীক্ষিত করালী এই সব অত্যচারের প্রতিবাদ করতে চাই প্রকাশ্যে । সে নতুন যুগের কর্ণ ধার । সে যেমন প্রাচীন সংস্কারান্ধ অন্যায় নিয়মকে মানে না , তেমনি তাদের প্রভু শক্তির অন্যায় অপমানের প্রতিবাদ করে সে । সুতরাং, পুরাতন কাহার সমাজের প্রতিনিধি বনোয়ারীর সঙ্গে নতুন যুগের করালীর সংঘাত ঘটে । পুরাতন সমাজ -ব্যবস্থা , আচার- আচরণ , ধর্ম সংস্কার সব কিছুই বনোয়ারীদের টেনে রেখেছে পিছনের দিকে -তাই মাঝে মধ্যে তারা যখন কোন প্রতিবাদ করতে গেছে - তখন তা জোরাল হয়ে উঠতে পারেনি । অন্য দিকে করালী এই সংস্কার কেটে বেরিয়ে গেছে - নতুন সমাজ বন্ধনে । নতুন যুগকে সে গ্রহণ করতে পেরেছে । তাই তার প্রতিবাদ সে উচ্চকন্ঠে ঘোষণা করতে পেরেছে । প্রাচীন আর নবীনের এই সংঘাত গোটা উপন্যাস জুড়ে রয়েছে । এই সংঘাত কে ব্যাখা করা যায় বিভিন্ন ভাবেঃ

জীবন ও যন্ত্রের সংঘাত ।
পুরাতন ও নতুনের সংঘাত ।
পুরাতন সংস্কার ও আধুনিক বিজ্ঞানের সংঘাত ।
বিশ্বাস ও অবিশ্বাসের সংঘাত ।
ঐতিহ্যবাদ ও আধুনিক মননের সংঘাত ।
চিরাচরিত পুরাণ নির্ভর মানসিকতা ও আধুনিক
যুক্তিবাদী মানসিকতার সংঘাত ।
সামন্ততন্ত্র ও ধনতন্ত্রের সংঘাত ।
গ্রামীণ কৃষিনির্ভর সমাজ ব্যবস্থা ও শিল্প নির্ভর
সমাজের সংঘাত ।
জমিদার ও ব্যবসায়ীর সংঘাত ।

আবার " গ্রামীণ সমাজের শাসন সংস্কার ও মূল্যবোধের বিরুদ্ধে ব্যক্তির বিদ্রোহ "[৬৫]- এই সংঘাতকে যে ভাবে বা যে নামে দেখি না কেন - এর মূলে রয়েছে যুগ পরিবর্তনের অনিবার্য ফলাফল । এই সংঘাতের প্রতিনিধিত্ব করেছে এই উপন্যাসের দুই চরিত্র বনোয়ারী ও করালী । তাই 'হাঁসুলী বাঁকের উপকথা'র এক দিকে যেমন অন্ত্যজ কাহার সমাজের সুখ - দুঃখ, স্বার্থ- সংঘাত, বিশ্বাস-সংস্কারের ছবি, অন্যদিকে তেমনি রয়েছে - আধুনিক যুক্তিবাদ , শিল্পায়ণ, যন্ত্রনির্ভর অবিশ্বাসী মানসিকতা । আর সব কিছুর উপরে আছে প্রাকৃতিক বিপর্যয় । উপন্যাসের শুরুতে আছে বন্যা, যে বন্যা নীলকরদের কুঠীবাড়ি ভাসিয়ে নিয়ে গেছে । উপককথার শেষেও বন্যার বিবরণ । অন্ত্যজ সম্প্রদায় কাহার জীবনের উপর দিয়ে পরিবর্তনের স্রোত - বন্যা জলস্রোতের মত - পুরাতন সব কিছু যেন ভাসিয়ে নিয়ে গেছে । তাই কাহার- জীবন ধারা নিস্তরঙ্গ থাকেনি ঘাত-প্রতিঘাত চলেছে

সমানেই । সুচাঁদের পূর্ববর্তী সময় থেকে সুচাঁদের সময়কে বাদ দিলে , বাকী সময়ের দুই প্রতিনিধি চরিত্র বনোয়ারী এবং করালী । ধনতন্ত্র আসার ফলে গ্রাম জীবনে যে পরিবর্তন সূচিত হয়েছে, সেই সংঘাতই গোটা উপন্যাস জুড়ে রয়েছে । অন্ত্যজ জীবনে এই সংঘাতের চিত্র গুলি পর্যালোচনা করব।

প্রাচীন সংস্কারে ঃ বিদ্রোহ ও আঘাত

'হাঁসুলী বাঁকের উপকথা' শুরু ঘন জঙ্গলের মধ্যে ' শিস' দেওার শব্দ দিয়ে - যে শিসের শব্দ অন্ত্যজ কাহার সকাজে বিভীষিকার সৃষ্টি করেছে । কেউ ভাবছে ' দেবতা ', কেউ ভাবছে 'যক্ষ', কেউ ভাবছে 'রক্ষ' , কেউ ভাবছে কর্তার ক্রোধ , কিন্তু করালী ভাবছে অন্য কথা । তাই কালুয়া কুকুর আর উট নিয়ে সে বেরিয়ে পড়েছে - শব্দ অনুসরণ করে । কালুয়া কুকুরের বীভৎস মৃত্যু , কাহার কুলের বিভীষিকা আরো বাড়িয়ে দিয়েছে । কিন্তু করালী দমবার পাত্র নয় । সে যুক্তি ও বুদ্ধি দিয়ে যাঁচাই করতে চাই ; বিশেষ করে এই শিসের শব্দের সঙ্গে পরিচিত। রেল লাইনের কাজ করতে গিয়ে সেখানে সাহেব - এমনই এক শিস্ শুনে একটা চন্দ্রবোড়া মেরেছে ।

বাঁশবাদীর দক্ষিণ মাথায় জঙ্গলের মধ্যে কাহারদের কর্তার ক্রোধ একদিন আগুন জ্বালিয়ে দিল । ধোঁয়া লক্ষ্য করে সেখানে গিয়ে বনোয়ারী আবিস্কার করল ' ডাকাবুকো' করালীকে । কর্তার ক্রোধ নয়, করালী 'কেরোচিন ত্যাল ' ঢেলে বাঁশপাতার স্তুপে আগুন লাগিয়ে নির্ভয়ে বুক চিতিয়ে দাঁড়িয়ে আছে । বনোয়ারীর ভয়ংকর মূর্তি দেখার অবকাশ তার নেই ; সে গ্রাহ্য ও করে না । বরং ইশারা করে দেখাল - বাঁশগাছের ডগায় প্রকান্ড চন্দ্রবোড়াটিকে । বনোয়ারী তখন ক্রোধে উন্মাদ । ঝাঁপিয়ে পড়ল সে করালীর উপর । শুরু হল প্রাচীন ও নবীনের সংঘর্ষ । করালীর শক্তির কাছে - পরাজয় ঘটল বনোয়ারীর । সেই মুহূর্তে চন্দ্রবড়োটি বাশেঁর ডগা থেকে পড়ল আগুনে ; ছটফট করতে করতে পেট কেটে বেড়িয়ে পড়ল একটা বুনো শুয়োরের বাচ্চা - যার চিৎকার গতদিন কাহার পাড়াকে কোন অপ্রাকৃত সম্ভাবনার অতঙ্কে আতঙ্কিত করেছিল ।

বিস্ময়ে হতবাক বনোয়ারী করালীর শক্তি ও বুদ্ধির তারিফ না করে পারেনি । করালীও সকলকে ডেকে বলেছে - 'দেখে যা তোদের কত্তা পুড়ছে ' । আর বনোয়ারীকে বলছে ' মুরুব্বি , কত্তার পূজোটা সব আমাকে দিয়োগো ।' করালীর এই উদ্ধত বাক্য বনোয়ারীর প্রাচীন সংস্কারাচ্ছন্ন মনে আঘাত হেনেছে । গোটা কাহার পাড়া স্তব্ধ হয়ে গেছে - করালীর সাহস , স্পর্ধা এবং উদ্ধতবাক্য শুনে । বনোয়ারী স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে থেকেছে -

"নোড়ার কাজের জন্য কুড়িয়ে আনা নুড়িটাকে আলোর ছটায় জ্বলতে দেখে মানুষ যেমন ভাবে সবিস্ময়ে সাগ্রহে সসম্ভ্রমে তাকে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখে, তেমনি ভাবে দেখলো তাকে বনোয়ারী।"[৬৬]

করালী যখন সাপটাকে নিয়ে , পাঁচজনকে দেখাতে চায় - তখন সমাজ আপত্তি তুললে ও বনোয়ারী অরাজি হয়নি । কারণ ,করালী তার বুদ্ধি ও সাহসিকতার যোগ্য অভিনন্দন লাভ করতেই পারে । মাতব্বরের ঐ ঔদার্য্যে করালীও তার প্রশংসা না করে পারেনি । অভিভূত বনোয়ারী আক্ষেপের সঙ্গে বলে উঠেছে -' তুতো মানিস না রে মুরুব্বি বলে ' । জবাব দেয় করালী -মানি গো

খুব মানি , মনে মনে মানি' । করালী কাহারদের নিয়ম লঙ্ঘন করে মৃত সাপটি তার বাড়িতে নিয়ে যায় - যেটা নিয়ে যাওয়া উচিত ছিল , বনোযারীর খামারে । তার এই স্পর্ধায় বনোযারী অবাক হয় না , বরং তার ছেলে মানুষীকে সমর্থন করে - ' করালীর পিঠে কয়েকটা আদরের চাপড় মেরে বললে-হ্যাঁ বীর বেটাছেলে বটিস তুই ।'

কিন্তু উপকথার সাক্ষী সুঁচাদ বুড়ি, পুরানো সংস্কার নিয়ে টেনে রেখেছে বনোয়ারীকে। কত কালের ব্রতকথায় সেই নিঃসন্তান বুড়ি - ' কাদি কাদি মন করছে , কেঁদে না আত্মি মিটছে, মহাবনে হাতি মরেছে , যাই ,তার গলা ধরে কেঁদে আসি ।' হঠাৎ সাপটির জন্য তার দরদ উথলে উঠল । কারণ, বিশ্বাস - সাপটি কর্তার বাহন - কাহার কুলে ও অবিশ্বাসের কিছু রইল না । হাহাকারের মাঝে করালীর বীরত্ব ধূলিস্মাৎ হতে বসে - তাই সে চায় চন্দন পুর থেকে ছোট সাহেবকে ডেকে আনতে সংঘর্ষ থেমে গেল মেজঘোষের আবির্ভাবে ।

মেজ ঘোষকে দেখে করালীর চোখ জ্বলে উঠে। ছেলেবেলার অপমান, মায়ের কলঙ্ক, মা হারানোর বেদনা তাকে চন্দনপুর যেতে বাধ্য করেছে । মেজঘোষকে সম্ভ্রম না দেখালেও- মাথা উচুঁ করতে পারে না সে , প্রতিবাদ তো দূরের কথা - কথা আটকে যায় । - কারণ অতীতে অপমান, বিনা দোষে চোর অপবাদ , জুতার মার - দুঃসহ বেদনার মত টনটন করে উঠে । বিদ্রোহী করালী তার সাহস , বিক্রম কোথায় হারিয়ে ফেলে ! উচ্চবিত্তের অহমিকার কাছে পরাস্ত হয় সে । যার পাশে আছে চন্দনপুরের সাহেবরা , যে কাহার মাতব্বরকে পরোয়া করেনা - সে এমন শামুকের মত গুটিয়ে যায় কেন ! শোষকের দম্ভের কাছে এখানেই অন্ত্যজ শ্রেণীর মানুষের নতিস্বীকার , হয়তো জন্মগত অনগ্রসরতার কারণেই ! বিনা অপরাধে শাস্তি পেয়েও , মাথা নিচু করতে হয়েছে করালীকে। অথচ অত্যাচারীর দম্ভ প্রকাশ পেয়েছে ।

করালীর চন্দনপুর যাওয়ার বাধা পড়ে । সুচাঁদ পিসীর ব্যাখ্যা শুনে বনোয়ারীর মানসিক পরিবর্তন ঘটতে সময় লাগেনি । প্রাচীন সংস্কারান্ধতা কোন যুক্তির ধার ধারেনা । তাই তারিফ এবং বকশিশ তো দূরের কথা - সে যে অপরাধ করেছে , তার প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে । এটাই 'বিধির বিধান' ; লাগল সংঘাত ।

বাবার বাহনকে হত্যা সামান্য অপরাধ নয়। কাহার পাড়ার কল্যাণ কামানয় - বাবার স্থানে পূজা হয় । করালীর ধমনীতে বইছে কাহার-রক্ত । তাই কিছু সংস্কার থাকা অস্বাভাবিক নয় । তিনটে হাঁস নিয়ে চলে আসে বাবার থানে ,বলি দিতে সকলের সামনে নাকে খত না দিলে বলি গ্রাহ্য হবে না। বিদ্রোহী করালী বলে ওঠে ,- ' এই করলে তবে লেবে আমার হাঁস ?' মুহূর্তের মধ্যে হাঁস তিনটির মুন্ডু ছিঁড়ে বলে ওঠে - ' কত্তা খাবে তো খাও , না খাবে তো খেয়ো না, যা মন চায় তাই কর। আমাদের হাঁস খাওয়া নিয়ে কথা , আমাদের বলিদান হয়ে গেল ।' কাহার কুলে অশুভ ক্ষণে জন্ম করালীর । তাই কাহারদের সঙ্গে তার মতের মিল নেই । কাহারদের সম্বন্ধে মেজঘোষের উক্তি, অত্যুক্তি নয় - ' অন্ধ জাগো । না , কি বা রাত্রী কি বা দিন । সেই এক কালই চলেছে রে তোদের ।' করালীর স্পর্ধা বনোয়ারীর কাছে অসহ্য । চৌকিদার করালীর সাহস ও বুদ্ধির প্রশংসা করে , তার

প্রাপ্য পাঁচ টাকা বকশিশের কথা জানিয়ে দেয় । এখানেও বুঝি করালীর জয় ।

কাহার সংস্কৃতিতে পরিবর্তনের সূচনা

করালী , কাহারদের ধর্ম সংস্কারের আঘাত হেনেছে , সংস্কৃতিতে এনেছে পরিবর্তন । শোষকের অন্যায়ের প্রতিবাদ করছে সে ।

উপকথায় , ইতিহাসে যুগান্তকারী পরিবর্তন ঘটতে চলেছে । কাহার সংস্কৃতিতেও পরিবর্তন এনেছে । করালী- পাখীর সঙ্গে 'সাঙা ' এমনই পরিবর্তন সূচিত করল । ' কাহার পাড়ার উপকথায় বরের সাজ সজ্জায় -করালী কলিযুগ এনেছে । ' প্রবীনদের মতে 'এতটা ভাল নয় ' । বনোয়ারীও এর কোন বিহিত করেনি - সম্ভবত , কালোশশী ঘটিত দুর্বলতার জন্য বরং নয়ানের ঘর ভেঙে করালীর ঘর বসানোর জন্য , সে সমালোচিত হয়েছে । তবে সুচাঁদের আক্ষেপ আর নয়ানের মায়ের গালি গালাজ শুনে , তার মনে হয় - করালী কর্তার বাহনটিকে মেরে অন্যায় করেছে - আর তখনই তার হয়ে কর্তার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করে কিন্তু শাস্তি দিতে পারেনা । করালীর প্রতি এই সমর্থনে আবার - অপরাধবোধ ও জাগে মনে - চলে যায় বাবা ঠাকুরের থানে । অদ্ভুত প্রক্রিয়ায় সে বুঝতে পারে , কর্তা তার উপর ক্রুদ্ধ হননি । নিশ্চিন্ত মনে বিয়ের আসরে এসে দেখে , সেকালের বুড়ি সুচাঁদ , একালের বিয়ের আসর জমিয়েছে ।

হাঁসুলী বাঁকের রাত্রি নামে গভীর অন্ধকার নিয়ে ; যেন রূপকথার জিন-পরী-ভূত-প্রেতের অলৌলিক জগৎ - " বাঁশবনে পাতা উড়িয়ে নেচে বেড়ায় 'বা - বাউলী' অর্থাৎ অপদেবতা। নদীর ধারে ধারে 'দপদপিয়ে' অর্থাৎ দপ দপ করে জ্বলে বেড়ায় - 'পেত্যা' অর্থাৎ আলেয়া । মধ্যে মধ্যে শাঁকচুন্নির মত ডাক শোনা যায় - শ্যাওড়া-শিমূলের মাথা থেকে । বাঁশবনে ক্যাঁ - ক্যাক ক্যাঁ - ক্যাক ডাক ওঠে। কাহারেরা মনশচক্ষে স্পষ্ট দেখতে পায় - গেছো পেত্নী কি কোন ও ছোকরা ভূত বাঁশের ডগাটা একবার মাটিতে ঠেকাচ্ছ , আবার ছেড়ে দিচ্ছে সেটা ওঠে যাচ্ছে সোজা ওপরে । সেটা ওদের খেলা ।" [৬৭]

করালীর বিয়েতে বাঁশবনের অন্ধকার হার মানল ঘুঁটে-কেরোসিনের আলোর ছটায় । হার মানল অপদেবতারা ।

সংস্কার প্রবণ কাহারদের অপদেবতার বিশ্বাস থাকবে , সঙ্গত কারণেই । বনোয়ারীর ধারণা কালবৌ বটগাছে বাসা বেধেছে এবং ঘূর্ণী ঝড়ের রূপ ধরে বনোয়ারীকে আমন্ত্রণ জানিয়েছে । এই ধরণের সংস্কার (বিশেষ করে গ্রাম্য পরিবেশে) মানুষের মনে ছিল। এই প্রসঙ্গে লেখকের ব্যক্তিগত নানা অভিজ্ঞতার কথা তাঁর আত্ম জীবনীগুলিতে পাওয়া যায় ।

" এত ভূতের সন্ধান ও জানতেন পিসীমা । কোথায় আছে ব্রহ্মদৈত্য , কোথায় আছে গলায় দড়ে , কোথায় আছে গলসে ভূত , কোথায় পেত্যা অর্থাৎ আলেয়া , কোথায় গো-ভূত - সব সন্ধান আমাকে জানিয়ে ছিলেন ।" [৬৮]

আর এক জায়গায় বলছেন, "আমাদের বাড়ির গলিতে বাড়ি থেকে বৈঠকখানা ও সদর

রাস্তায় যাবার পথে জ্যাঠামশায়দের ডুমুর গাছে ভূত ছিল , শিউলি গাছে ব্রাহ্মণ পেত ছিল। এই গলি পথ নিচের দিকে ছিল সর্প সঙ্কুল - অন্য দিকে মাথার উপরটা ভূত - অধ্যুষিত। সে কি বিপদ শিশুর পক্ষে।" [৬৯]

এই সংস্কার গ্রাম্য মানুষের মনে বাসা বেঁধেছিল । সুতরাং শিক্ষিত কাহারদের মধ্যে এই সংস্কার খুব স্বাভাবিক ভাবেই প্রতিফলিত হতে দেখা দেয় । সুচাঁদের মুখে শোনা যায় - ' হাঁসুলী বাঁকের সেকালের ভৌতিক লোকের ইতিকথা ।'

কিন্তু আধুনিক যুগে এসে সব কিছুতেই পরিবর্তন এনেছে । এই যুগ পরিবর্তনের ফলে অন্ত্যজ কাহার কুলের প্রাচীনা সুচাঁদও যেন সন্দিহান হয়ে ওঠে । তার বিশ্বাস কিছু কমেনি কিন্তু এ যুগের মানুষের মনে যে সন্দেহ ঘনীভূত - তা সুচাঁদের বক্তব্যে প্রমাণিত - মানুষের আধ্যাত্মিক জীবনের মত এতেও যেন পরিবর্তন ঘটেছে । '...এখন ভূত হলে চন্দন পুরের ছোকরাবাবুরা বন্দুক নিয়ে পাহারা দিয়ে পরীক্ষে করে দেখতে আসবে।'

'করালী' ঃ বিদ্রোহী সত্তার জাগরণ

বনোয়ারী করালীকে নিজের মাতব্বরীর আওতায় কোলগত করে রাখতে চেয়েছে । কিন্তু চন্দন পুরের কারখানার ছোঁয়াচ লেগেছে করালীর গায়ে । তাই সংঘর্ষ বাধে করালী ও বনোয়ারীর মধ্যে । করালী জানায় , কোম্পানীর আইনের কথা - যে আইনের সঙ্গে করালী ও বনোয়ারীর মধ্যে। করালী জানায় , কোম্পানীর আইনের কথা - যে আইনের সঙ্গে কাহার পাড়ার মাতব্বরের আইন মেলে না ।

করালীর মধ্যে এক বিদ্রোহী সত্তা মাঝে মধ্যে বনোয়ারীকে অভিভূত করে। যে দিন বৃষ্টিতে গুড় নষ্ট হবে বলে, রেল কোম্পানীর ত্রিপল এনে ঢেকে দিয়েছিল করালী, সেদিন ত্রিপলের জামা - পরা করালী শুধু তাদের ত্রাতা হয়ে আসেনি - তাকে দেখে সাহেবের মতো মনে হয়েছে, কাহারদের। কিন্তু অবাক হওয়ার তখনো বাকি ছিল । হেঁদো মন্ডল যখন করালীর বাহাদুরীর তারিফ করে বলে ওঠে - 'তা বাহাদুর বলতে হবে বেটাকে-হ্যাঁ, বেটা খুব বাহাদুর' ভুরু কুঁচকে ওঠে করালীর, মাইত ঘোষকে যে কথা মুখ ফুটে বলতে পারেনি , সেকথা হেঁদো মন্ডলকে বলতে তার এতটুকু বিলম্ব হয় না - '...উকি? বেটা বেটা বলছেন কেনে? ভদ্দলোকের উকি কথা !' বিস্মিত হেঁদো মন্ডল চেয়ে থাকে করালীর দিকে । সে বুঝতে পারে না, অন্যায়টা সে কি করেছে । সে বনোয়ারীর কাছে , এর উত্তর চায় কিন্তু তার আগেই করালী বলে উঠে - ' মুরুব্বীর কাছে উ সবতো অন্যায় লাগবে না , উ সব ওদের গা - সওয়া হয়ে যেয়েছে।' সে ঘোষণা করতে চলে যায় - " বেটা শালা হারমজাদা গুখোর বেটা লেগেই আছে- ভদ্দরলোকের মুখে লেগেই আছে । ভদ্দলোক মাথা কিনেছে । অঃ -" "ভদ্দলোকের বিরুদ্ধে ছোট লোকদের এই প্রথম স্পষ্ট প্রতিবাদ।"[৭০]

পায়ের তলায় মানুষ গুলির হয়ে জেহাদ ঘোষণা করেছে করালী । লেখক তার এই যুগের নায়কের মুখ দিয়ে এই কথা বলিয়াছেন , যে কথা অন্ত্যজ কাহার সমাজের টনক নাড়িয়েছে ।

বনোয়ারীও মানতে বাধ্য হয়েছে যে - "বেটা ফেটা কথা গুলি খারাপ বটে ।"

জংশনে হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গায় সামিল হয় করালী । কোন মুসলমান খালাসী হিন্দু কামিনকে অপমান করলে , প্রতিবাদ করে সে । এই ঘটনা জানতে পেরে বিস্ময়ে অভিভূত হয় বনোয়ারী । তারা এতকাল মুসলমানদের সম্মান করে এসেছে - যেহেতু ওরা শেখ, পাঠান । করালীর সাহস দেখে তার মনে হয়েছে , করালী যদি তার নিজের সন্তান হত ! সে দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলেছে - এই সম্ভাবনাময় কাহার যুবককে ঠিক পথে চালনা করতে হবে । কিন্তু - " ঘি দিয়ে ভাজ নিমের পাত , নিম না ছাড়েন আপন জাত ।" [৭১]

তাই প্রাচীনের সঙ্গে নবীনের সংঘর্ষ বাধে নানা কারণে । সংঘর্ষ বাধে করালীর পাকাবাড়ি তোলা নিয়ে । কাহার পাড়ায় কেউ কখনো কোঠাঘর তোলেনি -" যা পিতি পুরুষে করে না , তা করতে নাই । সয়না । সহ্য হয় না । মানুষ মরে যায় ।"[৭২]

করালীর কোঠাঘর করা নিয়ে দেখা দেয় সমস্যা । অন্ত্যজ কাহারদের চোখে করালীর সাজ সজ্জা ও সাহস বেড়ে চলেছে । সে 'কোট পেন্টুলেন ' পড়ে বেড়ায় । সে কোনও নিয়ম মানে না। সে যুদ্ধের চাকরি নিয়েছে , যুদ্ধের পোষাক পরেছে । তার পায়ে জুতো । সে এখন দিন মজুর নয় ; মাস মাইনের চাকরি করে সে । তাই বনোয়ারীর শাসন উপেক্ষা করে করালী কোঠাঘর তুলেছে। থানায় নালিশ জানাতে গিয়ে নতুন নিয়মের কথা জেনেছে বনোয়ারী ; জমাদারবাবুর কাছে অপদস্ত হয়েছে সে । করালী যখন জানতে পারে , ক্ষতি পূরণের নাম করে মাতব্বরকে ঠকিয়ে নেওয়া হয়েছে - তখন সে ঘোষণা করে যে , প্রয়োজনে স্বদেশী বাবুর কাছে গিয়ে সে দারোগার বিরুদ্ধে নালিশ জানাতে পারে ।

অন্ত্যজ শ্রেণীর মানুষের এই সচেতনতা করালীর মধ্যে লক্ষণীয় , একদিকে যেমন সে অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেছে , অন্যদিকে তেমনী প্রাচীন রক্ষণশীল সমাজকে ভেঙ্গে দিতে চেয়েছে । " ঘর করাটা আসলে করালীর জেদ । কোঠাবাড়ি তোলা হল , চির কালের নিয়ম ভেঙে দেওয়া হল , শেষ হয়ে গেল আগ্রহ । বাড়ি পড়ে থাকল , করালী বাস করতে গেল চন্দনপুরে রেলের ঘরে । " [৭৩]

কিন্তু অন্ত্যজ কাহার সমাজের যুক্তি অনুযায়ী , কালাবৌ-এর মৃত্যুর কারণ হয়ে রইল, করালীর কোঠাঘর তোলা। অজ্ঞান কাহারদের কর্তাবাবা মার্জনা করলেও , পিত- পুরুষের নিষেধ না শুনলে - তার ক্ষমা নেই । বিশেষতঃ চন্দন পুরের কারখানা , কাহারদের কাছে বিলেত । তাই বিলেত থেকে আসা করালী তাদের কাছে ভিন্ন দেশী মানুষ । করালীর সঙ্গে সংঘাত বাধল - বাবাঠাকুরের শিমূল বৃক্ষে উঠা নিয়ে । চন্দন পুরের তারে খবর পেয়ে ঝড়ের সংবাদ শুনিয়ে সমস্ত কাহার পাড়াকে সাবধান করে দিতে করালী উঠে ছিল শিমূল গাছে । এ অপরাধ ক্ষমার যোগ্য নয় । পরের ঘটনাটি, করালীর এই অপরাধকে প্রমাণ করে । ঝড়ে করালীর ঘরের চাল উড়ে যায়। কাহারদের বিবেচনায় - এ হল বাবা ঠাকুরের প্রতিশোধ গ্রহণ।

সমাজ বিবর্তনঃ প্রবীন-নবীনের প্রেক্ষিতে অসহায় বনোয়ারী

বনোয়ারীর সঙ্গে করালীর যতবারই সংঘর্ষ ঘটেছে, বনোয়ারী তার মধ্য দিয়ে বুঝেছে - করালীর শক্তি, বুদ্ধি ও সাহস আছে। সে তারিফ না করে পারে নি । অত্যাচারী সম্প্রদায়ের কথায় প্রতিবাদ জানাল, মেজো ঘোষের কাছে মাথা নত না করা - করালীর এই উদ্ধত আচরণকে বনোয়ারী মনে মনে সমর্থন করেছে বলেই সুচাঁদ বার বার তাকে পিছন দিকে টেনে এনেছে। বনোয়ারীও এই কুসংস্কারাচ্ছন্ন কাহার সমাজের মাতব্বর । কিন্তু দুজনের মধ্যে সূক্ষ্ম প্রভেদ আছে ।

" সুচাঁদ যে কাহার সমাজের ঐতিহ্য রক্ষক ও আধি দৈবিক বিপদের সংকেতবাহী , মাতব্বর বনোয়রী তাহার দৈনন্দিন জীবন যাত্রার পরিচালক ও ঐহিক ও পারত্রিক কল্যাণ সাধনের হোতা । সুচাঁদের দৃষ্টি অতীত পরাবৃত্ত ও উর্দ্ধলোক নিবিষ্ঠ- বর্তমান তাহার নিকট জীবন ধারণের কালাধার হইলেও তাহার মানসলোকে ইহা গৌণ। ঠিক অতীতের ছাঁদে বর্তমান ঢালা হইতেছে কিনা ও কালারুদ্র ও কর্তাবাবার ইঙ্গিত ঠিক মতো ইহার মধ্যে অনুসৃত হইতেছে কিনা, সেদিকে তাহার অতন্দ্র তীক্ষ্ম দৃষ্টি। বনোয়ারীর সহিত তাহার সামাজিক মতানৈক্য ঘটিলেও উভয়ের মধ্যে একটি নিবিড় আত্মিক সংযোগ আছে। বনোয়ারীর মনোযোগ বর্তমান ও অতীতের ঐতিহ্য সুখ-সচ্ছলতা ও চিরাচরিত , দেব নির্দিষ্ট নীতি - অনুসরণের মধ্যে তুল্যরূপে বিভক্ত । সে সুচাঁদের মত সর্বদা অতীত স্মৃতি রোমন্থনে বিভোর নয়। কিন্তু ঐতিহ্য শাসনের প্রতি তাহার অনুল্লঙ্ঘনীয় আনুগত্য। যে মুহূর্তে তাহার প্রতীতি বা সন্দেহ জন্মিয়াছে যে , বর্তমানের কর্মধারা অতীত চক্র চিহ্নিত পথ হইতে লেশমাত্র বিচ্যুত হইয়াছে ; অমনি সে গতিশীল রথের রাশ টানিয়া উহার মোর ফিরাইয়াছে।"[৭৪]

সুচাঁদ কোন অবস্থাতেই নতুন ভাবধারার সঙ্গে মানিয়ে নিতে পারে নি । (যদিও পরবর্তীকালে অবস্থার ফেরে করালীকেই আশ্রয় করতে হয়েছে) অন্যদিকে বনোয়ারী করালীর নিত্য নতুন কাজের তারিফ করেছে - যেহেতু সেই কাজগুলির দ্বারা কাহারেরা উপকৃত। দুটি উদাহারণ দিলে বিষয়টি পরিস্কার হতে পারে-

এক, চন্দ্রবোড়া সাপটিকে মারবার পর বনোয়ারী করালীর বুদ্ধি ও সাহসের তারিফ করেছে। মনে মনে বুঝেছে , তারা এতদিন বৃথাই ভয় পেয়েছিল এবং এতে কাহারেরা উপকৃত । কিন্তু সুচাঁদ এই ঘটনার পরিনামে ডুকরে কেঁদে উঠেছে এবং সঙ্গে সঙ্গে বিধান দিয়েছে - সাপটি ছিল বাবার বাহন এবং তার শিস ছিল সাবধান বাণী । তাকে হত্যা করার অর্থ মহাপাপ -সেই মহাপাপে পাপী করালী ।তাই তাকে প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে । এই কথা শোনবার পর , বনোয়ারীর চোখ খুলেছে। সমস্ত যুক্তি তর্ক তার মন থেকে মুহূর্তে মুছে গিয়ে , প্রাচীন সংস্কার তার মনকে আচ্ছন্ন করেছে ।

দুই , করালীর পূর্বেব যে কাহার মনের পরিবর্তন ঘটেনি এমন নয় । আগে কাহারেরা মুদ্দফরাসের কাজ করত , কিন্তু বনোয়ারী তা বন্ধ করেছে । সুচাঁদ কিন্তু এ ব্যাপারে , বনোয়ারীর সমালোচনা করেছে । কাহার সমাজে প্রচলিত , পিতৃপুরুষ যা করে গেছেন , বা বলে গেছেন - তা মেনে চলা । তার অন্যথা হলে সর্বনাশ ! সুচাঁদ তা মেনে চলে কিন্তু বনোয়ারী মাঝে মাঝে সংস্কার কেটে বেরিয়ে আসে , নিজের অজান্তে । তাই সে করালীকে অনেক স্থলে সমর্থন করে ।

বনোয়ারী পড়েছে নবীন ও প্রবীনের মধ্যে। দুজনের টানাপোড়েনে নবীনকে ক্ষমা করে প্রবীনের দিকেই ঝুঁকেছে। কারণ সেই দিকেই তার পাল্লা ভারী। পুরোপুরি সংস্কার কেটে করালী হয়ে ওঠার মানসিকতা তার নয় ; বরং পিতৃপুরুষের সংস্কার - ঐতিহ্যকে ধরে রাখতে চায়।

নিজের পাপস্খলনের জন্য সে কালারুদ্রের প্রধান ভক্ত হতে চেয়েছে। সে সুচাঁদ পিসির কাছে শুনেছে - চিরকাল নীচ জাতের লোকই কালারুদ্রের প্রধান ভক্ত হয় । আদ্যিকালের বান গোঁসাইয়ের আমল থেকে চলে আসছে এই রীতি। ইনি ছিলেন বাবার ভক্ত ছেট জাতের রাজা।

সমাজ - সংস্কৃতির বিবর্তন - ঔপন্যাসিকের সংশয়

যুগের পরিবর্তন এই আদিম সমাজ জীবনে গভীর প্রভাব ফেলেছে । কাহারদের বিশ্বাস সংস্কার - ঐতিহ্য - সংস্কৃতি এই মূল্যবোধ গুলো যখন ভেঙে যাচ্ছে , তখন তা ভালই হোক আর মন্দই হোক - চরিত্রটি করুণ। নতুন যুগের স্পর্শে যখন সেই আদিম কাহার সমাজ নৃশংসভাবে ধ্বংশ হতে চলেছে , তখন সেই পুরনো দিনের জন্য লেখকের মন কেঁদেছে। আবার নতুন যুগ যে সমাগত, তাকে না মেনেও পারছেন না অথচ প্রাচীন মূল্যবোধ গুলি যখন ভেঙে যাচ্ছে , তখন ব্যথিত না হয়ে পারা যাচ্ছে না । তাই করালীরকে সমর্থন করলেও বনোয়ারীর প্রতি তাঁর গভীর সহানুভূতি লক্ষণীয়। পাগল কাহারদের কথা বাগানে লেখকের মনো গজতের এই দ্বন্দ্ব লক্ষ্য করা যায় । এই প্রসঙ্গে দেখা যাক লেখক কি বলতে চাইছেন - তাঁর আত্ম জীবনীতে -

"... আমাদের দেশে সামাজিক ইতিহাস যাঁরা চর্চা করেছেন , তাঁরা বলেন - এই বোধ বা আধ্যাত্মিকতা মাত্রাতিরিক্ত রূপে এদেশের মানুষের মনে প্রভাব বিস্তার করে ছিল যে , ঐহিক সমস্যা সমাধানের সমগ্র জাতিটাকেই ক্লীব করে তুলেছিল । ইতিহাসে তার নজীর আছে । হিন্দুর পরাজয়ের আর অবধি নাই । যে এসেছে - শক্ , হূন , চিঙ্গিস খাঁ , তৈমুর লঙ , পাঠান , মোঘল , ইংরেজ - সবার কাছেই তাকে হারতে হয়েছিল । শুধু কি মানুষের কাছে হেরেছে ? সরীসৃপ , পশু - এর কাছেও হার মেনে এদের দেবতার আসনে বসিয়ে পূজা করেছে । মনোপূজা , দক্ষিণরায় পূজা আজও একেবারে বিলুপ্ত হয়নি । সত্য সত্যই জীবন দর্শন তখন বিকৃত হয়ে উঠেছিল । আধ্যাত্মিকতা পরিণত হয়েছিল তেত্রিশ কোটি দেবতার পূজা - সমারোহে - কোটি কোটি অক্ষম মানুষের 'দেহি দেহি ' প্রার্থনা কোলাহলে ; ভাবনা ও মন থেকে নির্বাসিত হয়ে বাইরে এসে নিয়েছিল অর্থহীন আকার ও অন্ধ সংস্কারের চেহারা ।

এসব স্বীকার করেও কিন্তু আমার মন সে কালকে কালাপাহাড়ের ভাঙা প্রস্তর বিগ্রহের মতো বিসর্জন দিতেও পারে না , শুধু পাথরের পুতুল বলে মিউজিয়ামের বস্তু বলেও ভাবতে পারে না । ওর মধ্যে কোথাও যেন কিছু আছে । বিচিত্র বিস্ময়কর কিছু । তেত্রিশ কোটি দেবপূজার শুকনো বা পচা ফুলের রাশির মধ্যে ওই বৈরাগ্যের দেবতা শিবের প্রসাদি নির্মাল্য , অম্লান বিল্বপত্রের মতো কিছু । আমার পূজা তাকে না দিয়ে পারি না।"[৭৫]

আবার বলেছেন - " আজ ভাবি এইসব কথা । সে সব জঞ্জাল আজ ধীরে ধীরে পরিষ্কৃত হতে শুরু হয়েছে । ভেবে আশ্বাস পাই । আবার সঙ্গে সঙ্গে প্রাণের অকুতিতে তাকে খুঁজে পেতে দেখি । সে আমলকে চোখে দেখেছি - অন্তরে অন্তরে ও অনুভব করেছি বলেই স্পষ্ট বুঝতে পারি জীবনের হবিকে ভস্মে ঢালার মর্মকথা । আমাদের সমাজের যে সকল মানুষের স্বল্প আয় , কিছু কৃষিক্ষেত্র নিয়ে স্বচ্ছন্দে সংসার যাত্রা চালিয়ে আসছিলেন - তারা অকস্মাৎ সম্মুখীন হলেন এক অভিনব সভ্যতার, যার ফলে অবশ্যম্ভাবী রূপে আরম্ভ হয়ে গেল এক অর্থনৈতিক বিপ্লব। বিপ্লব উপস্থিত হলেই বিপর্যয়ের দুঃখ শুরু , সেই দুঃখ থেকে পরিত্রানের পথ ছিল বাইরের জগতে গিয়ে- যে জগৎ গ্রামের অর্থ টেনে নিয়ে যাচ্ছিল , সেখান থেকে অর্থ উপার্জন করে আনা । কিন্তু সে শিক্ষা ছিলনা, সাহসও ছিলনা । সে আমলের সুখীর অন্যতম সংজ্ঞাই ছিল অপ্রবাসী। সেই কারণে প্রবাস বাস ছিল দুঃখদায়ক, এবং সংসারে যা দুঃখদায়ক তাই ভীতির বস্তু । আর শুরু হয়েছিল শিক্ষা বিপ্লব। যাঁরা ইংরেজী জানতেন না তাঁদের সম্মুখে বাইরের জগতের পথ ছিল রুদ্ধ ;অন্তত তাঁরা তাই মনে করতেন । অথচ ব্যক্তিত্বের যোগ্যতায় তাঁর আজকের দিনের উচ্চপদস্থের চেয়ে হীন কি অক্ষম ছিলেন না। ..... এই অবস্থার মধ্যে পড়ে এই সব মানুষই অসহায় হয়ে একমাত্র দৈব বিশ্বাসকে আকঁড়ে ধরেছিল । বিশ্বাস ছিল না নিজের উপর ; ভরসা ছিল না রাজ শক্তির উপর; সুতরাং ভরসাস্থল ছাড়া মানুষ বাঁচে কি বরে ? ধর্মের অবস্থা তখন বিকৃত ।... তাই অসহায় মানুষ ক্ষূদ্রতম দুঃখের জন্য দেবতাকে মানত করেছে ।.... পূজা করেছে , ভালো করেছে মন্দ করেছে , যা কিছু করেছে দেবতার নাম নিয়ে । তান্ত্রিক মদ খেয়েছে কালীর নাম করে, শৈব গাঁজা মদ সিদ্ধি খেয়েছে শিবের নাম করে , বৈষ্ণব গাঁজা খেয়েছে গোবিন্দের নাম করে। তাদের বেদনা অনুভব করি ।"[৭৬]

এই মানসিকতা থেকে হয়তো 'হাসুঁলী বাঁকের উপকথা' উপন্যাসের সংস্কার হয়েছে বার বার। অন্তত দুটি সংস্করণ হাতে পেয়ে, এই ধারণার উৎপত্তি । এ গ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণ- আশ্বিন ১৩৫৫ এবং তার দীর্ঘ দিন পর প্রকাশিত ত্রয়োদশ সংস্করণ ১৩৯৫- পর্যালোচনা করে কিছু অদল বদল চোখে পড়েছে । অবাক হওয়ার মত পরিবর্তন ঘটেছে উপন্যাসের শেষ অংশে ।

বনোয়ারীর মৃত্যুদৃশ্য (২ য় সংস্করণ / পৃঃ -৪৫০ / এয়োদশ সংস্করণ / পৃঃ- ৩১০) থেকে, কাহিনীর এই গুরুত্ব পূর্ণ পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায় -

'হাঁসুলী বাঁকের উপকথা' ঃ ২য় সংস্করণ - ১৩৫০-এর বন্যার আগেই দেহ রেখেছে বনোয়ারী। মৃত্যুর আয়োজন তার ইচ্ছামতই সম্পন্ন হয়েছে । অর্থাৎ কোপাই এর গর্ভে কুঁড়ে বেঁধে শয্যা পেতেছে সে । মৃত্যু আসন্নকালে গোটা কাহার পাড়াকে ডেকে চোখ ভরে দেখে গেছে। করালীর প্রতি তার আর রাগ নেই যেভাবে সে বারবার করালীরকে ক্ষমা করে এসেছে - সেই ভাবেই এক ক্ষমা সুন্দর স্নেহ - সহানুভূতিপূর্ণ হৃদয় নিয়ে, করালীর মস্তক স্পর্শ করে, তাকে শেষ বারের মতো সাবধান করে দিয়ে গেছে - "সাবধান ! খুব হুঁশ করে চলবে বাবা ।"

বনোয়ারীর শ্রাদ্ধের খরচ বহন করে করালী । কারণ 'মাতব্বরকেই দিতে হয় এমন ক্ষেত্রে।'

করালীর সকল অপরাধ ক্ষমা করে বনোয়ারী যে মহানুভবতা দেখিয়েছে সেই মহানুভবতা করালীর মধ্যে লক্ষ্য করা যায় নি ।

'হাঁসুলীবাঁকের উপকথা ' ঃ ত্রয়োদশ সংস্করণ - মৃত্যু আসন্ন কালে বনোয়ারীর সঙ্গে করালীর দেখা হয়নি । " শুধু দেখা হয় নাই করালীর সঙ্গে । করালী - ডাকাবুকো করালী , সেই শুধু আসেনি। এল তার মত্যুর পর ।" [৭৭]

করালী মাতব্বরের মৃত্যু সময় আসেনি । হয়তো , অভিমানে ! অনুশোচনায় ! পাপবোধে! নয়তো ,এ মুখ মাতব্বরকে দেখাবেনা বলে। কিন্তু পরে এসেছে, মাতব্বরের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়েছে , তার অন্তিম যাত্রার আয়োজন নিজে হাতে করেছে । মাতব্বরকে চিতায় শুইয়ে দিয়ে - তার পায়ের পরশ নিয়েছে মাথায় - ' যাও, চলে যাও সগ্‌গে ।' এখানে নিজের মাতব্বরি দেখানো নয় - আন্ত রিক শ্রদ্ধাই বড় কথা , নতুন যুগের মানুষ , পুরাতন যুগের মানুষকে মেনে নিয়েছে ; নমিত হয়েছে। বনোয়ারীর প্রতি লেখকের পক্ষপাতিত্ব এখানে আরো স্পষ্ট - যা করালী স্বীকার করে নিয়েছে । করালীর মানসিক পরিবর্তন ঘটার পর , সে যে হাঁসুলীবাঁকে ফিরে আসবে - তার ইঙ্গিত রয়েছে এখানে । তাই কাহারেরা চন্দনপুরের ঘুপচি কোয়াটার্স থেকে যখন বালি ভরা হাঁসুলীর বাঁকটার দিকে তাকায় , তখন তাদের মনে হয় , তাদের পথ প্রদর্শক কে হবে ! এই প্রসঙ্গে আবার ২য় সংস্করণের প্রসঙ্গ নিয়ে আসব । এখানে কাহারেরা ভাবে , কি করে বালি সরিয়ে তার পৈতৃক ভিটেকে নতুন করে তুলবে । তারা শুনেছে,- " যারা যুদ্ধ বাধিয়ে হাঁসুলী বাঁকের উপকথার ছেদ টেনে সেখানে নিয়ে এল ইতিহাসের ধারা , তারা নাকি এবার চলে যাচ্ছে । এবার ভূভারতের ব্যবস্থা করবে দেশের দশজনে। তারা চাষী কৃষাণদের জন্য , মজুরদের জন্য , নতুন ব্যবস্থা করবে। গান্ধী মহারাজ বলেছেন নাকি একথা ।" [৭৮]

তারা পরম বিশ্বাসে এই দিনটির জন্য অপেক্ষা করে আছে । তারা স্বপ্ন দেখছে - " তারা এবার জীবনের পাপ থেকে মুক্ত হবে । জীবিত কালেই মুক্তি পাবে কাহার জন্মের সকল শাপ থেকে - সকল পাপ থেকে । সে সব ব্যবস্থা হলে কাহারদের কতক ফিরে যাবে হাঁসুলীর বাঁকে - আবার গড়বে নতুন কালের ঘর , আবার করবে নতুন চাষ । হাঁসুলীবাঁক আবার গড়ে উঠবে নতুন রূপে । মজুর যারা খাটবে এখানেও , তারাও পাবে নতুন জীবন। আর যদি সব ভূয়া হয় , মেকি হয় - তবে চন্দন পুরের এই কারখানার মধ্যেই কাহারেরা আবার তৈরী করবে - নতুন এক উপকথা । সে উপকথা ও শেষ হবে একদিন এমনি ভাবেই । " [৭৯]

কিন্তু করালী সেকথা ভাবে না । সে স্টেশনের পাশে কাহারদের নিয়ে মিটিং করে - " সর্বাগ্রে মাঠে পোঁতে একটা তেরঙ্গা , কি লালঝান্ডা । চীৎকার করে - ইনকিলাব জিন্দাবাদ।" [৮০]

অবশ্য করালীর 'পাথরের অন্ধকার গুহা'য় - দমবন্ধ হয়ে আসে। বাইরের ঝলমলে আলো, তার সঙ্গে একঝলক টাটকা হাওয়ার জন্য তার প্রাণ আকুল হয়ে ওঠে।- "তাদের মন বলছে - খুলে দাও, ও পাথরটা খুলে দাও। চীৎকার করে বলছে - খুলে দাও । খুলে দাও।" [৮১]

কিন্তু তার ঘোরটা কেটে যেতে সময় লাগে না - "হঠাৎ সমস্ত সুর কেটে দিয়ে করালী উঠে দাঁড়িয়ে হাত তুলে হাঁক দেয় - হে ! সব উঠে পড় ! ঘন্টি পড়ছে কারখানায় হে! " [৮২]

সেই করালীর পরিবর্তন লক্ষ্য করতে গেলে , আবার ফিরে তাকাতে হয় - এই গ্রন্থের ১৩শ সংস্করণের দিকে - ' আগে পথ ধরবে কে ? ' পথ ধরার মানুষ স্বয়ং করালী। তাই দেখা যায় - একা একা লুকিয়ে সে , হাঁসুলীবাঁকের বালি খুঁড়ছে গাঁইতি হাতে । " হাঁসুলী বাঁকে করালী ফিরছে । সবল হাতে গাঁইতি চালাচ্ছে , বালি কাটছে, বালি কাটছে আর মাটি খুঁড়ছে । উপকথার কোপাইকে ইতিহাসের গঙ্গায় মিলিয়ে দেবার পথ কাটছে । নতুন হাঁসুলী বাঁক ।" [৮৩]

উপকথার প্রাচীনা সুচাঁদের কথার মধ্যেওএই পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। ২য় সংস্করণের শেষাংশে সুচাঁদ হাঁসুলী বাঁকের উপকথা বলতে বলতে , শেষে বলে 'আমি ফুরুলে এই উপকথার শেষ ।' ১৩শ সংস্করণে একই প্রসঙ্গে সুচাঁদ বলে - " আঃ হাঁসুলী বাঁক ও শেষ - আমিও শেষ, কথা ও শেষ ! আঃ - আঃ । কিন্তু বলতে বলতে থেমে যায় সুচাঁদ । আকাশের দিকে চেয়ে ভাবে,শেষ কি হয় ? কিছুর শেষ কি কখনও হয়েছে ? চন্দ্র , সূয্যি যতকাল , তার পরেও তো শেষ নাই ; তার পরে আদেশ যে মহাকাল । বাবা কালারুদ্দের , চরক পাটায় ঘোরা । সে ঘোরার শেষ নাই , আলো নাই, অন্ধকার নাই , তবু পাটা ঘোরার শেষ নাই । সেই ঘোরাতেই তো কখনও প্রলয় , কখনো সৃষ্টি । আঁধারে সৃষ্টি ডোবে , আবার আলোতে ওঠে । তবে শেষ কি করে হবে ? " [৮৪]

লেখক নতুন যুগের আগমন কে স্বাগত জানিয়েছেন ঠিকই , কিন্তু পুরাতন যুগের সব কিছুকে তিনি মুছে ফেলতে পারেননি । তাই তাঁর উপন্যাসে বাব বার এই পুরাতন ও নতুনের দ্বন্দ্ব দেখা গেছে । পুরাতন যুগের মাতব্বরকে পরাজয় স্বীকার করতে হয়েছে - নতুন যুগের মানুষের কাছে । নতুন যন্ত্র যুগের মানুষ করালী , যান্ত্রিকতার নাগপাশ থেকে মুক্ত হতে পারেনি ।(হাঁসুলীবাঁকের উপকথা - ২য় সংস্করণ) কিন্তু পরবর্তীকালে লেখক এর পরিবর্তন ঘটিয়েছেন । নতুন যুগের যন্ত্রমানব যেন পুরাতন যুগের মাতব্বরের কাছে নতি স্বীকার করেছে । তাই ফিরে এসেছে হাঁসুলী বাঁকে - মাটির সন্ধানে ; চেয়েছে , নতুন যুগের মাতব্বর হতে । (হাঁসুলী বাঁকের উপকথা , ১৩শ সংস্করণ)

এই পরিবর্তন লেখকের পুরাতনের প্রতি শ্রদ্ধাকে প্রকাশ করে। যান্ত্রিকতার সকল বন্ধন ছিন্ন করে মাটির খোঁজে ফিরে আসে করালী , হয়তো বনোয়ারীর স্বপ্ন সফল করার জন্য। আসলে, কালের পরিবর্তনকে কেউ অগ্রাহ্য করতে পারে না । কিন্তু এই পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে প্রাচীন মূল্যবোধগুলি যখন নষ্ট হয়ে যায় - তখন বেদনা অনুভব করেন লেখক । আবার কালের অনিবার্য পরিবর্তনকে যেমন অস্বীকার করা যায় না , তেমনি তার ভালো দিকটিকে অবহেলা করা যায় না ; তাকে বরণ করে নিতে হয় নতুন যন্ত্র যুগের কৃত্রিমতা, অবিশ্বাস সংশয় , সন্দেহ প্রভৃতি থেকে পুরাতন যুগের স্বাভাবিক বিশ্বাস , স্বাভাবিক সম্পর্ক যেমন কাম্য হয়ে ওঠে ।

প্রসঙ্গ ঃ কাহার জীবন ঃ যুদ্ধের প্রভাব এবং

চড়ক পাটায় কাহারদের বছর ঘোরে । কাহার পাড়ার উপকথার আদি অন্ত নেই - "পিথিমী ছিষ্টি হল কাহার ছিষ্টি করলেন বিধেতা , কাহারদের মাতব্বরও ছিষ্টি হয়েচে সেই সঙ্গে -" [৮৫]

সেই কাহার সমাজে প্রবেশ করল যুদ্ধের ডামাডোল । যুদ্ধের অভিজ্ঞতা যে তাদের ছিল না, তা নয় । সুচাঁদ বুড়ির মুখে শোনা যায় - ' বাপ পিতেমর আমলে ' বর্গীর আক্রমণের কথা - যা 'ইংরাজ, জারমনি, জাপুনী', যুদ্ধের চেয়ে অনেক বড় । তার অভিজ্ঞতার ঝুলি থেকে বেরিয়ে পড়ে, অনেক যুদ্ধে কাহিনী - " যুদ্ধ হয়েছিল সেকালে । বর্গী এসেছিল । ছেলে ঘুমলো পাড়া জুড়লো বর্গী এলো দেশে ! সে বাবা শুনেছি বাপ পিতেমর আমলে । অ্যাই বর্গীরা এল । ঘোড়া ছুটিয়ে টগবগ টগবগ করে তারোয়াল ঘুরিয়ে - কেটে কুটে ঘর দ্বোর জ্বালিয়ে ভেঙে মানুষের নাক কেটে কান কেটে হাত কেটে মুন্ডু কেটে - খচাখচ , চলে গেল । লোকে তাদের ভয়ে পোড়া মালসা মাথায় দিয়ে জলে গলা ডুবিয়ে বসে তাকত ।" [৮৬]

সাঁওতাল হাঙ্গামার কথা বলতে গিয়ে " বড়ীর চোখ বড় হয়ে ওঠে ?" [৮৭]

শুধু কি এই যুদ্ধ - হয়েছে রামায়ণের যুদ্ধ । তাদের বিশ্বাস - " যত কালই হোক ,হাঁসুলী বাঁক তো ছিল সেকালে । সেই রামায়ণ যুদ্ধের কালে ।" [৮৮]

চন্দনপুর থেকে যুদ্ধের বার্তা নিয়ে আসছে করালী । এ যুদ্ধ নিছক যুদ্ধই নয় । এই যুদ্ধ নিয়ে আসে সভ্যতা , যে সভ্যতা মুহূর্তের মধ্যে ধ্বংশ করে দিতে পারে সব কিছু । 'এ দুনিয়া আজব কারখানা !' - বৈষ্ণব ফকিরের গান মানুষের জন্ম-মৃত্যুর রহস্যকে নির্দেশ করত । আগে কাহারেরা 'দেহের খাঁচায় অদেখা অচেনা পরাণ পাখির কথা ভেবে কথাটা স্বীকার করত ।' এখন কিন্তু "কোম্পানীর কলের গাড়িতে, 'অ্যালের' পুলে, তার তারে টিলিগেরাফে , হাওয়া গাড়িতে - দুনিয়ার আজব কারখানা তারা যেন চোখে দেখছে । তার উপরেও আজব কান্ড এ যুদ্ধ । অবাক রে বাবা ! কোথা কোন্ 'দ্যাশ' সাত সমুদ্দুর তের 'নদী' পারে কে করছে তার সঙ্গে যুদ্ধ , এখানে চড়বে ধানের দর , চালের দর , আলু গুড় কলাই তরিতরকারির দর ! জঙ্গলের সদ্‌গোপ মহাশয়রা কোমর বাঁধছে - টাকা জমাবে ; বলাবলি করছে কাপড়ের দর চড়বে । আবার না কি কোম্পানিতে যুদ্ধের জন্য চাঁদা আদায় করবে ।" [৮৯]

যুদ্ধের সময় জিনিসপত্রের মূল্য বৃদ্ধি কাহারদের জীবনে কোন প্রভাব ফেলে কিনা তার আলোচনায় ব্যস্ত বনোয়ারী । তার মনে পড়ে যায় , ' তেরশ বিশ একুশ ' সালের যুদ্ধের কথা, দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির কথা , যুদ্ধের বাজারে চন্দনপুরের মুখুজ্জে বাবুদের কয়লার কারবারে ফুলে ফেঁপে বড়লোক হওয়ার কথা , মাইত ঘোষের বড়লোক হওয়ার কথা , চন্দনপুরের চার - পাঁচ ঘর জমিদার বাড়ি ভেঙে যাওয়ার কথা , জঙ্গলের চৌধুরীদের পতনের কথা , জঙ্গলের সদ্‌গোপদের বৃদ্ধির কথা, ভদ্রলোক হওয়ার কথা । এবারের যুদ্ধেও তারা আবার কামিয়ে নেমে । কাহারেরা অবশ্য তাদের মঙ্গল কামনাই করে । তাদের মালক্ষ্মীর পায়ের ধুলোই তো তাদের বাঁচিয়ে রেখেছে ।

কিন্তু করালী আলাদা দল গঠন করে , কাহার ছেলেদের কারখানার কাজের লোভ দেখায় । এটাই বনোয়ারীর চিরকালের ভয় । কাহারেরা কি চাষ বাস ছেড়ে কারখানার শ্রমিকে পরিণত হবে ! সে সুযোগ বুঝে করালীকে পরামর্শ দেয় , চন্দনপুরের রেলের কাজ ছেড়ে দিতে । কিন্তু করালী তার জীবনের পরিকল্পনা ছকে ফেলেছে । এখন রেলের চাকরি ছাড়ার কোন প্রশ্নই উঠে না । যুদ্ধ জোড়

শুরু হয়েছে । "রেলের কাজ যুদ্ধের সামিল হবে ।... মজুরি বেড়ে ডবল হবে । এখন লোক লোক শব্দ উঠেছে ।" [৯০] যুদ্ধের প্রভাবে চন্দনপুরে ' হৈ হৈ পড়ে গিয়েছে' ।

কাহার মাতব্বরের ধারণা, এসবই কালারুদ্রের লীলাখেলা । প্রথম যেদিন যুদ্ধে উড়ো জাহাজ দেখা গিয়েছিল কাহার পাড়ার আকাশে , সেদিন গোটা কাহার পাড়া ভয়ে , বিস্ময়ে বিহ্বল হয়ে পড়েচিল । বনোয়ারী ভেবেছিল, বাবার বাহন নতুন রূপে ফণা তুলে আসছে । কিন্তু তাদের ভয় ও বিস্ময় কাটিয়ে দেয় করালীর সাকরেদ মাথলা ও নটবর । এই উড়ো জাহাজের আড্ডা হবে চন্দনপুরের পাশে কোন এক স্থানে । এই অলক্ষণে উড়োজাহাজের ভয় বর্তমানে অন্য রকম । "ধানের দর চড়ছে । কাপড় ও চড়ছে । অন্য 'দ্রব্য' অর্থাৎ দ্রব্যের দর চড়ছে কিন্তু কাহারদের আছে শুধু খাওয়া আব পরা - অন্য দ্রব্যের দর চড়লে বেশী কিছু যায় - আসে না ।" [৯১]

যুদ্ধের প্রভাব রেলের কাজের মজুরি এবং মজুরের চাহিদা বাড়ছে । কাহার পাড়ার অনেকে গোপনে করালীকে অবলম্বন করছে । ঘোষবাড়ির চাল ছাওয়ার কাজে চারজন কাহার ছেলের অনুপস্থিতি, বনোয়ারীকে ভাবিয়ে তুলেছে । কাহার সমাজের ভাঙন বোধ হয় ঘটতে চলেছে ।

করালীর জাত বিচার ঃ স্বজাতি সচেতনায় বিদ্রোহী প্রচেষ্টা

নতুন যুগের মানুষ করালীর বিদ্রোহ শুধু অত্যাচারী শোষকের বিরুদ্ধে নয় , নিজের কুসংস্কার ও জাত বিচারের বিরুদ্ধেও । অন্ত্যজ শ্রেণীর মানুষ তাদের অশিক্ষার ফলে বঞ্চনায় অভ্যস্ত হয়ে গেছে । তারা কোন যুক্তি-তর্কের ধার ধারে না । চিরটাকাল ধরে , সমাজের পায়ের তলায় থেকে, মার খাওয়াটাকে তারা অদৃষ্ট বলে মনে করে - 'যাহার নামে সমন জারি করিবার জো নাই' ।

তাই তারা মাথা তুলতে চায় না - ' বিধির বিধান'-কে লঙ্ঘন করাটাকে স্পর্ধা মনে করে । গন্ডীবদ্ধ কাহারেরা দৈবশক্তি থেকে শুরু করে, প্রভুশক্তি পর্যন্ত সকল শক্তির কাছেই মাথা নত করেছে । তাই চন্দনপুরকেও কাহারেরা ভয় করে । এই ভয় অবশ্যই তাদের কাহারকুলে জন্মাবার কারণে । সেখানে 'আঙামুখ', 'হাঁসাচোখ', 'লাল চুল', সাহেবকে তো ভয় করেই ; আর ভয় ঠাকুরমশায়দের । তাদের ছায়া মাড়ানো পাপ ; 'খড়কুটোর যোগসাজসে ছোঁয়া ' পড়ার ভয় , বনিক মহাশয়দের হিসেবের ভয় , আবার সেখানকার ' ভগবত ভগবতী ' দেবতাদের ভয় । সে ভয় কালারুদ্রের থেকে ও বেশী । বিশেষ করে কালারুদ্র অন্ত্যজদের অর্থাৎ নীচজাতের দেবতা কিন্তু এই দেবতারা উচ্চবর্ণের দেবতা । এঁদের পূজোয় ঘটা ও মহিমা , স্বাভাবিক ভাবেই অনেক বেশী । "তাঁদের দরবারে পূজোর থান দূরের কথা - কাহারেরা নাট মন্দিরে উঠতে পারে না, দূর থেকে দেখতে হয়, তাদের ভোগের সামগ্রীতে কাহারদের দৃষ্টি পড়লে ভোগ নষ্ট হয়ে যায় ।" [৯২]

সেখানে তাদের 'অনধিকার প্রবেশ ' । অথচ " সকল জাতের বর- কনে বহন করতে আছে এই ' অশ্বগোত্ত' কাহারেরা । কাহারেরা পাল্কী কাঁধে করলেই পবিত্র ।" কি সুবিধাবাদী নিয়ম !

চন্দনপুরের ম্লেচ্ছ কারখানায় কাজ করতে গিয়ে করালী যেন হয়ে গেছে ভিন দেশী । তার জাত গেছে । এই জাত নিয়ে বিদ্রোহ করতেও করালী পিছপা হয়নি । করালীর মতে জাত যায়

- বড় মানুষের এঁটো খেলে ; এঁটো কুড়োলে । কিন্তু ছোঁয়া খেলে জাত যায় না । সুতরাং করালীর জাত যায় নি । জাত গেছে সেই কাহারদের - যারা বড় লোকদের প্রসাদ পাওয়ার আসায় এঁটো পরিস্কারের জন্য বার বার যায় । " সনাতন সামন্ততান্ত্রিক জন্মগত জাতিভেদগত অবস্থান মেনে নিয়ে প্রস্তুত নয় এই নতুন কালের মানুষ ।" [৯৩]

আসলে অশ্বগোত্র কাহেররা বহু ভাগ্যে মনুষ্য জন্ম পেলেও , (তাদের ধারণায় হীন কর্মের ফলে) কাহারকুলে জন্ম নিয়ছে । তাই মানুষ হয়ে ও ঘোড়ার মত উচ্চবর্ণের মানুষকে বহন করতে হয় । তাই বুঝি চরক পাটায় শুনে বনোয়ারী প্রার্থনা করে ছিল -'শিবো হে , আসছে জন্মে উচ্চকুলে জন্ম দিয়ো ।' কিন্তু করালী বনোয়ারী নয় । সে সোজাসুজি বিদ্রোহ করে । ঘোষ বাড়িতে খাওয়া দাওয়ার প্রসাদ পাওয়া উপলক্ষে, সে সদর্পে ঘোষণা করে, নিমন্ত্রণ করলে যাবে , কিন্তু প্রসাদ পেতে যাবে না । ইউনিয়ন বোর্ডের মেম্বার কর্তা রেগে গিয়ে কন্ট্রোলে পাওয়া চিনি, কেরোসিন, কাপড়, কুইনিন সব বন্ধ করে দিয়েছিলেন কাহারদের । বিদ্রোহী করালী ইউনিয়ন বোর্ড থেকে কাহারদের কার্ডের ব্যবস্থা করে দেয় ।

বিধির বিধান কাহারদের আজব। এই বিধান কি সত্যিই বিধির ? না সুবিধাবাদী স্বার্থপর একদল মানুষের, যে 'কাহারদের মেয়েরা সতী হলে ভদ্র জনদের পাপ ধরবে কারা, রাখবে কোথা?' উচ্চবিত্ত সম্বন্ধে কাহারদের ধারণা অদ্ভুত ধরণের । " ইহাদের সামাজিক হীনতা ইহারা শুধু স্বেচ্ছায় নয় সানন্দে মানিয়া লইয়াছে । উচ্চবর্ণের হিন্দুর প্রতি ইহাদের মনোভাব শ্রদ্ধা বিনয়ে মধুর অখন্ডনীয় দৈব বিধান রূপে স্বীকৃত ও সম্পূর্ণ ভাবে বিদ্বেষ ও হীনম্মন্যতা মুক্ত।.....ইহাদের চৌর্যবৃত্তি , সুরাসক্তি ও অবৈধ যৌনলালসা সবই যে বিধাতা তাহাদিগতে নিম্নবর্ণের করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন তাঁহারই বিধানের অঙ্গীভূত - সুতরাং এই প্রশস্ত পাপাচরণে তাহারই কোন বিবেক দংশন অনুভব করেনা ।" [৯৪] - এই মানসিকতা থেকেই করালীর সঙ্গে বনোয়ারীর সংঘাত ঘটেছে বার বার।

সারা পৃথিবী জুড়ে যুদ্ধ লেগেছে - চন্দনপুরে গেলে তার আঁচ পাওয়া যায় । 'কারখানাটা বেড়ে যেন ভীমের বেটা ঘটোৎকচ হয়ে উঠেছে । আর সে কি গর্জন।' কাহার পাড়ায় ও যুদ্ধের প্রভাব পড়েছে । তবে, সেটা কাহারেরা কোন অসুবিধা মনে করেনা । তারা যে কোন প্রকারে টিকে থাকতে অভ্যস্ত, যুদ্ধের বাজারে মনিবেরা ধান, পাঁচটাকা থেকে দশটাকায় উঠেছে । সদ্‌গোপরা এই সময় সব দান বেচে দিয়ে, দুহাতে রোজগার করছে ।

কাহার পাড়ায় - এই অভাব , বনোয়ারী বোঝে । সেই সঙ্গে এটাও বোঝে যে , কষ্ট কাহারদের সহ্য করতে হবে । করালী আসে তার ব্যানো মামার সঙ্গে বোঝাপড়া করতে । সে চায়, পাড়ার অভাবী লোকগুলোকে কারখানার কাজে বহাল করতে । উত্তরে বনোয়ারী হুঙ্কার দিয়ে উঠে। প্রাণ থাকতে সে কাহারদের কারখানার শ্রমিক হতে দেবে না । কাহারেরা এবং তাদের মতো নিচু কুলে জন্ম যাদের, সেই মানুষেরা চিরকাল চাষ করবে - "এ হল ভগবানের বিধান, বাবা ঠাকুরের হুকুম । খাট , খাও । বুক পেড়ে দুহাতে খাট , সোনার লক্ষ্মীতে ভরে উঠুক হাঁসুলীর মাঠ, বাবুমশায়দের সদ্‌গোপ মশায়দের ভাগ্য আর তোমার হাতযশ । মনিবের খামারে ধান তুলে দাও,

মনিবান শাঁখ বাজিয়ে জলধারা দিয়ে লক্ষ্মী ঘরে তুলুক তুমি আঁচলে খামার ঝেড়ে তুলে নিয়ে এস মা লক্ষীর পায়ের ধুলো । তাই তোমার ঢের , তার বেশী কি চাও ? ' যেমন বিয়ে তেমনী বাজনা' । কাহার কুলে জন্ম যখন হয়েছে , তখন এ জনমের এই বিধান ।" [৯৫]

- জন্মগত , বর্ণগত , অর্থগত শিক্ষা সংস্কৃতিগত অনগ্রসরতার ফলে , সমাজের কোণঠাসা এই মানব সম্প্রদায় - যাকে বিধির বিধান বলে জানে - সেই বিধান চিরকালের জন্য একদল স্বার্থান্বেষী মানুষের সৃষ্টি । কিন্তু এই সহজ কথাটা তারা বোঝে না - তাদের অশিক্ষার ফলে । তাদের চেতনার প্রসারতা নেই । তাদের অশিক্ষা , 'তাদের আপনার কোণে আপনি বদ্ধ ' , করে রেখেছে । তারাশংকর তাঁর স্মৃতিগ্রন্থের এক জায়গায় লিখেছেন - "ওরা আন্তরিক ভাবে বিশ্বাস করেছে হীনকুলে জন্মাপরাধে ওরা সত্যই অস্পৃশ্য । পরবর্তীকালে যখন সমাজসেবার ব্রত নিয়ে ওদের বুঝতে চেয়েছি যে , অস্পৃশ্যতা মানুষের সৃষ্টি , বিধাতার নয় - তখন ওরা শিউরে উঠেছে, আমাকে সন্দেহের চোখে দেখেছে ।" [৯৬]

করালী এই গন্ডীবদ্ধ জীবন থেকে বেরিয়ে আসতে পেরেছে - ব্যবহারিক জীবন সম্বন্ধে তার ধারণা তৈরী হয়েছে । তার মধ্যে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবোধ জেগেছে । অন্ত্যজ মনুষের এই সচেতনতা লক্ষ্য করার মতো । করালী তখন চন্দনপুরের কুলির সর্দার । সে সেখানে হুকুম চালায় । করালীর উত্তরোত্তর উন্নতি দেখে বনোয়ারীর মনে বিস্ময় জাগে । সে যেন তার চিন্তাশক্তি দিয়ে কিছু মেলাতে পারে না । হিসেবে গোলমাল হয়ে যায় । করালী বাবাঠাকুরের বাহনটিকে হত্যা করেছে , বাবা ঠাকুরের শিমূলবৃক্ষে চড়েছে , বাবা ঠাকুরের সম্বন্ধে আপত্তির কথা বলেছে , উপরন্তু কোঠাঘর তুলেছে - পিতৃপুরুষ ও গুরুজনদের কথা অমান্য করেছে । অথচ শাস্তির বদলে তার উত্তরোত্তর উন্নতি ঘটেছে । উনপঞ্চাশের ঝড়ে সবার ঘরের চালা উড়ে গেছে - ব্যতিক্রম করালী । তার কোঠাঘরের চাল লোহার তার দিয়ে বাঁধা । বনোয়ারীর মনে সংশয় - জাগলেও তার প্রবল বিশ্বাস বাবা ঠাকুরের অলৌকিক ক্ষমতার উপর । বাবাঠাকুরের কোপ তাল গাছের মাথা ভেঙে মাটিতে লুটিয়ে দেয় , পাকা রেলের পুল ভাসিয়ে দেয় । সুতরাং করলীর ছাঁদের বাঁধন , তার কাছে কিছুই নয় । করালীর পাপের ভারা এখনো পূর্ণ হয় নি । অথচ সেদিন ঝড়ে পড়ে গেল , বাবা ঠাকুরের বিল্ববৃক্ষটি । পানুর ছেলেটি প্রাণ হারাল চন্দ্রবোড়ের দংশনে । কাহারদের বিধান আজব , করালীর পাপ কাহার পাড়াকে অধর্মের পুরী করে তুলেছে । সেই পাপ সহ্য করতে না পেরে , তাদের ঈশ্বর বাবা ঠাকুর তাদের ছেড়ে চলে যাচ্ছেন । সর্পাঘাতে মাথলার ছেলের মৃত্যুর কারণও হয়ে রইল করালী ।

চিরকালের ভ্রান্ত ধারণার বশবর্তী হয়ে , বনোয়ারী আশাবাদী । তার ধারণা এবার ধানের ফলন ভাল হবে । অন্ত্যজ কাহারদের জীবন , মাঠের মাছ শাক পাতা , ভাত খেয়ে ও ছেঁড়া কাপড় পরে কেটে যাবে । সাহেব ভাঙার আচোট জমিতে সবুজ ধানের সমারোহ দেখে তার চোখ জুড়িয়ে গেছে - ভবিষ্যতের স্বপ্ন দেখেছে সে - তাকে অনেকদিন বাঁচতে হবে । তার কপাল ফিরেছে , সে খামার বাড়াবে , শক্ত করে একটা মরাই করবে আর তার চাই একটি পুত্রসন্তান - যাকে সে পরবর্তী কাহার মাতব্বর করে যাবে । বর্তমান যুদ্ধ যে কি রূপ নিয়ে আসতে পারে - কাহারদের জীবনে কি

রূপান্তর ঘটাতে পারে - তা বুঝতে পারেনি , কাহার মাতব্বর বনোয়ারী । তাই তার স্বপ্নও সফল হতে পারে না । সে দেখেছে, কাহার পাড়ার দুর্গতি। কাহার মেয়েদের পরনে মলিন কাপড়, কেরোসিনের অভাবে আলো নেই , পূজাপার্বনে চিনি নেই , ম্যালেরিয়ায় কুইনিন নেই।

কাহারেরা কর্তাবাবাকে বিশ্বাস করে যুগের পর যুগ কাটিয়ে দিতে পারে কিন্তু জমির মালিককে বিশ্বাস করা যায় না - একথা তারা জানে না । সদ্‌গোপ মনিবরা বেশী ধান দিতে চায় না । রতনের মনিব মারতে আসে আর পানার মনিব ' হাতে মারে না ভাতে মারে ' । ছেলে ছোকরারা বনোয়ারীকে স্পষ্ট বলেছে - তার কথায় তারা চাষে লেগেছে - আড়ালে বলছে , কারখানার কাজে গেলে বেঁচে যায় । " যুদ্দের সংকট কালে মন্বন্তরের দারুণ দুর্দিনে বনোয়ারী নয় , করালীই কালের পরিবর্তনে হয়ে ওঠে পরিত্রাতা ।" [৯৭]

বনোয়ারী চন্দন পুরের দোকানদারদের কাছে বাকিতে কাপড়ের কথা বলে আসে । সে জানে এবার প্রচুর ধান হবে , ধান দিয়ে সে ঋণ শোধ করবে । বনোয়ারীরা চিরকাল সমস্ত কিছুকে বিশ্বাস করে এসেছে । অবিশ্বাস করার মত মানসিকতা তাদের নেই । হাঁসুলী বাঁকের জগৎ বদলাচ্ছে। সারা বিশ্ব জুড়ে যে পালা বদল, তার স্পর্শ থেকে বাঁচতে পারেনা হাঁসুলীবাঁক - এখবর রাখেনা বনোয়ারী ; এই খবর রাখলে করালীর সঙ্গে পদে পদে তার সংঘর্ষ ঘটত না । বনোয়ারীর সব আশাকে নস্যাৎ করে দিয়ে কাহার পাড়ায় ঢেঁরা পড়ল - সাহেব ডাঙার জমি যারা নিয়েছিল, তাদের এবার খাজনার বদলে ধান , বাবুদের খামারে তুলে দিতে হবে । বাবুরা ধানের ভাগ দেবেন। মাথায় হাত দিয়ে বসে বনোয়ারী ।

চন্দনপুর থেকে যুদ্ধের বার্তা বহন করে আনে করালী। বিষয়টা বনোয়ারীর একেবারেই পছন্দ নয় । সে একুশ সালের যুদ্ধ দেখেছে । সুতরাং এঘটনা তার কাছে নতুন নয় । তার ধারণা করালী যুদ্ধের গল্প বলার নাম করে , কাহারদের কারখানার কাজের লোভ দেখিয়ে ভাগিয়ে নিয়ে যেতে চায় ; সেই সঙ্গে কাহার রমণীদের মনোরঞ্জন করতে চায় । তাই সে মনে মনে ভাবে - " যুদ্ধ লেগেছে তো তোর বাবার কি ! হাঁসুলীর বাঁকে তার কিসের গাল গল্প। ধান চাল আক্রা হবে, কাপড়ের দর চড়বে। হয় হবে , চড়ে চড়বে। ' খানিক-আদেক ' দুঃখ-কষ্ট হবে । মাথায় ধর্মকে রেখে পিতি পুরুষের ' গোনে গোনে ' অর্থাৎ পথে পথে সাবধানে বারোমাসে এক এক পাক খেয়ে যে কবছর যুদ্ধ চলে কাটিয়ে দেবে । কর্তা ঠাকুর রক্ষা করবেন । তাঁর আর্শীবাদে কেটে যাবে কাল সুখে - দুঃখে । হাঁসুলীর বাঁকের মাঠে মালক্ষ্মীর পায়ের ধুলো নিলেই সকল অভাব ঘুচে যাবে।" মুখে সে বলে -" কিন্তু বাপ যুদ্ধ মুদ্ধ এখানে কেনে ? কোথাও কোন দ্যাসে যুদ্ধ লেগেছে তো হাঁসুলীর বাঁকে বাঁশ আদায়ের ভেতর কাহার পাড়ার কাহারদের কি ? ' বনোয়ারীর পরবর্তী কথা গুলি করালীকে আঘাত করে- ' উসব গল্পের তাক লাগিয়ে মেয়েছেলের মনে অঙ ধরানো যায় , কিন্তু উসব এখানে চলবে না বাপু ! ... তোমার পরিবার আসছে , ছেলে- ছোকরার কানে মন্তর দিচ্ছে - পিতি পুরুষের কুল কম্ম ছেড়ে জাত নাশা কারখানায় চল মজুর খাটতে...জাতনাশা ! বেজাত কোথাকার ! তোর লজ্জা নেই , তোর মা ওই নাইনে কাজ করতে গিয়ে চলে গেল কুল ভাসিয়ে দেশ ছেড়ে , আর তুই

ওই নাইনে কাজ করছিস ? আবার পাড়ার ছোকরাদের মাথা খারাপ করতে এসেছিস ? পয়সার গরমে কোট পেন্টুল পরে মেয়েদের কাছে দেখাতে এসেছিস কত বড়ো মরদ তু !" করালী আত্মসংবরণ করতে পারে না। আঘাত প্রাপ্ত করালী পাল্টা আঘাত করে ফেলে "... জাত কার আছে ? কোন্ বেটার কোন্ বাবার আছে এখানে? ওই সুচাঁদ বুড়ী বসে রয়েছে , বলুক ওই বলুক,শুনি ! জাত ! লজ্জাও নাই তোমাদের । সদ্‌জাতের ভদ্রলোকের গা চেটে পড়ে থাক , তারা তোমাদের ভাতে মারে। পিঠের উপর জুতো মারে , তোমরা চুপ করে মুখ বুঝে সহ্য কর , লজ্জা! লজ্জার ঘাটে মুখ ধুয়েছ তোমরা? জাত ! কুলধম্ম ! কুলধম্ম তো জাঙলের চাষীদের মান্দেরি কৃষাণি রাখালি ? তাতেই রথে চড়ে স্বগ্যে যাবা। পেটে ভাত জোটে না , পরনে কাপড় জোটে না । কুলধম্ম! কুলকম্ম ! তোমার কি ? তুমি মাতব্বর , গুছিয়ে নিয়েছ , জমি করেছ ধান বেঁধেছ বুড়ো বয়সে বিয়ে করেছ , লোককে তুমি ধম্ম দেখাচ্ছ । লজ্জা ! বুড়ো বয়সে বিয়ে করতে তোমার লজ্জা নাই ? মাতব্বর । লোকে গতরে খেটে খেটে পেট ভরে খাবার মতো পরবার মতো রোজগার করবে , তাতে তুমি ধম্ম দেখাও । কেনে মানবে তোমার সে কথা লোকে ? কে মানবে ? " সে ঘোষণা করে -" যে যাবে কারখানায় - খাটতে, আমি কাজ করে দেব । দিনে পাঁচ সিকে মজুরি । কোম্পানি দেবে সস্তা চাল , সস্তা ডাল , সস্তা কাপড় । যার খুশি চলে আয়। ও বুড়োর কথা মানিস না ।" - এই বাদ প্রতিবাদে যেমন অন্ত্যজ কাহার সমাজের মানসিকতা (অশিক্ষা , কুসংস্কার প্রভুশক্তির প্রতি আনুগত্য) ধরা পড়ে ; তেমনি যুগ পরিবর্তন যে কাহার মনেও পরিবর্তন ঘটাচ্ছে , তার স্পষ্ট রূপ দৃষ্ট হয় । নতুন যুগের কাহার যুবক করালীর মনে এসেছে পরিবর্তন ; বিদ্রোহী সত্তার জাগরণ ঘটেছে - তাই কাহারদের চিরাচরিত বিধানের সম্বন্ধে ভ্রান্ত ধারণা গুলির প্রতি সে অঙ্গুলি সংকেত করেছে ।

যুদ্ধের প্রত্যক্ষ প্রভাব ঃ হতাশযুক্ত 'বনোয়ারী'

যুদ্ধের ছোঁয়াচ লেগেছে কাহার মনে - তাদের ব্যাঘাত ঘটছে কাজে - " মাথার উপর দিয়ে বড় বড় ভীমরুলের ঝাঁকের মতো গোঁ গোঁ শব্দ করে উড়োজাহাজের দল চলে যায় ; তখন হাতের কাজ ফেলে সবাই উঠে দাঁড়িয়ে দেখে ।... ওঃ,কাল যুদ্ধ রে বাবা ! ওদিকে চন্দনপুরে আর সব বাবু মহাশয়দের 'গেরামে' শহরে লেগেছে গান্ধীরাজার কান্ডকারখানা । লাইন তুলেছে , সরকারী ঘরদোর জ্বালাচ্ছে ; পুলিশ - মিলিটারীতে গুলি করছে, গুলি খেয়ে মরছে ; তবু ভয় ডর নাই ।"

করালী আবার আসে সাইক্লোনের সংবাদ দিয়ে । কাহারদের সাবধান করতে । সেই ঝড়ে বাবা ঠাকুরের বিল্ববৃক্ষটি পড়ে যায়। বনোয়ারী ভাবে " হাঁসুলী বাঁকের দেবতা উপকথর বিধাতাপুরুষ চলে গিয়েছেন। তবে আর কি রইল তাদের।" তিন দিন ধরে প্রলয় ঝড় চলল। " তবু কাহারেরা বাঁচল। চিরকাল বাঁচে । দুর্ভিক্ষ মহামারী বন্যা ঝড় কতবার হয়েছে , কাহারেরা মরতে মরতে ও বেঁচেছে।"

বনোয়ারী কাহার ঐতিহ্যকেব বাঁচানোর শেষ চেষ্টা করে। বাবা ঠাকুরকে ফিরিয়ে আনতে

গাছটিকে সোজা করে বাঁচিয়ে দেয় , পূজো করে - ' ফিরে এস বাবা , ফিরে এসো ।'

কিন্তু কালারুদ্রতলায় এখন ঠিকাদারের তাঁবু । তারা বাঁশ কিনবে , কাঠ কিনবে । এতকাল অনেক যুদ্ধ দেখেছে - সুচাঁদ বনোয়ারীরা । সেই যুদ্ধে সামান্য দুঃখ কষ্ট হলেও আবার সব ঠিক হয়ে গেছে । এবারের যুদ্ধ তাদের চিরকালের বিশ্বাসে আঘাত করলো । যুদ্ধ, কালারুদ্রের শাসন উপেক্ষা করে বাঁশবাদিতে ঢুকল । চন্দন পুর থেকে বাঁশবাদির মুখ পর্যন্ত পাকা রাস্তায় মোটর হাঁকিয়ে যুদ্ধ ঢুকছে - হাঁসুলী বাঁকে । বলার কিছু নেই - করালীর পাপে হাঁসুলীর এই পরিণতি । দেবতার ক্ষমা করবার সীমা অতিক্রান্ত । তাই তিনি কাহারদের ছেড়ে চলে যাচ্ছেন । বনোয়ারী ভাবে - " যুদ্ধ কি না খায় ? বাঁশ - কাঠও খায় ? শোনা যাচ্ছে গরু ছাগল ভেড়া ডিম নাকি চালান যাবে । ওই যে চন্দনপুরের পাশে উড়োজাহাজের আস্তানা , ওখানে দৈনিক একপাল ছাগল ভেড়া মুরগী হাঁস লাগবে ঝুড়ি ঝুড়ি । তাতে অবশ্য কাহারদের কিছু লাভ হবে । ছাগল ভেড়া ডিমের দাম এরই মধ্যে অনেক বেড়েছে , আরও বাড়বে ; দু'পয়সা করে আসবে । গরু তারা কখনও বেচেনা কসাইকে , বেচবেও না । বনোয়ারী তো বেচতে দেবে না । কিন্তু সন্দেহ হচ্ছে , রাখতে কি পারবে ? " শুধু গরু বাঁচানোর নয় , বনোয়ারী কি কাহারদের এতদিনের বিশ্বাস সংস্কার ঐতিহ্যকে ধরে রাখতে পারবে! 'স্থূল মস্তিস্ক হাঁসুলীবাঁকের মানুষ, বিরাট দেহ বনোয়ারী ' এসব বুঝতে পারে না ।

" স্বধর্মে নিধনং শ্রেয়ো পরধর্ম ভয়াবহ' - গীতার এই অমর উক্তি বনোয়ারী মনে প্রাণে গ্রহণ করিয়াছিল । করালীর প্রতি তাহার ক্ষমতাহীন অনমনীয় বিরোধিতার মূলেই এই আপ্তবাক্যে বিশ্বাস । কিন্তু সমস্ত সমাজ বিন্যাস অধ্যাত্ম - ভাবাত্মক হইলেও মূলতঃ অর্থনৈতিক ভিত্তি নির্ভর । অর্থনীতির গুরুতর পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে সমাজ ব্যবস্থাও পরিবর্তন হইতে বাধ্য । কাহার সমাজে অতীতেরও অর্থনৈতিক বিপর্যয় ঘটিয়াছে : কিন্তু তখন নীলকর সাহেবদের অকুণ্ঠ পৃষ্ঠ পোষকতায় এই ফাটল মন পর্যন্ত পৌঁছাইবার সুযোগ পায় নাই - বন্যা - দুর্ভিক্ষের পীড়া দ্রুত উপশমিত হওয়ায় তাহাদের পূর্বতন ঐতিহ্য ও মনোভাব অক্ষুন্ন রহিয়া গিয়াছে । কিন্তু আধুনিক যুগের বৈপ্লবিক চিন্তাধারা ও জীবননীতি উচ্চবর্ণের ভাবতটভূমি উপচাইয়া কাহার - জীবনের সুরক্ষিত বেষ্টনী রেখাতে আঘাত হানিয়াছে ... তাহাদের অর্থনৈতিক দুরবস্থা ঘনীভূত করিয়া তাহাদের সামগ্রিক চিত্তকে পরিবর্তনোন্মুখ করিয়াছে । মহাযুদ্ধের আহ্বান, যন্ত্রযুগের আত্মকেন্দ্রিক আমন্ত্রণ তাহাদের নির্জন বাঁশবনের জঙ্গলের দুর্ভেদ্য পরিবেশকে ভেদ করিয়া তাহাদের কানে পৌঁছিয়াছে ও জীবিকার্জনের দুর্দম প্রেরণা তাহাদের বহুশতাব্দী অধ্যাত্ম সংস্কার - শাসিত চিত্তে এক কর্তব্যভারমুক্ত , বিলাস বিভ্রমে লোভনীয় , স্বেচ্ছাচারে নিরঙ্কুশ , অভিনব জীবন আস্বাদনের রোমাঞ্চ জাগাইয়াছে । যুদ্ধের নির্মম প্রয়োজন কালারুদ্র ও কর্তাবাবার দেবস্থানকে বর্ণসম্ভারের গুদামে পরিণত করিয়া , কোপাই-এর ধারের নিবিড়চ্ছায় বৃক্ষরাজি ও বাঁশবনের উৎসাদন করিয়া তাহাদের মনের আধিদৈবিক আশ্রয়কে বিলুপ্ত করিয়াছে - তাহারা এক মুহূর্তে প্রদোষান্ধকারাচ্ছন্ন মধ্যযুগ অতিক্রম করিয়া প্রয়োজনের পাকা সড়ক ধরিয়া যন্ত্র সভ্যতার , কেন্দ্র স্থলে আসিয়া পৌঁছিয়াছে । একটা সমগ্র

North Muslim University

সভ্যতা , একটা বহুযুগের জীবনাদর্শ , অধ্যাত্ম প্রভাবিত মানব জীবনের একটা অর্ধমূঢ় অবশেষ যেন আধুনিকতার বিস্ফোরণ - বহ্নিতে নিমেষে ভস্মীভূত হইয়া গিয়াছে ।" [৯৮]

বনোয়ারীর সঙ্গে করালীর শেষ সংঘর্ষ হয়ে যায় - সুবাসীকে কেন্দ্র করে । সেখানে ও করালীর জয় । আর 'কাহার পাড়ার শ্রেষ্ঠ পুরুষ কোশ কেঁধে বনোয়ারী বাবা ঠাকুরের পরিত্যক্ত স্থানটিতে টলতে টলতে এসে লুটিয়ে পড়ে হা - হা করে কাঁদতে লাগল । বুক চাপড়াতে লাগল অরণ্য বাননের মতো ।'

সঙ্গীহীন নিরানন্দ ঘরে রোগশয্যা থেকে উঠে বসে বনোয়ারী। বোধ হয় মরলেই ভাল হত ! 'পাপের ফলে দেবতা চলে গেলেন । বাবা ঠাকুর চলে গিয়েছেন । যুদ্ধ - কাল যুদ্ধ ।' শেষ পর্যন্ত কাহারদের বিশ্বাস করতে হয় - 'এমন যুদ্ধ ভূ-ভারতে কখনও হয় নাই ।' যুদ্ধের খবর হাঁসুলীবাঁকে এসে পৌছেছে - " জাপানীরা খুব যুদ্ধ চালিয়াছে । কলকাতায় বোমা মেরে - ভেঙে চুরমার করেছে। সেখানকার লোকে কুকুর বিড়ালের মত পালিয়ে এসেছে । চন্নপুরের কুঁড়ের ভাড়া পাঁচ গন্ডা টাকা । চন্নপুরে ঘর না পেয়ে জঙ্গলে সদ্‌গোপদের বাড়ি ভাড়া নিয়েছে দশ- বারো ঘর কলকাতার লোক । চালের মন চল্লিশ টাকা , ধানের মন চব্বিশ টাকা ।"

বাঁশবাড়ির বাঁশের সন্ধান দিয়েছে করালী । সেখানকার বাঁশবন শেষ হতে চলেছে। 'কেউ গড়ে , কেউ ভাঙে ' । সেই গড়া ভাঙার ইতিহাস রচনা করেছে বনোয়ারী ও করালী । বনোয়ারী, 'বাপ - পিতামোর ' ঐতিহ্যকে ধরে রাখতে আপ্রাণ চেষ্টা করেছে - হাঁসুলী বাঁকে দেবতাকে ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করেছে - কিন্তু ব্যর্থ হয়েছে । নতুন যুগের কর্ণধার করালী কাহার সমাজে বিধির বিধানকে লঙ্ঘন করেছে - নিয়ম ভেঙ্গেছে আর ভেঙ্গেছে বনোয়ারীর ঘর । " হাঁসুলীবাঁকের উপকথায় এ এখনও ঘটে নাই । বান এসেছে , ঝড় এসেছে - গাঁয়ে আগুনও লেগেছে , মড়কও হয়েছে , পৃথিবীও কেঁপেছে - তাপ আছে হাঁসুলী বাঁকের উপকথায় । দাঙ্গা আছে , ডাকাত আছে , কালো বউ, বড় বউয়ের প্রেতাত্মা আছে , কিন্তু যুদ্ধ নাই । সে যুদ্ধে হাঁসুলী বাঁকের তন্দ্রাভঙ্গ হয় উপকথার ছেদ পড়ে , এখনকার মানুষের জীবনস্রোতের আকর্ষণে ইতিহাসের ধারায় মিশে যায়,সে যুদ্ধ উপকথার কল্পনায় নাই ।"

বনোয়ারী আর্তনাদ করে ওঠে - 'কেনে বাঁচলাম আমি' ? - এ যেন মহাকাব্যের নায়কের পতন । বনোয়ারীর প্রতি লেখকের পক্ষপাতিত্ব ও সহানুভূতি এখানে ঝড়ে পড়েছে । পাঠকও যেন দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে তার পরাজয়ে । হাঁসুলীবাঁকের শেষ অংশে লেখকের আক্ষেপোক্তি শোনা যায় - "হাঁসুলী বাঁকের মানুষেরা - অন্ধকার রাত্রে বটতলায় আশ্রয় গ্রহণ কারী মানুষের দল । এ রাত্রি আদ্যিকালের আরম্ভ হয়েছে । শেষ কবে হবে জানে না । তার শেষ যেদিন হবে , সেদিন হাঁসুলী বাঁকেরও শেষ হবে কাহার জীবন যতদিন , এ রাত্রী ততদিন , হাঁসুলী বাঁকও ততদিন । তার পর হয়তো দহে পরিণত হবে কোপাইয়ের কোপ । নয়তো অন্য কিছু হবে , কি হবে কে জানে ।"

বনোয়ারী ও করালীর মধ্যে বার বার ঘটেছে সংঘাত । মানুষ হিসাবে , এরা কেউই কারো শত্রু নয় । কাহার কুলের আদিম ঐতিহ্য-এর ধারক বনোয়ারী এবং যন্ত্রযুগের প্রতিনিধি করালী -

এদের মধ্যে থেকে মাঝে মাঝেই বেরিয়ে আসতে দেখা যায় , মানুষ বনোয়ারী ও মানুষ করালীকে। বনোয়ারীর করালীর প্রতি অপত্যস্নেহ এবং করালীর বনোয়ারীর প্রতি শ্রদ্ধাবোধ - এর পরিচয় বহন করে । আসলে তাদের দ্বন্দ্বের মূলে রয়েছে , যুগের পরিবর্তন ।

বনোয়ারী তাদের প্রাচীন সংস্কারে বিশ্বাসী ; হাঁসুলী বাঁকের বাইরের জগৎকে সে জানতেও চায় না , বুঝতে ও চায় না । করালী ঘটনাচক্রে এই সংস্কার কেটে বেরিয়ে পড়েছে - বাইরের জগতে। সে অন্ধবিশ্বাসে সবকিছু মেনে নিতে শেখেনি ; যুক্তি দিয়ে যাঁচাই করতে গেছে , কাহারদের কথিত সত্যকে । এর ফলে কাহার ঐতিহ্যে আঘাত করে ফেলেছে বার বার; সে আঘাত কাহার মাতব্বরকেও আঘাত করেছে । শুধু তাই নয় , যারা সমাজের স্বার্থান্বেষী প্রভুশক্তির বিধানকে বিধির বিধান মনে করে , তাদের প্রতি সামন্ত প্রভুর অবিচারের প্রতিবাদ করে , কাহারদের সচেতন করতে চায় করালী । আবার ধনতান্ত্রিক সমাজে , যুদ্ধের ডামাডোল কিছু কাঁচা পয়সার মুখ দেখলেও - সেখানের প্রভুশক্তির বঞ্চনার শিকার হয়ে পড়ে থাকতে চায় নি বলেই - ফিরে আসতে চেয়েছে করালী , হাঁসুলী বাঁকের শান্তিপূর্ণ জগতের উদ্দেশ্যে ।

ইতিহাস - স্রোতে ভাসমান উপকথা

হাঁসুলী বাঁকের উপকথা শেষ হয়েছে। উপকথা এখন রূপ কথায় পরিণত। যে রূপ কথা বলে যায় বৃদ্ধা ভিখারিনী সুচাঁদ। "বাঁশবনে ঘেরা তন্দ্রা - মাখা স্বপ্ন সুলভ ছায়াচ্ছন্ন হাঁসুলী বাঁকের উপকথা। ফুলে ভরা, বিষেভরা, রঙে স্নিগ্ধ , বেরঙে উগ্র, হাঁসুলী বাঁকের উপকথায় বসন্ত তার সাদা রঙের তুলির দাগ, পাখি তার রক্ত লেখা।... করালী হল দৈত্য কিংবা শয়তান - কিংবা সেই হল রাজপুত্র , নতুন কালের মাতব্বর। যুদ্ধকে ওই ডেকে নিয়ে গিয়ে বেশি করে ঢোকালে হাঁসুলী বাঁকের কাহার পাড়ায়। সেই ঠিকাদারদের খবর দিলে। হাঁসুলী বাঁকের বাঁশবনে আদ্যিকালের বুড়ো বট রয়েছে। কেটে ফেললে সেই বটগাছটা।... হাঁসুলীবাঁকের উপকথার হাড় - পাঁজরা মেরুদন্ড কাটিয়ে এনে তৈরী করছে যুদ্ধের হুকুম মতো ইতিহাসের ছাঁদে ঘরবাড়ি ।"

হাঁসুলী বাঁকের উপকথা শেষ করতে এল বান । লেখক বলেছেন - " বন্যার কথা উপকথা নয় , ইতিহাসের কথা। ১৩৫০ ইংরেজী ১৯৪৩ সালের বন্যা । তেরশো পঞ্চাশের যে বন্যার রেললাইন ভেসে গেল ; সেই বন্যা। ইতিহাসে আছে তার কথা । দামোদরের অজয়ের ময়ুরাক্ষীর কোপাইয়ের বন্যায় শুধু রেল লাইন ভাসেনি , হাঁসুলী বাঁকের মতো অগণিত স্থানের উপকথার পটভূমি ভেসে গিয়েছে, পরিবর্তিত হয়ে গিয়েছে । ইতিহাস অবশ্য কর্তার বাণী কালরুদ্রের খেলা , হরির বিধান মানে না । যে বলে আকস্মিক , কাকতালীয় । বলুক - সত্য যাইহোক কাহারেরা একে সত্য বলেই মানে ।"

কোপাই এ ঐতিহাসিক বন্যা আসার আগেই উপকথার নায়ক বনোয়ারীর মৃত্যু ঘটে। মাতব্বরকে শেষ সম্মান জানাবার জন্য করলী আসে । উপকথার ছোট নদীটি ইতিহাসের বড় নদীতে মিশে যায়। এই ইতিহাস কাহারদের কৃষক থেকে কারখানার শ্রমিকে পরিণত করে ।

আশাবাদ

কাহারেরা এখন যন্ত্র যুগের মানুষ । তাই তাদের আদব - কায়দা , পোশাক - আশাক, বিশ্বাস সংস্কার সম্পূর্ণ বদলে গিয়ে , তারা হয়ে উঠেছে , নতুন যন্ত্র মানব , ধুলি মাটির বদলে তোকালি , কাস্তে - লাঙলের বদলে শাবল - গাঁইতি, তারা ধারণ করেছে । তবে চন্দন পুরে গিয়ে ও তাদের দুঃখ দুর্দশার ইতি ঘটে নি । অভাব আছে , আছে রোগ , আছে প্রবলের অত্যাচার-শোষণ, তবে পদ্ধতিটা আলাদা । এখন আর সাপে না কাটলেও কলে কেটে মরে কাহারেরা । তার জন্য বাবা ঠাকুরকে ডাকার , তাদের আর অবকাশ নেই, নেই সরল বিশ্বাস। বিশ্বাসের জায়গা দখল করেছে সংশয় সন্দেহ । তবে তারাশংকরের হাঁসুলীবাঁকের কাহারেরা যুগপ্রভাবে যন্ত্র মানবে পরিণত হয়েও বোধ হয় কোথাও একটা মনুষ্যত্বের টান অনুভব করে। তাই তারা " চন্দনপুরের ঘুপ্‌চি কোয়াটার্সে থেকেও তাকায় বালি ভরা ওই হাঁসুলী বাঁকের দিকে । কিন্তু ফেরা উপায় কি ! পথ প্রদর্শক হবে কে! এই চিন্তার অবসান হল সেদিন যেদিন দেখা গেল হাঁসুলী বাঁকের নতুন যুগের নায়ক করালী গাঁইতি হাতে বালি খুঁড়ছে । করালী নতুন হাঁসুলী বাঁকের সৃষ্টি করতে চাইছে । সে উপকথার কোপাই কে ইতিহাসের গঙ্গায় মিলিয়ে দেবার পথ কাটছে ।"

হাঁসুলী বাঁকের কাহারেরা তাদের চাষ বাস ছেড়ে কারখানার মজুরে পরিণত হয়ে ও আবার হাঁসুলী বাঁকে ফিরে আসার স্বপ্ন দেখেছে -কাজের ফাঁকে উদগ্রীব হয়ে তাকিয়ে থেকেছে হাঁসুলী বাঁকের দিকে - তারা চেয়েছে সেই পথে ফিরে যেতে - একদিন পথ প্রদর্শককে আবিস্কারও করে ফেলেছে - তাদের ফিরে আসার আশা জাগরিত হয়েছে , হাঁসুলী বাঁকে গাঁইতি নিয়ে বালি সরাতে, মাটির সন্ধানে ব্যস্ত করালীকে দেখে । এখানে লেখক আশাবাদী ।

অন্ত্যজ শ্রেণীর মানুষ ঃ তারাশঙ্করের হৃদয়সিক্ত অভিজ্ঞতা

বাংলা সাহিত্যে অন্ত্যজ চারিত্রের সাক্ষাৎ মিলেছে প্রচুর। সেক্ষেত্রে লেখক এদের কি ভাবে প্রত্যক্ষ করেছেন, কি ভাবে উপলব্ধি করেছেন, কি ভাবেই বা পরিবেশন করেছেন - সেটা খুব গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হয়ে দাঁড়ায় - অন্ত্যজ চরিত্র এবং তার অবস্থান নিয়ে আলোচনার ক্ষেত্রে। অন্ত্যজদের নিয়ে লিখেছেন বহু লেখক । কিন্তু এদের কিভাবে দেখেছেন তারা - কাছ থেকে, দূর থেকে , না তাদের একজন হয়ে । তারাহশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় হাঁসুলী বাঁকের কাহারদের দেখেছিলেন - অত্যন্ত কাছ থেকে । তাই বোধ হয় অন্তজ শ্রেণীর মানুষকে নিয়ে মহাকাব্যোচিত উপন্যাসটি লিখতে পেরেছিলেন !

"তারাশংকর লাভপুর সংলগ্ন কাদপুরের কাহারদের যেমন দেখেছেন বর্ণনাও করেছেন তেমনই বিশ্বস্ততার সঙ্গে , আর এর সঙ্গে মিশিয়েছেন তাঁর গভীর সংবেদনশীলতা । কিছু কিছু মানুষতো সত্যিই রক্ত মাংসের মানুষের অনুসরণে আঁকা ।"[৯৯]

এই উপন্যাসের অন্যতম চরিত্র করালী বাস্তবে করালীচরণ মন্ডল , তারাশংকরের খুব কাছের লোক ছিলেন। "এই করালীচরণ লাভ পুরের কাছাকাছি একটি গ্রামের কৃষক পরিবারের ছেলে ছিল।

চল্লিশের দশকে তারাশংকরের বাগবাজারের বাসস্থানে কিশোর ভৃত্য হিসেবে কাজ করতে আসে । হাঁসুলী বাঁকের উপকথার করালীর মতোই তারও শ্যামলা রঙ , খ্যাদা নাক ও আকর্ণবিস্তৃত ছিল ; খানিকটা দুঃসাহসী ,বেপরোয়া এবং অত্যন্ত কর্মকুশল ছিল সে । তারাশংকর-এর টালাপার্কের বাড়ি তৈরীর সময় সে ছিল তত্ত্বাবধায়ক । এই সময়ে সে মোটর চালনোও শিখে নেয় । তারপর টালাপার্কের বাড়িতে সেই হয় তারাশংকরের কালো রং - এর রথটির সারথি । সেই সূত্রে তার আলাদা বাসস্থান হয় বাড়ির পেছনে গ্যারেজ সংলগ্ন ছোট্ট ঘরে । করালী তার পদোন্নতি সম্বন্ধে খুব সচেতন ছিল । সে তারাশংকরের বিশেষ প্রিয় পাত্র ছিল ; বাড়ির অন্যান্য কর্মচারীদের সঙ্গে নিজের তফাৎটা সে বেশ জাহির করতে ভালবাসত, তাছাড়া মাইনেও সে তাদের থেকে অনেক বেশী পেত। তারাশংকরকে ডানা দিয়ে আগলে কোথাও নিয়ে যাওয়া , তারাশংকরের পোষা কুকুরটি দেখা শোনা, গাড়ী নিয়ে তারাশংকরের ' বিশাল হোটেলের ' বাজার করা সবই সে নিপুণতার সঙ্গে করত। ঔদ্ধত্যও চোয়াড়ে স্বভাবের এই করালী ধীরে ধীরে তার গ্রাম্যতা কাটিয়ে পোশাক-পরিচ্ছেদ কথাবার্তা সবেতেই শহুরে ধাঁচ ধরে ফেলেছিল , যদিও তার ঔদ্ধত্য কমেনি । সে বাবুদের কাছে ছাড়া আর সবার সঙ্গে উদ্ধত ব্যবহার করত ।" [১০০]

এই প্রসঙ্গে নসুবালা সম্বন্ধে দু'একটি কথা উদ্ধার করব -" এই নসু নামের লোকটি ষাটের দশকে খুবই আসত তারাশংকরের নবীকৃত বৈঠকখানা বাড়িতে । তারাশংকরকে যারা খুব আপনজন ভাবত নসুও তার মধ্যে একজন । লাভপুরের লোকেদের উচ্চারণে নসু হয়ে দাঁড়িয়ে ছিল 'লোসা'। সে প্রায়ই আসত। কথা বলত , গান শোনাত । বেঁটে খাটো , রোগা , কালো একটু পুরুষালী মুখের গড়নের সাদা কাপড় ঘোমটা দিয়ে পরা এক মহিলা বলেই মনে হত তাকে । তার গান তারাশংকর টেপরেকর্ডারে নিজে তুলেছেন ঃ

" আগাম জলে কলমীলতা ,
ডগ্‌মুচুরে লে ভেঙ্গে লো ,
কোথা গেল সে ?
আমার মন ঘোরে আশে পাশে লো ।"

নসুর চরিত্রের ও আচরণের সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য যা অল্পক্ষণের পর্যবেক্ষণেই ধরা পড়ে , তা হল তার কথা বলা ও হাত মুখ নাড়ার মধ্যে একটু মেয়েলি ঢঙের আধিক্য । একেবারে হাঁসুলী বাঁকের উপকথা বর্ণিত নসু যেন । " [১০১]

কতকটা অন্তরঙ্গ লেখক এদের দেখেছিলেন - তা লেখকের আত্মজীবনী থেকেও উদ্ধার করা যায় -" এই জানার পুঁজির মূল্য বুঝে আমি এদের কথা বাংলা সাহিত্যে বলেছি , নিজের কথা বলার মতো করেই বলেছি । 'হাঁসুলী বাঁকের উপকথা'র মানুষদের পর্যন্ত আমার এইভাবে জানার সুযোগ হয়েছিল । ওই সুচাঁদ এবং আমি বসে গল্প করেছি আর বিড়ি টেনেছি ।... পথে নসুবালার সঙ্গে দেখা হয় ; সে চুল বেঁধে নাকছাবি পরে থমকে দাঁড়ায় , বলে - হেই মাগো । কখন এলা ? বলি মনে পড়ল

আসতে । ছেলেরা ভাল আছে ? তোমার শরীর এমন কাহিল হল ক্যানে ? .. এদের সঙ্গে আমার পরম সৌভাগ্যের ফলে একটি আত্মার আত্মীয়তা গড়ে উঠেছে । এমনই সে আত্মীয়তা যে প্রবাসে থাকি - প্রতিষ্ঠা খানিকটা পেয়েছি, তবু সে আত্মীয়তা এতটুকু ক্ষুন্ন হয়নি । এ পাওয়া কি পাওয়া সে আমি জানি । তাই আমি এদের কথা লিখি। এদের কথা লিখবার অধিকার আমার আছে। আমি ওদের জানি - ওদের আত্মীয় আমি। উপকারী নয়, কৃতজ্ঞতাভাজন নয়, ভালোবাসার জন।" [১০২]

স্পষ্টতঃই বোঝা যায় , তারাশংকর সেই দলের লেখক - যাঁরা মানুষের সঙ্গে একাত্ম হয়ে মানুষকে জেনেছেন , বুঝেছেন , উপলব্ধি করার চেষ্টা করেছেন । তাই চরিত্রগুলি তাদের নিজস্ব সমাজ কাঠামোর মধ্যে , তাদের নিজস্বতা নিয়ে এত জীবন্ত হয়ে উঠতে পেরেছে ।

তারাশংকর সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের মন্তব্য স্বরণ করে বক্তব্য শেষ করব - " তুমি দেখেছ অনেক । এত দেখলে কি করে ? ... দেখবে - দু' চোখ ভরে দেখবে । দূরে দাঁড়িয়ে নয় । কাছে গিয়ে পাশে বসে তাদের একজন হয়ে যাবে । সে শক্তি এবং শিক্ষা তোমার আছে ।" [১০৩]

খ) নাগিনী কন্যার কাহিনী

নাগিনী কন্যার কাহিনী ঃ ভিন্নরূপ ভিন্ন রস

তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'নাগিনী কন্যার কাহিনী' (১৯৫১) ভিন্ন স্বাদের উপন্যাস। নাগিনী কন্যার জগৎ সভ্যসমাজ থেকে দূরে অবস্থিত। এ এক আলাদা জগৎ। তাই 'নাগিনী কন্যার কাহিনী' উপন্যাসে বর্ণিত অন্ত্যজ মানুষের জীবনযাত্রা সম্পূর্ণ ভিন্নখাতে বয়ে গেছে।

আমরা যে সমাজে বাস করি, সেই সমাজ-কাঠামোর মধ্যে অন্ত্যজ মানুষদের স্থাপন করে, তার আলোচনা করতে গিয়ে লক্ষ্য করেছি, সমাজ বিবর্তনের ইতিহাস, যুগে যুগে অন্ত্যজ মানুষদের জীবনধারাকে স্পর্শ করে গেছে (সে ভারতবর্ষের যতই প্রত্যন্ত অঞ্চল হোক না কেন)। তাই অন্ত্যজদের ব্যক্তিগত ও সামাজিক সমস্যা এই আলোচনার মধ্যে দিয়ে উঠে এসেছে। কিন্তু নাগিনী কন্যারা যে জগতে বাস করে, সভ্যসমাজে সঙ্গে তার কোন সম্পর্ক নেই। মাঝে মধ্যে পেশাগত কারণে সভ্যসমাজে তারা আবির্ভূত হলেও -সমাজ বিবর্তনের কোন ঘাত-প্রতিঘাত তাদের জীবনধারাকে ছুঁয়ে যায়নি। বিশেষ করে লেখক তারাশংকর সেই দিকে আগ্রহ প্রকাশ করেন নি।

বাস্তব জগতের অধিবাসী এই নাগিনী কন্যারা যেন রূপকথার জগতে বিচরণ করে। তাদের সমাজ, তাদের নিয়ম মতো চলে। তাদের ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত জীবনযাত্রা যে নিয়মের ছকে বাঁধা - তার সঙ্গে সভ্যসমাজের নিয়মনীতির কোন মিল নেই। তাই গতানুগতিকতার ছাঁদে ফেলে এসে এদের আলোচনা করা যায় না। এরাও অন্ত্যজ শ্রেণীর মানুষ।এদের ব্যক্তিগত আশা আকাঙ্ক্ষা, আকর্ষণ-বিকর্ষণ, বিশ্বাস-সংস্কার, দ্বন্দ্ব-সংঘাত - নিয়ে এদের এক বিচিত্র জীবন চিত্র এখানে আঁকা হয়েছে। এরা অর্থাৎ এই বেদে সম্প্রদায় স্বতন্ত্রভাবে বসবাস করলেও - মাঝে মাঝে এরা সভ্যসমাজে আবির্ভূত হয় জীবিকার সন্ধানে। বিভিন্ন খেলা দেখানো, সাপের বিষ বা অন্য জড়ি বুটী বিক্রি করে।

সভ্য সমাজ থেকে দূরে অবস্থিত এই সম্প্রদায়ের সঙ্গে পরিচিতির অভাব এদের সম্বন্ধে কৌতূহল জাগিয়ে তোলে । এদের সম্বন্ধে এই স্বাভাবিক কৌতূহলই বোধ হয় আলোচ্য উপন্যাস সৃষ্টিতে লেখকের অনুপ্রেরণা।

"রাঢ়ের বিলীয়মান লোকসংস্কৃতি ও লৌকিক কাহিনী এবং ইতিহাস অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে তারাশংকর এই উপন্যাস অঙ্কিত করেছেন। মা-বিষহরি বা মা-মনসার কাহিনী অথবা চাঁদ সদাগর ও বেহুলা-লখীন্দরের উপাখ্যান বাঙালীর একান্ত আপন জিনিস। বহু শতাব্দী ধরে বেহুলা ও লখীন্দরের উপাখ্যান এবং মাল বেদে, সাপুড়েদের বিচিত্র কাহিনী ও বাঙালীর মর্মমূলে প্রোথিত। তারাশংকর বিংশ শতাব্দীর মধ্যাহ্নে সাপুড়ে ও বেদেদের কাহিনী নবরূপে পাঠকের সামনে উপস্থাপিত করেছেন।" [১০৪]

পৌরাণিক উপন্যাস ও মনসামঙ্গলের কাহিনীর কে আশ্রয় করে অন্ত্যজশ্রেণীর বেদে-সম্প্রদায়ের জীবনযাত্রার নিখুঁত চিত্র যেমন এখানে আছে, তেমনি আবার এই কুসংস্কারাছন্ন সমাজবন্ধন ছিন্ন করে মানবতার জয় ঘোষণা করা হয়েছে।

অন্ত্যজ নাগিনী কন্যা ঃ পরিচিতি এবং

"যে সমস্ত অনার্য জাতি ক্রমশঃ হিন্দু সমাজভুক্ত হইয়া আর্যধর্মের অধ্যাত্মভাব প্রধান নিয়ম-সংযমের সহিত প্রাচীন সমাজপ্রথা ও জীবনবোধকে এক উদ্ভট সমন্বয়ে গ্রথিত করিয়াছিল, বেদে সম্প্রদায় তাহাদের মধ্যে অন্যতম।" [১০৫]

তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায়ের সৃষ্টিসম্ভারে অন্ত্যজ মানুষের কথা বারে বারে ঘুরে ফিরে এসেছে। বিশেষ করে অন্ত্যজ সমাজের অন্তর্ভুক্ত বেদে জাতটার প্রতি তাঁর আগ্রহ বোধ হয় বেশি ছিল। এই বেদে সম্প্রদায়কে নিয়ে তিনি একাধিক কাহিনী লিখেছেন। সাপুড়ে, বেদেনী বাজিকরীরা তাঁর রচনায় ভিড় করেছে বারবার। লেখক তাঁর 'বেদেনী' গল্পের এক জায়গায় বলেছেন- "বিচিত্র জাত বেদেরা। জাতি জিজ্ঞাসা করিলে বলে, বেদে । তবে ধর্ম ইসলাম। আচারে পুরা হিন্দু, মনসা পূজা করে, মঙ্গল চন্ডী-ষষ্ঠীর ব্রত করে, কালী-দূর্গাকে ভূমিষ্ট প্রণাম করে, নাম রাখে শম্ভু, শিব, কৃষ্ণ, হরি,কালী,দূর্গা, রাধা, লক্ষ্মী। হিন্দু পুরাণ গান করে, তাহারা নিজেরা বলে - পটুয়া চিত্রকরের জাতি। বিবাহ আদান-প্রদান সমগ্রভাবে ইসলাম সম্প্রদায়ের সঙ্গে হয় না, নিজেদের এই বিশিষ্ট সম্প্রদায়ের মধ্যে আবদ্ধ। বিবাহ হয় মোল্লার নিকট ইসলামী পদ্ধতিতে, মরলে পোড়ায়না, কবর দেয়। " [১০৬]

'নাগিনী কন্যার কাহিনী'-তে অবশ্য তারাশংকর বেদে সম্প্রদায়ের একটা আলাদা জগৎ গড়ে তুলেছেন। এ জগৎ যেন রূপকথার জগৎ। পৌরাণিক গাল গল্প ও জনশ্রুতি এবং মধ্যযুগের মনসামঙ্গলের কাহিনীকে আশ্রয় করে এই আধিদৈবিক জগৎ গড়ে উঠেছে। এই বেদে সম্প্রদায় হল, "সাঁতালীর বিষবেদে-সাঁতালী ওদের গ্রামের নাম। হিজলবিলের ধারে ভাগীরথীর চরভূমির ঘাসবন,

ঝাউবন, দেবদারু গাছের সারির আড়ালে, ওই হাঙরমুখী নালার ঘাট থেকে চলে গেছে একফালি সরুপথ, দুদিকে ঘাসবন, মাঝখানে পায়ে পায়ে বনপথ, এঁকে বেঁকে চলে গিয়েছে ওই বিষ-বেদেদের সাঁতালী গ্রামের মাঝখানে, বিষহরি মায়ের 'থান' অর্থাৎ স্থান পর্যন্ত।"

এই সাঁতালী গ্রামের ঘাসবনের মধ্যে যেখানে কাল নাগিনীদের বাসভূমি, বিষবেদেরা সেখানে থাকতে ভালেবাসে । বন্যার ফলে, সেখানার পাঁকাল মাটি, ঘাস পচা ভ্যাপসা গন্ধ,মশা-মাছি, ডাঙায় বাঘ, জলে কুমীর, কামট, হাঙর আর অসংখ্য সাপ - বিষবেদের কাছে এই হল স্বর্গ। কারণ এখানেই আছে মা-মনসার আটন। আর বন্যার জলে ভেসে আসা অসংখ্য নাম-না-জানা সাপের আবাসস্থল।

হিজলবিলে মনসার আটনের সুন্দর বর্ণনা দিয়েছেন লেখক। মা মনসার রূপের বর্ণনার সঙ্গে এখানকার প্রকৃতি যেন মিলে মিশে একাকার হয়ে গেছে। "এই রূপই যেন তুমি দেখতে পাবে গাছের দিকে তাকালে। দেখবে হয়তো সবচেয়ে উঁচু ডালটি জড়িয়ে ফণা তুলে ফুঁসছে, বিশাল ফণা এক দুধে গোখরো। শকুনি গৃধিনীর আক্রমণকে প্রতিহত করবার জন্য সে অহরহ প্রস্তুত হয়ে আছে। তারপরে তাকাও ডালে ডালে। দেখবে পাকে পাকে জড়িয়ে কি যেন সব নড়ছে, দুলছে, কখনও বা মাথা তুলে দাঁড়াচ্ছে। সাপ, সব সাপ। বন্যায় ডুবছে হিজলের ঘাসবন, সাপেরা উঠছে গাছের ডালে ডালে। কত-নতুন কালীনাগ কত দেশ থেকে গঙ্গার জলে ভেসে আসতে হিজলের ঝাউডাল দেবদারু ডাল জড়িয়ে ধরে ধীরে ধীরে উপরে উঠছে। খুব সাবধান! চারিপাশের জলের স্রোতে সতর্ক দৃষ্টি রেখো, হয়তো ঝপ করে নৌকার কিনারা জড়িয়ে ধরবে স্রোতে ভেসে চলা সাপ! গাছের তলাগুলো এড়িয়ে চলো; হয়তো উপর থেকে ঝপ্ করে খসে পড়বে সাপ!"- এ জমি মা বিষহরির সনদ দেওয়া জমি। কোনও জমিদার, কোনও বিষবেদের কাছে এ জমির খাজনা আদায় করতে পারে না।

এদের ধারণা, আদিযুগ থেকে চম্পাই নগরের সাঁতালী পাহাড়ে বাস করে আসছে ওদের শিরবেদে। এরা তখন ছিল বিষবৈদ্য। পরবর্তীকালে এদের সে বাসও উঠেছে, জাতও গেছে। মা লক্ষ্মী এদের ছেড়েছেন। তবে বিষহরির কৃপায় এরা নাগিনী কন্যা পেয়েছে। "রাত্রির মতো কালনাগিনী, সুন্দরী, সুকেশী মেয়ের সুচিক্কণ তৈল মসৃণ চুলে রচনা করা বেণীর গঠন আর তেমনি তার কালোরঙের দীপ্তি! কালো কেউটে অনেক জাতের আছে। কালোর ওপর শ্বেত সরষের মতো সাদা ছিট আছে যে কেউটের কালো গায়ে, সে কেউটে জেনো শামুক ভাঙা কেউটে। যে কেউটের গলায় কণ্ঠীমালার মত, যার গায়ের রঙ কালো রঙের চেয়েও ঘন কালো,কালো রঙের দুটি দাগের বেড় আছে, সে জেনো কালীদহের কালীনাগের জাত। কালনাগিনী শুধু কালো, তার লেজ খানিকটা মোটা, বেহুলা জাঁতি দিয়ে কেটে নিয়েছিল তার লেজের খানিকটা। কালনাগিনীর নিজের জাত নেই।অন্য নাগের জাতের সন্তান প্রসব করে কালনাগিনী।তাই থেকে হয়েছে নাকি নানা জাতের কেউটের সৃষ্টি! মা বিষহরির ইচ্ছায় ওরই মধ্য দুই-চারিটি কন্যা একেবারে রক্ত মায়ের জাত নিয়ে জন্মায়, কালনাগিনীর ধারা অব্যাহত রাখার জন্য ! কালনাগিনী চেনে ওই বিষ বেদেরা।" কালনাগিনী রূপের সঙ্গে নাগিনীকন্যাদের একটা অদ্ভুত সাদৃশ্য আছে। এই নাগিনী কন্যারা যখন রূপকথার জগৎ থেকে, সভ্যজগতে আবির্ভূত হয়,তখন সভ্যজগতের আলোয় তাদের কেমন দেখায় - সে বর্ণনাও লেখক দিয়েছেন -

"বেদেরা কালোই হয়, কিন্তু এমন মসৃণ উজ্বল কালো রঙ কখনোও দেখেননি শিবরাম । তেমনি ধারালো গড়ন। মেয়েটির বয়স অবশ্য অল্প, কিন্তু বেশী বয়স হলেও একে দূর থেকে মনে হবে কিশোরী ময়ে। ছিপছিপে পাতলা গড়ন,দীর্ঘাঙ্গী, মাথায় একরাশি চুল, রুক্ষ কালো করকরে কোঁকড়া চুল, খুলে দিলে পিঠের আধখান ঢেকে চামরের মতো ফাঁপা হয়ে বাতাসে দোলে,কোঁকড়া চুল টেনে সোজা করলে এসে পড়ে জানুর উপর। কালো রঙের উপর চিকচিক করছে তিন অঙ্গে চারখানি তুলির রেখায় টানা সাদা রেখা। কালো চুলের ঠিক মাঝ খানে পৈতের সুতোর মতো লম্বা সিঁথিটি, ধারালো নাকটির দুপাশে নরুণ দিয়ে চেড়া আর সরু অথচ লম্বাটানা পদ্মের একেবারে ভিতরের পাপড়ির মতো দুটি চোখের সাদা স্রোত,আর ঠোঁটের ফাঁকে ছোট সাদা দাঁতের সারি। পরনে লাল রঙে ছোপানো তাঁতে বোনা খাটো মোটা রাঙা সারি, গলায় পদ্মবীজের মালা,তার সঙ্গে লাল সুতো দিয়ে ঝুলছে মাদুলি, পাথর আরও অনেক কিছু। হাতের মণিবন্ধ খালি, উপর হাত লাল সুতোর তাগা টান করে বাঁধা, নরম কালো হাতের বাইরে যেন কেটে বসে গেছে।"

হিজল বনে মা মনসার আটনের বর্ণনা, কালনাগিনীর রূপের বর্ণনা এবং নাগিনী কন্যার রূপের বর্ণনা, 'মনসামঙ্গলে' বর্ণিত মনসা দেবীর রূপ-বর্ণনা, কোথায় যেন মিলেমিশে একাকার হয়ে যায় -

" সেবক রক্ষিতে দেবী হইলা সুবেশ
চিরনিয়া নাগ লৈয়া কুরুলিলা কেশ।
নাইনাড়া নাগে কৈলা করবী প্রতুল
উদয়কাল নাগেতে খোপার পঞ্চফুল।
সিন্দুরিয়া নাগ হইল সীমন্তে সিন্দুর
উদয়গিরি সূর্য জেনো করিছে মেদুর।
সর্বনামে নাগেতে মাথায় সিতি-পাতি
নীলমেঘ তটে জেন বিজলী-দিপতি।
কালি-নাগিনী হৈল নয়নে কজ্জল
কুবলয় দলে জেন খঞ্জন যুগল।" [১০৭] ইত্যাদি

তাই নাগিনী কন্যার জগৎ আমাদের পরিচিত সভ্যজগতের বাইরে অনার্য সুলভ আদিম ভাবনা জড়িত, অলৌকিক রহস্যমন্ডিত এক অন্য জগৎ। এই জগৎ থেকেই উঠে এসেছে তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাগিনী কন্যারা, তাদের উপর আরোপিত অলৌকিকতার প্রসাধন মেখে।

দুই নাগিনী কন্যার পরিচয়

বেদে সমাজ থেকেই নাগিনীকন্যার উৎপত্তি। বেদে জাতের বিধবাদের আবার বিয়ে হয়। যদিও বেদে সমাজে মেয়েদের বিয়ে ছ'মাস থেকে তিন বছরের মধ্যে হয়। কিন্তু বিধবাদের ক্ষেত্রে

ষোল বছরের আগে বিয়ে হয় না। কারণ এই সময় এদের মধ্যেই নাগিনীকন্যার আবির্ভাব ঘটে। তাই এদের প্রতি সকলের সতর্ক দৃষ্টি থাকে। মা মনসা কাকে দয়া করবেন, সে-ই নাগিনীকন্যায় রূপান্তরিত হবে। ধীরে ধীরে তার কপালে ফুটে উঠবে নাগচক্র। এর জন্য ষোল বছর পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে। নতুন নাগিনী কন্যা দেখা দিলেই, পুরনো নাগিনী কন্যাকে চলে যেতে হবে গ্রামের প্রান্তে অবস্থিত কুঁড়েতে। সেখানে তার বাকি জীবন কেটে যাবে-মা বিষহরির ধ্যানে -আগামী জন্মের ভাগ্যোদয়ের সাধনায়। পুরুষ শাসিত অন্ত্যজদের সমাজেও নারী বঞ্চনার আর এক ধরণ।

এই উপন্যাসে নাগিনীকন্যা দু'জন-শবলা আর পিঙলা। নাগিনীকন্যার উৎপত্তির অলৌকিক আবরণে এদের মানুষী সত্তা চাপা থাকে । বেদে সমাজের সমাজপতিকে বলা হয় শিরবেদে। এখানে শবলার শিরবেদে মহাদেব আর পিঙলার শিরবেদে গঙ্গারাম। এই শিরবেদেরা যেহেতু তাদের সমাজের দন্ডমুন্ডের কর্তা, সেহেতু এদের ক্ষেত্রে কোন বিধিনিষেধ নেই। এরা সমাজের মাথার উপর পা দিয়ে চলে আর যেকোনও ব্যভিচার এরা করতে পারে। কারণ তাদের পাপমুক্তির জন্য নাগিনীকন্যারা আছে, নাগিনীকন্যার পুণ্যে তাদের পাপস্খলন ঘটে। তাই নাগিনীকন্যার ধর্ম যাতে অটুট থাকে - সেদিকে তাদের অতন্দ্র দৃষ্টি। তবে নাগিনীকন্যারা যেহেতু দেবী স্বরূপিনী সেইহেতু মা বিষ-হরির ভয়ে তারা এদের কাছে ঘেঁষতে পারেনা। নাগিনী কন্যার ধর্ম ব্রহ্মচারিণীর ধর্ম। মা মনসার মানসকন্যা এরা - এদের ওপর মা-মনসার 'ভর' হয়। সেই 'ভর' অবস্থায় তাদের মুখ থেকে নিঃসৃত বাণী হল দৈববাণী বা দেবীর প্রত্যাদেশ, সেখানে সমাজপতি শিরবেদের ও কোন কথা চলে না। সে ক্ষেত্রে সমাজে নাগিনীকন্যার স্থান সবার উপরে। শিরবেদে সর্বদা সতর্ক থাকে নাগীনকন্যার ধর্মরক্ষার জন্য - যাতে কোন পুরুষ বা নাগিনীকন্যাকে স্পর্শ করতে পারে। তাহলেই সে সমাজে পতিত হবে-সমাজের ও পতন ঘটবে। বিশেষ করে সমাজের সমস্ত পাপ নীলকণ্ঠের মতো ধারণ করে নাগিনীকন্যা তার পুণ্য কর্মফলে।

"প্রাচীন ও মধ্যযুগে রাজশক্তি ও যাজকশক্তির দ্বন্দ্বের মতো শিরবেদেও নাগিনী কন্যার শক্তির প্রতিদ্বন্দ্বিতা বেদে জাতির ইতিহাসে একটা চির-আবৃত ঘটনা ক্রম। তারাশংকরের উপন্যাসে একবার মহাদেব ও শবলা আর একবার গঙ্গারামও পিঙলার মাধ্যমে এই দ্বন্দ্বের নিদারুণ পরিণতি ও নির্মম ঘাত-প্রতিঘাত দেখানো হইয়াছে। শিরবেদে সমাজনেতা, কিন্তু তাহার কোনও অলৌকিক শক্তি নাই। নাগিনীকন্যা মা-বিষহরির সেবায় উৎসর্গীকৃতা, বিশেষ অবয়বচিহ্নাঙ্কিতা, জীবন সংঘটনের একটি বিশেষ পরিণতি-পরিচিতা যুবতী নারী। সেই বেদে জাতির ধর্মবোধের প্রতীক, উহাদের অপরাধস্খালনকারিনী ও চরিত্রবিশুদ্ধি রক্ষয়িত্রী পুণ্যশক্তি, দেবমানসের প্রত্যক্ষসংস্পর্শ জাত দিব্যদৃষ্টির অধিকারিনী। অতন্ত্র, নির্ণিমেষ, অন্তর রহস্যাবগাহী বিধাত্রী চেতনা যতই ক্ষীণ হউক তাহার মধ্যে সক্রিয়; দেবতার ইচ্ছা তাহারই মধ্যে অন্ধকার রাত্রির খদ্যোৎ দীপ্তির ন্যায় ক্ষণিক আলোকবিন্দুতে উদ্ভাসিত। সমস্ত সম্প্রদায়ের অধ্যাত্ম জীবন তাহারই অঙ্গুলি-হেলনে সঞ্চালিত। প্রাচীন সমাজ জীবনের দিব্য দৃষ্টিসম্পন্না, ধ্যানমহীয়সী নারীর (Prophetess) ন্যায় বাঙলাদেশে ঊনবিংশ শতকে এক কুসংস্কারাছন্ন, মৃত্যুদূতের নিবিড় সংশ্লেষাবদ্ধ, অস্পৃশ্য সম্প্রদায়ের মধ্যে এই নাগিনী কন্যা যেন

অবলুপ্ত অতীতের শেষ বিস্ময়কর নিদর্শনরূপে বর্তমান।" [১০৮]

তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায়ের দুই নাগিনীকন্যা শবলা ও পিঙলা কিন্তু তাদের কুসংস্কারাছন্ন সমাজের নিগড় ভেঙে, দেবীত্বের আচরণ ছিন্ন করে, তাদের মানুষীসত্তা নিয়ে বেরিয়ে পড়েছে- প্রকৃতির নিয়মে। ষোল বছর বয়স থেকে যে কামনা বাসনা তাদের অবরুদ্ধ, কঠোর সংযমের শাসনে - সেই অবরুদ্ধ মানবত্মা বেরিয়ে এসেছে, তার রক্তমাংসের নারীসত্তা নিয়ে। নাগিনীকন্যার শরীর থেকে চাঁপা ফুলের সৌরভ বেরিয়েছে - যে সৌরভ, ছড়িয়ে পড়েছে চারিদিকে - শিরবেদে সতর্ক হয়ে উঠেছে।

অকাট্য যুক্তি তাদের সমাজপতির। নিজেরা পাপ করলে, তাদের পাপমুক্তির জন্য আছে নার্নীকন্যা। তাই নাগিনীকন্যার ব্রতভঙ্গ হলে চলবে না। তারাশংকরের প্রথম নাগিনী কন্যা শবলা আকৃষ্ট হয়েছিল এক তরুণ বেদের প্রতি। সেক্ষেত্রে সে তার ব্রতচারিণীর ধর্ম-রক্ষার্থে সেই তরুণ বেদেকে মণ দিলেও দেহধর্ম অক্ষুন্ন রেখেছিল। কিন্তু সদাসতর্ক শিরবেদে নাগিনীকন্যার ধর্মরক্ষার্থে সেই তরুণকে হত্যা করে। সদ্য ধরা রাজ গোখরোর দংশনে মৃত্যু ঘটে শবলার প্রেমিকের। নাগিনীকন্যা শবলা কাল নাগিনীর মতোই প্রতিহিংসা পরায়ণা। তাই, শিরবেদে মহাদেব তার হাত থেকে নিস্কৃতি পায়নি। নাগিনীকন্যার বিষ নখের আঁচরে মৃত্যুবরণ করে মহাদেব শিরবেদে। প্রেমের জন্য শবলা নাগিনীকন্যার ব্রতভঙ্গ করে। পরে এক মুসলমান বেদের সঙ্গে সংসার পাতে।

পরবর্তী নাগিনীকন্যা পিঙলার দেহে যখন চাঁপাফুলের সৌরভ বের হয় - তখন নাগুঠাকুরের প্রতি আকৃষ্ট হয় সে । এই ভালবাসার তপস্যা করতে গিয়ে, শেষ পর্যন্ত তাকে প্রাণ দিতে হয় - নাগুঠাকুরের ফেলে যাওয়া শঙ্খচূড়ের হাতে। পিঙলার মৃত্যুর পর সাঁতালীর বেদে সমাজ ছত্রভঙ্গ হয়ে যায়। নাগুঠাকুর শিরবেদেকে হত্যা করে সাঁতালী গ্রামের বেদে সমাজকে তছনছ করে দেয়।

ভ্রষ্টাচার সমাজ ঃ নাগিনী কন্যার বিদ্রোহ

'নাগিনীকন্যার কাহিনী' উপন্যাসে সভ্য সমাজ বহির্ভূত অন্ত্যজ বেদে সম্প্রদায়ের জীবনচিত্র এঁকেছেন তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায়। চিত্রকর তারাশংকর তুলির টানে সে চিত্র অসাধারণ হয়ে উঠেছে। পৌরানিক প্রেক্ষাপটে, অরণ্য প্রকৃতির এক ভয়াল পঙ্কিল পরিবেশে, আদিম সংস্কারাবদ্ধ বর্বর জাতির জীবন-ইতিহাস লিখেছেন তিনি। এরই মধ্যে রয়েছে এদের ব্যক্তিগত কামনা-বাসনা, সমাজিক ন্যায়-নীতি-অন্যায়-পাপাচার-কুসংস্কার। কিন্তু নাগিনীকন্যাকে এমন একটা জায়গায় স্থাপন করা হয়েছে - যেখানে কোন কামনা-বাসনা, পাপ-ভ্রষ্টাচার প্রবেশ করতে পারবে না।কারণ এসবের উর্দ্ধে সে এমন একটা অলৌকিক পরিমন্ডলের মধ্যে তাকে রাখা হয়েছে - যেখানে মানুষের স্বাভাবিক প্রবৃত্তিগুলির কোন স্থান নেই।

তারাশংকর সৃষ্ট দুই নাগিনী কন্যা শবলা ও পিঙলা, মানুষের জৈবিক প্রবৃত্তির উর্দ্ধে উঠতে পারে নি। ষোলো বৎসর বয়স থেকে যাদের হৃদয়ের স্বাভাবিক গতিবিধিকে দেবী মাহাত্ম্যের প্রলেপ লাগিয়ে আর অষ্ট প্রহর সমাজ পতির রক্ত চক্ষুর পাহারায় অবরুদ্ধ করে রাখা হয়েছে -

তাদের সেই অবরুদ্ধ মানবাত্মার ক্রন্দন কেউ শুনতে পাইনি। বিংশ শতাব্দীর লেখক তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায় শুনেছিলেন সেই ক্রন্দন, তাই সারা জীবন নিজেদের চিত্ত বৃত্তিকে অবদমিত রেখে যারা ব্রহ্মচারিণীর ব্রত পালন করে গেছে, তাদের সংস্কার কেটে বেরিয়ে আসতে বেশি সময় লাগেনি। তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাগিনী কন্যার কাহিনী, নাগিনী কন্যার মানুষী সত্তার বিকাশের কাহিনী। কোন সংস্কারই - মানবতার বিকাশের পথে বাধা হতে পারেনা - হওয়া উচিত নয়।

বিংশ শতাব্দীর সভ্য সমাজে বসে, বেদে জীবনের যে চিত্র তারাশংকর এঁকেছেন - তা অভাবনীয় । কিন্তু নাগিনী কন্যার অলৌকিক জীবন যাত্রা তুলে ধরাই শুধু লেখকের অভিপ্রেত নয়। তাই শুধু শবলা নয়, দ্বিতীয় নাগিনীকন্যা পিঙলাও - অলৌকিতার নাগপাশ ছিন্ন করে বেরিয়ে এসেছে তাদের স্বাভাবিক হৃদয় বৃত্তি নিয়ে। "পুরাণ কল্পনা ও অন্ধ ধর্ম সংস্কার যে বাস্তব জগতে রক্ত-মাংশের প্রাণী রূপে মূর্ত হইতে পারে নাগিনী কন্যা তাহারই বোধ হয় একমাত্র আধুনিক দৃষ্টান্ত।"[১০৯]

নাগিনী কন্যারা আসলে বেদেনী। বেদেনীর উপর দেবী মাহাত্ম্য অরোপ করে এরা নাগিনী কন্যা রূপে পরিচিতা। তারাশংকরের 'বেদেনী' গল্পে, বেদেনীর স্বাভাবিক চরিত্র বৈশিষ্ট্য জীবন্ত ভাবে ধরা পড়ে। বেদেনীরা সাপের মতোই হিংস্র। তাই বেইমানী করলেই ভালোবাসার মানুষকে মেরে ফেলতে তাদের কোন সংকোচ হয় না। 'বেদেনী' গল্পের রাধিকা একদিন শম্ভু বাজীকরের খেলা দেখে, তার চেহেরা দেখে আকৃষ্ট হয়ে, তার ভালো মানুষ স্বামী শিবপদকে ছেড়ে এসেছিল। আবার কঙ্কালীর মেলার কিষ্টো বাজীকরের জোয়ান চেহেরা ও তার খেলার সরঞ্জাম দেখে, শম্ভুর তাঁবুতে আগুন লাগিয়ে কিষ্টোর সঙ্গে পালিয়ে যেতে তার মুহূর্ত সময় লাগেনি।

সভ্যসমাজ গন্ডীর বাইরে অরণ্যের অন্ধকারে আদিম জীবন যাত্রায় অভ্যস্ত নরনারীর স্বাভাবিক প্রবৃত্তিকে অবরুদ্ধ করেছে - এদেরই সৃষ্ট কুসংস্কার এবং সেই কুসংস্কার থেকে সৃষ্ট সমাজ বিধি - যার মধ্যে নিহিত আছে বহু যুগের সঞ্চিত বঞ্চনার ইতিহাস, আর এই সমাজ বিধির রাশ টেনে রেখেছে যে শিরবেদেরা - তারা তাদের প্রবৃত্তির তাড়নায় নানা অকাজ-কুকাজ করতে পারে, যথেচ্চাচার করতে পারে। কিন্তু নাগিনী কন্যাকে তার ব্রত ধর্মে অটল থাকতে হবে। না হলে তাদের পাপকে ধরে রাখবে কারা ! পাপস্খলনের বেশ সুন্দর ব্যবস্থা এদের সমাজের ! শবলা-এর প্রতিবাদ করেছে। তার ভালোবাসার পথে বাধা সৃষ্টিকারী শিরবেদের প্রতি তার ক্রোধ সঞ্চিত হয়েছে এবং ভালবাসার মানুষের হত্যাকারী শিরবেদের প্রতি প্রতিশোধ গ্রহণ করে যেন সমাজের এই মুখোসটা ছিঁড়ে দিতে চেয়েছে। এর জন্য তার ধর্ম গেছে , সে তাদের সমাজের কুসংস্কারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে মানবতার জয় ঘোষণা করেছে। আদিম সমাজ ব্যবস্থায় এক বিদ্রোহিনী নারী শবলা।

পিঙলার বিদ্রোহ সেদিক দিয়ে এতটা প্রত্যক্ষ নয়। পিঙলা ও ভালোবাসার কাছে নতি স্বীকার করেছে- ভালোবাসার পরিণামস্বরূপ মৃত্যুকে বরণ করে নিয়েছে - আর পিঙলার মৃত্যুর পর বেদে সমাজ ভেঙে পড়েছে।

"তারাশংকরের লক্ষ্য ছিল নাগিনীকন্যাদের সত্যিকার ইতিহাস লোকচক্ষুর সামনে তুলে ধরা

এবং কোন আলোক বলয় ছাড়াই। শবলা এবং তারপর পিঙলা নামে আর একটি বেদের মেয়ের জীবন বৃত্তান্তে দেখা যায় যে তারা প্রকৃত পক্ষে সাধারণ মানবী ছাড়া আর কিছুই নয় - অথচ বেদেদের সমাজের চাপে ও অন্ধসংস্কারে আছন্ন হয়ে তারা উপকথায় বর্ণিত নাগিনী কন্যার ভূমিকায় অভিনয় করার বিড়ম্বনা ভোগ করছে। আসলে তারা বঞ্চিত নারী,পুরুষ শাসিত বেদে সমাজের ছলনার শিকার। এক্ষেত্রে পিঙলা আগে ও শবলা পরে এলে প্যাটার্ণটি মনে হয় আরো ভালো করে ফুটত। কারণ শবলা আধুনিক নারীর মত বেশি বস্তু তান্ত্রিক আর পিঙলা একটু বেশি আদর্শবাদী ও কাব্য ধর্মী। তেমন করে অন্ধসংস্কার আর শোষণের থেকে বেদিনীরা মুক্তি পেয়ে পরিষ্কার আলোয় মানবিকতার শক্ত মাটিতে পা দিয়ে দাঁড়াল এবং জৈব ধর্মকে, যৌবনের তাগিদকে যথাযোগ্য মর্যাদা দিতে শিখল -এরচিত্রটি পিঙলা আগে ও শবলা পরে এলে আরো সুষম চেহারা পেত।

শবলা দেহজ কামনার কাছে নতি স্বীকার করেছে বললে ভুল বলা হয়। সে একটি তরুণ বেদেকে ভালবেসেছিল এবং এ ভালবাসা তার অঙ্কুরেই বিনষ্ট হয়েছে শিরবেদের চক্রান্তে। তার মন উপোসীই রইল, কিন্তু জীবন্ত মানুষের কাছে দেহও তো ফেলনা নয়। দেহকে উপোসী রাখা তো আরো বঞ্চনা । তাই শবলা এর পর দৈহিক পরিতৃপ্তির কথাই ভেবেছে এবং বেদেদের এইসব শোষণ ও কুসংস্কারের বিরুদ্ধে সে বিদ্রোহ করেছে। পিঙলা শবলার মত অত বাস্তববাদিনী নয়, সে প্রিয় জনকে না পেয়ে মৃত্যু বরণ করাই শ্রেয় মনে করেছে। তাই তাকে অনেকটা ঊনবিংশ শতাব্দীর সাধ্বী প্রেমিকা মনে হয়। সে আগে এলে শবলার মত - বাস্তববাদিনীর আসার পথ সুগম হত। শবলা বিংশ শতাব্দীর জীবনমুখী মেয়ে।"[১১০]

নাগিনী কন্যার প্রতি লেখকের সংবেদনশীল মনের পরিচয় - শিবরাম কবিরাজের মানসিকতার মধ্য দিয়ে প্রকাশিত। তিনি দেখেছেন অন্ত্যজ বেদে সমাজের সমাজপতি শিরবেদেরা কিভাবে পৌরাণিক জনশ্রুতি ও সাধারণ বেদে সম্প্রদায়ের অজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে শিরবেদে হয়ে বসেছে। যুগ যুগ ধরে চলে আসা এই শোষণ ও বঞ্চনার থেকে মুক্তি এনে দিয়েছে - এই দুই মানবী। তাই নাগিনী কন্যার কাহিনী - নাগিনী কন্যার শাপমুক্তির কাহিনী; আদিম সংস্কারাচ্ছন্ন, অভিশপ্ত বেদে সমাজের শৃঙ্খল ভেঙে মূল স্রোতে মিশে যাওয়ার কাহিনী।

বেদে সম্প্রদায় ঃ তারশংকরের অন্তর্দৃষ্টি

'নাগিনী কন্যার কাহিনী' ১৯৫১ সালে প্রকাশিত হয়। বিংশ শতাব্দীর সমকালীন এই পরিবেশে অবশ্যই এই ধরণের উপন্যাস লেখার উপযুক্ত বাতাবরণ নয়। তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতো বলিষ্ঠ লেখকের পক্ষেই বোধ হয় সম্ভব হয়েছিল, এই যুগ পরিবেশের মধ্যে থেকে, সেই সকল পিছিয়ে পড়া মানুষের জীবন কাহিনী রচনা করা, যারা সম্পূর্ণ ভিন্ন পরিবেশে, পৌরাণিক চিন্তাধারাকে অবলম্বন করে মঙ্গলকাব্যের ছাঁদে তাদের জগৎ গড়ে তুলেছে । কিন্তু সবকিছুর মূলে রয়েছে - চিরকালের সেই শোষণের ইতিহাস। লেখক বেদে সমাজের সেই সম্পূর্ণ চেহেরাটি তুলে ধরতে পেরেছেন সর্বসমক্ষে।

" নাগিনী কন্যার পরিকল্পনাটি আশ্চর্য রকমের মৌলিক; বাংলা দেশের অসংখ্য অনার্য মানব গোষ্ঠীর মধ্যে একটির গোপনতম জীবনরস নির্যাস যেন ইহারই মধ্যে নিহিত। সর্প বিষের মন্ত্র ও ঔষধির মতো উহার অস্তিত্ব ও দুর্বোধ্য ক্রিয়াকলাপ জাতির গন্ডী বহির্ভূত সমস্ত মানুষের নিকট হইতে প্রাণপণ প্রয়াসে সংবৃত । তারাশংকর যে কেমন করিয়া রহস্যের দুর্ভেদ্য গন্ডী অতিক্রম করিয়া এই গুহ্যতত্ত্ব জানিতে পারিয়াছিলেন তাহা একটা পরম আশ্চর্যের বিষয়।"[১১১]

আসলে এই বেদে জাতটার প্রতি লেখকের কৌতূহল বরাবর ছিল। তিনি এদের কথা বলতে চেয়েছিলেন অত্যন্ত আন্তরিকতার সঙ্গে। তাঁর আত্মজীবন স্মৃতিগুলির মধ্যে এই বক্তব্য ধরা পড়ে -

"আমার সাহিত্য কর্মের মধ্যে কালের বিবর্তনে সামাজিক পরিবর্তনের মধ্যে বিলীয়মান গোষ্ঠী,সম্প্রদায়, বিশেষধারার ব্যক্তিত্ব একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছে। এসব আমার নিজের চোখে দেখা। ...জমিদার শ্রেণী ছাড়াও বেদে, পটুয়া, মালাকার,লাঠিয়াল, চৌকিদার, ডাকহরকরা প্রভৃতি যারা সমাজের বিশেষ অংশ জুড়ে ছিল তাদের নিয়ে গল্প রচনা করবার প্রেরণাই হোক বা অভিপ্রায়ই হোক আমার মধ্যে এসেছিল। বোধ করি এদের কথা অন্য কেউ বিশেষ করে আগে লেখেন নি বা লেখেন না বলে।" [১১২]

আর এক জায়গায় বলেছেন - "ডাইন ডাকিনী ভূত প্রেত সমাকুল আমার সে কাল। বেদে সাপুড়ে পটুয়া দরবেশ তখন দেশে প্রচুর । প্রতিদিনিই এদের কারুর না কারুর বা কোনও দলের না কোনও দলের সঙ্গে দেখা হতোই। আমার সাহিত্যিক জীবনে এরা দল বেঁধে ভিড় করে এসেছে ঠিক এই কারণেই। " [১১৩]

উপরোক্ত দুটি মন্তব্য থেকে বোঝা যায়,তারাশংকর এই অন্ত্যজ শ্রেণীর মানুষ গুলিকে গভীরভাবে প্রত্যক্ষ করেছিলেন। এদের সম্বন্ধে জানার আগ্রহ থেকে, এদের ঐতিহ্য ও লোকসংস্কৃতি সম্বন্ধে জেনেছেন এদের কাছ থেকেই এবং অত্যন্ত সহানুভূতির সঙ্গে এই বিলীয়মান সংস্কৃতির দিকটিকে তুলে ধরেছিলেন - সেই সঙ্গে এদের মানবতার জয়গানে মুখরিত হয়েছিলেন।

" বেদেদের তিনি নানা মেলায় খুব কাছ থেকে লক্ষ্য করেছেন। লাভপুরের বাড়ীতেও বেদেরা আসত সাপের খেলা দেখাতে - তিনি তাদের সঙ্গে আলাপ জুড়তেন -একথা তার কন্যা গঙ্গার কাছ থেকে শোনা। তিনি শিল্পী হিসাবে তারপর যা করেছেন তা হল এই বেদেদের জীবনের বিভিন্ন তথ্যাদির ওপর বিভিন্ন মানবিক আবেদন (যেমন প্রেম,স্নেহ, ঈর্ষা, দুঃখ ,ক্রোধ ইত্যাদি) আরোপ করে বেদেদের ছবিগুলি জীবন্ত করে ফেলেছেন"।[১১৪]

সভ্য-অসভ্য অনেক বেদেদের কথা তিনি তাঁর আত্মজীবনীতে উল্লেখ করেছেন। এই সব মানুষদের শুধু দেখা নয় -অত্যন্ত আন্তরিকতার সঙ্গে দেখেছিলেন । এদের কারো করো সঙ্গে তাঁর হার্দিক সম্পর্ক ও গড়ে উঠেছিল সেই কারণেই । আর সেই জন্যই এদের জীবনযাত্রার সমস্ত রকম প্রথা-সংস্কারের মধ্যে থেকে তাঁর ভালবাসার মানুষগুলিকে তুলে আনতে পেরেছেন। নাগিনী কন্যার আড়ালে যে সাধারণ বেদেনীর বাস সেই বেদেনীদের কাহিনীই তিনি লিখতে পেরেছেন এই অসাধারণ উপন্যাসে ।

সমাজের একেবারে অন্ত্যজ শ্রেণীর মানব গোষ্ঠী ,সভ্য সমাজে যাদের উপস্থিতির হার অতি নগণ্য, সেই গোষ্ঠীর মানুষকে খুব কাছ থেকে দেখা - তাদের জীবন যাত্রার তথ্য সংগ্রহ করা - খুব সহজ ব্যাপার নয় - তারপরে থাক না চিত্র করের তুলির টান আর কবির কল্পনা। তিনি তো প্রথা-সংস্কারের উর্দ্ধে মানুষের কথা বলতে চেয়েছেন, যে মানুষ সভ্যসমাজের দ্বারা অবহেলিত, যারা ঘৃণা ও অবিশ্বাসের পাত্র। তাই এই উপন্যাস সমন্ধে একথা নিঃসন্দেহে মেনে নেওয়া যায় - " মহেঞ্জোদারো, হরপ্পার আবিষ্কার যেমন মাটির তলা থেকে প্রাচীন ধ্বংসাবশেষ তুলে বিশ্বজনকে শুধু সচকিত করে দেয়নি, বিশ্ব-সভ্যতার ইতিহাসের প্রথম দিকে ভারতের আসন সুনির্দিষ্ট করে দিয়েছিল, বর্তমান গ্রন্থখানি তেমনি এক অভিনব আবিস্কার। এই রাঢ় বাংলার ধুলামাটিতে এখনো বেঁচে আছে এমন সব প্রায়-বিলুপ্ত আদিম বর্বর জাতি, যারা বছরে মাত্র কয়েকটি দিন দেখা দেয় সভ্যসমাজে, তারপর চলে যায় কোথায় লোকচক্ষুর অন্তরালে; কোন অজ্ঞাত অখ্যাত অঞ্চলের আদিবাসী তারা কেউ জানে না, খোঁজ রাখে না,তারাশংকর তাদেরই কথা বলতে গিয়ে যেন বিধাতার প্রতিদ্বন্দ্বী হয়েছেন, নতুন মানুষ নতুন জগৎ সৃষ্টি করেছেন। বিধাতার দূত একদিন বাল্মীকি কে বলেছিলেন, 'কবিতব মনোভূমি রামের জন্ম-স্থান অযোধ্যর চেয়ে সত্য জেনো । এই সত্য যা রচিবে তুমি, ঘটে যা তা সব সত্য নহে'। যথার্থ সাহিত্যিক ও কবি যাঁরা তাঁরাও সত্যদ্রষ্টা ঋষি। তারাশংকর ও সেই সুদুর্লভ শক্তিতে সত্য ও কল্পনায় মিলিয়ে এমন এক জগৎ সৃষ্টি করেছেন যা সত্যের চেয়েও সত্য,বাস্তবের চেয়েও বাস্তব। "[১১৫]

দুই) বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৯৪-১৯৫০)

এমন একটি সময়ে বিভূতিভূষণের আবির্ভাব, বাংলা সাহিত্যকে যখন বলা চলে একটা প্রশ্ন চিহ্নের যুগ। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরই স্থির ও ধ্রুব বিশ্বাসে ফাটল ধরতে শুরু করেছিলো। রবীন্দ্রনাথের আনন্দিত সৃষ্টি সমকালীন কল্লোলীয়দের খুশি করতে পারছিল না। রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্রের মতো শিল্পী ও নিটোল উপন্যাস সৃষ্টি থেকে বিরত ছিলেন। আসলে যে আস্তিক্য মনোভাব উপন্যাস শিল্পের জন্ম দিতে পারে, সেই মনোভাবই আজ সংশয়াচ্ছন্ন। সেই সময়ে বিভূতিভূষণের হাতে 'পথের পাঁচালী' (১৯২৯)-র মতো উপন্যাসের জন্ম একটা বিস্ময়কর ঘটনা।

বিভূতিভূষণ বন্দোপাধ্যায়ের মানসিকতার বৈশিষ্ট্য বিচার করতে গিয়ে বলা হয়েছে বলা হয়েছে, বাংলা সাহিত্যে দু-ধরণের ঔপন্যাসিক আছেন- ক) জ্ঞানমার্গীয়, যাদের কাকপন্থী বলা যায় অর্থাৎ বিচার বিশ্লেষণের দ্বারা যাঁরা জীবনের রূপ ফুটিয়ে তুলতে চান, খ) আস্বাদনপন্থী বা কোকিল বৃত্তের লেখক, জীবনকে যাঁরা উপভোগ করতে চান। বিভূতিভূষণ এই দ্বিতীয় ধরণের লেখক।

ব্যক্তিগত জীবনে যিনি ছিলেন নিতান্ত সরলও সাদাসিধা মানুষ, রচনা ভঙ্গিও তাঁর আটপৌরে। ভঙ্গি দিয়ে চোখ না ভুলিয়ে অনুভূতির গভীরতা ও আন্তরিকতাতেই পাঠককে তিনি মুগ্ধ করেছেন। বিষয়ের বৈচিত্র্য ও তাঁর উপন্যাসের একটি লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য। তিনি যেমন সমাজের উঁচুতলার

মানুষকে নিয়ে উপন্যাস লিখেছেন, তেমনি সমাজের নিচুতলা অর্থাৎ অন্ত্যজ শ্রেণীর মানুষদের নিয়েও তিনি উপন্যাস লিখেছেন। আমার বিষয় যেহেতু স্বাধীনতা পরবর্তী, তাই বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যয়ের 'ইছামতী' উপন্যাসটি আলোচনা করব সেখানে কীভাবে অন্ত্যজ মানুষদের কথা,তাদের সুখ-দুঃখের কথা, তাদের সমাজিক, রাজনৈতিক জীবন ও অর্থনৈতিক জীবন কতটা জীবন্তভাবে উপন্যাসে তুলে ধরেছেন।

ক) ইছামতী

ইছামতীর ঘটনাকাল

'ইছামতীর' ঘটনাকাল গত শতাব্দীর বাংলার গ্রামাঞ্চলে নীলকর সাহেবের আগমন, নীল চাষের পত্তন, নীলচাষের ফলে বাংলার কৃষকদের বিড়ম্বনা, নীলকরের বিরুদ্ধে প্রজা বিদ্রোহ, নীলকুঠীর পতন।

বাংলার গ্রামাঞ্চলে নীলকরদের আগমন, নীলকুঠী স্থাপন, নীলবিদ্রোহ - এসব ঘটনাই ইতিহাস প্রসিদ্ধ। ইংরেজরা যখন এদেশে আসে, তখন শাসকরূপে আসেনি, এসেছিল বণিকরূপে বানিজ্য করতে। তাই তাদের বানিজ্যিক বুদ্ধি দিয়েই বুঝেছিল বাংলাদেশের উর্বর ভূমি কীভাবে কাজে লাগালে বেশী মুনাফা লাভ করা যায়।

বাংলাদেশে নীল চাষ আরম্ভ হয় ১৭৭০-১৭৮০ সালের মধ্যে। "... ল্যুই বোনদ (Louis Bonnaud) নামে এক ব্যক্তি মরিশাসে নীলচাষ করে ব্যর্থ হয়ে বাংলা দেশে আসেন। ১৭৭২ সালে তিনি চন্দন নগরের কাছে গোঁদল পাড়া গ্রামে দুটি মাত্র ভ্যাট নিয়ে একটি ছোট নীলকুঠী স্থাপন করেন। এটাই বাংলার প্রথম নীলকুঠী।"[১১৬]

নীলচাষী থেকে শুরু করে নীলবাহী কুলিরাও অন্যায়ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হত, অত্যাচারিত হত। জোর করে চাষীদের দিয়ে নীলচাষ করানো হত।

"মনে হয় সারা পৃথিবীর স্বেচ্ছাচারিতার ইতিহাসে বাংলাদেশের নীলকর সাহেবরা যেন শীর্ষস্থান অধিকার করে আছেন। তাঁদের জীবনের জপ-তপ-ধ্যান হল টাকা আর টাকা মুনাফা। খাদ্যফসলের প্রয়োজন নেই; নীলের মতো টাকার ফসল চাই। তার জন্য চাষীদের উপর অমানুষিক অত্যাচার করা, তাদের ভিটেমাটি থেকে উচ্ছেদ করা, ধানী জমিতে জোর করে নীল চাষ করা, এবং তার জন্য থানার দারোগা থেকে যে কোন দুর্বৃত্তের সঙ্গে টাকার চুক্তি করা - এসব যেন নীলকরদের জন্মগত অধিকারে পরিণত হয়েছিল মগের মুল্লুক বাংলাদেশে। এই চরম অত্যচারের ফলেই বাংলাদেশ নীলবিদ্রোহ (১৮৬০) হয়।" [১১৭]

প্রসঙ্গ 'ইছামতী' ঃ দু'পারের জনজীবন ঃ লেখকের অভিপ্রায়

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'ইছামতী' উপন্যাসের ঘটনা এই সময়কে কেন্দ্র করে গড়ে

উঠেছে। তাই 'ইছামতী'র কাহিনী সূত্র ধরে - নীলকরের অত্যাচার ও নীলবিদ্রোহের ঘটনা, ঐতিহাসিক তথ্যরূপে না এলেও উপন্যাসের অঙ্গীভূত ক্ষীণরূপে এসেছে।

একটি বিশেষ কালখন্ডকে আশ্রয় করে লেখক এখানে ইছামতীর তীরবর্তী জীবন ধারার পরিচয় দিয়েছেন। এখানে কোন রাজনৈতিক ইতিহাস তাঁর অভিপ্রেত নয় বলেই মনে হয়! " ঐ আমাদের গ্রামের ইচ্ছামতী নদী। আমি একটা ছবি বেশ মনে করতে পারি - ঐ রকম ধূ ধূ বালিয়াড়ী, পাহাড় নয় শান্ত, ছোট, স্নিগ্ধ, দু'পাড় ভরে ঝোপে ঝোপে কত বন কুসুম, কতফুলে ভরা ঘেঁটুবন, গাছপালা, গাঙশালিকের বাসা, সবুজ তৃণাচ্ছাদিত মাঠ। গাঁয়ে গাঁয়ে গ্রামের ঘাট, আকন্দফুল। গত পাঁচশত বৎসর ধরে কত ফুল ঝরে পড়েছে - কত পাখি কত বনঝোপ আসছে যাচ্ছে, স্নিগ্ধ পাটা শ্যাওলার গন্ধ বার হয়। জেলেরা জাল ফেলে, ধারে ধারে কত গৃহস্থের বাড়ি। কত হাসিকান্নার খেলা। আজ পাঁচশত বছর ধরে কত গৃহস্থ এল, কত হাসিমুখ শিশু প্রথম মায়ের সঙ্গে নাইতে এল কত বৎসর পরে বৃদ্ধাবস্থায় তার শ্মশান শয্যা হল ঐ ঠান্ডা জলের কিনারাতেই, ঐ বাঁশবনের ঘাটের নিচেই। কত কত মা, কত ছেলে, তরুণ-তরুণী সময়ের পাষাণবর্ত্ম বেয়ে এসেছে গিয়েছে মহাকালের বীথিপথ বেয়ে। ঐ শান্ত নদীর ধারে ঐ আকন্দ ফুল, ঐ পাটা শ্যাওলা, বনঝোপ, ছাতিম বন। এদের গল্প লিখবো, নাম হবে ইছামতী।"[১১৮]

'ইছামতী'র পরিকল্পনা থেকে মনে হয় - লেখক এখানে মহাকালের প্রেক্ষাপটে মানবজীবনের ইতিহাস তুলে ধরেছেন - যে ইতিহাস গড়ে উঠেছে ইছামতীকে কেন্দ্র করে। ইছামতীর তীরবর্তী গ্রামবাংলার প্রকৃতি এবং সেই প্রকৃতির কোলে লালিত মানুষের জীবনালেখ্যই ইছামতীর উপজীব্য। তাই ইছামতীর গ্রাম্য মানুষগুলির জীবনের সুখ-দুঃখ, আশা-আকাঙ্ক্ষার চিত্র পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে না হলেও সুন্দরভাবে ধরা পড়েছে।

গ্রাম বাংলার অনেক অন্ত্যজ শ্রেণীর চরিত্র এই মানুষের ভিড়ে অবস্থান করছে। এখানে কোন ব্যক্তিচরিত্র নয়-সমষ্টিগত ভাবে, সে যুগের পটভূমিতে, এই চরিত্রগুলির জীবনযাত্রা তাদের শোষিত মানবাত্মার ক্রন্দন, নীলকরের অত্যাচারে অত্যাচারিত এদের বিদ্রোহীরূপ ধরা পড়েছে - যা থেকে তৎকালীন পরিবেশে অন্ত্যজ শ্রেণীর মানুষদের অবস্থা কেমন ছিল তা বুঝে নিতে অসুবিধা হয় না। যেমন নীলকরের অত্যাচার, জাতের বিচার, শোষকের অত্যাচার, শোষিতের বিদ্রোহীরূপ- এর চিত্র রয়েছে 'ইছামতী' উপন্যাসে । ইতিহাসের পটপরিবর্তনে নীলকরের হাত থেকে বাঁচলেও সমাজ শাসকের রক্তচক্ষুর শাসন থেকে মুক্তি পায়নি এরা।

অন্ত্যজ জীবন ঃ 'ইচ্ছামতী'র পেক্ষাপটে

এক বিশেষ সময়ের আধারে , ইছামতীর পার্শ্ববর্তী জনজীবনের ছবি এঁকেছেন লেখক। উপন্যাসটি অন্ত্যজ শ্রেণী প্রধান নয়, কিন্তু বহুচরিত্রের ভিড়ে এই ধরণের কিছু চরিত্র খুঁজে পাওয়া যায় - এদের উপস্থিতি ঘটেছে কখনও এককভাবে, কখনও সমষ্টিগতভাবে - কখনও প্রত্যক্ষ ভাবে- কখনো পরোক্ষভাবে।

'ইছামতী' উপন্যাসে অন্ত্যজ শ্রেণীর বহু চরিত্র আছে - গয়াবাগদিনী, সতীশকলু, নালুপাল, ভজামুচি, শ্রীরামমুচি, নবুগাজি, তিনকড়ি কাওরা, বরদা বাগদিনী, অক্রুর, জেলে, খেপী সন্ন্যাসিনী, হলা পেকে, অঘোরমুচি, শ্যামবাগদী, কুসুম, ছিহরি সর্দার, নারাণ সর্দার, ভগীরথ বাগদীর মা, কেনারাম সর্দার, নীরদাবাগদিনী- এদের মধ্যে কিছু চরিত্র আছে যাদের একক উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়, আর কিছু চরিত্র এসেছে সমষ্টিগতভাবে। সমাজে বর্ণবৈষম্যের কারণে দেখা গেছে হিন্দুসমাজ যাদের স্পর্শদোষ বাঁচিয়ে চলে, তারাই নীলকর সাহেবের অধীনে কাজ করে। তাদের জীবনযাত্রা সুখের না হলেও, স্বস্তিতে কেটে যায়। ভজা মুচির দাদা শ্রীরাম মুচি নীলকরের বেয়ারার পদ লাভ করেছে। "নীলকুঠিতে কোন অবাঙালী চাকর বা খান সামা নেই। এই সব আশেপাশের গ্রামের মুচি, বাগদী, ডোম শ্রেণীর লোকেরা এদের খানসামার কাজ করে।"

এই ধরণের আরো চরিত্র আছে। আছে ডাকাত হলাপেকের কথা। কিন্তু হলাপেকে কিভাবে ডাকাত হল - সে পরিচয় স্পষ্ট নয়। বিভূতিভূষণ প্রকৃতির মতো মানুষকেও ভালবেসেছেন। খুনে-ডাকাতও তাঁর সহানুভূতির স্পর্শ থেকে বঞ্চিত হয়নি। তাঁর নিজের বক্তব্য এই প্রসঙ্গে স্মরণীয় -

"কাউকে ঘৃণা করতে হবে না। এ জগতে যারা হিংসুক, স্বার্থান্ধ, নীচমনা তাদের যেন ঘৃণা না করি ... শুধু উচ্চ জীবনানন্দ তাদের দেখিয়ে দেবার কেউ নেই বলেই তারা ঐ করম হয়ে আছে। কোন্ মুক্ত পুরুষ অনন্ত অধিকারের বার্তা তাদের উপেক্ষিত বুভুক্ষুশীর্ণ প্রাণে পৌঁছে দেবে ? " [১১৯]

অন্ত্যজ শ্রেণীর আর একটি চরিত্র হল গয়া বাগদিনী। তার সঙ্গে নীলকরদের বড় সাহেবের ঘনিষ্ঠতার কথা কারোর অজানা নয়। তাই বাগদিনী হলেও, সকলে তাকে খাতির করে চলে। সে গয়া মেম নামে পরিচিত। সাহেবের বদান্যতায় তার আর্থিক অবস্থাও বেশ ভাল। কিন্তু নীলকুঠির পতনের দিনে যখন নীলকুঠির সাহেবরা দেশে ফিরে গেলেন, রয়ে গেলেন বড় সাহেব। অসুস্থ সাহেবের নিঃসঙ্গ জীবনের আশ্রয় হল গয়া। সাহেবের মৃত্যুর পর সমাজে তার ঠাঁই মেলেনি। সমাজের ঘৃণায় সে এক ঘরে হয়ে নিঃসঙ্গ জীবনযাপন করেছে। গয়াকে আক্ষেপ করে বলতে শোনা যায় ঃ -

" খেতি পেতাম না যদি সাহেব সেই জমির বিলি না করে দিত... যদ্দিন সময় ভাল ছেল, আমারে দিয়ে কাজ আদায় করে নেবে বুঝতো, তদ্দিন লোকে মানতো আদর করতো। এখন আমারে পুঁছবে কেডা? উল্‌টে আরো হেনস্থা করে , এক ঘরে করে রেখেছে পাড়ায়-আমার জাত গিয়েছে যে । একঘাট জল কেউ দেয় না অসুখে পড়ে থাকলি কেউ উঁকি মেরে দেখে না। ... সেদিন কি আমার আছে।" - সমাজে জাত বিচারের চেহারাটা এই বাগদিনী চরিত্রের মধ্য দিয়ে স্পষ্ট।

অন্ত্যজ সমাজের আর একটি চরিত্র হল নালুপাল। পান-সুপারির মোট নিয়ে হাটে যেত বেচতে। মামার বাড়িতে অসমাদৃত নালু তার এক মাসীর সহায়তায় সতেরো টাকা মূলধন নিয়ে কাজে নেমে পড়ে। তার সঙ্গী হয় সতীশ কলু। প্রথমে মুদির দোকান, তারপর ব্যবসায় তাকে বড়লোক করে দেয় । নীলকুঠির পতন দশায়, নীলকুঠি কিনে নেওয়ার কথা চিন্তা করতে পারে। অর্থনৈতিক দিক থেকে অন্ত্যজ শ্রেণীর মানুষের উত্তরণের চিত্র লক্ষ্য করা যায়- এই নালুপাল

বা লালমোহন পাল চরিত্রে। কিন্তু সেক্ষেত্রে অন্ত্যজ শ্রেণীর নালুপাল জন্মগত অভিশাপ থেকে মুক্ত নয় বলে, ব্রাহ্মণ ভোজনের ব্যবস্থা করতে হয় অপরের গৃহে। এক্ষেত্রে সমাজের জটিল সমস্যার শিকার সে - সমাজের বিত্তশালী সম্প্রদায় ভুক্ত হলেও বর্ণগত দিক থেকে অপাঙক্তেয়। অন্ত্যজ সমাজের মানুষের উত্তরণ তাই জটিলতায় আচ্ছন্ন।

নীল বিদ্রোহ ঃ অন্ত্যজ সমাজ

'ইছামতী' উপন্যাসে অন্ত্যজ সমাজের মানুষের প্রতি নীলকরে অত্যাচারের চিত্র এবং এই অত্যারিত মানুষগুলির বিদ্রোহের চিত্র আঁকা হয়েছে তবে সতন্ত্রভাবে কোন 'তোরাপ' চরিত্র সৃষ্ট হয়নি। 'ইছামতী'তে নীলকরের অত্যাচারে অত্যাচারিত এবং নীল বিদ্রোহে সামিল মানবাত্মার পরিচয় আছে - যাদের প্রতিনিধি ছিল 'তোরাপ'।

"নীল বিদ্রোহ তিন জেলায় সমানে দাপটে চলল। স্যার উইলিয়াম গ্রে সব দেখে গিয়ে যে রিপোর্ট পাঠালেন, নীলকরদের ইতিহাসে সে একখানা বিখ্যাত দলিল। তিন জেলার বহু নীলকুঠি উঠে গেল এর দু'বছরের মধ্যে। বেশির ভাগ নীলকর সাহেব কুঠি বিক্রি করে কিংবা এদেশী কোন বড়লোককে ইজারা দিয়ে সাগর পাড়ি দিলেন। দু'একটা কুঠির কাজ পূর্ববৎ চলতে লাগল, তবে সে দাপটের সিকি ও কোথাও ছিল না।" [১২০]

এই উপন্যাসের কোন কোন স্থানে গ্রাম্য প্রজাদের বিদ্রোহী রূপ ধরা পড়েছে-চর পাড়া গ্রামের মুচি পাড়ার লোক নীল বুনতে না দেওয়ার জন্য বিদ্রোহ করে, জমির দাগ উপড়ে ফেলে। ফলস্বরূপ বাগদীপাড়ার মোড়ল রামু সর্দার খুন হয়। এরপর নীলকুঠির দুই সাহেব, দেওয়ান, আমিন, লাঠিয়াল - সকলে মিলে বাগদী পাড়া জ্বালিয়ে দেয়। বিদ্রোহী প্রজার দল রামনগর কুঠি লুট করতে এসে - বন্দুকের গুলির মোকাবিলা করতে না পেরে পালিয়ে যায়। পরবর্তী বিদ্রোহ দেখা দেয়, ইছামতীর ধারের পথে রসিক লাঠিয়ালের সরকির আঘাতে খুন হয় পাঁচ জন প্রজা। কোন সাক্ষী নেই তবু এর জবাব পেতে দেরি হয় না। র্লড মেয়ো খুন হবার পর নীলকুঠির সংকটকাল উপস্থিত হয়। কালো সোনার বাগদীদের হাতে খুন হয় দেওয়ান রাজারাম। প্রতিবাদে খুনীদের ঘর জ্বালিয়ে দেওয়া হয়। নীল বিদ্রোহ দেখা দেয় সারা যশোর ও নদীয়া জেলায়। জার্মানি থেকে কেমিক্যাল নীল ভারতে আসায় নীল চাষে ভাঁটা পড়ে।

"সেদিন হেমন্ত অপরাহ্নে বড় সাহেব জেনকিন্‌স শিপটন সুন্দর ভবিষ্যদ্বাণী উচ্চারণ করেছিল। রাম গোপাল ঘোষের বক্তৃতা, হরিশ মুখুয্যের হিন্দু পেট্রিয়ট কাগজ, পাদ্রী লংয়ের আন্দোলন, (দীনবন্ধু মিত্রের নীল দর্পনের সময়ের পরের ব্যাপার), নদীয়া যশোরের প্রজা বিদ্রোহ, স্যার উইলিয়ম গ্রে'র গুপ্ত রির্পোটে যে কাজ হাসিল করতে পারে নি, জার্মানি থেকে আগত কৃত্রিম নীল বড়ি অতি অল্পদিনের মধ্যেই তা বাস্তব পরিণত করলে।" [১২১]

'ইছামতী' উপন্যাসে অন্ত্যজ সমাজের মানুষ অপ্রধান চরিত্র রূপেই এসেছে। কিন্তু এই অপ্রধান চরিত্রগুলি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকায় অংশ গ্রহণ করেছে। বাংলার ইতিহাসে নীল চাষের পত্তন ও

নীলচাষের পতন - এই পটভূমিতে অন্ত্যজ মানুষদের নীল বিদ্রোহের চিত্র -এই আলোচনায় সবিশেষ মনোযোগ আকর্ষণ করে।

দুই) সমরেশ বসু (১৯২৪-১৯৮৮)

বর্তমান বাংলাদেশের ঢাকা জেলার রাজা নগর গ্রামে মধ্যবিত্ত পরিবারে সুরথনাথের জন্ম হয়। লেখক নাম সমরেশ তিনি নিজেই গ্রহণ করেছিলেন। ১৯৪৪ সালের ' পরিচয়' পত্রিকায় প্রকাশিত সাম্প্রদায়িকতা- বিরোধী গল্প, 'আদাব' তাঁকে বিখ্যাত করে। আর ঐ সালেই কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য হন। রাজনীতি করার কারণে কারাবাসও করতে হয়। পরবর্তী কালে সাহিত্যকে একমাত্র জীবিকা করেছিলেন। পশ্চিমবাঙলার প্রায় সমস্ত প্রতিষ্ঠিত পত্রিকায় তাঁর লেখা প্রকাশিত হত। 'কালকূট' ছদ্ম নামেও তিনি বিখ্যাত । আর একটি ছদ্মনাম ছিল 'ভ্রমর' ।

সমরেশ বসু বহু ব্যাপ্ত অভিজ্ঞতা সম্পন্ন লেখক ছিলেন । জীবনে যে সত্যকে অনুভব করেছেন তাকেই প্রকাশ করেছেন সাহিত্যে। সাম্যবাদে আস্থাশীল হলেও সাহিত্য সৃষ্টির উপর দলীয় অনুশাসন মেনে নেন নি। ফলে এক সময় পার্টির সঙ্গে তাঁর সংযোগ বিচ্ছিন্ন হয়। জীবনকে নানা দিক থেকে দেখবার আগ্রহ ছিল তাঁর । জীবনের বিচিত্ররূপকেই প্রকাশ করেছেন। বৈচিত্র্য তাঁর সৃষ্টি প্রতিভার একটি লক্ষণ। সমাজ ও রাজনীতি সম্পর্কে প্রখরভাবে সচেতন ছিলেন। তবে শিল্পকর্মে ব্যক্তি মনের বৈচিত্র্যকে ও সমান গুরুত্ব দিয়েছেন। বহু বিচিত্র মানুষকে উপন্যাসে জীবন্ত করে তুললেও মধ্যবিত্ত ও নিম্নবিত্ত মানুষকে নিয়ে লেখারই আগ্রহ ছিল তাঁর। আদিবাসী জনজাতি গোষ্ঠীকে বিশেষ রূপায়িত করেন নি। শতাধিক উপন্যাসের লেখক সমরেশ বসু। যদি কিশোর উপন্যাস ও গোয়েন্দা উপন্যাস ধরা হয়- তবে উপন্যাস সংখ্যা দুশোর বেশি। পঞ্চাশের দশকের গোড়া থেকেই তাঁর উপন্যাস প্রকাশিত হতে শুরু করেছে। প্রথম উপন্যাস 'উত্তরঙ্গ' ১৯৫১ সালে প্রকাশিত।

তিনি কিছুকাল কাজ করেছিলেন ইছাপুরের বন্দুক কারখানায়। বাস করেছেন শ্রমিক-বস্তিতে। নিতান্ত নিম্নবিত্ত ও অন্ত্যজ শ্রেণীর শ্রমিক মানুষদের নিয়ে একাধিক উপন্যাস তিনি লিখেছেন। সেগুলির মধ্যে 'উত্তরঙ্গ', 'গঙ্গা', 'মহাকালের রথের ঘোড়া'- ইত্যাদির নাম করা যায়।

ক) উত্তরঙ্গ

'উত্তরঙ্গ' ঃ উপন্যাসের প্রেক্ষাপট

এক ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে 'উত্তরঙ্গ' উপন্যাসের কাহিনী রচিত হয়েছে। সিপাহী বিদ্রোহ (১৮৫৭) এর ঠিক পরে ১৮৬০ সাল থেকে শুরু করে ১৮৮০ -১৮৮২ সাল পর্যন্ত এর ব্যাপ্তিকাল।

" সমরেশ যখন 'জগদ্দল' উপন্যাসের প্রথম পরিকল্পনা করেন তখন ঐ অঞ্চল অর্থাৎ জগদ্দলের চটকলগুলো কিভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, কারখানা ও জনপদগুলোর ক্রমবিকাশ কিভাবে

ঘটেছিল এবং ক্রমবিকাশের সূত্র স্বরূপ বাস্তব ঘটনাবলী কি কি সেই ঐতিহাসিক উপকরণ সম্বন্ধে লেখক সম্যক জ্ঞাত ছিলেন না। উনিশশো একান্নতে, নব্বই বছরের এক বৃদ্ধচটকল কর্মী নবকুমার ঘোষ, সমরেশকে এ সম্পর্কে যে তথ্য সরবরাহ করেন তার ভিত্তিতেই আঠারোশো ষাট থেকে আঠারোশো বিরাশি পর্যন্ত এই বাইশ বছরের ইতিহাস নিয়ে সমরেশ লেখেন 'উত্তরঙ্গ'।" [১২২]

তবে এর আগের ইতিহাসকেও ছুঁয়ে গেছেন লেখক। ১৮৫৩-তে প্রথম রেললাইন পাতায় সাধারণ মানুষের অসুবিধা। ১৮৫৫-তে রিষড়ার কারখানাতে - গ্রামীণ নিস্তরঙ্গ জীবনযাত্রায় যন্ত্রের আবির্ভাব - ১৮৫৭ তে সিপাহী বিদ্রোহ। এই ঘটনাগুলির ফলশ্রুতি পরবর্তী ২২ বছরের রাজনৈতিক ও আর্থ-সামাজিক পরিবর্তনের প্রেক্ষাপটে লেখা 'উত্তরঙ্গ' উপন্যাস।

একদিকে ঘটে যাওয়া সিপাহী বিদ্রোহ, অন্যদিকে কোম্পানীর ক্ষমতা লোপ, ইংরেজ সরকারের সাম্রাজ্যবাদ ও ঔপনিবেশিকতাবাদ। এই পটভূমিতে সাধারণ অন্ত্যজ শ্রেণীর মানুষের জীবনে বিরাট পরিবর্তন ঘটে গেছে এবং আরও পরিবর্তন ঘটতে চলেছে। 'উত্তরঙ্গ'তে এই পরিবর্তমান অন্ত্যজ সমাজ জীবনের সঙ্গে পরিচয় ঘটে প্রথমেই। এই পরিবর্তনের আগে এদের জীবন যাত্রা কেমন ছিল সে সম্বন্ধে একটা আন্দাজ করে নেওয়া যায় । তবে উত্তরঙ্গের শুরু থেকেই দেখা যায় পরিবর্তন ঘটতে শুরু করেছে। এক ঐতিহাসিক কাল খন্ডের আধারে একটি বিশেষ অঞ্চলের বিভিন্ন বৃত্তি জীবী অন্ত্যজ মানুষের জীবন সংগ্রামের কাহিনী 'উত্তরঙ্গ' । ইতিহাসের এক বিশেষ সময়ের পরিবর্তনের স্রোত-মানুষের জীবনের উপর দিয়ে বয়ে গেছে। গজিয়ে ওঠা অসখ্য কলকারখানার দৌলতে গ্রামীণ শিল্পের পতন ঘটেছে। বিভিন্ন বৃত্তি জীবী অন্ত্যজ মানুষ পেটের দায়ে হয়ে পড়েছে যন্ত্রের দাস। কেউ এই দাসত্বকে মেনে নিয়েছে, কেউ বিদ্রোহ করে নির্যাতিত হয়েছে, কেউ হয়েছে আত্মঘাতী।

রাজপুত সিপাহী ঃ অন্ত্যজ বাগদী

সিপাহী বিদ্রোহের পলাতক সিপাহী ঘটনা চক্রে হয়ে যায় লখাই বাগদী। অন্ত্যজ শ্রেণীর বাগদী ঘরে তার এই পুনর্জন্ম ঘটে। সিপাহী বিদ্রোহের মন্ত্র, ইংরেজদের প্রতি বিদ্বেষ, প্রতি হিংসাপরায়ণতা নিয়েই হীরালাল সীপাহীর অন্তর্ধান ঘটে- লখাই রূপে সে যখন আত্ম প্রকাশ করে, তখন সে স্থান পায় অন্ত্যজ সমাজে-সেখানে অন্ত্যজ সমাজের মানুষদের সমস্যার শরিক হয়ে ওঠে সে - প্রতিটি পদক্ষেপে অন্যায়ের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে। লেখক সুকৌশলে অন্ত্যজ সমাজে বিদ্রোহের এমন জ্বলন্ত অস্তিত্বকে এনেছেন কিন্তু শেষ রক্ষা হল কি !

১৮৬০ সালের এক রাত্রে শুরু হয়েছে উত্তরঙ্গের কাহিনী। পটভূমি ফরাসডাঙা । সিপাহী বিদ্রোহের পলাতক সিপাহী রাজপুত হীরালাল অচেতন অবস্থায় গঙ্গার স্রোতে ভাসতে ভাসতে পৌঁছে গিয়েছিল ফরাস ডাঙার অপরপার জগদ্দলে। ফরাসডাঙ্গা থেকে বুড়ো পাটনী, ছেলে চূড়ামণিকে নিয়ে দো-মাল্লাই মাঝারি নৌকা খানি ভাসিয়ে ছিল। তারাই আবিষ্কার করে সেই সিপাহীকে । গ্রাম বাসীদের ধারণা সাপে কাটা মৃত দেহ মনসার দয়ায় প্রাণ পেয়েছে - তাই মনসার সন্তান লখীন্দর ওরফে লখাই। শ্যাম বাগদীর বাড়িতে আশ্রয় পাওয়ায় তার পরিচয়, লখাই বাগদী। সেখানে সে

পেয়েছে পারিবারিক মর্যাদা, সমাজিক মর্যাদাও পেয়েছে ভালোবাসা ও নারী সান্নিধ্য। সে লাভ করেছে শ্যাম বাগদীর ভাই নারাণের স্ত্রী কাঞ্চনকে। লাভ করেছে তার সন্তান হীরালালকে।

লখাইকে ঘিরে এই উপন্যাসে একটা গল্পরস দানা বেঁধে উঠেছে। লখাই-এর সূত্র আর একদিকে বাঁধা - সে হল মুরলি দাসের আখড়া। সেখানে তার দুঃখ জীবনের সাথী আখড়ার সেবা দাসী সারদা। পলাতক সিপাহীর পরিচয় এরা কেউই জানে না, শুধু কাঞ্চন ছাড়া। কিন্তু লখাইয়ের প্রথম জীবন হীরালাল সিপাহীর জীবন। এই পরিচয় সে লুকিয়ে রাখলেও এই সংস্কার সে মুছে দিতে পারে নি। তাই তার পুত্রের নাম রেখেছে হীরালাল। তাই কোম্পানীর সাহেব দেখলে তার মাথার ঠিক থাকে না। সেই কারণেই সে সেন বাড়ির পাহারাদারের চাকরি খোয়ায় কিন্তু সেন কর্তার অপরিসীম স্নেহতে সে কিছু জমি পেয়ে যায়।

শ্যাম বাগদীর ঘরে লখাইকে ঘিরে একটি পারিবারিক সুখ-দুঃখের ছবি আঁকা হলেও এটিকে ঠিক পারিবারিক উপন্যাস আখ্যা দেওয়া যায় না। ভাগীরথীর উপকূলবর্তী ভাটপাড়া, জগদ্দল, নৈহাটি, হালি শহর সন্নিহিত অঞ্চল ও গঙ্গার পশ্চিম প্রান্তে হুগলি জেলার অন্তর্গত এলাকা নিয়ে গঠিত অঞ্চলে সাধারণ মানুষের দিনযাত্রার ছবি রয়েছে। আরো স্পষ্ট করে বলা যায় - এখানে বিভিন্ন বৃত্তিগত অন্ত্যজ শ্রেণীর মানুষের জীবন যাত্রার টানাপোড়নের মধ্যে দিয়ে সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিবর্তনের প্রভাব তাদের কিভাবে প্রভাবিত করেছে, তার চিত্র তুলে ধরা হয়েছে- "শ্রেণীগত ভাবে নিম্নবিত্ত ও বিত্তহীনেরা মূলত এই উপন্যাসের মেরুদন্ড। একদিকে সমাজিক রূপান্তরের ঢেউ, অন্যদিকে অসংস্কৃত মনের শিথিল গঠন এই জন্য তাদের ব্যক্তি জীবনে প্রেম ও প্রতিহিংসা- সবই উচ্চগ্রামের বা কিছুটা স্থূল।"[১২৩]

সিপাহী বিদ্রোহের ঠিক পরেই পালিয়ে-আসা লখাই যে পটভূমিতে ও পরিবেশে স্থান করে নিল ফরাস ডাঙায়,তা একান্তভাবেই তার শত্রুর রাজ্য। যারা একদিন কোম্পানীর বিরুদ্ধে লড়াই করেছে, তাকেই কোম্পানীর অধীনতা মেনে নিতে হয়েছে। প্রতিটি ক্ষেত্রে সে উপলব্ধি করেছে সেই পরাজয়ের গ্লানি। এই অঞ্চলের সাধারণ মানুষ তাদের বংশগত পেশা ছেড়ে সাধারণ চাষী এবং শেষে ভূমিহীন শ্রমিকে পরিণত হচ্ছে, কিভাবে জমি উৎখাত করে কোম্পানী কারখানা খুলছে এসবই দেখছে লখাই।

প্রসঙ্গ অন্ত্যজ মানুষ ঃ প্রেক্ষিত চিত্র অসহায়তা

লেখক এখানে একটি বিশেষ অঞ্চলের কথা বলতে বসেছেন। এই অঞ্চলে বিভিন্ন বৃত্তি জীবী অন্ত্যজ মানুষের জীবনে নিদারুণ রূপান্তর ঘটেছে। শ্যাম বাগদীর মনে হয়, তিপান্ন সালে কোলকাতা থেকে হুগলি পর্যন্ত যে দিন প্রথম রেললাইন পাতা হল - সেদিন থেকে আকালের শুরু হল। আগে মানকুন্ডুর খাঁয়ের ১০১টি নৌকা গঙ্গার উপর দিয়ে মাল নিয়ে যাতয়াত করত। রেললাইনের দৌলতে খাঁয়েদের জলপথের ব্যবসা হল কানা। জগদ্দল সেন পাড়ার লোকেরা সেদিন হৈ চৈ করে ছুটেছিল রেলগাড়ি দেখতে, তারা জেনেছিল এগাড়ির গতির কথা-একদিনের পথ পলকে যায়।

কোলকাতার চাকুরিরত বাবুরা রেলপথ ধরল। কিন্তু যে দিন ঐ গাড়ি করে কোম্পানী মাল বইতে শুরু করল সেদিন - যা পেল সব সাবাড় করতে লাগল। ফরাস ডাঙার তাঁতীদের সুতোর জন্য হাহাকার আগেই পড়েছিল এবারে জানা গেল দেশের সুতোয় বিলিতি মেশিনে কাপড় বোনা হবে।

পঞ্চান্ন সালে আর এক ধাক্কা এল, খেটে খাওয়া মানুষের প্রাণে। তা হল পাটকল। সাধারণ মানুষের ধারণা ছিল - পাট থেকে দড়ি হয় আর সূক্ষ্ম পাটের সুতোয় ডাকার তাঁতীরা রেশমের মতো জেল্লাদার কাপড় বোনে।

এরপর সকলের মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ল, কোম্পানী প্রবর্তিত খাজনা আইনে। গোঁসাই ও সেন কর্তাদের রূপ গেল বদলে। "খাজনা বাড়ল তো বটেই আবার কাঁচা পয়সায় সে খাজনা দেবার নিয়ম হল। ওদিকে জেলে, তাঁতী, যূগী- সবাই তখন মাঠে নেমে এসেছে। সারাদেশে নাকি তুলো নেই, সুতো নেই। এমনকি, মুচি, ডোম পর্যন্ত চামড়ার জন্য হা-পিত্যেশ করে রইল।দেশে নাকি চামড়াও নেই। জোলা হল জেলে, মুচি হল চাষী। হাড়ের বোতাম চিরুনি গড়ত যারা, তারা ও নামল মাঠে। সারা পরগণায় পায়রার খুপরির মতো জমি ভাগ হল কুটি কুটি। "

দেশের চাল ফসলে ভাটা পড়ল, হাটের মালপত্র কোথায় পাচার হয়ে গেল, তার হদিশ পাওয়া গেল না। খাজনা ক্রমশ বাড়তে লাগল-"শ্রীরামপুর-চাঁতরার ও গোঁসাই বাবুরা রাজা, সাড়া হালি শহরে পরগণার জমিদার তাদের ব্রহ্মোত্তর কিন্তু পত্তনী দেওয়া কৃষক প্রজারা তো কোন রাজ রাজরার কুলোগুরু নয়। অভাবের দায়ে দেনার জন্য হাত পাতল তারা।"

মহাজনেরা ঋণ দানের জন্য এগিয়ে এল। খাজনা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে ফরাস ডাঙার গোরারা দিনে ডাকাতি শুরু করল, উৎপন্ন ফসল কেড়ে নিয়ে যেতে লাগল।
রাজবাড়ীর আনন্দে কোন ভাটা পড়ল না।

কানুভড় ছিল তাঁতী। তার বাবাকে ফরাস ডাঙা থেকে সেন কর্তরা এনেছিল তখন তার খুব নাম ডাক। নবাব বাদশারা তাকে জানত। দিল্লী থেকে হিন্দুস্থানের বাইরেও তাদের সুনাম ছড়িয়ে ছিল। সেই কানু বিশ্বকর্মাপূজার দিন তাঁত চরকার পূজো করে তাঁতের উপর মাথা রেখে পড়েছিল- শ্যাম বাগদীকে বলেছিল 'রিষড়ের কলে পাটের বোরা বুনতে যাব রে শ্যাম।' কদিন পর তাকে তাঁত ঘরে মাচার বাঁশে ঝুলতে দেখা যায়।

কানুভড়ের বাড়ীতে একদিন ছিল বাবুলোকের আনাগোনা। মহাজন থেকে শুরু করে পাইকারি বিক্রেতা এসেছে কাপড় কিনতে। আজ সেই বাড়ি পোড়োবাড়ির মতো খাঁ খাঁ করছে। কানু বিধবার পক্ষে দিন চালানো কষ্টকর। সুতা কেটে সংসার চালাবে উপায় নেই, তুলো পাওয়া যায়না। 'জমিও বেহাত হয়েছে, আছে শুধু ভিটেটা ' লখাই তার এই দুরবস্থার কথা মজুমদারদের সেনকর্তাকে বলেছিল। কর্তা বলেছিলেন কলকাতার সংবাদ পত্রে ছাপানোর জন্য তিনি একটা চিঠি লিখে দিবেন - 'যাতে কাটুনির জীবিকানির্বাহের মতো তুলাটুকু বিনামূল্যে সরকার সরবরাহ করেন ও সুতোর ক্রেতা হন।' কিন্তু লখাই তাকে রক্ষা করতে পারেনি। তার একমাত্র অবলম্বন ১৫-১৬ বছরের মেয়েটি মারা যাবার পর কানু তাঁতীর হাতে বোনা শেষ নিদর্শন নয়ন মোহন উজ্জ্বল শাড়ি খানি পরে

সে চলে যায় গঙ্গার পথ ধরে আতপুরের ঘাটের দিকে। কাটুনি বউ সব বুঝেছিল, তাই তার নিজের জবানিতে সেজবাবুকে লিখতে বলেছিল- 'গায়ের জোরে যারা সব নিল তাদের কাছে দয়া মেগে কি কিছু পাওয়া যাবে'?

শ্রীনাথ কাঠুরের কাজ নেই মহাজন ডেকে নিয়েছে চড়া দামে সব গাছ। কাঠুরে পাড়ার শ্রীনাথ তাই সকাল বেলাতেই তাড়ি খাওয়া শুরু করেছে- ' চাল নেই, তাই রান্না নেই। গাছ নেই তাই কাটাও নেই। ' অন্নের সন্ধানে সে চলে জঙ্গলপীরের থানে দেবতার গাছই সে কাটবে। মনোহর বেদে দুর্দান্ত ডাকাত। যার নামে সারা পরগণা থরহরিকম্প, পদ্ম পুকুরের জল স্থির হয়ে যায়। সেই মনোহরের সঙ্গে দেখা লখাইয়ের । মনোহর ডাকাতকে সামনে দেখে লখাই আশ্চর্য হয়ে ভাবে, 'এ কেমন ডাকাত! ডাকাত এমনভাবে কথা বলে, সে ভাবতে পারে না। এতো তার ছিনাথ কাঠুরে বন্ধুর মতো, সদাশয়, অমায়িক, হাস্যময়।' সে অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করে- "তুমি ডাকাত কেন?" মনোহর ও হেসে উত্তর দেয় "ডাকাত কোথায় দেখলে ? কোথায় আমার লেঠেল বরকন্দাজ ঘোড়সাওয়ার যে লুঠ ডাকাতি করব? ডাকাত হল তোমার ফরাসডাঙার বড় সাহেব আর মানিক ঠাকুর। ওদের দল আছে তলোয়ার বন্দুক আছে, গন্ডা গন্ডা ছিপ লেটকো আছে।" তবে মনোহর স্বীকার করে সে ডাকাতি করে, তাই বলে - " ... যা রটে তা কিছুতো বটেই। লইলে কোম্পানি আর বড় বড় বাবুরা বড় খাপ্পা কেন, বলো? তা বলে কি ডাকসাইটে জমিদার আর কোম্পানির ফিরিঙ্গিদের মতো দিনে দুপুরে লুটতে পারি আমরা?" লুঠ করার ব্যাপারে ডাকাতের সঙ্গে এদের কোন পার্থক্য নেই।বরং এরা ডাকাতের থেকেও ভয়ানক।

রেললাইন নিয়ে সাধারণ মানুষের মধ্যে বিরাট আলোড়ন। রেললাইন দেখতে যেদিন সেনপাড়া জনদ্দলের লোকেরা এসেছিল, সেদিন কালো দুলের মেজোছেলের নাতি কিন্তু কৌতূহলী হয়ে গাড়ির গায়ে আঙ্গুল ঠেকিয়েছিল বলে, তার দুর্গতির অন্ত ছিল না। নিদারুণ প্রহারের পর তাকে পবিত্র করার প্রচেষ্টায় ছিল অমানবিকতা। তার কারণ ঐ গাড়ি ছিল অপবিত্র ও অমঙ্গলের প্রতীক। গাড়ি চলবার আগের মুহূর্তে ট্রলি চাপা পড়ে এক ব্রাহ্মণের মৃত্যু ঘটেছিল। তাই ওই রেললাইন ব্রাহ্মণ হত্যা করেছে বলে মেয়েরা কলসীতে করে গঙ্গা জল ঢেলেছিল রেললাইনে। এদেশে যন্ত্রের আবির্ভাব যাতে মঙ্গলময় হয় তাই পথের ধারে ধারে মঙ্গলঘটও পাতা হয়েছিল এবং চাকলার মহাজনরা শ্যামনগরে বিরাট ভোজ দিয়েছিল।

মহারাণী ভিক্টোরিয়ার ভারতেশ্বরী হওয়ার আনন্দে সেনবাড়িতে চলেছে বিরামহীন উৎসব কিন্তু সেনপাড়া ও জগদ্দল থেকেছে মিস্প্রাণ ও বিমর্ষ। তারা শুধু উৎকণ্ঠা ও হতাশার সঙ্গে এই কথাই ভেবেছে, খাজনা বৃদ্ধি, জমি হাতছাড়া ও ফসল উধাওয়ের কথা। মাথায় হাত ও বুক চাপড়ানো ছাড়া আর কোনও আশা নেই তাদের। তারা শুনেছে শ্রীরামপুরের খবরের কাগজে বেরিয়েছে, কোম্পানির খাজনা আইনের অসারত্ব দেখিয়ে চাষীদের দুর্দশার কথা জানান হয়েছে। কিন্তু এতে চাষী প্রজারা কোন ভরসা পায় না। মহাজন ও জমিদাররা যেন তাদের ঘাড়ের ওপর ঋণের বোঝা নিয়ে চেপে বসেছে। নারাণ কাতুকে নিয়ে রিষড়ের চটকলে কাজ করতে যায়।

শ্যামবাগদীর ঘরে সুখ দুঃখের মজলিস্ বসে সন্ধ্যেবেলা। শ্রীশ মন্ডলের মুখে শোনা যায়। মহাজনী অত্যাচারের কথা - "মান-অপমান মহাজন বাছাবাছি য্যাতই কর মরলেও কি বাঁধন ছাড়তে পারবে? জমিদারের খাজনা আদায় নাকি কম পড়ে, তাই জমি নীলামে ডাকবে।" এই জমি যে কোন প্রজারই হতে পারে, পরম চাঁড়াল বলে আইনের কথা খাজনার কথা- 'আমরা কি খাজনা দিইনে?' শ্রীশ বলে - "তিক্ত এবং বিদ্রূপভরা রাজত্বে নাকি আইন বড় চড়া, কিন্তু প্যাঁচ করবি কার সঙ্গে। জমিদারের সঙ্গে ? উচ্ছেদ করে ছেড়ে দেবে না তোকে?"

তাদের সংশয় অমূলক নয়। সপ্তাহ খানেকের মধ্যেই পাইকারী হারে অনেক জমি নীলাম ডাকা হল। চাষযোগ্য জমি চাষীদের হাত থেকে মুষ্টিমেয় মহাজনের হাতে গিয়ে পড়ল। মহাজন সেই জমি বন্দোবস্তের জন্য লোকের খোঁজ করতে লাগল। সদগোপ চাষীরা এখন অনেক জায়গা জমি কিনে জমিদার।

শোষকের অত্যাচার যে কিভাবে কোথা থেকে হতে পারে, তার নিদর্শন রয়েছে পবন চাঁড়ালের প্রতি নির্মম অত্যাচারের মধ্যে। জমিদারের সঙ্গে প্যাঁচ কষার ব্যাপারে, লখাই যখন পবনকে বলে "কী করতে পারো তুমি জমিদারকে? কী ক্ষমতা আছে তোমার?" উত্তরে পবন বলে- "কিছু না পারি মরতেও পারি লখাই।" সেই পবণকে অপমান করলেন আতপুরের পালকর্তারা। এ যেন মানুষকে অপমান করে মজা পাওয়া - যে মানুষ গুলোকে মানুষ বলেই মনে করা হয় না। তাই এই পৈশাচিক রসিকতা - পবনকে রাস্তা দিয়ে যেতে দেখে পালকর্তা তাকে ডেকে নিয়ে টেরিচুল ও ছোটলোকের স্পর্ধার কথা নিয়ে যা মুখে এল বললেন। সে ছোটলোক হয়ে টেরিচুল রেখে কি অন্যায় করেছে, বুঝতে পারে নি। যার শাস্তি নাপিত ডেকে মাথা মুড়িয়ে দেওয়া। স্তব্ধ, আড়ষ্ট পবন যেন পাথরের মূর্তি " বুক পুড়ে গেল অপমানে। দৌলতের ক্ষমতার কাছে তার তপ্ত চাঁড়াল রক্তের আসুরিক বল থমকে রইল। " " সে জানত এখানে কোনও কথাই চলবে না। অর্থের এ পাশবিক শক্তি তাতে আরো নতুন কৌশল রচনা করবে। সে বিনাবাক্যে পথ ধরল।... নিস্তব্ধ নিঝুম পথ। দুপাশে গাছের ঝুপসিঝাড়ের ছায়ায় ভরা। সে পথের উপর দিয়ে দ্রুত চলল সে । কিন্তু কোথায়, কেন যাবে, সমস্ত যেন এলোমেলো হয়ে গেল তার মনে। অপমানে রাগে দুঃখে বুক পুড়ে যেত লাগল। সে যন্ত্রণার থেকে নিস্কৃতি পাওয়ার জন্যই শুধু সে হাঁটছিল, তার কোনও গন্তব্য নেই। ... একসময় তার চোখ ফেটে দরদর ধারে জল গড়িয়ে পড়তে লাগল। অপমানে ঠাসা বদ্ধ হৃদয়ের ক্লেদ প্রকাশের জন্যই বুঝি এ চোখের জল। তাই তার কান্না যেন আরও উদ্দাম হয়ে উঠতে লাগল। কিন্তু তাতে তার বেগ যখন মানল না, তখন হঠাৎ সে একটা গাছের কাছে দাঁড়িয়ে তার গুঁড়িতে মাথা ঠুকতে ঠুকতে রক্ত বার করে ফেলল আর বারবার বলতে লাগল, ' ভগবান এ হাত পা বাঁধা ছোটলোকদের তবে কেন তুমি জন্ম দেও, কেন দেও, কেন দেও! আর সে জন্মদিয়ে যদি এই তোমার খেলা হয়, তবে বলি ভগবান, তুমি গরীবের কেউ নও।"

পবন তার স্ত্রী তারাকে নিয়ে এসে জুটেছিল, চটকলে কাজ করতে। সেখানে ওয়ালিক সাহেব বলে দিয়েছে- 'যব্ তুম মেশিন মে হাত লাগায়েগা, সমঝো তুমভি মেশিন'। পবন ও বুঝেছে যে, এক

অনুশাসনের কাছে মাথা মুড়িয়ে যেখানে সে এসেছে মাথা মোড়াতে-তা হল যন্ত্রের অনুশাসন তবু মনে ক্ষীণ আশা- " ... কোনও রকমে করে কম্মে কিছু টাকা জমিয়ে গাঁয়ে চলে যাব আবার।" কিন্তু সেখানে'কুরুসেন' সাহেবের অত্যাচারে এবং প্রতিহিংসা পরায়ণ স্বামীকে দেখে ভয়ে তারা গঙ্গায় ডুবে মরে। পরিণামে পবন আত্মঘাতী হয়। এই ঘটনা কাঞ্চনের মনে বিকারের সৃষ্টি করে এবং সেও মারা যায়।

অন্ত্যজ 'লখাই'ঃ প্রতিবাদের সুর

লখাই নিজেদের 'নিধিরামের জাত'ভাবতে ইচ্ছুক নয়। তার একটা অতীত আছে এবং সেই অতীতে সে এদেশে সিপাহী বিদ্রোহে যোগ দিয়েছিল। তার মনে পড়েছে - " ফিরিঙ্গির রক্তে ভাগীরথী লাল করে দেওয়ার কথা।" তার মনের আশা- "যুদ্ধ থেমেছে সাময়িকভাবে, দিন আবার আসবে।"

লখাই অন্ত্যজ সমাজের প্রতিনিধি হলেও, তার অতীতটা অন্যরকম। এখানে সে যেন ছদ্মবেশ ধারণ করে আছে। অতীতের সংস্কার থেকে সে মুক্ত হতে পারেনি আর সেই কারণেই তার সাহেব বিদ্বেষ এতো বেশী। সে সাহেবদের সামনে মুখ খুলতে ভয় পায়না। মুরলিদাসের আখড়ায় মন্দির চত্বরে গোরা সাহেবকে জুতো পায়ে প্রবেশ করতে দেখে তার রক্ত গরম হয়ে যায়। সে এই অনাচার সহ্য করতে না পেরে "ক্রুদ্ধ সিংহের মতো ছুটে যায়। মত্ত হয়ে গালাগাল দিতে থাকে। সেখানে তার প্রাণের ভয় নেই। সে ভালই বুঝতে পারে- এরা কুমতলবে এসেছে।" আমলা বুঝিয়ে দেয়- "সাহেবরা বাবুদের কাছ থেকে এখানকার সব জমি নেবেন, চটকল উঠাবে এখানে।" লখাইও বিদ্রূপের সুরে বলে - "পাণ ভরে শুনো মুরলীদাদা, তোমার আখড়া ভেঙে চটকল উঠবে।" কথাটা মিথ্যে নয়। সত্যিই একদিন মুরলি দাসের বাপপিতামহর আখড়া ভেঙে চটকল ওঠে। আর লখাইয়ের পাহারাদারের চাকরি যায়। সেন কর্তার পোষা পাহরাদার ছিল সে। মুরলীদাসের আখড়ায় দুই গোরা সাহেবকে অপমান করে বলেছিল লখাই - কামান থাকলে উড়িয়ে দিত-তার ভিতরকার বিদ্রোহী সিপাহী হীরালাল জেগে উঠেছিল তখন। কিন্তু সেনকর্তার প্রশ্ন গোরাদের সঙ্গে বিবাদের দুঃসাহস সে পেল কোথা থেকে! কোম্পানীর দেওয়া দৌলতে তাকে পাহারাদার রাখা হয়েছে। দেওয়ান এখন দেওয়ানি ছেড়ে কোম্পানীর চাকুরে। তাদের সেই তেজও নেই, অধিকার ও নেই।

এই মানসিকতা থেকে লখাই পবন চাঁড়ালের হাতে কাটারি তুলে দিয়েছিল, অত্যাচারী ক্রুসেনকে হত্যা করার জন্য। পবন সাহেবকে হত্যা করতে সাহসী হয়নি - আর সাহেবকে মারলে তার বউ তারা তো ফিরে আসবে না ক্রমশ যুক্তি দেখালে, লখাই হিতাহিত জ্ঞান হারিয়ে পবনের গালে এক থাপ্পড় বসিয়ে দিয়ে বলেছিল- "শালা পারবিনে তো, এখানে এসেছিস কেন? মাগের মান রাখতে পারিসনি, গলায় দড়ি দিগে যা।" সে রাতেই পবন গলায় দড়ি দেয়।

হালিশহর পরগণার জমিদারের আদেশ ঢ্যাঁড়া পিটিয়ে জানান হল যে, "পরগণার গঙ্গার ধারের কোন জমি বিলি বন্দোবস্ত দেওয়া হইবেক না। ঐ জমি বর্তমান সমস্ত বাসস্থান ও বন্দোবস্ত

দেওয়া গঙ্গার ধারের জমি কোম্পানীকে বিলি করিতে সকলে বাধ্য থাকিবেক। এই খানে সমস্ত জমিতে চটকল বসিবেক, কোম্পানীর এই রূপ আদেশ আছেন।"

" তাহলে এতদিনের গ্রাম জনপদ ভিটা মাটি সব ছেড়ে চলে যেতে হবে? নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে এই সব প্রাচীন ইমারত, আগুড়িপাড়া, দুলেপাড়া, বাগদীপাড়া সমস্ত জনদ্দল? কেন কেন কেন ? মানুষগুলো যেন আদেশের সঙ্গে সঙ্গেই উচ্ছেদ হয়ে গেছে..।"

লখাইয়ের হাতে পায়ে শক্তি নেই, তার জগৎ অন্ধকার। চোখের সামনে ভেসে উঠেছে- "বহুদিনের ভিটা ছাড়া দীর্ঘ এক বাস্তুহারা দল চলেছে ভিটার সন্ধানে। ... আর সেই হাজার বছরের গড়ে তোলা ও পরিত্যক্ত জনপদ ভেঙ্গে উঠেছে মস্ত বড় বড় ইমারত। দীর্ঘ পাড় জুড়ে তার পাথুরে দুর্গের মতো ব্যাপ্তি। তার মধ্যে যন্ত্রের গর্জন গুম গুম করে ধরিত্রির অঙ্গ পীড়ন করছে। বিশাল কালো চিমনি দৈত্যের মতো দাঁড়িয়ে আছে সগর্বে, সন্ধানী সতর্ক প্রহরীর মতো। কোট গ্লাস্টারের চিমনির মতো গর্জন করে উঠেছে গোঁ গোঁ করে । লোহা পাথর পাট দুলো রেল... এক দানবীয় শব্দে হাহাকারে ছুটে এসে গ্রাস করছে সেনপাড়া। জগদ্দল পাথরের মতো দুলে বাগদী ডোমপাড়া পদদলিত করে এক বিচিত্র বিশাল যন্ত্র দাঁড়াচ্ছে মাথা তুলে। তারপর, আরও আরও ... সমস্ত জগৎটাই যেন ছেয়ে ফেলেছে কেবলি চটকল... চটকল... চটকল। আর সব ছাপিয়ে সেই ইমারতের আকাশের উপরে চটকল দেবতার চাবুকের শিষ হিস্ হিস্ করে উঠছে ক্ষিপ্ত বিষাক্ত গোখরের মতো।"

"মানুষের জীবন ও পারিবারিক গঠনের সঙ্গে গোটা এলাকাটা যেন তার মানুষজন ও প্রকৃতি নিয়ে কী নিদারুণ রূপান্তরিত হয়ে যায়। তাঁত শিল্প উপযুক্ত কাঁচামালের অভাবে বন্ধ হয়ে গেল, জোলা-চাষী-তাঁতী ও জেলেরা সাম্রাজ্যবাদী ও ঔপনিবেশিকতাবাদী ইংরেজ সরকারের তৈরী চটকলে, নতুবা ব্রিজ তৈরীর কাজে বা রেললাইন পাতার প্রয়োজনে গ্রাম-গঞ্জ ছেড়ে চলে গেল। চারিদিকে একটা দারিদ্র, শোষণ, বঞ্চনার হাহাকার, শ্মশানের বিশৃঙ্খলা । সমরেশ সমাজিক রূপান্তরের বিশ্বস্ত দলিলীকরণের জন্য খুব ডিটেলসে, বিভিন্ন চরিত্রের ও ঘটনার বিন্যাসের মাধ্যমে অপেক্ষাকৃত ব্যাপকভাবে ওই সময় ও সমাজ ফুটিয়ে তুলেছেন। এই প্রসঙ্গে লেখক শ্রীরামপুর চাতরার, গোঁসাইবাবু হালি শহরের জমিদার, জগদ্দলের সেনবাবু , আতপুরের রাজা প্রভৃতিদের বিলাস ব্যাসন ও দান - খয়রাত, অতিথি বৎসলতা, শাসক ইংরেজের তোষণ ও প্রজাদের কাছ থেকে খাজনা আদায়ও নানাবিধ দাপটের প্রসঙ্গ ও উল্লেখ করেছেন এবং কাহিনীটির ঐতিহাসিক বিশ্বস্ততা সম্পর্কে পাঠককে সুনিশ্চিত করার প্রয়োজনে বঙ্কিমচন্দ্রকে সশরীরে উপস্থিত করেছেন।" [১২৪]

'উত্তরঙ্গ'-র নায়ক লখাই বাগদী অবাক বিস্ময়ে দেখেছে এইসব কিন্তু সাহস থাকলেও এর প্রতিবাদ করার শক্তি তার নেই।

খ) গঙ্গা

প্রসঙ্গ ঃ 'গঙ্গা' ঃ অন্ত্যজ মেছুয়াদের জীবনচিত্র

" গঙ্গার জল সাক্ষাৎ ভগবতীর। এত বিস্তর তুমি কোথায় পাবে। ভগবতীর জলে মাছ মারবে, তুমি মাছমারা, তার খাজনা নেবে মানুষে । বিল বলো, বাওড় বলো, তুমি নিজের হাতে

গড়োনি। কিন্তু তার প্রাণী থেকে ঘাস কচুরিপানা, সবকিছুর খবরদারি করবে তুমি। গাঙ-বিল-বাওড়ে যে প্রাণ দেবে আর নেবে, তার ওপরে তোমার আইন খাটাতে চাও মানুষ হয়ে ! খাজনা ধরো, ট্যাকসো ধরো। মাছ তুমি ছাড়োনি। কিন্তু ভাত না দিয়ে তুমি কিল মারার গোঁসাই। কীসে তোমার হক? না, তুমি জমা নিয়েছ, দেশের তুমি রাজা হয়েছ।

যে দৌলত তুমি দাওনি, আমার বাপ-পিতামোর কৌশল খাটিয়ে যাকে পাই, তার ওপরে তোমার খবরদারি। নির্যাতন করবে তুমি কেন? না, আমি মাছ মারি । তোমার শক্তি আরও বড় , তুমি আমাকে মারো ।" [১২৫]

- ছোটর প্রতি বড়ব প্রতাপ, দুর্বলের প্রতি সবলের অত্যাচার - যাই বলি না কেন, এই হল চিরকালের শোষক আর শোষিতের সম্পর্ক। যুগ যুগ ধরে সমাজে চলে আসছে নিয়ম। সমাজে যারা ছোট, যারা দুর্বল-তারাই বঞ্চিত, নিপীড়িত অন্ত্যজ সমাজের অন্তর্গত মানুষের জীবনের এই মূল সত্যটি, 'গঙ্গা' উপন্যাসে মাছমারার ভাবনায় প্রতিফলিত।

ঔপনাসিক সমরেশ বসু, জেলে নৌকায় একাধিক দিন কাটিয়েছেন, মৎস্যজীবী সঙ্গীদের কাছ থেকে বিভিন্ন তথ্য সংগ্রহ করেছেন, তাদের সঙ্গে থাকার ফলে, তাদের জীবনের একটা দিক সম্বন্ধে তিনি প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা লাভ করেছেন। যা থেকে মাছমারাদের জীবিকা সংস্থানের বিভিন্ন অভিজ্ঞতা,তাদের মাছমারার বিভিন্ন উপকরণ, তাদের মুখের ভাষা, মাছ ধরার নিয়ম, গঙ্গার যাত্রাপথের বিবরণ, শহরের অভিজ্ঞতা, কখন-কোথায়-কিভাবে মাছ ধরতে হবে তার বিবরণ,মাছমারাদের ব্যবহৃত দ্রব্যের পরিভাষা, বিভিন্ন ধরণের নৌকার বর্ণনা-বেশ পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে চিত্রিত।

সম্ভবত, জেলে নৌকায়, জেলে মাঝিদের সঙ্গে থাকার ফলে, মৎস্য জীবীদের জলের জীবনকে লেখক যেভাবে সাহিত্যিক রূপ দিয়েছেন - ঘরের জীবন সেভাবে তুলে ধরেন নি। তাই গঙ্গার মাছমারাদের জীবন সংগ্রামের যে কাহিনী লিপিবদ্ধ হয়েছে, তার বেশীর ভাগটাই পাঁচুমালোর ভাবনায়-জেলেদের জলের জীবনের নানা অভিজ্ঞতা । তারই মধ্যে শোনা যায়, পরবর্তী প্রজন্মের মাছমারা বিলাসের একক কণ্ঠের প্রতিবাদ। মাছমারাদের ঘরের জীবন- যা তাদের ঘরণী সামলায় তার ক্ষীণচিত্র ধরা পরে, তাদের বারোমাস্যাই আর মাছমারার জীবনে সবকিছুর মূলে আছে জলের সঙ্গে মাছের সম্পর্ক মাছের সঙ্গে মাছমারার সম্পর্ক।

প্রকৃতির আনুকূল্যে কোন ঋতুতে , কখন, গঙ্গার কোথায়, কেমন চেহারা থাকবে- তখন মাছেরা কিভাবে , কোথায় অবস্থান করবে- তার ওপরেই নির্ভর করে মাছমারার হাসিকান্নার জীবন ছন্দ। কারণ-

> "যাবৎ জীবনের মরণ ধনদৌলত, সবকিছু নিয়ে মাঠাকরুণ বসে আছেন গাঙের তলায়।" [১২৬]

'গঙ্গা'য় যেসব মৎস্যজীবীদের কথা বলা হয়েছে, তাদের মধ্যে আছে- জেলে, কৈবর্ত, নিকিরি, চুনুরী, মালো, রাজবংশীরা। রাজবংশীরা মাটি হারিয়ে মৎস্যজীবী হয়েছে। এই

মৎস্যজীবীরা-তেঁতুলিয়া , সারপুল, পুরোখোঁড়াগাছি, কতুল্লোপুর, ফরিদকাঠি,বীরপুর- এ সমস্ত জায়গা থেকে আসে আবার পুঁড়্যা আতুরে, ইটিন্ডে, দন্ডীর হাট, শাঁকচূড়া, টাকি থেকেও আসে মস্যজীবীরা এই মাছ মারাদের দলকে যেন 'দখনে বাওড়' তাড়া করে নিয়ে আসে। দক্ষিণে গোপালপুর পশ্চিমে সন্দেশ খালি হাসনাবাদের তলা দিয়ে মঠ বাড়ি, দুলদুলি হয়ে সাহেবখালির মুখে ঝিল্লে আর রায় মঙ্গলের মোহনায় তারা ভেসে আসে। তারপর দক্ষিণে খেল্যের গাঙ রেখে শুকুনী গাঙ, ভবানীপুর কালী নগর ভিরিয়ে ন্যাজাট। কুলটির গেটে থামতে হয় টিকিটের জন্য। সেখানে একরাত কাটিয়ে কেষ্টপুরে খালগেট জলযাত্রীদের পথ বন্ধ লোহার শেকলে। এখানে 'কুত' অর্থাৎ নৌকার মত টিকিটের দাম ধার্য হয়। এরপর উল্টোডাঙা বা নিউক্যানেলের পর বাগবাজার খালগেট - কেষ্টপুরের টিকিট বাগবাজারে দিলে - গঙ্গা। - মৎস্য জীবীদের যাত্রা পথের সুন্দর বর্ণনা দিয়েছেন লেখক। কিন্তু যাদের উপর নির্ভর করে আছে অগণিত মাছমারাদের জীবন, তাদের স্বভাব চরিত্র কেমন- "ঠাকরুণ নদীকে ভাল না লাগলে মাতলায় যাবে। ইছামতীকে মনে না ধরলে, গঙ্গার মোহনায় যাবে ঝাঁক বেঁধে। মায়পাঁজি-পঞ্জিকার আঁক-কষা কথাকেও ঠেলে ফেলে মীনেশ্বরী চলাফেরা করে।" [১২৭]

মাছের চরিত্র, খাল-বিল-নদী নালা থেকে গঙ্গা - নদীমাতৃক বাংলার এই জলের চরিত্র, তারপর আছে সমুদ্র যাত্রা- তার নানা বিপদ আপদ- জলে কুমীর, ডাঙায় বাঘ- সবকিছুর নারী-নক্ষত্র জেনে, পাঁজির হিসাব কষে চলতে হয় সন্তর্পণে - এই ভাবে জীবন মরণ সংগ্রাম করে মাছের দেবতা খোকা ঠাকুরের কৃপায় যদিও কিছু শুভ ফল পাওয়া গেল তারপর আছে মহাজন পাইকার, ফড়ে-ফড়েনী, আড়তদার- এদের উৎপাত; লোক ঠকানোর নানা কলা কৌশল। আরো আছে প্রাকৃতিক বিপর্জয়।

এদের জীবন যাত্রার প্রতিটি পদক্ষেপে যেন মরণ ফাঁদ পেতে বসে আছে। শুধু ফাঁদে পরবার অপেক্ষা । এই মরণ ফাঁদ ফেলে মাছ মারা যেমন মাছ মারে, তেমনি মাছমারাকেও মরতে হয় ফাঁদ বন্দী হয়ে- "তুমি মার মাছ, তোমাকে মারেন আরএকজন।" [১২৮]

প্রসঙ্গ ঃ অন্ত্যজ মেছুয়া জীবন ঃ প্রেক্ষাপট 'বারমাস্যা'

মালোদের নিজস্ব ঐতিহ্য-সংস্কার দিয়ে গড়া তাদের সমাজ। তাদের উৎপত্তির ইতিহাস, তাদের সৃষ্টি, তাদেরই মুখে মুখে ফেরে। রাম মালোর মুখে শোনা যায় তাদের আদি পুরুষের কাহিনী - "এই তোমার সেকালের বাদার মালোদের পেথম পুরুষের কথা বলছি। সেকি আজকের কথা। চোদ্দ পুরুষেরও চোদ্দ পুরষ আগে। ওয়াঁর কল্যাণেই সমুদ্দুর পারের মাল বংশ বড় হয়েছিল, ছইড়ে পড়ে ছেলো। মালোরা ত্যাখন রাজা হয়েছিল দেশের। শুনিচি, 'দক্ষিণদে হেঁটে এয়েছিলেন। হ্যাঁ সমুদ্দুরের ওপরদে', দিব্যি পা ফেলে ফেলে হেঁটে এয়েছিলেন। দিগম্বর কালো কুচকুচে এক পুরুষ, কোঁচকানো চুল ফণা ধরে আছেন কপালের ওপর। গায়ে আর কিছু নেই। হাতে এক মস্ত ক্যাঁচা ! ডাঙায় এসে ওয়াঁর বড় বেপদ হল। দক্ষিণ রায়ের রাজ্যি। ছেড়ে কি কথা কয়। ত্যাখন অবশ্যি ধলতিতেও বাদা। আসার পথে নড়ুই হল দক্ষিণ রায়ের চেলাদের সঙ্গে। জিতলেন উনি। দক্ষিণরায়

খুশি হয়ে মস্ত একখানি গায়ের ছাল দিলেন ওয়াঁরকে পরতে। ঐ হল ওয়াঁর আসল মূর্তি। বাঘের - ছাল-পড়া, ক্যাঁচা হাতে কালো কুচকুচে পুরুষ। তোমার গোটা সমুদ্দুরের পাড় ধরেই ছিল ওয়াঁর রাজ্যি।" - এই কাহিনীর সত্যতা নিয়ে কোন প্রশ্ন ওঠে না মালোদের মনে। বরং তাদের এই 'পেথম পুরুষের' কাহিনী শুনে তাদের বুক গর্বে ভরে ওঠে নিবারণ মালো ও তার ছেলে বিলাসের হাবভাব ও স্বভাবে এই আদিপুরুষের মিল তারা পায়।

ঔপন্যাসিক এখানে মাছমারাদের ঘরের জীবনের থেকে জলের জীবনের কথা বলেছেন বেশি। তবুও তাদের গৃহস্থালির চিত্র মাঝে মাঝে লক্ষ্য করা যায়। মাছমারারা গঙ্গার বুকে, রাত জাগে মাছের আশায়। আর তাদের ঘরে, রাতজাগে তাদের বৌ-ঝিরা - বুক ভরা আশঙ্কা নিয়ে কোন অকূল-গাঙে ভাসছে তাদের প্রিয়জন !

এখানে বর্ষার মরশুম চারমাস- আষাঢ়, শ্রাবণ, ভাদ্র, আশ্বিন। এই চার মাস " অন্ধকারে দু'চোখ মেলে সেও ভেসে বেড়ায় ঘরের মানুষের সঙ্গে সঙ্গে। এই বিধির বিধান নয় । বিধি দেয় রাত আর ঘুম । এ ঘরনি জাগে পোড়া প্রাণের বিধানে।" [১২৯]

নদীতে যখন ' শাওটার ঝড়' বয়ে যায় তখন একা ঘরে সে 'নিঃশ্বাস চেপে প্রহর গোনে'। মাছমারা যখন গাঙে বৃষ্টিতে ভেজে - তখন অন্ধকার ঘর থেকে সে আঁচলের ঢাকা দেওয়ার বৃথা চেষ্টা করে।

" যখন মীন চক্ষু উত্তাল তরঙ্গের বেশে, ঘূর্ণির ছদ্মবেশে, ঝড়ের রুদ্র দাপটে ঘিরে ধরে মাছমারাকে, তখন ঘরে জাগে সতর্কদৃষ্টি । মীন যাকে ছিনিয়ে নেবে নদীতে, তার প্রথম হ্যাঁচকা লাগবে এই ঘরে। কেন? না , সে মাছ মারার বৌ । তার জন্য বাঁচে, তার জন্য মরে। " [১৩০]

কার্ত্তিক মাসটা যদি মাছমারারা 'চাকুন্দে মাকুন্দে খয়রার ফেরে' কাটিয়ে আসে - তাহলে পাঁচমাস পরে মানুষ ঘরে ফেরে। মাছ মারার বৌ সারাদিন ঘর কন্না সামলে রাত জেগে জাল বোনে, ছেঁড়া জাল মেরামত করে। দেখতে দেখতে উত্তরের বাতাস বয় - জলে টান ধরে - এর অর্থ সমুদ্রে যেতে হবে। সাইদারের ডাক আসে সাগরের। আবার চিন্তার রাত শুরু হয়।

"নীলম্বুধি অন্ধকারের বুকে, শাবরের আনাচে-কানাচে, মাছের চকের পিছনে পিছনে, বনের অদৃশ্য দানোর সঙ্গে সঙ্গে, দক্ষিণ রায়ের পায়ে পায়ে, মা বনোবিবির আঁচলে আঁচলে জাগে তার চোখ। আর তার বিনিদ্র আত্মা মাথা কোটে মাছের দেবতা খোকা ঠাকুরের পায়ে"। [১৩১]

প্রকৃতির নিয়মে একে একে আসে - অঘ্রাণ,পৌষ,মাঘ, ফাল্গুন। বর্ষার চারমাস কেটে যাওয়ার পর আসে 'পাট পচানির কাল' - দুর্দিনের শুরু। পৌষে আছে 'পৌষপোড়া' এদের জীবনেই পোড়ার অভাব নেই। ফালগুন ও সুদিন নিয়ে আসে না, নিয়ে আসে 'দখনে বাওড়' । এই নোনার সুদিনে সাইদার যায় সমুদ্রযাত্রায়। সেখানে সুদিন ও আসতে পারে আবার দুর্দিন ও আসতে পারে । দুর্দিন এলে জেলে, মালো, ব্যাপারী, আড়তদার সকলেরই মাথায় হাত।

চৈত্রমাসে মাছমারা ফিরে আসে কিন্তু চৈত টোটার চিন্তায় মাছমারার বউয়ের ঘুম নেই। সমুদ্র যাত্রার অর্থ চলে যায় মহাজনের ধার শোধ করতে। হাঁড়িতে পড়ে টান। জলের সন্ধানে বের হয়

মাছমারা কিন্তু পাঁক জলে শুধু পোকা । পেট চালাতে মহাজনের কাছে সব খোয়াতে হয়। মাছমারাকে তখন গাজনের সংসেজে ভিক্ষে করতে বেরোতে হয়-"সন্যাসের হাঁকের আড়ালে মাছ মারার ক্ষিদের কান্না কেউ শুনতে পাই না" । পাঁচু মালো প্রায় প্রতিবছরই সন্ন্যাস নিয়েছে। না নিয়ে উপায় থাকে না। একে বলে চৈত্রের মন্বন্তর। এই সময় মালোরা ভিখারিতে পরিণত হয়।

বৈশাখে আসতে থাকে নতুন জল, নতুন পাঁজি, সুদিনের আশা - জ্যেষ্ঠে শুরু হয় প্রস্তুতি। নতুন আশায় মাছমারার বউ স্বপ্ন দেখে মানত করে স্বামী -সংসারের মঙ্গল কামনায়- "তার বিনিদ্র আত্মা মাথা কোটে মাছের দেবতা খোকা ঠাকুরেরপায়ে। বলে, হে দক্ষিণরায়, তোমার খাঁড়া নজর দূরে রাখো। মা বনবিবি, মাছ মারার শাবরে তোমার দৃষ্টি দিয়ো না। খোকা ঠাকুর, জল ভরে , খোল ভরে মাছ দাও। তুমি মাছ মারার দন্ডমুন্ডের কর্তা । তুমি দিলে আমি আমার সোয়ামীর হাসিমুখ দেখব, ঘরে আমার সোহাগের বান ডাকবে। আমার ছায়েরা হেসে খেলে বেড়াবে, আমার হাঁড়ি ভরে থাকবে। নতুন সুতো আসবে নতুন জাল বুনবো আমি।আমি পূজো দেবো সকলের পায়ে।"

নতুন আশায় জেগে ওঠে মালোরা। এই হল মাছমারার জীবনের বারমাস্যা - " তুমি মাছমারার বৌ, তুমি জাগো বারো মাস।" কারণ 'এ জীবন তার মাছমারার নিয়মের জালে জড়ানো ।'

অন্ত্যজ মাছ মারা সমাজ ঃ প্রতিবাদী ' বিলাস' চরিত্র

নিবরাণ মালো তার অমিত বল ও সাহস নিয়ে দুঃসাহসিক যাত্রায় বেরিয়েছে বারবার। তাই এই শক্তি ও সাহস তাকে এগিয়ে দিয়েছে - যে কোন প্রতিকূলতার মধ্যে। তাই নিবারণের সময়, তাদের বাড়ি লক্ষ্মী অবস্থান করেছেন। শক্তি ও সাহস নিয়ে নিবারণ দারিদের সঙ্গে লড়াই করে গেছে। এমনকি প্রকৃতির বিরুদ্ধে অভিযান চালাতে সে ভীত হয়নি-যদিও পাঁচুকে সে এ বিষয়ে বার বার সতর্ক করেছে।

নিবারণের ছেলে বিলাস শুধু নিবারণের আদল নিয়ে জন্মায়নি, তার মধ্যেও আছে তার বাবার মত শক্তি ও সাহস। নিবারণ বেঁচে থাকার রসদ সংগ্রহের আশায় বারবার প্রকৃতির প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে এগিয়ে গেছে- বিলাস আরো একধাপ এগিয়েছে। বিলাসের মধ্যে আছে সংস্কার মুক্ত মন আর প্রতিবাদী সত্তা। এই প্রতিবাদ শুধু প্রকৃতির বিরুদ্ধে নয়, কুসংস্কারের মধ্যে, সমাজের অন্যায় নিয়মের বিরুদ্ধে, অত্যাচারীর বিরুদ্ধে । তাই বিলাসকে নিয়ে পাঁচুর যেমন ভয় আছে তেমনি স্বপ্নও দেখে বিলাসকে ঘিরে। সে তাকে সর্বদা নজরবন্দী করে রাখতে চায়। বিলাস মালো সমাজে সকলের চেয়ে আলাদা ।

বিলাস সংস্কার মুক্ত, সাহসী, বলিষ্ঠ যুবক। মাছমারাদের গন্ডীবদ্ধ জীবনের সীমাকে সে অতিক্রম করতে চায়। অদম্য কৌতূহল বোধে অজানা রহস্যকে ভেদ করতে চায়। তাই শহরজীবনের প্রতি তার একটা স্বাভাবিক কৌতূহলে ছোট বেলায় সে দুবার চাষীদের সঙ্গে লুকিয়ে শহরে এসেছে। শহরের প্রতিও যেমন তার আকর্ষণ - সমুদ্রের প্রতিও সে অনিবার্য টান অনুভব করে । শহরে থাকতে

না চাইলেও, শহর দেখার শখ তার আছে। গ্রাম পেরিয়ে শহর , খাল বিল নদী পেরিয়ে সমুদ্রের অসীমতায় পরিব্যাপ্ত তার জগৎ।

রগচটা, গোঁয়ার এই যুবক তার বিবেচনায় যা অন্যায়, তার কাছে হার মানতে রাজী নয়। মন রেখে কথা বলা তার স্বভাব নয়, সব কথার উত্তর তার মুখে জোগানো - মহাজনকেও সে রেহাই দেয় না। মহাজনের কাছে টাকা ধার করতে গিয়ে কৈফিয়ৎ চায়- রসিকতাও করতে ছাড়ে না।

বিলাস তাদের সমাজের সকলের নজর কাড়তে থাকে। নিবারণ মালো ছিল বাছাড়। চার-পাঁচ মণ ওজনের তাল গাছের গুঁড়ি একদিকে ধরে তুলে, যে সবেচেয়ে দূরে টেনে নিয়ে যেতে পারে - সেই পায় বাছারের সম্মান। সে সম্মানে সম্মানিত হয়েছে বিলাসও।

মাছমারাদের জীবনে আছে মহাজনের অত্যাচার । অন্ত্যজ মানুষকে ঠকানো যাদের চির দিনের অভ্যাস। পাঁচুরা অবশ্য মহাজনের ফাঁকি বুঝতে পারে, জেনে শুনে ঠকে - প্রতিবাদ করার সাহসের অভাবে।

কদম পাঁচুর মহাজন ব্রজেন ঠাকুর মাছমারাদের তুই-তোকারী ছাড়া কথা বলে না। এ হল শহরের মহাজন। এদের চরিত্র বোঝা ভার। সব মাছ মহাজনকে দিয়ে টাকা শোধ করলে- কদম পাঁচু তার ছেলেদের নিয়ে খাবে কি ! সে মাছ নগদে বেচে দেওয়ায় ক্রুদ্ধ হয়ে ওঠে তার মহাজন-গালাগালি দিতে থাকে। বিলাস এ অন্যায় সহ্য করতে পারে না। জাত তুলে গালি দেওয়া তার ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটায়- "আপনার বড় মুখে ছোট কথা ভালো লাগে না। জাত-বেজাত কেন? টাকা নিয়েছে, পুলুশে দেন।" বিলাসের এই আচরণ করালীকে মনে পড়ায়।

মহাজন সুদ মেটাবার কথা বলে - তাকে স্মরণ করিয়ে দেয় মাছমারাদের সময় ভালো। রাণী রাসমণির জলে খাজনা দিতে হয় না। তাছাড়া পাঁজি লিখছে - এবার 'মৎস্যদশ' -পাঁচুর মুখে মহাজনের এই মন্তব্য শুনে বিদ্রুপ করে ওঠে বিলাস-"মহাজনকে বল, সে একখান পাঁজি নিয়ে এসে একবার নড়ু ই করে যাক গঙ্গার সঙ্গে।" পাঁচু মহাজনের আইন দেখালে, সে প্রতিবাদ করে- "আরে আমার আইনরে ! আমার নৌকো জাল রেখে দেবে, তবে আর কি! তার চেয়ে, ঋণ নেব না। আমাকে ঋণ দে'তো মহাজন খায়। আমি যদি ঋণ না নে' না খেয়ে মরি, মহাজন বাঁচে কমনে? ঋণের জোরেই তো ? " অশিক্ষিত অন্ত্যজ মানুষের এ এক অভিনব বিদ্রোহ।

শাঙনে টোটা মাছমারাদের মহামন্বন্তর। মহাজন পাল মশাই প্রতি নৌকায় মাছ খুঁজে বেড়ায়, খুঁজে পেলে ফড়ে পাইকার ডেকে দর করে মাছ বিক্রি করে, টাকা নিয়ে, টাকা শোধের হিসাব করে। খাবার টাকা না থাকলে চালের দাম দেয়। জ্ঞানের কথা বলে; কাজের উপদেশ দেয়। পশ্চিমের মহাজনী নৌকার কদম পাঁচুর জাল নষ্ট করে দিলে, বিলাস তার শোধ নেয় ও পঞ্চাশ টাকা উশুল করে তবে ছাড়ে।

পশ্চিম পাড়ের মাছমারারা যখন বাঁধাছাঁদি জাল পাতে, তখন বাকি মাছ মারারা বিপদে পড়ে। পাঁচু তার ভাইপো বিলাসের বুদ্ধি ও সাহসের তারিফ না করে পারে না। বিলাসের কথায় আপোসে না মিটলে-লেগে যায় বিলাসে রসিকে মারা মারি। বিলাসের শক্তির কাছে হার মানে

রসিক। মানী লোকের সভায়, সোনার আংটি ও বোতামধারী এক ভদ্রলোক বিধান দেন-সকলেই বাঁধাছাঁদী জাল ফেলতে পারে। প্রতিবাদ করে বিলাস- পূব পাড়ের মাছ মারাদের হয়ে, সেই মানি আড়তদারের বিরুদ্ধে- "মশায়, বিচার করছেন কেমন ধারা আপনি? আমরা আসি দূর গাঁ থেকে, নৌকোয় বাস। বাঁধাছাঁদি আনতে পারি নে। ... আমার যদি বাঁধাছাঁদি না থাকে, তবে কি আমি কলা মুখে দে থাকবো মশায়? এটা কেমন বিচার তাহলে গরীব মাছমারারা কি করবে?" ঠিক হয় টানের দিনে রাত্রে বাঁধাছাঁদি চলবে।

শহরের বুকে বয়ে - যাওয়া- গঙ্গার নিয়ম আলাদা। ডাইনে টিটাগড়ের ঘিঞ্জি কলকারখানা- সামনে ব্যারাকপুর। এখানে ১৪৪ ধারার বাঁধের ১০০হাত দূর দিয়ে যেতে হবে। ধর্মপতির কোপ পড়লে হয় শূলে যেতে হবে, নয়তো জরিমানা। ফলে দাঙ্গা হাঙ্গামা লেগেই থাকে।

শহরের আর একজন মহাজন হল ফড়ে ফড়েনী। ডাক সাইটে ফড়েনী দামিনী। নিবারণ এই দামিনীর কাছেই মাছ বিক্রি করত, টাকা ধার নিত। নিবারণের প্রতি দামিনীর একটা আলাদা টান ছিল- তাই পাঁচুকেও অন্য চোখে দেখে। দামিনীর নাতনী হিমি-বর্তমানে সব দেখা শোনা করে । বিলাসের সঙ্গে এই ফড়েনীর একটা আন্তরিক সম্পর্ক গড়ে ওঠে।

প্রসঙ্গ ঃ অন্ত্যজ মেছুয়া-জীবন ঃ মরণ- বাঁচনের তাগিদ

পাঁচুর মৃত্যু- একটি অধ্যায়ের শেষ। পাঁচু সংসার ছেড়ে চলে গেল। মাছ মারা সে, জলের বুকে নৌকার মধ্যেই শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করল। যাবার আগে বিলাসের জন্য মঙ্গল কামনা করে গেল-

"হে দক্ষিণ রায়, তোমার ভয়ংকর রূপ আমি দেখেছি। মা বনবিবি,তোমার মহামারী বিভীষিকা দেখেছি সাঁইয়ের শাবরে। হে সমুদ্র,তোমার রুদ্র রূপ আমি দেখেছি। বাদা, হেতাল, সুঁদুরি বনের দানো, তোমার খরা শুনেছি। মাগো গঙ্গা, তোমার অনন্ত বুকের মহাসর্বনাশকে দেখেছি, তোমার আশীর্বাদ পেয়েছি অনেক। তুমি আসছো খোলা জটায় লুটিয়ে, রুদ্রাণী তুমি আমার শিয়রে। তোমার মাঝে একদিন মাছমারা আমি ফিরেছি। তোমাদের হাতে রেখে গেলুম বিলাসকে।"

বিলাসকে সে পরামর্শ দিয়ে যায়- মাছমারারা চিরকাল মাছ ধরবে - এটাই বিধান। বিলাস যেন সমুদ্রে যায় টানের মরশুমে। হিমি যদি বিলাসকে চায়- বিলাস যেন তাকে গ্রহণ করে। পাঁচুর অবর্তমানে বিলাস যেন হালে বসে। সে বিলাসকে আশীর্বাদ করে বলে যায়-"মানুষ চিরকাল মাছ ধরবে। এ সোমসারের মানুষ মাছ ভাত খাবে। তুই মাছ মারিস। জীবনে তাতে তোর কিছু বাদ পড়বে না। তোর কল্যাণ হোক। তুই দুধে ভাতে খাস।" - এ যেন মাছমারার দুর্দিনে আশ্বাসবাণী। পাঁচুর আশীর্বাদে গঙ্গার সুদিন ফিরে এল- যেমন আসে প্রকৃতির নিয়মে। হিমি তার সর্বস্ব দিয়েও মাছমারা বিলাসের সঙ্গী হতে পারল না। ডাঙার মানুষ হিমি, বিলাসের সঙ্গে অকূল সমুদ্রে ভাসবার সাহস পেল না।

উপন্যাসের প্রথম অংশে মৃত্যুর যে রহস্যময়তা কাহিনীর পাকে পাকে জড়িয়ে রয়েছে- বিলাসের আগমনে তা অনেকটা স্তিমিত হয়ে এসেছে। বিলাশ শক্তি-সাহস - কামনা-বাসানায় পরিপূর্ণ

এক যুবক- যে কোন সংস্কারকেই মানতে চায়না। মাছমারার জীবন-মরণের সংস্কারকে সে মানে না। তাই জীবনের প্রতিটি পদক্ষেপে মরণের সঙ্গে লড়াই করার মানুসিকতা তার আছে। কিন্তু মৃত্যু চেতনায় আছন্ন হয়ে মৃত্যুকে বরণ করে নেওয়ার মানসিকতা তার চরিত্রে অনুপস্থিত । বিলাস যে দিন থেকে তার কাকা পাঁচুর সঙ্গী হল- সেদিন থেকেই জীবন সম্বন্ধে পাঁচুর আশঙ্কা ও বিধি - নিষেধ উপেক্ষা করেছে বিলাস। বিলাসের প্রাণোচ্ছ্বাসে জীবন প্রতীকায়িত হয়েছে। পাঁচুর ট্র্যাজিক মৃত্যু এবং মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্তে বিলাসের প্রতি উপদেশে, যেন শুধু বিলাস নয় - মাছমারাদের বেঁচে থাকার ইঙ্গিত আভাসিত হয়। বিলাস জীবনের প্রতীক। যে জীবন সর্বক্ষণ মরণের সঙ্গে সংগ্রাম করে বেঁচে থাকে-মরণের ভয়ে মরে থাকে না বা মরণের হাতে অসহায় ভাবে আত্মসমর্পণ করে না।

লেখক এখানে নদী ও সমুদ্রের বুকে মাছমারার যে কাহিনী বয়ন করেছেন- সেখানে প্রতি মুহূর্তে রয়েছে প্রাকৃতিক বিপর্যয় অজ্ঞাত বিপদের সম্ভাবনা। "প্রবহমান নদী ও রসস্যময় সমুদ্রের মধ্যে যাহাদের জীবন অতিবাহিত হয়, তাহাদের মনে প্রাকৃতিক বিপদ ও অতিপ্রাকৃতের অনুভব যেন একই অভিজ্ঞতার ভিতর ও বাহির দিক বলিয়া প্রতিভাত হয়। উহাদের আঁকে বাঁকে, অসীম বারি বিস্তারের বিভ্রান্তিকর নিঃসঙ্গতায়, ঢেউ-এর ওঠা-নামায়, ঝড়ের দুর্দম দাপটে ও আবর্তের অদৃশ্য আকর্ষণে এক কুটিল রহস্যময় শক্তির অতন্দ্র হিংসা, এক মানববোধাতীত মায়া সত্তার সর্ব ব্যাপ্ত, নিঃশব্দ সুযোগ প্রতীক্ষা জল বিহারী মানুষের মনে আতঙ্ক-কুহকের অনুভূতি জাগায়, তাহার সমস্ত ইন্দ্রিয়কে এক অজ্ঞাত বিভীষিকার আবির্ভাব প্রত্যাশায় রোমাঞ্চিত করে। Coleridge-এর 'The Ancient Mariner' হইতে সমরেশ বসুর গঙ্গা পর্যন্ত জলচর মানুষের এই রূপ মানস প্রবণতা উদাহৃত।"[১৩২]

- সেইজন্য দুঃসাহসী নিবারণ মালো- জলের জীবনের অভিসন্ধি জেনেও রহস্যময় মৃত্যুর অতলে তলিয়ে গেছে। সেক্ষেত্রে এই সবকিছুর প্রত্যক্ষ দ্রষ্টা পাঁচুমালোর ভয় অকারণ নয়। বরং মৎস্যজীবী সমাজে বিলাস ব্যতিক্রম। প্রকৃতির প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে মানুষের সংগ্রামে শেষ পর্যন্ত মানুষকেই হার স্বীকার করতে হয়- যেমন করেছিল নিবারণ মালো। তার ছেলে বিলাসও সমুদ্রযাত্রা করেছে-প্রকৃতির সঙ্গে সংগ্রামে নেমেছে-মাছমারাদের জীবনে মরণের হাতছানি বয়েই গেছে। কিন্তু পাঁচুর শেষ কথা - 'তুই দুধে-ভাতে খাস।' জীবনে আশার ইঙ্গিত। বিশেষ করে মানুষের অত্যাচার আর শোষণের প্রতিবাদ করে, একটা সুস্থ জীবনের আশ্বাস-যেখানে মানুষ দুধে ভাতে খেয়ে শান্তিতে থাকতে পারে- বিলাসের মতো প্রতিবাদী চরিত্র হয়তো মানুষের শোষণের বিরুদ্ধে লড়াই করে- এই সুখটুকু হাসিল করে নিতে পারে- এই আশা।

ঘ) মহাকালের রথের ঘোড়া

প্রেক্ষাপটঃ 'মহাকালের রথের ঘোড়া'

নকশাল আন্দোলনের পটভূমিতে লেখা সমরেশ বসুর- 'মহাকালের রথের ঘোড়া'। উপন্যাসটি

প্রকাশিত হয় ১৯৭৭ সালে; এই সূত্র ধরে হিসেব করলে দেখা যাবে- উপন্যাসটিতে রয়েছে উপন্যাসের নায়ক রুহিতন কুরমির আট বছর কয়েকমাসের জীবন সংগ্রামের কাহিনী। এই হিসাবে ধরে নেওয়া যায়, উপন্যাসটির ঘটনাকাল ১৯৬৭-১৯৭৫ সাল, এই সময়ের মধ্যে। যদিও ঔপন্যাসিক কোনো সাল- তারিখের হিসাব এখানে দেননি।

ঔপন্যাসিক এই গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত ভূমিকা স্বীকার করেছেন- "ইতিহাস লিখতে বসিনি। ভূগোলও না। অতএব, উক্ত দুই বিচারে ত্রুটি মুক্ত নই। চরিত্র ও ঘটনার কি কোন বাস্তব সম্পর্ক আছে? নেই। কল্পনায়? আছে। লেখকের কল্পনা যেখান থেকে উদ্ভাসিত হয়, এ কাহিনী সেখান থেকে গৃহীত, পরিণতিও তেমনি সৃষ্টি ছাড়া, আর একান্ত আপন।"

উপন্যাসের সংক্ষিপ্ত ভূমিকায় লেখকের এই বক্তব্য মাথায় রেখে বলা যায়- নকশাল আন্দোলনের মতো রক্তাক্ত আন্দোলনের প্রভাব যে লেখকের মনোভূমিকে নাড়া দিয়েছিল তাতে সন্দেহ নেই। পুরোপুরি ভূগোল, ইতিহাস মেনে না চললেও , এক রক্তক্ষয়ী ঐতিহাসিক ঘটনা এই উপন্যাসের পটভূমি। এই আন্দোলনের নেতৃবর্গ সাধারণ মানুষের কাছে এতই পরিচিত ব্যক্তিত্ব যে, তাঁদের প্রভাব কাটিয়ে উপন্যাসের নেতৃনিধিদের চরিত্র সৃষ্টি করা মুশকিল হয়ে পড়ে। আর এই উপন্যাসের নায়ক রুহিতম কুরমির বাস্তবভিত্তি হিসাবে যদি এই আন্দোলনের আর এক ব্যক্তিত্ব, জঙ্গল সাঁওতালের নাম মনে আসে, তাহলেও বলা যায় সেটা অবাক হওয়ায় মতো কিছু নয়।

লেখকের অভিপ্রেত, রুহিতন কুরমির জীবন সংগ্রামের কাহিনী - যে রুহিতনরা চিরকাল মহাকালের রথ টানার জন্য ঘোড়ার কাজে লেগেছে। রুহিতনের আশা-আকাঙ্ক্ষা, তার স্বপ্ন এবং পরিশেষে তার পরিণতি-পাঠককে এক কঠিন প্রশ্নের সম্মুখীন করে- সারাজীবনের রাজনৈতিক বিপ্লবের জোয়াল কাঁধে নিয়ে শেষ পর্যন্ত সে কি পেল? রাজনৈতিক আন্দোলনে ব্যবহৃত এই ধরণের চরিত্রের অভাব নেই। তাই লেখকের ভাবনার সামনে এদের কেউ একজন এসে দাঁড়িয়ে পড়তেই পারে এবং সেখানে যদি রুহিতনের মধ্যে জঙ্গল সাঁওতালের সাদৃশ্য পাওয়া যায়- তার অর্থ এই নয়, লেখক ভূমিকায় যা মন্তব্য করেছেন, তা ভুল । নকশাল আন্দোলনের মতো সাড়া জাগানো আন্দোলন, সেই সময়ের প্রতিষ্ঠা সচেতন মানুষকে ভাবিয়ে তুলেছে। সেই অভিজ্ঞতা লেখকের ছিল। নকশালদের স্লোগান, তাদের প্রতি পুলিশি নির্যাতন, নকশাল সন্দেহে পথে ঘাটে সাধারণ মানুষের প্রতি হামলা, পুলিশ কর্তাদের প্রতি অরিরিক্ত সতর্কতা অবলম্বন এসবই প্রত্যক্ষ করা।

সমরেশ বসু 'উত্তরঙ্গ' উপন্যাস রচনাকালে (১৯৪৯) প্রেসিডেন্সি জেলে ছিলেন। 'মহাকালের রথের ঘোড়া' উপন্যাসে রুহিতনের জেলজীবনের শেষের দিকে কোলকাতার যে জেলখানায় রুহিতন ছিল- তার বর্ণনা হুবহু এক না হলেও প্রেসিডেন্সি জেলের ভিতরকার চেহাহার সঙ্গে সাদৃশ্য আছে।

১৯৭২ সালের ঘটনা। জঙ্গল সাওঁতালকে কড়া নিরাপত্তার জন্য কোলকাতার প্রেসিডেন্সি জেলের লেপার ওয়ার্ড-এ রাখার ব্যবস্থা হয়েছিল। লেপার ওয়ার্ড হলেও সেখানে এই ধরণের কোনো বন্দী তখন ছিলেন না। লেপার ওয়ার্ড নামের দোষ খন্ডন করার জন্য সে ওয়ার্ডাটিকে খুব ভালভাবে জীবানুমুক্ত করা হয়েছিল। এই ওয়ার্ডে রাখার উদ্দেশ্য ছিল, যাতে তাঁর সঙ্গে অন্য

রাজবন্দীদের যোগাযোগ না ঘটে। উপন্যাসে, রুহিতনের কুষ্ঠ হওয়ার জন্য তাকে আলাদা রাখার ব্যবস্থার কথা হয়েছিল।

এই প্রসঙ্গে নকশাল নেতা কানু সান্যালের বক্তৃতার কিছু অংশ- "... জঙ্গলের বাবা কান্না কিসকু ছিলেন কমলপুর চা বাগানে একজন চা-শ্রমিক। বাবার মৃত্যুর পর ওর মা ওদের তিন ভাই এক বোনকে নিয়ে চলে আসেন নকশাল বাড়ি। এবং সেখানে দুর্লভ মহম্মদ নামে একজন জোতদারের বাড়িতে ভাগচাষী হিসাবে জঙ্গলের কর্মজীবন শুরু। ... জঙ্গল একদিনে 'জঙ্গল সাঁওতাল' হয়নি। এর ইতিহাসটা বড় কঠিন-কঠোর আবার তেমনি কোমল। অসাধরণ সাহস, অকৃত্রিম নিষ্ঠা, সীমাহীন আনুগত্য, অকল্পনীয় পরিশ্রম এবং সর্বোপরি মেহনতী মানুষের প্রতি অকৃত্রিম দরদ মানবিক এই সম্পদগুলোর ঠিক ঠিক ব্যবহার তাঁকে এতবড় একটা জায়গায় পৌঁছে দিয়েছিল । ... জঙ্গল ছিল শ্রেণী সংগ্রামের অগ্রগামী সৈনিক। রাজনীতির তত্ত্বগত জ্ঞান বিরাট ছিল না কিন্তু প্রত্যক্ষ সংগ্রামের মধ্য দিয়ে তত্ত্বের মর্মবস্তুটিকে চিনে নেওয়ার একটা অদ্ভুত ক্ষমতা জঙ্গলের ছিল।"[১৩৩]

অন্ত্যজ 'রুহিতন' ঃ বিপ্লবী চেতনার উন্মেষ

রুহিতন কুরমি যে সমাজে বেড়ে উঠেছে - তা সমাজের একেবারে নিচুস্তর হলেও এদেরও সমাজ ব্যবস্থায় নিয়ম আছে- যেমন কুরমির ছেলের সঙ্গে সাঁওতাল মেয়ের বিয়ে হয় না। তবে 'ধলভূম, মানভূম, সাঁওতাল পরগণা নয় বলে এবং তরাইয়ের চা-বাগান ও কৃষি জোতের অঞ্চল বলে এখানে জাতিগত বৈষম্য অনেকটা কম। তাই রুহিতনের বাবা পোশ্‌পত্ কুরমি গজেন সাঁওতালের মেয়ে গঙ্গাকে বিয়ে করতে পেরেছিল। রুহিতনের ক্ষেত্রেও এই সমস্যা দেখা দিয়েছিল। রাজবংশীদের মেয়ে টেঁপড়ির সঙ্গে রুহিতনের ভালবাসা ছিল কিন্তু বিয়ে হয়নি। (সে ক্ষেত্রে অন্য বিয়ে হয় না, হয় 'বাহা সাম্‌হা' । 'বিধবা অথবা বিবাহিতা মেয়ে স্বামী ছেড়ে এসে আবার একজনকে বিয়ে করলে, সেই বিয়েকে বাহা সামহা বলে।') কারণ রাজবংশীদের সঙ্গে মাহাতো কুরমি সাঁওতালদের বিয়ে হয় না। মঙ্গলাকে পেয়ে রুহিতনকে ভুলতে হয়েছিল টেঁপড়িকে। মঙ্গলাকে সে ভালবেসেছিল। রুহিতণের তিনটি সন্তান- বুধুয়া, করমা এবং বুধি।

রুহিতনের সমাজে তারা মারাংবুরুর কৃপা চায়, করমপুজো করে, রাজবংশীরা শিরুয়া কিসুয়া উৎসবে যায়। ডেয়ং খাওয়া তাদের ধর্ম, ডাইনি প্রথায় বিশ্বাস করে তারা। এই রুহিতন গ্রামীণ জোতদারের বিরুদ্ধে বিপ্লবী নেতায় পরিণত হল। তাই পরাধীন ভারতবর্ষের, আটবছরের রুহিতনের, দার্জিলিং পাহাড়ের লেবং দেখবার কৌতূহলই তীব্র হয়েছিল। বসন্তকালে ঘোড়দৌড় দেখার জন্য না। সে তার বাবার কাছে শুনেছিল - "বিপ্লবীরা বাঙলার লাট বাহাদুর 'আনারসন'-কে (স্যার জন এ্যান্ডারসন-গভর্ণর জেনারেল) লেবং-এ হত্যা করার চেষ্টা করা হয়েছিল।" সেদিন সমস্ত পাহাড়, তড়াই অঞ্চল ও ডুয়ার্স ঘিরে-পুলিশের তান্ডবের পরিচয় সে পেয়েছিল এবং ঘটনাটা তার মাথায় গেঁথে গিয়েছিল। চোদ্দ-পনেরো বছর বয়সে সে বন্ধুদের সঙ্গে লেবং দেখতে গিয়েছিল। এর কয়েকবছর পরে দার্জিলিং হিমালয়ান রেল মজুরদের ধর্মঘট রুহিতনের রক্তে মিশে গিয়েছিল।

সেদিন গরীবদের চিরশত্রু, কোম্পানীর সাহেব, মারোয়ারী বিহারী মহাজন, বাঙালী-রাজবংশী, নেপালী জোতদারদের পরাজয়ে তার বুকের রক্ত টগবগিয়ে উঠেছিল । এই সার্থক ধর্মঘট তার মস্তিষ্কে বিঁধেছিল। দিবাবাবুরা তখন চা-বাগানে, শহরে আন্দোলনে মেতে উঠেছে। রুহিতন তখন জানত গান্ধীবাবার সঙ্গে তার মত ও পথের বিরোধের কথা। তার পথ অহিংসার নয় তা হল 'মারো, না হয়-মরো।' তার নেতা দিবাবাগচি ঠাট্টা করত- 'উপোস করা আবার একটা আন্দোলন নাকি? ওকে বলে মাগ ভাতারের ঝগড়া।' কিন্তু অনশন যে বিপ্লবের হাতিয়ার হতে পারে, সেটা রুহিতন সাত বছরের জেলে জীবনে বুঝতে পরেছিল। রুহিতন আরো অনেক কিছু বুঝেছিল –'তরাইয়ের মেচি নদীর বালুচর থেকে, ঝোরার গা বেয়ে উঁচুতে উঠে যাওয়া বন ঘেরা অঞ্চল'- যার নাম এখন সারা দুনিয়া জানে, যেমন ভাবে রুহিতন কুরমির নাম। কারণ, রুহিতন এখন 'খুনী লুণ্ঠনকারী, অগ্নিসংযোগকারী এবং রাষ্ট্রক্ষমতা দখলকারী এবং আরো অনেক অভিযোগে অভিযুক্ত।' তার মতো অপরাধীকেও কয়েদ করে রাখার জন্য বিশেষ ব্যবস্থা। কোন জেলই যেন তার উপযুক্ত বা নিরাপদ নয় - তাই একাধিবার -একাধিক জেলখানায় তার কয়েদ হওয়ায় অভিজ্ঞতা বড়ই বেদনাদায়ক।

ভবঘুরে কয়েদি রুহিতন কলকাতার জেলে স্থানান্তরিত হওয়ার সময় পুলিশের জীপে যখন শৃঙ্খলিত জন্তুর মতো শরীরটাকে কোন মতে ফেলে রেখেছিল - তখন দিনের আলো ফুটেছিল বলে কলকাতা শহরটাকে দেখতে পেয়েছিল এবং তার মনে পড়ে গিয়েছিল ১৪-১৫ বছর আগেকার কথা। একবারই সে কলকাতায় এসেছিল। সেখানে মনুমেন্টের তলায় শ্রমিক কৃষকদের বিরাট জমায়েত ছিল। সেদিন তরাইয়ের চা-বাগানের শ্রমিক ও ভূমিহীন কৃষকদের নেতৃত্ব দিয়ে এখানে নিয়ে আসার দ্বায়িত্ব ছিল তার উপর ন্যস্ত। তার মাথার উপর ছিল - দিবাবাগচি, ভবানীরায়রা। রুহিতনের জীবনে এ এক নতুন অভিজ্ঞতা। হাজার হাজার মানুষ। যেন বিরাট কিছু একটা ঘটতে চলেছে । এক ধরণের বীরত্বের অনুভূতি, একটা অনাস্বাদিত উত্তেজনা পথের দুধারে মানুষের কোলাহল - উল্লাস "চা- বাগানের মালিক বলো আর তরাইয়ের বড় বড় জোতের জোতদার বলো, সবাইকেই কী তুচ্ছ মনে হয়েছিল, সব মিলিয়ে এমন একটা বিশাল আর প্রচন্ড শক্তি মনে হয়েছিল যে, যে কোনও শক্তিকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দেওয়া যায়। মনের মধ্যে কেমন একটা বেপরোয়া ভাব এসে গিয়েছিল।... কিন্তু রুহিতন যে কী আশা নিয়ে গিয়েছিল নিজেই তা জানতো না। সভা শেষ হতেই তার মনটা কেমন হতাশায় ভরে উঠেছিল। সভায় অনেক বক্তৃতা হয়েছিল। কী বেজায় হাততালি আর হইচই, তারপরেই যেন ঠিক ভাঙা মেলার হাল।" কারোর মুখে হাসি ছিল না, কথাও ছিল না। তবে 'নিবে যাওয়া উৎসাহের মধ্যেও কলকাতাকে দেখার কৌতূহল ছিল অনেকেরই।' অথচ রুচিতন তার স্ত্রী মঙ্গলার কাছে বেশ গর্ব করে বলেছিল - "সারা দেশের কৃষি-মজুর কলকাতার মাঠে জমা হয়ে সরকারের কানের তুলো খুলে দিয়ে আসবো। ওরা যে কানে শুনতে পায় না। মস্ত ব্যাপার, গোটা দেশের কৃষি মজুর জমায়েত হবে, সকলের সাথে সকলের চেনা জানা হবে।" রুহিতন ভাঙা মন নিয়েই ফিরেছিল কলকাতার জমায়েতে নেতৃত্ব দেওয়ার পর। কলকাতার জমায়েত থেকে ফিরে ভাঙা মন আবার জোড়া লেগেছিল বেশ কয়েকবছর পর দিবাবাগচির সেই 'শোলোক' দিয়ে - "গ্রাম

দিয়ে শহর ঘিরতে হবে। শহরকে গ্রামের কব্জায় ঘিরতে হবে। কলকাতায় জমায়েত না। দক্ষিণের যাবৎ শহর ঘিরতে ঘিরতে কলকাতাকেও গ্রাম দিয়ে ঘিরতে হবে।" সেই থেকে রুহিতন নতুন মন্ত্রে দীক্ষিত। সে এখন গ্রাম দিয়ে শহর ঘেরার লড়াই - এর ব্রত গ্রহণ করেছে; 'জানকবুল, কিন্তু শত্রুর শেষ রেখো না। রুহিতন রাখে নি। খতম আর ঘেড়াও, এক নাগাড়ে।' 'গ্রাম দিয়ে শহর ঘিরতে হবে' - এই স্বপ্নকে সফল করতে রুহিতনকে লড়াই করতে হয়েছে অনেক। সে দেখেছে গরীব ও ভূমিহীনদের স্পর্ধায় জোতদার ও মহাজনরা ক্ষেপে উঠে লোক বেছে বেছে মারতে শুরু করেছিল। কিন্তু রুহিতনরা এক বিশাল এলাকার(পূর্ব-দক্ষিণে টুকারিয়া ঝাড়, উত্তরে মেচি আর পশ্চিমে ডালকাঝাড় জঙ্গল) সকল জোতদার মহাজনের বন্দুক ছিনিয়ে নিয়েছিল। জোতদার মোহন ছেত্রীর ছেলে বড়কা ছেত্রী- যার সঙ্গে রুহিতনের ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্ব ছিল-সেই বন্ধুত্ব শত্রুতায় পরিণত হয়েছিল - যখন সে জেনেছিল রুহিতন অন্য জগতের লোক। তাদের জোতের মজুর ও বাড়ির চাকর গোবরা সাঁওতালকে সে সন্দেহ করেছিল-যে গোবরা জোতদার মারার দলে ভিড়েছে। সে কথা বের করবার জন্য তাকে পিটিয়েছিল- যে 'খুন করার জন্যই মার'। রুহিতন সেদিন বড়কার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। এই অবসরে গোবরা একদল লোক এনে মোহন ছেত্রীর জোতবাড়ি আক্রমণ করেছিল। বৃদ্ধ মোহন ও তার দুই ছেলে মরেছিল। বড়কা হয়ে গিয়েছিল রুহিতনের শত্রু। 'সকল জীবের যদি নিজের ধর্ম থাকে, তবে ভূমিহীন কৃষক রুহিতন কুরমিরও একটা ধর্ম আছে। সেই ধর্মের কাছে শত্রুর একটাই বিচার। 'মরো না হয় মারো।' রুহিতন দেখেছিল তরাইয়ের জঙ্গলে সাধারণ মানুষের সাহস ও উৎসাহ। "ছেলেবুড়ো , মেয়েমদ্দ, সকলের চোখমুখের চেহারা বদলিয়ে গিয়েছিল। সত্যিই কি তারা একটা নতুন জীবন পেয়েছিল? এমনকি অনেক হাঁড়িয়া খাওয়া, বউ-পোটানো বন্ধ করে দিয়েছিল। ... মুক্ত অঞ্চল গড়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে সকলের মধ্যেই একটা পরিবর্তনের ঢেউ লেগেছিল। সকলেই কেমন সচেতন আর কঠোর হয়ে উঠেছিল। কঠোরতা এই কারণে, সকলেই নিষ্ঠার সঙ্গে কর্তব্য পালন করতে চেয়েছিল। মুক্ত এলাকাকে সবাই অতন্দ্র প্রহরীর মতো পাহারা দিত। তার বউ মঙ্গলা মনে প্রাণে মাহাতোদের মেয়ে হয়েও মুক্তাঞ্চলের মধ্যে এক ডাইনী পোড়াবার ঘটনায় ভীষণভাবে রুখে দাঁড়িয়েছিল।"

নিঃসঙ্গ রুহিতন

তরাইয়ের নিশিথ রাত্রে রুহিতনের স্ত্রী মঙ্গলা এসে রুহিতনের আলাদা পাত্রে ভাত তরকারি ঢেলে দিয়ে গিয়েছিল। কুরমি মাহাতোর ছেলে ভাতের ওপর কখনো রাগ না করলেও এ ভাত সে মুখে দিতে পারেনি। সে দিন সে তার পাটাহীন নাকে ঘণ নিশ্বাস নিলেও মঙ্গলার গন্ধ পায়নি। সেই রাত্রে ঘর ত্যাগ করে পথে বেরিয়ে পড়ে রুহিতন। লক্ষ্য স্থির ময়নাগুড়ি মৌজা। খুঁজে পেল অর্জুন গাছের চিহ্ন, খুঁড়ে বের করল ডবল ব্যারেল একটি বন্দুক ও কিছু টোটা। যেন গুপ্তধন খুঁজে পেল সে। "তার মনে এখন একটি মাত্র সান্ত্বনা সে অপমান আর অভিশপ্ত আশ্রয় থেকে নিজের যথার্থ জায়গায় ফিরে এসেছে, সে বুঝতে পারছে, গভীর ঘুম আসছে তার ।" এই বৃহত্তর বিশ্বে রুহিতন এখন

একা। ব্যক্তিজীবন ও রাজনীতির বৃহত্তর জীবনে ব্যর্থ সে, বেঁচে থাকার কোন যুক্তি খুঁজে পায় না।

"তাঁর রাজনৈতিক উপন্যাসগুলোর অবয়বে সময়ের কথা থাকে, সংগ্রামের কথা আলোচিত হয়, মতাদর্শগত প্রসঙ্গ উত্থাপিত হয় কিন্তু অন্তরে থাকে নায়কের নৈঃসঙ্গ, নির্জনতাবোধ, আত্মার যন্ত্রণা, তার ব্যর্থতার বেদনা। আত্মিক সংকটে চূড়ান্তভাবে জর্জরিত কোন নায়কই শেষপর্যন্ত ঈপ্সিত লক্ষ্যে পৌঁছাতে পারে না। বাধা যত না বইরের, তার চেয়ে অনেক বেশি ভিতরের ।...

'নক্‌শালবাড়ি', শব্দটির মধ্যে আছে বিদ্যুৎ, আবেগ, তরঙ্গ, যে শব্দটির থেকে সন্ত্রস্ত হয়েছিলেন তামাম ভারতবর্ষের শাসকগোষ্ঠী এবং সকলের সম্মিলিত প্রয়াসে তীব্র আক্রমণে পর্যুদস্ত করে পিছু হটতে আপাতত তাদের বাধ্য করা হয়েছে। রুহিতন যদি নকশাল পন্থীদের চেতনায় প্রভাবিত হয়ে ভেবে থাকে ভূমিহীন হিসাবে সে ভূমি পাবে, জনমজুরে যেহেতু রাজ্য চালাবে, সেহেতু শ্রমিকরাজ কায়েম হলে আশা-আকাঙ্ক্ষা চরিতার্থ হবে, তাহলে সমরেশের শ্লেষাত্মক দৃষ্টিতে এই ন্যায্য দাবি হয়ে যায় স্বপ্ন প্রতিম। তাঁর ভাষায় এ যেন অনেকটা অন্ধের দৃষ্টি ফিরে পাওয়া, বোবার বলা কথা এবং বন্ধ্যা নারীর সন্তান হওয়ার মতো।

তবু রুহিতনেরা লড়াই করে কারণ শৃঙ্খল ছাড়া তাদের সত্যিই হারাবার কিছু নেই আর কালের রাজপথে ইতিহাসের নির্মম রথচক্র যখন ধুলো উড়িয়ে চলে যায় তখন সেই বিস্মৃতির ধুলোয় চাপা পড়ে থাকে লক্ষ লক্ষ স্বপ্নবিলাসী রুহিতন । কুরুক্ষেত্র যুগ থেকে এই একই ধারা প্রবহমান।" [১৩৪]

ভূমিকায় লেখকের মন্তব্যকে মাথায় রেখেও বলা যায়, কাহিনীর মধ্যে থেকেই ধরা পড়ে, এর বাস্তব পটভূমি। রুহিতন যে বিপ্লব করেছে, সেই বিপ্লবের কালসীমা বুঝে নিতে কোন অসুবিধা হয় না। রাজনীতির নেতা ও রাজনীতির চেহারাও হয়তো বাস্তবে চেনা। উত্তরবঙ্গের চা-বাগানের শ্রমিক নেতা রুহিতন হয়তো বাস্তবে ছিল। সেই সময়ের ইতিহাস-সচেতন যে কোন ব্যক্তির পক্ষে এর বাস্তবভিত্তি অন্বেষণ করতে অসুবিধা হয় না। বলাবাহুল্য সেই সময়কার রাজনৈতিক ঝঞ্ঝাবিক্ষুব্ধতা উপন্যাসটিকে যথেষ্ট প্রভাবিত করেছে। কিন্তু উপন্যাসটি পাঠ করলে মনে হয় লেখক যেন রুহিতন কুরমির জীবনকেই প্রাধান্য দিয়েছেন এবং সহানুভূতির সঙ্গে তার লাভক্ষতির হিসাব করেছেন। আসলে রুহিতনরা চিরকালই রাজনৈতিক বিপ্লবের রথকে টেনে নিয়ে যায়, তাদের ব্যবহার করা হয় রথের ঘোড়ার মতোই। বিপ্লব শেষে রুহিতনরা তাই দিশেহারা হয়ে যায় - পরবর্তী জীবনে সে কি করবে! এদের ক্ষেত্রে রাজনীতির কোন কেতাবি জ্ঞান থাকে না। এরা নিজেদের অসুবিধা গুলিকে ক্রমাগত ভোগ করে, প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা থেকে বিদ্রোহে সামিল হয়। বিপ্লবে তাদের অংশগ্রহণ তাই খুব আন্তরিক। যে আন্তরিকতা ছিল ঢোঁড়াই বা লখীন্দরের মধ্যেও। কিন্তু কেতাবি রাজনীতির ধরণ ধারণ তারা বেঝে না। তারা এও বোঝে না দলের লোকেরা চরিত্র - যেমন রহিতন বোঝেনি।

"সরল রুহিতন জানত না, মহাকাল বড়ই নিষ্ঠুর, পৃথিবী অতীব নির্মম। জীবনের সব কিছু পণ রেখে স্বপ্নের জগৎ গড়ে তুলতে চাইলে তাকে প্রায়শই তার দাম দিতে হয়। স্ত্রী, দুই ছেলে ও মেয়েকে পিছনে রেখে সে এগিয়ে এসেছিল। স্নেহ মায়ামমতার বন্ধন ছিন্ন করে মুক্ত অঞ্চল গড়ে

তোলার সংগ্রাম শুরু করেছিল। উদ্দেশ্য ছিল শ্রেণী শত্রুকে খতম করে শহর ঘিরতে। কিন্তু পথ বড়ই জটিল ও দুর্গম। মহাকালের রথটিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার স্পর্ধায় যার স্ফীত নাসারন্ধ্রে দেখা দিয়েছিল অগ্নি স্ফুলিঙ্গ, উদ্ধত গ্রীবার ফুলে ওঠা কেশরগুলো,ঝড়ের মাতনে নেমে উঠেছিল আর গতির আবেগে চঞ্চল হয়ে উঠেছিল বল দৃপ্ত চরণপেশীগুলো, সেই তুরঙ্গ প্রতিম রুহিতনকে দলিত পিষ্ট করে চলে যায় কেন নিষ্ঠুর মহাকালের নির্মম রথচক্র?

রুহিতনের স্বপ্ন ব্যর্থ হয়ে যায় কিন্তু তার জন্য তাকে মূল্য দিতে হয় অনেক। প্রায় সাড়ে আট বছর পশ্চিম বাংলায় বিভিন্ন জমানা-শাসিত প্রশাসনিক লাঞ্ছনা তাকে ভোগ করতে হয়। সাড়ে আট বছর কারগারের অন্ধকারে রেখে তাকে যখন ছাড়া হল তখন সে স্বজনহীন, নির্বান্ধব, নিজভূমেও যেন পরবাসী। নিঃসঙ্গ রুহিতন উত্তর বাংলায় তার প্রিয়তম জন্ম ভূমিটির ভিটেয় গিয়ে উপলব্ধি করল, পরিস্থিতি সম্পূর্ণ পরিবর্তিত। কুষ্ঠ রোগে আক্রান্ত ও বিকলাঙ্গ রুহিতনের শুধু পুত্র কন্যারা নয়, হৃদয় থেকে নির্বাসনে পাঠিয়েছে স্ত্রী মঙ্গলাও। রুহিতনের কাছে আত্ম হত্যার কোনও বিকল্প থাকে না।

নকশালবাড়ি আন্দোলনে সামিল হয়ে পশ্চিম বাংলার গ্রামে গঞ্জে, খেতে-খামারে ও অরণ্যে যে হাজার হাজার যুবকের মৃত্যু ঘটেছে,রুহিতন তাদের সামিল হয়ে যায় নীরবে, একেবারে নেপথ্যে থেকে।" [১৩৫]

যে মুক্ত এলাকার জন্য রুহিতন মরণ-বাঁচন লড়াই করেছিল, জেল থেকে মুক্তি পাওয়ার পর দেখল- "তাদের সেই মুক্ত এলাকার অস্তিত্ব সত্যি আর নেই। তবে কি মিথ্যা হয়ে গেল তার গোটা জীবনটাই? " [১৩৬] হয়তো তাই ! তার ঘরের জীবন, বাইরের জীবন কোনটাই তার কাছে আর সত্যি নয়।তাই আত্মহত্যা ছাড়া আর কোনও বাঁচার রাস্তা খোলা থাকেনা।

চার) মহাশ্বেতা দেবী (১৯২৬)

মহাশ্বেতা দেবীর জন্ম ১৯২৬ সালে ঢাকায়। তাঁর পিতা ছিলেন 'কল্লোল' যুগের সুপরিচিত কবি এবং কথাসাহিত্যিক মনীশ ঘটক (যুবনাশ্ব)। মা ধরিত্রী দেবীও ছিলেন লেখিকা। অতি সুশিক্ষিত পরিবারের সন্তান মহাশ্বেতা দেবী। শান্তিনিকেতন ও কলকাতায় স্কুলের পাঠ শেষ করে শিক্ষকতার জীবিকা গ্রহণ করেন। বিজয়গড় যতীশ রায় কলেজের ইংরেজীর অধ্যাপিকার পদ থেকে ১৯৮৪ সালে স্বেচ্ছাবসর গ্রহণ করেন।

সাম্যবাদী আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত এবং গণনাট্য আন্দোলনের অগ্রণী ব্যক্তিত্ব, 'নবান্ন' নাটকের লেখক বিজন ভট্টাচার্যের সঙ্গে বিবাহসূত্রে মহাশ্বেতা দেবী সমাজতন্ত্রের প্রতি আস্থা ও দরিদ্রবর্গের মানুষ সম্পর্কে আগ্রহ নিয়ে নিজের সাহিত্য সৃষ্টিকে সমৃদ্ধ করে তোলেন।

অল্প বয়স থেকেই তাঁর লেখালেখি শুরু হয়। এবং লিখে জীবিকা অর্জনের চেষ্টা তিনি প্রথম থেকেই করেছিলেন। তাঁর প্রথম প্রকাশিত রচনা একটি ইতিহাস-নির্ভর জীবনীগ্রন্থ 'ঝাঁসির রাণী'

(১৯৫৬)। মহাশ্বেতা দেবী পঞ্চাশটির অধিক উপন্যাস এবং বহু ছোটো গল্প লিখেছেন। ছোটদের জন্যও অনেক লেখা আছে তাঁর। বিচিত্র বিষয় নিয়ে লিখলেও তাঁর উপন্যাসধারাকে মোটামুটিভাবে দুটি পর্বে ভাগ করা যায়। প্রথম প্রকাশিত উপন্যাস 'নটী' (১৯৫৭) থেকে শুরু করে ১৯৬৬ পর্যন্ত প্রথম পর্ব। কোথাও, কোথাও উপন্যাসের উপাদানরূপে ইতিহাস ব্যবহৃত হলেও এই পর্বের উপন্যাসে বিচিত্র ধরণের প্লট এবং মানুষ নিয়ে আখ্যান নির্মাণের আগ্রহই প্রধান। দ্বিতীয় পর্ব শুরু হয়েছে 'আঁধার মানিক' উপন্যাসটি থেকে। এই সময় থেকে সাম্প্রতিক কাল পর্যন্ত তিনি যত উপন্যাস লিখেছেন সেখানে বিষয়ের ক্ষেত্রে বিচিত্র পথ পরিক্রমা থাকলেও সামগ্রিকভাবে সমাজের পিছিয়ে পড়া, অত্যাচারিত, লাঞ্ছিত, শোষিত, অন্ত্যজ আদিবাসী সম্প্রদায়ের মানুষের অবস্থান এবং ইতিহাসের গতিপথ তাঁর উপন্যাসের প্রধান অবলম্বন।

বহু সংখ্যক উপন্যাসের মধ্যে তাঁর উল্লেখযোগ্য উপন্যাসগুলি হল- 'নটী' (১৯৫৭), 'মধুরে মধুর'(১৯৫৮), 'প্রেমতারা' (১৯৫৯), 'বায়োস্কোপের বাক্স'(১৯৬০), আঁধার মানিক' (১৯৬৬), 'কবি বন্দ্যঘটী গাঞির জীবন ও মৃত্যু' (১৯৬৬), 'হাজার চুরাশির মা' (১৯৭৪), 'অরণ্যের অধিকার' (১৯৭৭), 'চোট্টি মুন্ডা ও তার তীর' (১৯৮২), 'বিশ-একুশ' (১৯৮৬), 'গণেশ মহিমা' (১৯৮৭),'টেরোড্যাকটিল পূরণ সহায় ও পিরথা'(১৯৯০), 'ব্যাধখন্ড' (১৯৯৭) ইত্যাদি।

রচনা বিশেষত্ব

মহাশ্বেতা দেবী একই সঙ্গে লেখক ও মনন দীপ্ত গবেষক। বহু বিস্তৃত তাঁর কর্মক্ষেত্র। আদিবাসীদের মধ্যে আদিবাসীদের উন্নয়নের জন্য তিনি কাজ করেছেন। আবার এই অবহেলিত মানুষগুলি, পিছিয়ে থাকা জনগণ, অবহেলিত, উপেক্ষিত, অত্যাচারিত মানুষগুলি তাঁর লেখার বিষয়। বস্তুত জিনিসটি তাঁর রিক্থ-পৈতৃক ধন। তাঁর পিতা মনীশ ঘটক(ছদ্মনাম যুবমাশ্ব) চোর,ভিখিরি, পকেটমার, রূপজীবা- সমাজ বিন্যাসের এই নিম্নস্তরের মানুষগুলিকে নিয়ে লিখেছিলেন'পটলডাঙার পাঁচালী'। তাঁর মা ধরিত্রী দেবী নিয়মিত সাহিত্য চর্চার সঙ্গে সমাজসেবাও করেছেন। বলা যায় যারা সভ্যতার 'পিলসুজ মাথায় নিয়ে' যারা দাঁড়িয়ে আছে তাদের জীবনকে লেখার বিষয় করার বা তাদের জন্য কাজ করার প্রেরণা ছিল তাঁর স্বভাবের অন্তর্গত।

বৃহৎ একান্নবর্তী পরিবারে কেটেছিল তাঁর শৈশব। সে পরিবারে কেউ-ই ছিলনা অবাঞ্ছিত। ভৃত্য-পরিচারিকারাও সেখানে হয়ে গিয়েছিল পরিবারের সদস্য। তাই তাঁর মনের মধ্যে কোন সংকীর্ণতা ছিল না। মহাশ্বেতা দেবীর লেখক জীবনকে দুটি অধ্যায়ে বিভক্ত করা যায়। পঞ্চাশের দশকের মাঝামাঝি থেকে সত্তরের দশকের মাঝামাঝি পর্যন্ত একটি অধ্যায়। সত্তর দশকের মধ্যভাগ থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত আর একটি অধ্যায়।

প্রথম অধ্যায়ের গল্প-উপন্যাসের মধ্যে নির্যাতিত, নিপীড়িত অন্ত্যজ মানুষগুলির জীবনচিত্র ততটা প্রবল নয়। তবে এ অধ্যায়েও ভারতবর্ষের বিচিত্র সংস্কৃতির বিভিন্ন মানুষকে জানার আগ্রহ ছিল তাঁর মনে। আর বিভিন্ন স্তরের নরনারীর উপর অত্যাচারের দিকটিও উপেক্ষিত হয়নি এসময়ের

রচনায়। এই সময়েও তাঁর ইতিহাসবোধ প্রবল। তিনি যে অভিজ্ঞতার সত্যতার ভিত্তিতে নির্মাণ করেছেন সাহিত্য - এটা তখনই স্পষ্ট হয়ে গিয়েছিল।

দ্বিতীয় পর্বে তিনি অভিজ্ঞতা-অর্জনকে করে নিয়েছেন জীবনের অঙ্গ এবং রচনা করেছেন সেই জীবনের ভাষারূপ। ষাটের দশকের শেষ দিক থেকেই আদিবাসী, অন্ত্যজ, নিপীড়িত, ভূমিদাস, মানুষগুলির দঃখদীর্ণ জীবন সম্পর্কে অভিজ্ঞতা অর্জনে উদ্যোগী হয়েছিলেন তিনি। এজন্য তিনি পায়ে হেঁটে ঘুরেছেন বিহার আর বাংলার দরিদ্র, আদিবাসী-অধ্যুষিত স্থানগুলি। তাদের সঙ্গে বাস করেছেন দীর্ঘকাল। স্বাধীনতার অর্ধশতক পরেও যে মানুষগুলি জীবনধারণের ন্যূনতম প্রয়োজন মেটাতে পারেনি, রবং উচ্চবর্ণের শোষণ, লালসার শিকার হয়ে আছে - সেই লোধা, শবর, গঞ্জ, দুসাদদের জীবনচিত্র বাস্তব হয়ে উঠেছে তাঁর গল্প -উপন্যাসে। চরিত্র এবং তার প্রেক্ষিত-উভয়েই তাঁর রচনাগুণে হয়ে উঠেছে বলিষ্ঠ এবং সুন্দর। তাঁর গল্প-উপন্যাসের কেন্দ্র বিন্দু অন্ত্যজ শ্রেণীর অনন্ত দুঃখ, যন্ত্রণা, এবং অত্যাচারী বিত্তবান উচ্চবর্ণের মানুষ। আমরা এখন মহাশ্বেতা দেবীর দুটো উপন্যাস আলোচনা করে দেখবো, কিভাবে উচ্চবর্ণের মানুষেরা অন্ত্যজ শ্রেণীর মানুষদের শোষিত ও বঞ্চিত করত।

ক) কবি বন্দ্যঘটী গাঞির জীবন ও মৃত্যু

ঘটনাকাল

সময়টা মধ্যযুগ, আকবরের মত বিদ্যোৎসাহী সম্রাট দিল্লীর মসনদে অধিষ্ঠিত। ১৪৯৩ খ্রীষ্টাব্দে গৌড়ে সিংহাসনে সুলতান হুসেন শাহের অভিষেক। বাংলার বুকে সুশাসন ও সাহিত্য সংস্কৃতি চর্চার একটা অনুকূল পরিবেশ। ১৪৮৬ খ্রীষ্টাব্দে চৈতন্য দেবের আর্বিভাব। ১৫৯৪-এ মানসিংহ বাংলাদেশে মুঘল শাসন প্রতিষ্ঠার জন্য প্রেরিত হন। ১৬০৫ সালে আকবরের মৃত্যু।

"পঞ্চদশ শতাব্দীর সমাপ্তি হইতে সপ্তদশ শতাব্দীর প্রারম্ভ পর্যন্ত বিস্তৃত কিঞ্চিদধিক শতবর্ষের কাল পর্যায়কে চৈতন্য পর্ব নাম দিতে পারি।" [১৩৭]

এই অনুকূল আবহাওয়ায়-চৈতন্যদেব তাঁর মানব প্রেমের ধর্মনিয়ে আবির্ভূত হয়েছিলেন- যে ধর্মে উচ্চ-নীচ, স্ত্রী-পুরুষ, জাতি-ধর্ম-নির্বিশেষে কোন ভেদাভেদ ছিল না। যদি ৩০০ বছর আগের অবস্থাটার দিকে পিছন ফিরে তাকান যায়- তাহলে বোঝা যায় পার্থক্যটা কোথায়। ত্রয়োদশ শাতব্দীর বাংলার কলঙ্কিত ইতিহাস বাংলার-সাংস্কৃতিকে ২০০ বছর স্তব্ধ করে রেখেছিল। কিন্তু একটা জাতির সর্বনাশের দিনে, সমূহ ভাঙন রোধ করতে মানুষ অনুভব করেছিল-একতাই বল। তাই মঙ্গল কাব্যের মতো সাহিত্যের জন্ম হয়েছিল - যেখানে বাংলার আর্য-অনার্য মিলন প্রচেষ্টায় বাস্তব অভিজ্ঞতা, মনোভূমি প্রস্তুত করেই রেখেছিল। প্রাকচৈতন্য মধ্যযুগ থেকেই বাংলা সাহিত্য পরিপূর্ণ হতে থাকে অফুরন্ত সৃষ্টি সম্ভারে। চৈতন্যযুগ হয়ে ওঠে বাংলা সাহিত্যের 'স্বর্ণযুগ'।

"ষোড়শ শতাব্দীর বাংলা সাহিত্য ও চৈতন্য প্রভাবিত বাংলার সংস্কৃতির যে বিচিত্র বিকাশ

দেখা যায়, তাহাকে কেহ কেহ য়ুরোপীয় রেনেসাঁসের সহিত তুলনা দিতে চাহেন।"[১৩৮]

মধ্যযুগের চৈতন্য প্রভাবিত এই পটভূমিতে যদি কোন কবির কবিত্ব শক্তির উন্মেষ ঘটে, তবে এইতো উৎকৃষ্ট সময়। বিভিন্ন রাজা-বাদশাহ্-সুলতানরা যেন কবিদের পৃষ্ঠপোষকতা দান ও উপাধিদানে প্রস্তুত। এই রকম পরিবেশে সুপ্ত প্রতিভার বিকাশ ঘটতে বাধ্য। মানুষের হীনমন্যতার ভাবও কেটে যেতে থাকে চৈতন্য ধর্মের যাদুকাঠির স্পর্শে। এই পরিবেশে চুয়াড় যুবক কলহনের হৃদয়ে কবিত্বশক্তি বিকশিত হওয়া কোন অস্বাভবিক বা অসম্ভব ব্যাপার নয়। কিন্তু জন্ম পরিচয়ে অভিশপ্ত সে । সেই অভিশাপ থেকে মুক্তি নেই তার ; সমাজের অন্যান্য স্তরের মানুষের সঙ্গে নিম্নবর্গস্থিত মানুষের তফাৎ এখানেই।

মধ্যযুগের সাহিত্য সংস্কৃতিচর্চার এক সুস্থ বাতাবরণে যখন কোন অন্ত্যজ সম্প্রদায়ে কবির আবির্ভাব ঘটে তখন তার ফলাফল কি হতে পারে এমন একটা চিন্তা ঔপন্যাসিকের ছিল- "মধ্যযুগের রাঢ় বাংলার এক অরণ্য চুয়াড় যুবকের কবি খ্যাতিতে প্রতিষ্ঠিত হবার প্রচেষ্টা ও তার পরিণতিকে কেন্দ্র করে লেখবার কথা শ্রী অসিত গুপ্ত প্রথম আমাকে বলেন। এ গ্রন্থের নামকরণও তারই।" [১৩৯]

এই ভাবনার মধ্যে বর্ণশাসিত সমাজ জীবনের একটা বিরাট জিজ্ঞাসা রয়ে গেছে। ষোড়শ শতাব্দীর সমাজ পটভূমিতে একদিকে রাজতন্ত্র অন্যদিকে এই সমাজ বহির্ভূত আদিম জীবনযাত্রায় অভ্যস্ত এক অন্য জগৎ যে জগৎ সভ্যতার মুখ দেখেনি।এই দুই জগৎকে নিয়ে কাহিনী লিখতে বসেছেন ঔপন্যাসিক। তাই তার পটভূমিটা একটু খতিয়ে নেওয়া যাক।

"ষোড়শ শতকের রাঢ় বাংলার ইতিহাস বিভিন্ন কারণে আমাকে আকৃষ্ট করেছিল। একদিকে বাংলা ও ভারতের অন্যান্য অঞ্চলে প্রায় একই সময়ে মানবিকতাবাদী ধর্মের এক সুবিপুল নব-জাগরণের পটভূমিকাটি ছিল, যা আধুনিক পৃথিবীর উদার মানবিকতাবাদী চিন্তার অন্যতম মাতৃ-উৎস বলে বিবেচিত হওয়া উচিত। কিন্তু এতবড় কথা বাদ দিয়েই বলি, আমার মনে হয়েছিল যে মেদিনীপুর এতরকম বিচিত্র আদিবাসী সম্প্রদায়, লোকসংস্কৃতির জন্ম ও ধাত্রী ভূমি, সেই মেদিনীপুরের অবস্থিতি কলিঙ্গ সীমান্তে হবার দরুণ, চৈতন্য প্রভাবে সেখানকার নিম্নবর্গের জাতির মধ্যে মানুষ হিসেবে নিজেকে জানবার ও জানাবার একটি প্রয়াস নিশ্চয় দেখা দিয়েছিল। এই চেতনার প্রমাণ কাব্য, পাঞ্চালী, গাথা, গীতি, পেটো-নাচের ভেতর দিয়ে আমাদের কাছে পৌঁছিয়েছে।

রাঢ় বাংলার মেদিনীভূমের সাধারণ মানুষের জীবনের এই বিপুল বর্নাঢ্যতা আমাকে আকৃষ্ট করেছিল। অন্যদিকে, বর্ণশাসিত সমাজের বাইরে যে অরণ্যবাসী আদিবাসী সমাজ মেদিনীপুরে অনন্তকাল ধরে বাস করছে,যারা ভারতের আদিমতম অধিবাসী তাদের সম্পূর্ণ পৃথক অস্তিত্ব, দেবোপাসনা, তাদের Totem ও Taboo, বিশ্বাস-প্রথা-ব্যবহার, চান্দ্রবৎসর গণনা, মাতৃকা আরাধনা, তাদের কথা আমার মনে ছিল। আমরা ও তারা একই ভূ-খন্ডে বাস করি কিন্তু তাদের ধ্যান ধারণার জগৎ একেবারে পৃথক, আজও পৃথক, এবং এই দুই জগৎ দুই অস্তিত্বের ব্যাপারটিও আমাকে প্রলোভিত করেছিল।" [১৪০]

অন্ত্যজ চুয়াড়দের পরিচয়

মধ্যযুগে কবিকঙ্কণ সৃষ্ট কালকেতু দেবী চন্ডীকে আক্ষেপ করে বলেছিল-

"অতিনীচ কুলে জন্ম জাতি গো চোয়াড়।
কেহ না পরশে জল লোকে বলে রাঢ়।"[১৪১]

এ যুগে চুয়াড় বিদ্রোহের ইতিহাস আমাদের জানা। দক্ষিণ মেদিনীপুর, দক্ষিণ বিহার, ছোটনাগপুর, উড়িষ্যা প্রভৃতি অঞ্চলের আদিবাসীরা- দুর্ভিক্ষ, বন্য জন্তুর উপদ্রব, রাজস্ববৃদ্ধি, রাজস্ব আদায়ের ব্যাপারে অত্যাচার ; কর্মচ্যুত সৈনিক, সর্বস্বান্ত কৃষক, পেশাচ্যুত কারিগরদের সশস্ত্র দল নিয়ে লুঠতরাজ- চুয়াড়দের মধ্যে অসন্তোষের সৃষ্টি করেছিল। মেদিনীপুর জেলার ভূমিজীবী চুয়াড়দের বাস ছিল। ১৭৬০ খ্রীষ্টাব্দে মেদিনীপুর ইংরেজদের দখলে চলে গেলেও এই অঞ্চলের জমিদাররা অবাধ্য ছিলেন। ধলভূমের রাজা জগন্নাথ ধল ১৭৬৮ খ্রীঃ চুয়াড়দের সংঘবদ্ধ করে ইংরেজদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী করে তোলেন-কোয়লাপাল, ধৌলক, বরভূমের জমিদারগণ এই বিদ্রেহে যোগ দেন। ১৭৭৯ খ্রীঃ চুয়াড়েরা আবার বিদ্রোহী হয়। ১৮০০ খ্রীঃ বহু অঞ্চলের সরকারী সম্পত্তি পুড়িয়ে দেয়। ১৮৩২ খ্রীঃ রাজা গঙ্গানারায়ণের নেতৃত্বে চুয়াড়েরা আবার বিদ্রোহী হয়। বিদ্রোহ দমনের জন্য সামরিক বাহিনীর সাহায্য নেওয়া হয়েছিল কিন্তু শান্তি শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনতে সময় লেগেছিল। ইতিহাস প্রসিদ্ধ চুয়াড় বিদ্রোহের এই কাহিনী, ইতিহাস সচেতন সকলের জানা। কিন্তু ষোড়শ শাতব্দীতে এবং তারও অনেক আগে চুয়াড় জাতির সৃষ্টি লগ্নে চুয়াড়েরা কেমন ছিল, কেমন ছিল তাদের সমাজ-জীবনের লোক-বিশ্বাস ও সংস্কারের দিকগুলি, সভ্য সমাজভুক্ত না হয়েও সভ্য মানুষের প্রয়োজনে কিভাবে তারা সভ্যজগতে আবির্ভূত হত - তার পরিচয় আলোচ্য গ্রন্থ থেকেই লব্ধ হয়।

"নিদয়ার জঙ্গল অতি ভীষণ,দুর্ভেদ্য বনভূমি। সৃষ্টির আরম্ভ থেকে বুঝি এ অরণ্য ছিল। বিন্ধ্যের দক্ষিণে দন্ডকারণ্য থেকে এ বনভূমির শুরু এবং ক্রমে কলিঙ্গ থেকে মেদিনীভূমে এ অরণ্য প্রবেশ করেছে।

হস্তীযূথ এ অরণ্যের আদিমতম সম্রাট। তারা দেবী পর্ণশবরী, অরণ্য রক্ষয়িত্রীর সন্তান। সৃষ্টির দশদিক যেমন ইন্দ্র, অগ্নি,যম, দিকপালগণ রক্ষা করেন ঐরাবতগণ তেমনই, স্তম্ভস্বরূপ এ ধরিত্রীকে তাদের দিব্য দন্তে ধরে রেখেছে।

তাই তারা দন্ডকারণ্য থেকে কলিঙ্গ, কলিঙ্গ থেকে মেদিনীভূম স্বচ্ছন্দে বিচরণ করে। অন্ধকারের মতো কালো তাদের শরীর। অজগরের মতো তাদের শুঁড় দোলে। নির্ভয়ে, সগর্বে, ভয়ঙ্কর কোনও অমোঘ শক্তির মতো তারা বন থেকে বনে বিচরণ করে। অরণ্য রক্ষয়িত্রী দেবীর সচল প্রহরী তারা, অরণ্যবাসী আদিম চুয়াড়েরা হাতী ও নাগ পূজা করে, তাই তারা নির্ভয়ে অরণ্যে বাস করে।" নিদয়ার জঙ্গলে প্রমত্ত হস্তিযূথ স্বচ্ছন্দে বিচরণ করে। মানুষের সংস্পর্শ তারা ত্যাগ করেছে। কারণ "মানুষ আর স্বাধীন নেই। মানুষ নিজেই নিজের স্বাধীনতা হরণ করেছে। অভ্যাসের দাস, সংস্কারের দাস, প্রবৃত্তির দাস। অরণ্য বল, প্রকৃতি বল', সবকিছুর আদিম গ্রন্থ আর মানুষের মধ্যে নেই।" যে মানুষ গুলির মধ্যে এই আরণ্যক আদিমতা রয়েছে, যারা বরাবর স্বাধীন ভাবে

জীবনযাপন করে আসছে, তারা হল পালকপ্য মুনির বংশধর এই চুয়াড়েরা। এক সময় মানুষের সব ছিল - "মানুষের নখ, দাঁত, বলশালী বাহু, অতিকায় শরীর। বুঝি বা, যে আদিম মুনিপুত্র হাতীদের রক্ষাকর্তা, তাঁর আকৃতিও সে-রকমই ছিল। হিমবান ও সাগরের মধ্যবর্তী ভূখন্ডে তিনি হাতীদের সঙ্গে বাস করতেন। হাতীরা তাঁকে ঠাকুর বলে জানত এবং নিজ ভাষায় 'আমাদের ছেড়ে যেও না' বলে তার অঙ্গে শুঁড় বুলিয়ে কতই মিনতি জানাত। তখন হাতীতে মানুষে প্রেম হত, প্রণয় হত, সন্তান হত।

ক্রমে সভ্য হওয়ার প্রয়োজনে মানুষ তার নখ, দাঁত, হাত লোম, সিংহের মতো মাথা, সব বিসর্জন দিয়ে বর্তমানে যেমনটি দেখা যায়, তেমনি আকৃতি নিল। বনবাশুলী তাকে সব দিলেন, শুধু বললেন 'এখন হতে তোতে আর পশুতে ভাব- ভালবাসা রইবে না। উ মারবে, তু মরবি। তু মারবি, উ মরবে'। ... সেদিন হতে মানুষ আলাদা লেংটি পরে, তীর ধনুক হাতে, জাল কাঁধে পশুদের শিকার সন্ধানে থাকে। পশুদলও ঝোপঝাড় হতে মানুষকে দেখলে পালায়।

শুধু নিদয়ার জঙ্গলে প্রমত্ত হস্তীযূথ আদি জননীর ভয়ঙ্কর প্রহরীর মতো আজও ফেরে, আজও ফেরে। একমাত্র চুয়াড় জাত ছাড়া আর কারোকে তারা কাছে থাকতে দেয় না। চুয়াড়দের আদিপুরুষ হাতীদের রক্ষাকর্তা সেই মুনির সন্তান। তাই , এ রাজ্যে বল, মহিষাদল, নাড়িয়াজোল, বনবিষ্ণুপুর যেন বল, চুয়াড় ভিন্ন কেউ হাতী ধরতে, হাতীর রোগ সারাতে পারে না। হাতীদের সঙ্গে তাদের বহুদিনের মেলবন্ধন। সেই জন্য এ রাজ্যে নিয়ম, চুয়াড়দল যখনই অরণ্য ত্যেজে আসবে, রাজা গর্গবল্লভকে তাদের অভিযোগ শুনতে হবে। চুয়াড় দল ঘন্টা, প্রহর, সময়, সুবিধা কিছুই বিবেচনা করে না। ... চুয়াড় দলের কেউ যদি জাত ত্যেজে অরণ্য ছেড়ে আসে, তার মরণ কোনও না কোনও হাতীর হাতে। এটি পরীক্ষা করা সত্য ।... চুয়াড়রা ভিন্ন উ-দের আর কেউ নাই। তাই একটি প্রাণী দল ছাড়লে উ-রা আত্মীয়া হারা যায়, তাই একটি প্রাণী দল ছাড়লে উ-রা আত্মীয়া হারা যায়, তাই মেরে ফেলায়।"

চুয়াড়েরা তাদের নিজস্ব সংস্কার নিয়ে চলে। তাদের জীবন এই পৌরাণিকতার আশ্রয়ে গঠিত। তাদের এই পুরাণাশ্রয়ী জীবনের টোটেম হল হস্তীযূথ আর তাদের ধর্মীয় নিষেধাজ্ঞা হল, কোন চুয়াড় হাতীর সঙ্গে থাকলেও তার জন্ম-মৃত্যু ও মৈথুন দেখবে না এবং অরণ্য ত্যাগ করে চলে যেতে পারবে না। তাই নিষেধাজ্ঞা মেনে না চললে তার মরণ হাতীর পায়ের তলায়। সৃষ্টির আদিম লগ্ন থেকে এই মানুষগুলো মিথ এর ওপর নির্ভর করে যুগের পর যুগ কাটিয়ে দিয়েছে। মানবসভ্যতার প্রাচীনযুগ কাটিয়ে মধ্যযুগে উপনীত হয়েও এইসব অরণ্যচারী জাতির কোন পরিবর্তন ঘটেনি। তারা নিদয়ার জঙ্গলের মতো গভীর অরণ্যে বসবাসকারী, তাই সভ্যজগতের কোন ছোঁয়াচ এদের স্পর্শ করে না। গর্গরাজার রাজ্যের অতন্দ্র প্রহরী এরা । রাজ্য আক্রান্ত হলে, সংকেত পাওয়া মত্র তারা চলে আসে রাজাকে সাহায্য করার জন্য। আর নিজেদের অস্তিত্ব বিপন্নহলে রাজ সভায় আসে বিচারের জন্য। সভ্যজগতের সঙ্গে তাদের সম্পর্ক এইটুকুই। এই প্রসঙ্গে তারাশংকর বন্দোপাধ্যায়র 'নাগিনী কন্যার কাহিনী' উপন্যাসটি উল্লেখ করা যায়। নাগিনী কন্যার যে জগৎ লেখক সৃষ্টি করেছেন,

সেই জগৎও সভ্যজগতের বাইরে, সমাজ বহির্ভূত এক আলাদা জগত - পুরা কথার উপর নির্ভরশীল এক রূপকথার জগৎ। এখানকার মানুষগুলো তাদের জীবিকার কারণে মাঝে মাঝে সভ্য সমাজে দেখা দেয়। আধুনিক যুগ মানসিকতার পেক্ষাপটে নাগিনী কন্যার কাহিনী রচিত। মানবিকতার মু ক্তির আকাঙ্ক্ষায় তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাগিনী কন্যারা মিথ এর নিগঢ় ভেঙ্গে বেরিয়ে আসতে পেরেছিল। মহাশ্বেতা দেবী মধ্যযুগের পেক্ষাপটে ইতিহাস ও পুরাণকে আশ্রয় করেছিলেন। মধ্যযুগের চুয়াড় সন্তান মিথ শাসিত সমাজকে ভাঙতে পারে নি। সে চেষ্টা করেও ব্যর্থ হয়েছে - তার চুয়াড় সংস্কার তাকে সেই পৌরাণিক পরিবেশে ফিরিয়ে নিয়ে গেছে।

অন্ত্যজ শ্রেণীর মানুষ ঃ উত্তরণের ব্যর্থ প্রচেষ্টা

মধ্যযুগের কবি প্রশ্ন রেখেছিলেন- "নীচ কি উত্তম হবে পাইলে বহু ধন"। - দেবী তাকে আশ্বাস দিয়েছিলেন এবং দেবী চন্ডীর দয়ায় তার বরপুত্র ব্যাধ কালকেতু পেয়েছিল সাত ঘড়া ধন ও মূল্যবান অঙ্গুরীয়-যার সাহায্যে সে মুহূর্তে একটি রাজ্য স্থাপন করে, আর রাজা হয়ে উঠতে পেরেছিল। দেবীর অলৌকিক মহিমায় অন্ত্যজ ব্যাধের এই উত্তরণ মধ্যযুগের সমাজ কাঠামোতে কিভাবে মানাবে - এ নিয়ে মুকুন্দ চক্রবর্তী ভেবেছিলেন। তবে তাঁর সহায় ছিলেন অঘটন ঘটন পটীয়সী দৈব শক্তি।

কিন্তু এই মধ্যযুগের সেই একই অন্ত্যজ চুয়াড় যখন জন্ম পরিচয় ত্যাগ করে কবি জন্ম নিতে গেল - তার এই সমাজিক উত্তরণের চেষ্টা সব দিক দিয়েই ব্যর্থ হল । তার চেষ্টাকে ব্যর্থ করে দিতে প্রথমেই আছে রাজা ও পুরোহিত বর্গ। তাদের সঙ্গে আছে ভীমা দলের সাধারণ মানুষ - যারা চৈতন্য প্রবর্তিত ধর্মের সমালোচনা করে। অন্যদিকে আছে চুয়াড় সমাজ-যারা নিজেদের সমাজ সংস্কারকে মেনে চলে । এরা সম্পূর্ণ আলাদা জগতের বাসিন্দা; আদিম পদ্ধতিতে জীবন ধারণকারী চুয়াড়দের জগৎ গড়ে ওঠে এদের - 'দেবোপাসনা, তাদের টোটেম ও ট্যাবু, বিশ্বাস-প্রথা-ব্যবহার, চান্দ্র বৎসর গণনা, মাতৃকা আরাধনা '- এই নিয়ে। এই সমাজের নিষেধাজ্ঞা অমান্য করার অর্থ মৃত্যু। তাই রাজ সভায় রাজার সামনে চুয়াড় বৃদ্ধ ঘোষণা করে- "ছেলেটি যদি আমাদের সঙ্গে না যায় তবে আমরাই-উকে লিয়্যে যেঞে হাতীর নিচে ফেলাল্‌ব ... চুয়াড়ের শাস্তি চুয়াড় দিবে, ই-টি আমাদের শাস্ত্রের কথা!" চুয়াড় বৃদ্ধ চায় তাদের সমাজের রাজা, তাই সে বলে- "ইসমাজে তুমার কাজ কি? তুমি আমাদের সমাজে চল মাথা হঞে থাকবে। ... রাজার কাছে ক্ষমা মেংগে লাও হে ! উদের সমাজের কাপড় চাদর ফেলে দাও। তুমার কাপড় মোড়া লিয়ে এসেছি।' ... ' তুমার ধনুক লিয়্যে এসেছি। ... চাঁদ এখন নতুন কলা ধরবে যি ! চাঁদের লতুন কলা তিন দিনের মধ্যে তুমায় পাটা বসা করাব।" কিন্তু কবি চুয়াড় জন্ম ত্যাগ করে এসেছেন, তাই মহাপাপী - 'ধনজনের লালচে' যে নিজের সমাজ ত্যাগ করে, সে ' ঘৃণ্য, অস্পৃশ্য'। সে কুষ্ঠ ধরা হাতের সামিল। স্বজাতির এই বিদ্বেষ, স্বজাতি কতৃক বর্জিত কবি ব্যাথা পেলেন। তিনি বোঝাতে পারলেন না-

"ধন জন মাঙ্গি নাই হে ! অন্য জন্মে যাব, অন্যরকম হব,সেই আকাঙ্ক্ষায় আমি ভীমা দলে আসি।... আমি শিকার খেলি, বাণের মুখে বাঘবিন্ধি, আর থাকি থাকি জঙ্গলের ভিতরে যেঞে বসি।

হাতীর পাল খেলে, কুন্দে, জল ছেটে, তাই শুনে শুনে আমার মনে পাঞ্চালী উঠে আসে। পাঞ্চালী রচব হে, পাঞ্চালী বান্ধব, এই কথাটি সোঙরে, সোঙরে আমার অংগ বেথা করে। সে বেথার জ্বালা তোমরা জানো না।" বিধাতা তাকে 'চুয়াড়দের কুণকের মাপে' গড়েননি । কিন্তু চুয়াড় বৃদ্ধের মুখে কথা নেই। একথা তারা বোঝে না। সংস্কারবদ্ধ এই সকল মানুষ মনুষত্বের মূল্য বোঝে না। বিশেষ করে আদিম যুগ থেকে বর্ণবিভেদের শিকার হয়ে, জাতির পায়ের তলায় থেকে, অবহেলা ও লঞ্ছনায় তাদের প্রাপ্য বলে তারা মনে করে । তারা তাদের জন্মগত অভিশাপকে স্বীকার করে নেয় । চুয়াড় বৃদ্ধ তাই বলে ' সি -টি মোদের কপালে লেখন কলহন' । এই কপালের লিখনকে স্বীকার করে, সমস্ত রকম লাঞ্ছনা তারা মাথা পেতে নিতে অভ্যস্থ। আর এই অভ্যাসের ফলে তাদের ভালো কিছু করতে গেলে, সেটা তারা সন্দেহের চোখে দেখে । এমন প্রমাণও মেলে এই গ্রন্থে। মহিষাদলের এক ভূম্যধিকারী কালি খাঁ, মহাপ্রভুর প্রেরণায় সকল প্রজাকে ভাই বলে কোল দিতে শুরু করেন এবং চন্ডালের সঙ্গে মহোৎসব করবেন - এই সংবাদ প্রাপ্তিতে চন্ডালেরাই কালী খাঁকে মেরে ফেলে।

এর পর আছে রাজ্যের প্রজাবৃন্দ; প্রজাদের নিয়েই রাজার রাজত্ব। প্রকাশ্য রাজসভায় কবি যে চুয়াড় তা জানার পর সমালোচনার ঝড় বয়ে যায়-"মাধব ঠাকুর তুষসেঁকা হচ্ছে গ ! হবারই কথা চুয়াড় জামাই।'... 'যবুক ছেলা, যুবতী মেঞা, মাধব বেন্দাবন খুলে দিয়েছিল যি' 'কবি দেখে লালচে মরেছিল গ এখন চুয়াড় দেখে ডর খাচ্ছে।' 'বাম্ভোনের মেঞা চুয়াড়ের সঙ্গে পীরিত হল, ই দেশে আর থাকব লাই গ !' 'গর্গরাজা হে কুকুরকে লাই দিলে উপরে চড়ে, তোমার কপালেও চড়েছে।' 'বেশি আঁটলে গিরো ফস্‌কা হয়, রাজা এঁটেছিল বেশি। কলু ময়রাকে বিদ্যা হতে লাই বুলে পাঠশালের ছানু দিয়ে হাটতে দিত না। '...' জেতের আগড় ভাঙবে বোলে রাজা বোষ্টমদের চোখে দেখতে পারে নি, বৃদ্ধ-ঠাকুর পুজে যারা সে মগ নেড়া নেড়িদের এক বছর ও রইতে দেয় নি-এখন জেতের মুখে ঝাঁটা পড়ল না ? ' 'সভ্যসমাজের চিরাচরিত চিত্র। মধ্যযুগ বলে সমালোচনার মাপ কাঠি সময়ানুগ। এই সমালোচনার তোপের মুখে পত্নী প্রেমিক রামচন্দ্রকেও পড়তে হয়েছে। সমাজের এই চেহেরা তো ধর্মগ্রন্থেই আঁকা আছে।"

উৎসব মিশ্র এই ব্যাপারে উল্লসিত হয়েছিল-রাজা বৈষ্ণবদের সহায়তা করে নি বলে মনে মনে ক্ষুদ্ধ ছিলেন - 'যা হোক, রাজা মহাপ্রভুর নিন্দেয় পঞ্চমুখ হতেন, তাঁর থোঁতা মুখটি ভোঁতা হল'। কিন্তু হঠাৎই তিনি উপলব্ধি করলেন - সকলেরই জাত যায়- মহাপ্রভুর ভক্ত হলেও - "এক পাত্র থেকে তারা সকলে পান নিয়েছেন, পুজোর প্রসাদ গ্রহণ করেছেন। " সুতরাং ধর্ম বিপন্ন। তিনি হাহাকার করে ওঠেন, " রাজা গো ! রক্ষক হঞে সকল বাম্ভোনের জাত খেঞাছ... "

সমাজের কাছেও কবির মুক্তি নেই। নৃশংসতায় তারা আরো একধাপ এগিয়ে । কারা রক্ষী চূড়ন চন্ডাল বলে-"সভে আমোদ করতে লেগেছ । এমন আমোদ কি নিত্য হয় গ' । ... 'তুম্ভার হাতী মারা দিশবে বলে এখন নিত্য নিত্য কত মানুষ আসে তা জানো? শতে শত, লাখে লাখো।' ... সভে বলে মোরা গাছের ডালে চেপে বসব গ'। তা'লে ভালো দেখা যাবে। ই মানুষগুলান গুড়ে মাছি গ। মানুষ মরলে যাবে, বিভা হল্যে যাবে বামুনের মেয়ে চিতায় পুড়লে যাবে, লরবলী হল্যে যাবে, কুন-অ

ঠেঙে উ-রা বাদ লাই।"

এই সমাজ মানসিকতায় রাজা তো নিমিত্ত মাত্র। রাজা বোঝেন তাঁর অপমানের কথা পার্শ্ববর্তী রাজ্য গুলিতে প্রচারিত হবে। তাঁর মনে সংশয় জাগে - " এই কবি আসলে মহাপ্রভুর ভক্ত নয়তো! ... মহাপ্রভুর প্রভাবে এইসব জায়গায় প্রতিটি পতিত জাতির মধ্যে একটা নতুন আত্মবিশ্বাস জেগেছে। যাকে ক্যাও দেখে না, সমাজে যার ! ঠাঁই লাই। সে বৈষ্ণব হঞা বাঁচতে পার্যে গ ! এই কথাটি তাদের মুখে সদা সর্বদা শোনা যায়। গর্গরাজা তো শবর - পুলিন্দ -তীবর এদের মধ্যে সেই উদ্ধত অত্মবিশ্বাস দেখেছিলেন। উদ্ধত ওরা, দুর্বিনীত! যারা বলে বৈষ্ণবেরা বিনয়ী, সহিষ্ণু, নম্র, তারা তো জানে না ওদের ঐ বিনয় কত উদ্ধত হতে পারে। তারা তো জানে না একটা তীবর যুবককে 'হরিনাম ছাড়' বলে বেত মারতে মারতে মাটি সৈ করে ফেললেও সে যখন হাত জোড় করে শুধু 'হরি ওঁ হরি ওঁ' বলে তখন তাকে কি ভীষণ দুর্বিনীত মনে হয়।"

কবি সভায় স্বীকার করেন, 'হ্যাঁ। একদিন আমি ওদের কল্‌হন ছিলাম।' গর্গরাজার মনে হয় সভামধ্যে যত মানুষ আছে সবার চেয়ে শ্রেষ্ঠ কবি; তাঁর লেখা পাঁচালীটাও ভাল, কিন্তু সমস্ত পুঁথি পুড়িয়ে দিয়ে করিব নাম মুছে ফেলতে হবে - " যা দেখে অধম মানুষের মনে ' ভোবনে লিজের ঠাঁই খুঁজতে যাই' এ ইচ্ছেটি চিরতরে ঘুরে যায়।"

হরিশ রায়া জানে দু'দশটাকে শূলে চড়ালে সব শান্ত হবে। মনে মনে ভাবে "পালিয়ে প্রাণ বাঁচাল না কেন? চুয়াড় বুদ্ধি হয়তো একেই বলে।" রাজাও আর্তকণ্ঠে বলেন - "যদি শূদ্র হয়ে মসীজীবী হতে ইচ্ছে হয়েছিল তবে বোষ্টম হলে না কেন, তাদের সমাজে ভেদাভেদ নাই।" রাজার অনুশোচনা আছে কিন্তু তাঁকে রাজ কর্তব্য করতে হবে। চুয়াড় হয়ে ব্রাহ্মণের নাম নেওয়া অমার্জনীয় অপরাধ। এর শাস্তি রাজাকে দিতেই হবে।

কবি চন্ডীদাসের কথা স্মরণ করিয়ে বলেন - ' সবচেয়ে মানুষ সত্য, ই কথা শুন নাই।' কবি উপলব্ধি করেছেন তাঁর মতো মানুষ এ সময় আসবে। কিন্তু ' রাঢ়ের কবি ' চন্ডীদাস তো 'মহাপাপী'। 'লবাব তাকে হাতীমাঢ়া কর্যে ছেড়েছিল।'

কবির কথা কেউ বোঝে না-"মাধবাচার্য মদমত্ত ব্রাহ্মণ, ক্রুদ্ধ হাতীর মতো ফুলতে ফুলতে মুখ ফেরালেন। গর্গরাজার মুখ যন্ত্রাণার্ত, অথচ কঠোর। আর চুয়াড় বৃদ্ধের মুখ নির্বিকার।" এঁদের একটাই কথা, চুয়াড় যুবক ব্রাহ্মণের নাম নিয়েছে, শূদ্রের এতবড় স্পর্ধা অসহ্য। তাকে শাস্তি পেতেই হবে। রাজার শাস্তিও হাতীর পায়ের তলায় ফেলে দেওয়া, অন্যদিকে স্বজাতি শাস্তি ও সেই হাতীর পায়ের তলায় ছুঁড়ে ফেলা। সমস্ত সমাজ তাঁর বিরুদ্ধে। এখানে কবির প্রেম, ফুল্লরার প্রেম, কবির 'পাঞ্চালীর সম্মান' - এর কোন মূল্য নেই।

রজার কাছে সুবিচার না পেলেও 'প্রেম তাকে অলৌকিক সাহস দিল।' কারাগার থেকে পালিয়ে তিনি গিয়েছিলেন ফুল্লরার কাছে, কিন্তু সেখান থেকেও মর্মান্তিক প্রত্যাখ্যান- "জেত ভাঁড়িয়ে এসেছিলি চুয়াড়!" ফুল্লরাও তাহলে তাঁকে ভালবাসেনি ! মনের দুঃখে ব্যর্থ কবি চলে যান তাঁর জন্মস্থান নিদয়ার অরণ্যে।

কবির সারাজীবনের স্বপ্ন ভেঙে চুরমার হয়ে যায়। তাঁর মনে পড়ে তাঁর অক্ষর পরিচয়ের কথা । "কারণ ওদের হাতে মা সরস্বতী নিজে হাতে খড়ি দিয়েছিলেন। বৈষ্ণবেরা 'চরিতামৃত' পড়বার জন্যে পুঁথিপাঠ শেখেন, এই সব কথা ভাসা ভাসা শুনতে পেতেন মাতংবুড়োর কাছে। 'মোদের লিখতে নাই? 'না' 'কেনী' ? ' মোরা একলব্যের বংশ হই। চার আঙ্গুলে ধনুক তীর বিন্ধি।" এক ব্যাধিগ্রস্ত সন্ন্যাসীর সেবা করে কবি অক্ষর পরিচয়ের বর চেয়ে নেন। সন্ন্যাসী বলেন - "ই কাজ গণেশের কাজ। ই কাজ সরস্বতীর প্রসাদে হয়। ই তুদের বাণ বিন্ধে বাঘমারা লয় হে।" কিন্তু লোহার শলা দিয়ে মেঝেতে অক্ষর শিক্ষা দিয়েছিলেন। আর দিয়েছিলেন কীটদষ্ট কিছু তালপাতার পুঁথির অংশ। " যেন বিশ্ব ভুবন তিনি জয় করে ফেলেছেন, যেন চাঁদ সূর্য হাতে নিয়ে তিনিও লোফাপুফি করতে পারেন। " কিন্তু ফল স্বরূপ পেলেন রাজা প্রদত্ত শাস্তি আর ফুল্লরার প্রত্যাখ্যান।

তাঁর ভরসা এখন অভয়ার চরণ। নিদয়ার জঙ্গলে প্রবেশ করেন কবি। যেখানে তাঁর জন্ম, সেই জঙ্গলে চলা ফেরা করার বুদ্ধি যদি তাঁর হারিয়ে যায়- তাহলে বুঝবেন- "জঙ্গলের জগৎ ও তাঁকে ত্যাগ করেছে ।" কোথাও ভরসা পান না কবি। তাঁর মনে পড়ে -

" চন্ডীদাস ঠাকুর বাশুলী পুজতো, সে রক্ষা পায় নাই ! ... হায় ! ব্রাহ্মণ হয়ে চন্ডীঠাকুর ধোপানীর ভালবাসায় মজেছিল। ঠাকুর তাকে বাঁচাননি । চুয়াড় সন্তান হয়ে ব্রাহ্মণের মেয়েকে ভালবেসে তিনি কেমন করে রক্ষা পাবেন? "

কবির আক্ষেপোক্তি - 'কুথাও ক্ষমা নাই' , নগরে তাঁর ক্ষমা হয়নি, তাঁর প্রেমিকা তাঁকে প্রত্যাখ্যান করেছে। তিনি 'যোগ্যতা যার পৃথিবী তার ' এই মনে করে নতুন জীবন খুঁজতে গিয়েছিলেন। দেবী কেন তাকে সকল চুয়াড়ের মতো করে সৃষ্টি করলেন না ! কেন তিনি তাঁর অন্তরে কবির প্রেরণা জাগালেন- " যা তোর ঠাঁই খুঁজে নে গা, অন্য দেশে যা?"

কবি মাতৃজঠরে আশ্রয় নেবার পথ খুঁজতে লাগলেন- ব্যর্থ কবি ঘরে ফিরে এসেছেন, মাতৃজঠরে ঢুকে যেতে পারলে নিশ্চিন্ত - " মায়ের লাড়ীর মধ্যে যাব, আঁতের লাড়ীর মধ্যে যাব, পোঞা যেমন থাকে তেমনি থাকবো ! ... 'মা গো! যশ চাই না, মান চাই না, কিছু চাই না, ... " তিনি যেন দঃস্বপ্ন দেখেছিলেন । চুয়াড়ের কবি জন্ম সফল হয় না। "সব মিথ্যা"।

মাতৃজঠরেও পৌঁছাতে পারেনা কবি। তাঁর অন্তিম পরিনাম রাজসৈন্যের হাতে ধরা পড়ে- রাজসম্মানের বদলে - রাজদন্ড, হাতীর পায়ের তলায় পিষ্ট হয়ে মৃত্যুবরণ।

"ভাগ্যের বিধানকে, সমাজের অনুশাসনকে, inherited এর নিয়মকে লঙ্ঘন করে 'পৃথিমীটো ঘুর্যে দেখে আসি', বলে জেদ করে যে চুয়াড়-যুবক কবি হয়ে অভয়ামঙ্গল রচে acquired birth-এ উত্তীর্ণ হয়, এ তারই কাহিনী। অভীপ্সার উত্তরণ বিধাতার দেওয়া জন্মকে অতিক্রম করে অন্য জন্মে উত্তরণের আশ্চর্য কাহিনী এই উপন্যাস ।" [১৪২]

'অভীপ্সার উত্তরণ' ঘটলেও বাস্তব ক্ষেত্রে সমাজ জীবনে তাঁর উত্তরণ ঘটেনি। কবি হিসাবে তাঁর সন্মান পাওয়ার পূর্ব মুহূর্তেই অসম্মানে জর্জরিত হয়েছেন কবি। সৃষ্টি ও তার স্রষ্টাকে

ধ্বংস করে দেওয়া হয়েছে; দুনিয়া থেকে তাঁর নাম মুছে দেওয়া হয়েছে তাঁর প্রতি রাজদন্ড শুধু তার মৃত্যুদন্ডই নয়- ' অধম মানুষের' 'ভবনে ঠাঁই খুঁজতে যাওয়ার 'ইচ্ছে'- টিকে ' চিরতরে ঘুচিয়ে দিয়েছে।'

খ) অরণ্যের অধিকার

অরণ্যের অধিকার ঃ বাস্তবতার সন্ধানে

১৮৯৯-১৯০০ খ্রীঃ রাঁচী অঞ্চলের বীরসা মুন্ডার নেতৃত্বে যে ব্যাপক আদিবাসী আন্দোলন সংঘটিত হয়-তা ইতিহাস প্রসিদ্ধ ঘটনা। ব্রিটিশ শাসনের সময় থেকেই মুন্ডাদের জমি জায়গা দখল করতে থাকে, উত্তর ভারত থেকে আসা জায়গিরদার, ঠিকাদার,বণিক ও মহাজনেরা। সেই সঙ্গে চলে মুন্ডা শ্রমিক সংগ্রহ করার জন্য অত্যাচার। অন্যদিকে খ্রীষ্টান পাদ্রীরা এদের প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শন করে সাহায্যের আশ্বাস দিয়ে, খ্রীষ্টধর্ম প্রচার করতে থাকে। কিন্তু জমি সংক্রান্ত সমস্যা অমীমাংসিত থেকে যায়। ১৮৯০-এর দশকে মুন্ডা সর্দাররা আদালতে বিদেশী জমিদারদের শোষণের বিরুদ্ধে অভিযোগ আনে। কিন্তু কোন ফল না হওয়ায়, মুন্ডারা বীরসা মুন্ডার নেতৃত্বে বিদ্রোহে সামিল হয়। মুন্ডাদের মধ্যে রাষ্ট্রবিরোধী প্রচার চালান হচ্ছে - এই অভিযোগে বীরসাকে গ্রেপ্তার করা হয় এবং তার দু'বছরের সশ্রম কারাদন্ড হয় । কারাগার থেকে মুক্ত বীরসা নতুন করে বিদ্রোহের প্রস্তুতি নেয়। ১৮৯৯ খ্রীঃ প্রথমে গির্জার ওপর হামলা শুরু হয়। এরপর আক্রমণ শুরু হয় পুলিশ ও থানার ওপর। শেষপর্যন্ত মুন্ডা বিদ্রোহ দমন করা হয়, বিরসা গ্রেপ্তার হয় এবং কারাগারে তার মৃত্যু ঘটে। পরে অবশ্য সরকার মুন্ডাদের অভাব অভিযোগ নিরসন কল্পে ১৯০৮খ্রীঃ ছোটনাগপুর প্রজাস্বত্ব আইন প্রবর্তন করে, মুন্ডাদের 'খুটকট্টি', অধিকার স্বীকারও বেগারপ্রথা নিষিদ্ধ করা হয়।

এই ইতিহাসের ওপর ভিত্তি করেই মহাশ্বেতা দেবী তাঁর অরণ্যের অধিকার উপন্যাসটি লিখেছিলেন। লেখিকা এই গ্রন্থের ভূমিকায় সুরেশ সিং রচিত 'Dust and Hnging Mist' বইটির কাছে ঋণ স্বীকার করেছেন। [১৪৩]

'অরণ্যের অধিকার' উপন্যাসটি যেন মুন্ডা বিদ্রোহের এক তথ্য পূর্ণ দলিল । ঔপন্যাসিক এখানে নিরপেক্ষ ঐতিহাসিক ও সমাজ তাত্ত্বিকের দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে বীরসা মুন্ডা ও তার বিদ্রোহের কথা বলেছেন। এ ব্যাপারে সমাজের প্রতি তাঁর দায়বদ্ধতা স্বীকার করে নিয়েছেন-

"লেখক হিসাবে, সমকালীন সামাজিক মানুষ হিসাবে, একজন বস্তুবাদী ঐতিহাসিকের সমস্ত দায়দ্বায়িত্ব বহনে আমরা সর্বদাই অঙ্গীকার বদ্ধ। দ্বায়িত্ব অস্বীকারের অপরাধ সমাজ কখনোই ক্ষমা করে না। আমার বীরসাকেন্দ্রিক উপন্যাস সে অঙ্গীকারেরই ফলশ্রুতি।" [১৪৪]

মহাশ্বেতা দেবীর উপন্যাসে এই সমাজ সচেতনতার দিকটি সম্পূর্ণ আলাদা ধরণের। সেদিক দিয়ে খুব স্পষ্ট বক্তা তিনি। তিনি তাঁর উপন্যাসে ঘটনা বর্ণনায়, সবকথা বলে নেন। চরিত্রদের দিয়ে সবকথা বলিয়ে নেন। ফলে কোনো ইঙ্গিত বা সংকেত বা ব্যঞ্জনার ব্যবহার তাঁর উপন্যাসে প্রায়

অনুপস্থিত। তাঁর উপন্যাস বিশ্লেষণ করতে গেলে অন্যান্য লেখকের সঙ্গে তাঁর এই পার্থক্যটা ভীষণ ভাবে ধরা পড়ে। সব কথাই যেন বলা হয়ে গেছে; পাঠকের জন্য কোনো দ্বায়িত্ব রাখা হয়নি। সমালোচকের ও পর্যবেক্ষকের কাজ প্রায় কিছুই থাকে না - তার গুণাগুণ বিচার ছাড়া। অত্যন্ত বস্তুনিষ্ঠ ভাবে, অথচ উপন্যাসের রসাস্বাদানের দিকটি বজায় রেখে তিনি লেখেন। 'অরণ্যের অধিকার' উপন্যাসের ক্ষেত্রেও দেখা যায় - উপন্যাসে বর্ণিত অন্ত্যজ সম্প্রদায়ের সমস্যাগুলিকে সমালোচকের দৃষ্টিতে দেখে-মূলকথাগুলি যেন বলাই হয়ে গেছে। তাই সমালোচোনার ক্ষেত্রে উপন্যাসের ঘটনা, লেখকের জীবন দর্শন, চরিত্রের সংলাপ, অংশকে উদ্ধৃত করতে হয়। সেখানে নিজের ভাষা বলার বোধ হয় কিছুই থাকে না - শুধু নির্দিষ্ট জায়গাগুলিকে তুলে ধরা ছাড়া। আর এ ক্ষেত্রে, উপন্যাসে অন্ত্যজ সম্প্রদায়ের অবস্থানের বিষয়টাকে তুলে ধরতে - লেখকের উদ্ধৃতির মতো প্রামাণ্য তথ্য আর কিছু আছে বলে মনে হয় না; বিশেষ করে মহাশ্বেতা দেবীর মতো বস্তুনিষ্ঠ ঔপন্যাসিকের ক্ষেত্রে।

বীরসা মুন্ডার আন্দোলনের ঐতিহাসিক ঘটনাকে কাহিনীবদ্ধ করে তোলা-সহজ ব্যাপার নয়। সেক্ষেত্রে সমাজ তাত্ত্বিকের বস্তুনিষ্ঠ দৃষ্টিভঙ্গি বজায় রেখেও তিনি রসিক পাঠককে হতাশ করেননি। বীরসা মুন্ডা 'অরন্যের অধিকার' - এর জন্য লড়াইয়ে নেতৃত্ব দিয়েছিল। বীরসা একদিনেই নেতা হয়ে ওঠেনি।যে সমাজে সে জন্ম নিয়ে, বেড়ে উঠেছে, সে যে তার পাঁচটা মুন্ডা ছেলের মতো নয়- সে পড়াশুনা শিখবে, বাঁশি বাজাবে, প্রকৃতিকে উপলব্ধি করবে, পারিপার্শ্বিক অবস্থা তার মধ্যে বিদ্রোহী মনোভাব গড়ে তুলবে, সর্বোপরি সে হয়ে উঠবে মুন্ডাদের বীরসা ভগবান - এই কাহিনী, বীরসার জীবন কাহিনী।এই কাহিনী গড়ে তুলেছেন ঔপন্যাসিক। এখানে বীরসার সেই বিদ্রোহের রূপ দিয়েছেন তিনি- যে বিদ্রোহ বীরসার মৃত্যুতে শেষ হয়ে যায়নি- "... জীবন, বিদ্রোহ যা কিছু চলমান তার সত্যতা কোনো কালে কোনো দেশে নেতার মৃত্যুতে শেষ হয় না। কালে-কালান্তরে উত্তরাধিকারের ধারাপথে অব্যাহত থাকে তার অগ্রগতি। বিদ্রোহ থেকে জন্ম নেয় বিপ্লব।" [১৪৫]

বীরসার জীবনে পরিবর্তনের সূত্রপাত

মুন্ডাদের মধ্যে আলাদা বীরসা। সে বাঁশি বাজায়, জঙ্গলে এলে সে সাংসারিক অভাবের কথা ভুলে যায়। তাই সে ধানীকে বলেছিল- 'এ আমার বন'। ধানী একথার অন্য অর্থ করে বলেছিল- ' মনে রাখিস, বলেছিস এসব তোর ।' বীরসার বিস্ময় জেগেছিল ধানী সম্বন্ধে এবং দাদার কাছ থেকে জেনেছিল- সে 'লড়াই খেপা'-"লড়াই যেথা, ও সেথা। ওর বয়স আটশো অষ্টাশি চাঁদ হল । এর মধ্যেও সেই প্রথম মুন্ডা লড়াই, হুল, খেরোয়ার লাড়াই, সর্দারদের মুলকি লড়াই, সব জায়গায় লড়ে এসেছে ।" ওর তীর ধনুকের নিশানা পাকা, ওর মতো দেশ-বিদেশ কোন মুন্ডা দেখে নি। ও জীবনকালে দশটি ছেলেকে লড়াইয়ে নামিয়েছে। তাই বীরসা সম্বন্ধে করমির ভয়।

ধানী বীরসাকে বলে- "... এই যত বন আছে, যত পাহাড়, সব নাকি আমার।" বীরসা একথা তার মাকে বলে। মা ভয় পায় কারণ সে জানে ধানী ভগবান খুঁজে বেড়ায়।

"... সে ভগবান নাকি মুন্ডা হয়ে জন্ম নিবে। সে সকল মুন্ডাদের তরে খুট কাট্টি গ্রাম দিবে।

সে এলে সকল মুন্ডাদের গায়ে কাপড়, হাঁড়িতে ঘাটো, খুচিতে লবন থাকবে। ভাঁড়ে থাকবে মৌয়ার কড়ুয়া তেল। তখন মুন্ডারা রাজা হবে।"

প্রকৃতির সঙ্গে বীরসার একাত্মতায় করমি তার ছেলে সম্বন্ধে ভীত হয়- সে কোমতার মতো নয়- অন্যান্য মুন্ডা ছেলেদের সঙ্গে কোথায় যেন তার পার্থক্য। সুগানাও বোঝে - বীরসা মুন্ডা হলেও অন্য জাতের ছেলে। সকলের মতো দেখতে নয়। সব মুন্ডা ছেলে বাঁশি বাজাতে পারে কিন্তু বীরসার বাঁশি সুগানাকে মনে করায় অন্য কথা। ছোট বেলায় মুন্ডারীদের আদি দেবতা হরম আসুলের পূজোয় জোয়ার উৎসবের সময় গ্রাম পহান্ বলতো হরম আসুল বাঁশি শুনতে ভালো বাসেন বলে কোন কোন ছেলের আঙ্গুলে ও ঠোঁটে তার আশীর্বাদ দিয়েছিলেন। বীরসার বাঁশি শুনে সকল মুন্ডারী দু দন্ড দাঁড়ায়। মুন্ডারী মায়েরা করমিকে বলে - "... ঐ দিকু নন্দ গোলদার যে ঠাকুর পূজে, সেই কিষ্ণর মতো তোর ছেলা বাঁশি বাজায় যে?" সকল মুন্ডার ঘরেই ছেলে বাঁশি বাজায় কিন্তু- "সে বাঁশি শুনে ছুটান্ত খরা, দূরান্ত বরা, বনের হরিণ, সব শান্ত হয়ে দু দন্ড দাঁড়ায়, একে কোথা দেখেছে কবে?" বীরসার মা-বাবা চান বীরসা যেন সকলের মত হয়।

সুগানার মনে হয় সিংবোঙা কর্তৃক মুন্ডাদের জগৎ সৃষ্টি কাহিনী যখন - দেবতা সিংবোঙা সেঙ্গেলদার আগুন জ্বালিয়ে ছিলেন নতুন জগত সৃষ্টির জন্য।

"কিন্তু সুগানার কপালে তো সেংগলদার আগুন। কপালে আগুন, পেটে আগুন, মনে আগুন।" সে সব মেনে নিয়েছে, প্রতিবাদ করে নি। এত আগুন একেবারে নেভে না- তাতে সুগানার দুঃখ নেই। "ভরপেট খেলে, আস্ত কাপড় পড়লে,অটুট ঘরে ঘুমোলে কেমন লাগে তা ও জানে না। ভাই কম খেয়ে - না খেয়ে, ছেঁড়া কাপড় পরে ভাঙা ঘরে ঘুমিয়ে ওর দুঃখ নেই।" বরং তারা কপালকে ধন্যবাদ দেয়- সেবক পাট্টা লিখে জন্মদাস হয়নি, কোনো দিকুর কাছে বেঠবেগারী দেবার শাসন নেই। আড়কাঠি বছর বছর টাকার লোভ দেখিয়ে চা-বাগানের কুলির কাছে মুন্ডাদের নিয়ে যায়- তাও ওরা পায়নি।

কিন্তু বীরসা কেন এমন- সে জঙ্গলের রহস্য কেন জেনে আছে। " কোথায় কন্দ, কোথায় কুন্ডীতে মাছ, কোথায় সুমিষ্ট কুল আর অম্ল কষায় আমলকী, বনকচু আর মাংসল খরা, শজারু-সব কথা ও একা জানে কি করে? যেন অরণ্য সব রহস্য ওকে জানায় একা। একা -বীরসার হাতে তুলে দেয় সব লুকানো ঐশ্বর্যের সঞ্চয়। কেন এমন হয়।" বীরসা কেন সবার মতো হয় না। সুগানা ঠিক করে প্রথম সুযোগেই বীরসাকে কোথাও গাইচরী কাজে ভিড়িয়ে দেবে। বীরসার ছোটভাই কনুইটা হামা টেনে ঘাটো খাবার মতো বড় হয়ে গেল।

বীরসার মাথা নিবাই মুন্ডা নিয়ে যায় দুই ভাইকে। ভুরা মুন্ডার কাছে গাইচরাই করলে কোমতার জীবন কেটে যাবে- ওরা ভাত খায়। লবনেরও অভাব নেই। আর বীরসাকে দেবে জয়পাল নাগের কাছে গাইচরী কাজে। জয়পাল পাঠশালা খুলছে- সেখানে পড়াশুনা করতে পারবে। " করমির মায়ের মন বলল, আট বছরের ছেলেকে আঁচলচাপা দিয়ে রাখে। কিন্তু ও তো শুধু 'মা' নয়, মুন্ডারী মা। মুন্ডারী মা জ্ঞানে, আট বছরের ছেলে গাইচরী করে হোক, বা কোনও দিকুর খামারে ঝাটপাট

দেবার কাজ করে হোক, পেটের ঘাটো যোগাড় করে নেয়।"

সুগানা তাকে বোঝায়, বীরসা অনেক পড়েছে এত পড়া চালকাড়ের কোন ছেলে পড়েনি। মিশনের সাহেবদের হাতে পায়ে ধরে বাগানের মালির কাজ পেতে দুবেলা ভাত খেতে পাওয়া যাবে। কিন্তু বীরসা চাইবাসা যাবে। সুগানা তাকে বোঝায় - " ... পড়লে পরে এ ঘরে এ সংসারে তোর মন উঠবে না। ... যত পড়বি বাপ, তত দুঃখ। আমার দুঃখ নাই, আমি উপাসে-উপাসে ভিখ মাঙাটি হয়ে গিয়েছে। তুই শুধামুধা দুঃখ পাবি। অনেক পড়লেও কেউ বাবু বলবে না তোকে, কোনও গ্রামে মান্‌কি করে দিবে না। শেষে খেতনের ছেলেদের মতো কয়লাখাদে কুলি হবি। আড়কাঠির সঙ্গে চা-বাগানে চলে যাবি । ঘরে থাক তুই। এবার ধারকর্জ করে আরেকটা গাই কিন্‌ব, চরাবি।"

বীরসা নাছোড়বান্দা। সে বলে- " ... পড়লে পরে আমি সাহেবদের সমান হব, সাহেব বলাছে।" সুগানার আর বলার কিছুই নেই। চালকাড় থেকে চাইবাসা অনেক দূর- ১৮৮৬ সালে এই চারটি ছেলে সুগানা মুন্ডার সঙ্গে গিয়েছিল চাইবাসায়। অভিরাম, বামবা , ইশাক পথের দূরত্বটুকু হেঁটেছিল আর বীরসা হেঁটেছিল "... এক জন্ম, এক জীবন থেকে আরেক জীবনের দিকে। হেঁটে চলেছে বীরসা। সুগানা বোঝে জমিজমা, চাষবাস, থিতু হয়ে থাকা।" কিন্তু বীরসা "... চেনাজানা জগৎ ছেড়ে বাইরে বেরোতে চায়।" বীরসা চলে আসে চাই বাসার মিশনের পড়াশুনার পরবর্তী পাঠ নিতে।

বীরসার বিদ্রোহী চেতনার উন্মেষ

জার্মান লুথেরান চার্চে যারা ক্রীশ্চান হয়েছিল সেই মুন্ডারা একদিন ডাক্তার এ, নট্রট- এর কাছে তাদের আর্জি জানাল- " ছোটনাগপুরে টেনিওর আইনে বলছে যার জমি সে রাখতে পারবে। ... আমাদের খুটকাট্টি গ্রামগুলা ফিরিয়ে দাও ।... তুমি সাহেব। দেশের সরকারও সাহেব। সাহেব সরকারেকে বলে দাও। ব্যবস্থা কর।" কিন্তু মিশনের সাহেবের কথা শুনবে না সরকার। এই কথা শুনে তারা দলে দলে জার্মান মিশন ছেড়ে লীয়েভেন্‌স্ সাহেবের কাছে ক্যাথলিক হল। বীরসা শুনল, "লীয়েভেন্‌স্ সাহেব বলে দিয়েছেন, যারা অত্যাচারী, তাদের সঙ্গে লড় গিয়ে। লড়লে পরে ওরা ঠান্ডা হবে।" আরো শুনল সরকার সৈন্য পাঠিয়ে সর্দারদের ধরছে-বদলি করে দিয়েছে লীয়েভেন্সকে। সর্দাররা ধরা পড়তে লাগল - কেস উঠল ৪০ জনের নামে কিন্তু আদালতের কাঠগড়ায় পোঁছানর আগেই রাঁচি জেলে গেল ৮জন। সে আরো শুনল, সর্দাররা যে উকিলদের ঠিক করেছিল তারা কিছুই করেনি- মন্ডাদের হয়ে লড়েছেন ব্যারিষ্টার জেকব-কলকাতা থেকে।

বড়দিনের ছুটিতে বীরসা যখন বাড়ি গেল তখন, ধানী মন্ডা ওর সঙ্গ নিল। ধানীর কাছে বীরসা ভগবানের কথা শুনল। সে ক্রীশ্চানদের যীশু নয়, মুন্ডাদের ঘরে সে আসবে- "মুলকুই লড়াইয়ের ধিমাধিমা আগুনে জ্বালিয়ে দিবে সব।"

বীরসাকে সে জানায় বীরসাই হতে পারে সেই ভগবান, যেহেতু ছোটনাগপুর বীরসার আদি

পুরুষের তৈরী। ছুটির পর মিশনে ফিরে বীরসা দেখলো মুন্ডাদের মধ্যে যারা ক্রীশ্চান হয়েছিল তারা সর্দারদের মুলকুই লড়াইয়ে সামিল হয়েছে। তাদের কথা-মিশনের সাহেব আর সাহেব সরকার সব এক আর সাহেবদের হাতে মুন্ডাদের মঙ্গল নেই। বীরসাকে তারা বলে- "তুই যা বলবি, মোরা শুনব। তুই মোদের পহান্।" বীরসাকে তারা অমূল্যের সঙ্গে মিশতে মানা করে । ওদের ধারণা - "... ও বাবু, ও দিকু হবে, ও মুন্ডাদের দুশমন... কোনও বাবু ছেলা কোনদিন মুন্ডা ছেলার বন্ধু হয় নাই, হতে পারে না।" বীরসার চোখ রাঙা হয়ে ওঠে - " পড়া শিখ, লিখা শিখ, মুন্ডা মুন্ডাই রয়ে যায়। অমূল্য আমার বন্ধু। আমি ওরে ফেলাব না। তাতে তোরা মোরে ছাড়লে ছাড়তে পারিস।" মু ন্ডারা আর এতে দ্বিমত করেনি। কারণ তারা জানত বীরসা ওদের সেরা।

ফাদার নট্রট বুঝতে পেরেছিলেন, মুন্ডাদের মনে বাইরের বাতাস লেগেছে। তিনি বীরসাকে বোঝাতে চাইলেন - সর্দাররা যা বোঝাচ্ছে তাতে মুন্ডা ছেলেদের ভাল হবে না- বরং মিশনের কথা শুনে থাকলে সরকার খুশি হবে । ভাল হবে। বীরসার প্রশ্ন 'জমি ফিরে পাব?' এর উত্তর, মিশনের মু ন্ডারা পাবে। তিনি আরো জানালেন- সর্দাররা কেস করলেও কেস দাঁড়ায় নি। এর যুক্তি দেয় অমূল্য- "মুন্ডারা উকিল খাড়া করে। উকিল মুন্ডাদের টাকা খায়। হাকিমকে বোঝায় উল্টো পাল্টা।"

"১৮৭৮ সালে মুন্ডারা সরকারকে আর্জি লিখে জানিয়েছিল ছোটনাগপুর তাদের মালিকানা দেশ। সে দেশে তাদের অধিকার কায়েম করা হোক।" ছোটনাগপুরের জমিতে তাদের দখল না থাকা মানে মাতৃভূমির সঙ্গে বিচ্ছেদের পাঁচিল তুলেছে- মিশন। মিশনের জন্য তারা সর্বশক্তিমান সিংবোঙার আশীর্বাদ থেকে বঞ্চিত। "১৮৭৯ সালের আর্জিতে লাভ হয়নি কোন। ১৮৮১-তে একদল সর্দার মুন্ডা মিশন ভেঙে বেরিয়েছিল।" কিন্তু ফল হয়নি কোনো, তারা ধরা পড়ে, জেলে যায়, আবার নট্রটের কাছে আসে ছোটনাগপুরের দাবিতে এবং সেখানে ফল না হওয়ায় তারা চলে যায় ফাদার লীয়েভেন্সের কাছে।"চাইবাসা মিশনের সুন্দর শান্ত পরিবেশে সর্দারদের হাজারটা কথাবার্তায় আগুন থেকে আঁচ আসছিল। মিশনের পরে মুন্ডাদের পরে মন্ডাদের বিশ্বাসের অঙ্কুরগুলো শুকিয়ে যাচ্ছিল সে আঁচে। লীয়েভেনসের কাছে যাওয়া মুন্ডাদের ৪০ জন ধরা পড়ে এবং বিচারাধীন অবস্থায় ৮-৯ জন মারা যায়। মুন্ডাদের ভরসা এখন কলকাতার ব্যারিষ্টার জেকব। জেকব তাদের শেখান অধিকারের জন্যে আইনের সাহায্যে লড়াই করতে।"

ফাদার নট্রট ভয় পেয়ে ছেলেদের ডেকে ভরসা দিচ্ছিলেন, তারা যেন মিশনের প্রতি ভরসা না হারায় - সব জমি তারা ফিরে পাবে। "১৮৮৭-৮৮ সালের মধ্যে সর্দারদের সঙ্গে মিশনের কাটাকাটি হয়ে গেল।"

ফাদার নট্রটের মুখে শোনা - "সর্দাররা জোচ্চোর, তারা ঠক" - বীরসার মনে বিরাট ধাক্কা দিল। সে তো বিশ্বাস চেয়েছে কিংডাম্ অফ্ হেভনে? সে তো বিরাট ধাক্কা দিল। সে তো বিশ্বাস করতে চেয়েছে যে ফাদার নট্রটের জামা যেমন শুভ্র, অন্তর তেমনি শুভ্র? সে তো বিশ্বাস করতে চেয়েছে, প্রকৃত ক্রীশ্চান কারোর মধ্যে মন্দ দেখে না? সে তো ভালবেসেছে এই সুন্দর পরিবেশ, সুন্দর প্রার্থনা সভা, গির্জার গান? সে তো কৃতজ্ঞ হয়েছে ফাদারদের কাছে? তাঁরা ওকে পড়তে

শিখিয়েছেন, আলোকিত জ্যোতির্ময় জগতের দরজা দেখিয়ে দিয়েছেন। কিন্তু সর্দাররা মুন্ডা। তারা মুন্ডাদের ভাল চেয়েছে। নইলে কয়েদ হয় কেউ? নাহলে গিয়ে অমন করে মরে? সর্দারদের জোচ্চোর আর ঠক বললে বীরসার ভেতরের মুন্ডারী রক্তে আগুন লেগে যায়। মুন্ডার শরীরের এক ফোটা রক্ত মানে সমগ্র কৃষ্ণ ভারত। সে ভারতে সেংগেলদার আগুন অতি সহজে জ্বলতে পারে, অতি সহজে। কেননা সে ভারতে দাহ্যভূমি শুকনো, দাবানলের প্রত্যাশী।"

বীরসা ছেলেদের বলে বেড়ায় "ফাদাররা বদমাশ। তারা সর্দারদের এখন জোচ্চোর বলছে।" ফাদার নট্রট বীরসাকে ডেকে পাঠিয়ে বললেন- বীরসা মিশনের নামে নিন্দা করছে । বীরসা জানতে চায় কেন তারা সর্দারদের গাল দিচ্ছে- ফাদার আবার বলেন 'তোরা জোচ্চোর' - প্রতিবাদ করে বীরসা খুব উঁচু গলায় - অবাক হয়ে যখন নট্রট। ঘোষণা করেন- "মন্ডা মুন্ডা এক সমান, মিশনের কাছে আসে ভিখারির মতো। ভিতর ভিতর সর্দারদের কথা মানে। সকল মুন্ডা বেইমান।" প্রতিবাদ করে বীরসা- "না ! তোমার কথা ফিরায়ে নাও। বেইমানী জানে না হে মুন্ডা । জানলে পরে তার মিশনকে মিশন উড়ায়ে দিত।" সেও ঘোষণা করে- "সাহেব সাহেব এক টোপি। সরকার যা, মিশন তা, সব এক সমান।" মিশনে তার আর জায়গা হল না। চালাকড়ে ফিরে এসে, সেখানকার মিশন থেকে নাম কাটিয়ে এল।

মুন্ডারী রক্তে বিদ্রোহের আগুন

বীরসার রক্তের মধ্যে চুটু আর নাগুর রক্তের উপলব্ধি। বীরসার অঙ্গীকার - "আমা হতে মুন্ডারা বাঁচবে..." সেই দিন পহানের নাগর বেজে উঠেছিল পৃথিবী কাঁপিয়ে "গ্রামের সকল মানুষকে বজ্র-বিদ্যুতের নীল আলোয় দেখা যাচ্ছে, কালো চামড়ায় সৃষ্টির জল চমকাচ্ছে, গড়াচ্ছে। ... নাগর বাজছে গম্ভীরে, জঙ্গল ঝড়ের চাবুকে আর্তনাদ করছে, আকাশ বজ্রবিদ্যুতে হাসছে আর জল ঢাকছে। আর আকাশ পানে দু-হাত তুলে বীরসা আসছে। বীরসার চোখে মুখে বৃষ্টির জল, দৃষ্টি উজ্জ্বল, ভীষণ, ভবিষ্যতের মতো, মুন্ডাদের ভবিষ্যতের মতো ভীষণ।" বীরসা বলেছিল - "... আমি সকলের জন্য এই জঙ্গল মাটি সব জিনে এনে দিব। এরা ভগবান চেয়েছিল মা, আমি ভগবান হয়ে ফিরে এলাম।... আমি ভগবান, মাগো। আর তোর কোলে মোরে ধরবে না। আটকাবে না। আমি এই ধরতি আবা।"

দুদিনে সুগানার ঘর তীর্থক্ষেত্র হয়ে উঠল- লোঙ্গা, কুরিয়া, নারাঙ্গা, তুবিল, মুচিয়া, বনপিরি, বারতোয়া, গোপালা, বীরবাঁকি, বোন্দো, বামবা - দূর দূর থেকে লোক আসতে থাকলো। "মুন্ডাদের সকল প্রত্যাশা পূর্ণ করে ভগবান মানুষ হয়ে জন্মেছে।"

" কতদিন ধরে আদিবাসীরা বীরসার মতো কারোকে চাইছিল কে জানে! সিংবোঙার সঙ্গে মিশনের ধর্মের সঙ্গে একই সাথে যে নামতে পারে যুদ্ধে সেই ধরতি আবাকে চাইছিল। ওঁরাও, কোল, খারিয়াদের আর রক্ষা করতে পারছিল না সিংবোঙা। তারা ভরসা পাচ্ছিল না যীশুর শরণে। নতুন ভগবান চাইছিল ওরা! যে ভগবান শুধু জাদু আর অপদেবতা আর অভিশাপ দেখিয়ে ভুলিয়ে রাখে

না। যে দেবতা কিংডাম অফ হেভেনের কথা বলে না উপোসী মানুষদের।

যে দেবতা বলে , অপদেবতা নয়, দিকু আর সরকারকে খতম কর । নিজেদের হক্ নিজেরা কেড়ে নাও। যে দেবতা বলে, দরকার হলে মারো, মরার জন্য তৈরী থাক। সেই দেবতার কথা পৌঁছে গিয়েছিল দূর-দূরান্তে। পালামৌ কোথায়, কোথায় ছোটনাগপুর! পালামৌয়ের বারোয়ারী আর চেচারি অবধি চলে গিয়েছিল খবর। অধিকাংশ ওঁরাও আর মুন্ডা হয়ে গিয়েছিল বীরসাইত! "

বীরসা শুনেছে সর্দাররা বীরসার কাঁধে কুড়াল রেখে শালগাছ কাটতে চায়। বীরসা সে কথা জানে কারণ সর্দারদের আন্দোলন হল আর্জি কারার আন্দোলন। "সে আন্দোলনে কোনওদিন একথাটা স্পষ্ট হয়ে ওঠেনি। যে আন্দোলনটা সরকারের বিরুদ্ধে, সরকারের মতোই মিশনারিরাও আসলে মুন্ডা স্বার্থের বিরোধী। দাঁতে দাঁত চেপে লড়াই করাই যে একমাত্র পন্থা, তাও বোধ হয় সর্দার মানেনি। সর্দাররা মুন্ডাদের স্বার্থের জন্যই আন্দোলন চালিয়েছে। কিন্তু সে যেন শুধু ছোটনাগপুর টেনিওর অ্যাকট কার্যকরী করার আন্দোলন। এবারই ওরা মিশনের সংস্রব ছাড়ল। দেখা গেল, ওরা যেন উদ্দেশ্যে খানিকটা স্থির, পন্থায় খানিকটা মরিয়া।" কিন্তু ওরা উদ্দেশ্য নিয়ে বীরসার কাজে সামিল হতে চায়, সেটা বীরসা বোঝে। ১৮৩১-৩২ সালে কোল বিদ্রোহে যোগ দেবার জন্য প্রবীন সর্দার বীরসিং মুন্ডার ঠাকুরদা চালকাড় সমেত বাইশটা গ্রামের মান্‌কিদারী হারায়। বীরসিং তাই চায় বীরসার আন্দোলনে সামিল হলে সে আবার মানকি হবে।

বীরসা চায় সর্দারদের আন্দোলনের সঙ্গে বীরসার আন্দোলন মিশে যাক কিন্তু বীরসা তাদের হাতের পুতুল হবে না; সেই হবে নেতা-"তবে কি মুন্ডা রাজের ডাক দেবে বীরসা? যে রাজে সব বিদেশী হবে বিতারিত। যে রাজের প্রধান হবে বীরসা নিজে? " বীরসা ঘোষণা করে -"মুন্ডারা বড় বাঁধা পড়ে গিয়েছে হে । দিকুরা মুন্ডাদের ধারে-কর্জে-কয়লাখাদে রেলে জেহেলে-আদালতে হাজার পাকে বেঁধেছে । এখন মোদের সব রকমে আজাদ হতে হবে। সকল বিদেশীকে তাড়াব। কারেও কোন খাজনা দিবনা। সকল বন নিয়ে নিব। যেমন আগে নিয়েছি, তেমনি করে নিব।"

সরকারী চাকা নড়তে শুরু করে। জমিদার জগমোহন সিং, মহাজন সুরাজ সিং, পাটোয়ারী বলরাম সাউ, আড়কাঠি শিউলালের মতো লোকেরা ভয় পেয়ে গেল- খাজনা হবে না, সুদ হবে না, ধান গম ধার নেবে না, জমি বাঁধা রেখে। কুলি হবে না চা-বাগানের - তাহলে কি করে সম্ভব। মিশনের সাহেবরাও ভয় পেল- কেউ ক্রীশ্চন হবে না, মিশন ছেড়ে চলে যাচ্ছে সব। সরকারের টনক নড়ল- এ অবশ্যই বিদ্রোহের প্রস্তুতি। কোন ভরসায় তারা চাষবাস ছেড়ে দিচ্ছে। "চাষ করলে, সারা বছর আকাশপানে মুখ তুলে আকাশের দয়ার দিকে চেয়ে চাষ করলে, তবু যাদের দু-পেটা ঘাটো জোটেনা, তাদের বুকে এমন সাহস জোগাল কে? " ডেপুটি কমিশনার খবর পাঠালে তামারের দারোগার কাছে । ১৮৯৫ সালের ৬ই আগষ্ট খবর এল তামারে - বীরসা বলেছে, "সরকার 'উৎগেছে' খতম হয়ে গেছে। মুন্ডারীরাজ এবার কায়েম হবে। তখনি হেড কনেস্টবলকে আরো দুজন কনস্টেবল দিয়ে পাঠিয়ে দিল দারোগা।" কিন্তু বীরসাকে গ্রেপ্তার করা গেল না। এবার এলেন বাঁচির পুলিশের ডেপুটি সুপার মীআর্স । সঙ্গে মুরহু মিশনের রেভারেন্ড লাস্‌টি, বন্দগাঁওয়ের জমিদার বেয়নেট উঁচিয়ে এগিয়ে এল। পুলিশ বীরসাকে সহজে ধরল।

একে একে সিমুবুয়া পাহাড়, ডোমবাড়ি পাহাড়ে সভা হয়ে গেল। সেখানে বীরসা তার বিদ্রোহের বিবরণ দিয়ে দিল। পুলিশ চিরুনি তল্লাসী করেও তাদের ধরতে পারল না। বীরসাইতরা বিদ্রোহের গান গাইল-'বাঁচার চেয়ে মৃত্যু ভাল? অবাক হয় বীরসা ! পরে বুঝেছে সময় তাদের এই গান শিখিয়েছে। একদিকে বিদ্রোহ অন্যদিকে বিদ্রোহ দমনের চেষ্টা।

আইনের প্যাঁচে ফেলে মুন্ডাদের শাস্তি দেওয়া ছাড়া আর কোনো পথ নেই। এর সুবিধা অনেক, বিচারের সময় কেউ কারো ভাষা বোঝে না। গ্রেপ্তার করে, কয়েদ করে রেখে, অনন্তকাল ধরে তদন্ত চালান যায়।

বিচারাধীন অবস্থায় রাঁচি জেলে মারা যায় বীরসা। প্রচার করা হয় বীরসার কলেরা হয়েছিল। বীরসা জানত তার কলেরা হয়নি। অমূল্য তাকে আশ্বাস দিয়েছিল, বীরসাদের কেস নিয়ে হইচই হয়েছে; এবার ফয়সালা হতে পারে। সে ওয়ার্ডারের দেওয়া খাবার, ওষুধ এমনকি জল পর্যন্ত খেতে নিষেধ করেছিল। কিন্তু বীরসা জানত তাকে ওরা জীবন্ত তাকে বার হতে দিবে না। বীরসা যে ভগবান নয়, তার প্রমাণের জন্য তার লাশ জ্বালিয়ে দেবার হুকুম ছিল। আর লাশ জ্বালিয়ে দিলে জেকবরা আর লাশ কাটার দাবি জানাতে পারবে না।

বীরসার মৃত্যুতেই বিদ্রোহ শেষ হয় না

১৯০০ সালের ৯ই জুন রাঁচি জেলে সকাল ন-টা দশ এ বীরসার মৃত্যু ঘটে। এখানে কাহিনী শেষ হয়নি। ঔপন্যাসিক এর পরেও 'উপসংহার' টেনেছেন। জন্ম-মৃত্যুর মধ্যে দিয়েই বজায় থাকে চলমানতা। যেখানে স্থিতি, সেখানেই সব শেষ হয়ে যায়। একজনের শূন্যস্থান পূরণ করতে আর একজনের আবির্ভাব ঘটে। তেমনি,কোন নেতার মৃত্যুতে বিদ্রোহ থেমে যায়না; সেই জায়গা পূরণ করতে অপর নেতার আবির্ভাব ঘটে।

"কালা-কালান্তরে উত্তরাধিকারের ধারাপথে অব্যাহত থাকে অগ্রগতি। বিদ্রোহ থেকে জন্ম নেয় বিপ্লব। আমার উপন্যাসের সমাপ্তির পরেও তাই সংযোজন করতে হয় পরিশিষ্ট।"[১৪৬]

অমূল্যর নোটবই আর ব্যারিষ্টার জেকবের সহায়তায় পরিশিষ্টটি জ্ঞাত হয়। সাক্ষ্য প্রমাণের অভাবে নিরপরাধ মুন্ডাদের খালাস করে দেওয়া হয়। কিন্তু গয়া মুন্ডা, তার ছেলে ও সুখারাম মুন্ডাকে ফাঁসির হাত থেকে বাঁচানো যায় না। ওদের ফাঁসির পর অমূল্য চাকরিতে ইস্তাফা দেয়। সে দেখেছিল বীরসার মা করমিকে - যে বীরসার ফিরে আসার প্রতীক্ষা করতে করতে একদিন পাথর হয়ে যাবে। সেই জংলী পরিবেশে বসে অমূল্যর মনে হয় - "পরাজয়ে সংগ্রাম শেষ হয় না। থেকে যায়, কেননা, মানুষ থাকে, আমরা থাকি।" [১৪৭]

বীরসার মন্ত্র, বীরসার প্রেরণা, কারাগারে জন্তুর মত আবদ্ধ মুন্ডাদের মধ্যে সঞ্চারিত ছিল। বীরসার মৃত্যুতে যে বিদ্রোহ শেষ হবে না বরং আরো ছাড়িয়ে পড়বে-'অনেক রেশম পোকা'র মতো- এই ইঙ্গিত এখানে রয়েছে। ইতিহাসের কথা স্মরণ করলে দেখতে পাই বীরসা মুন্ডার আন্দোলন ব্যর্থ হয়নি।

পাঁচ) অদ্বৈত মল্লবর্মণ (১৯১৪-১৯৫১)

'তিতাস একটি নদীর নাম' উপন্যাসটি কালজয়ী হলেও দীর্ঘ জীবন লাভ করেন নি এর স্রষ্টা অন্ত্যজ সম্প্রদায়ের অন্তর্গত অদ্বৈত মল্লবর্মণ। ১৯১৪ সালে অবিভক্ত ত্রিপুরা রাজ্যের ব্রাহ্মণ বাড়ি শহরের (বর্তমান বাংলাদেশে) তিন মাইল দক্ষিণ পশ্চিমে তিতাস-পারের গোকর্ণ গ্রামে এক দরিদ্র মৎসজীবী পরিবারে তাঁর জন্ম হয়। অধর চন্দ্র মল্লবর্মণের চার সন্তান- তিন ছেলে ও এক মেয়ে এবং অদ্বৈত মল্লবর্মণ দ্বিতীয় সন্তান। শৈশবেই তাঁর বাবা, মা এবং দুই সহোদরের মৃত্যু হয়। এবং তাঁর মৃত্যু হয় ১৯৫১ সালে ১৬ই এপ্রিল।

ব্রাহ্মণ বাড়িয়া মাইনর স্কুলে অদ্বৈতর পড়াশুনার সূত্রপাত, ইস্কুলে তিনি ছিলেন ফার্স্ট বয়। প্রথম শ্রেণীতে ম্যাট্রিক পাশ করে আই. এ. পড়তে যান কুমিল্লার ভিক্টোরিয়া কলেজে। দরিদ্র মালো পরিবারে পিতৃ-মাতৃহীন সন্তানের পক্ষে বংশগত পেশা ছেড়ে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষাগত যোগ্যতা অর্জন করা কত দূর কষ্টসাধ্য হয়েছিল তা সহজেই অনুমেয়।

বালক বয়স থেকেই কবিতা লিখে, স্কুলের দেওয়াল পত্রিকায় লেখা ছাপিয়ে অদ্বৈত নাম করেছিলেন। ক্রমে 'মাস-পয়লা', 'খোকাখুকু', 'শিশুসাথী' প্রমুখ ছোটদের পত্রিকায় ও বেশ কয়েকটি আঞ্চলিক পত্র-পত্রিকায় নিয়মিতভাবে তাঁর কবিতা প্রকাশিত হতে থাকে।

সংক্ষিপ্ত জীবনে অদ্বৈত মল্লবর্মণের প্রকাশিত গ্রন্থের সংখ্যা বেশি নয়। মৃত্যুর আগে তাঁর একটি মাত্রই বই 'ভারতের চিঠি পার্ল বার্ককে' পুস্তিকা-গ্রন্থ- হিসাবে প্রকাশিত হয় ১৯৪৩ বা ৪৪ সালে। এছাড়া 'দলবেঁধে' নামে তার সম্পাদিত ৫০টি গল্পের একটি সংকলন ও তাঁর জীবদ্দশায় প্রকাশিত হয়। অবশ্য এতে তাঁর নিজের লেখা একটি মাত্র গল্পই ছিল। 'তিতাস একটি নদীর নাম' ছাড়াও তাঁর রচিত দুটি উপন্যাসিকার সন্ধান পাওয়া যায়-'শাদা হাওয়া' (১৯৪৮) এবং 'রাঙ্গামাটি' (১৯৬৪)।

ক) তিতাস একটি নদীর নাম

একটি স্বতন্ত্র পদক্ষেপ

অন্ত্যজ শ্রেণীর মানুষদের নিয়ে লেখা উপন্যাসগুলির মধ্যে 'তিতাস একটি নদীর নাম' উপন্যাসটি একটু স্বাতন্ত্র্য দাবি করে। বাংলা সাহিত্যে অন্ত্যজ জেলে-মালোদের নিয়ে যে সকল উপন্যাস লেখা হয়েছে তার মধ্যে,-তিতাস একটি নদীর নাম' উপন্যাসটি অন্যতম। একটি বিশেষ অঞ্চলের জীবনচিত্র এখানে ধরা পড়েছে। অন্ত্যজ মানুষের এই জনজীবন তিতাস নদীর কোলে লালিত, তিতাস পারের সংস্কৃতিতে পুষ্ট। এদের পেটের খোরাক জোগায় তিতাস নদী আর মনের খোরাক জোগায় এদের সংস্কৃতি। তাই সুখ-দুঃখের মধ্যে দিয়ে তিতাস পারের মালোরা টিকে থাকে না - বেঁচে থাকে। তিতাসের করুণাধারায় বেঁচে থাকা মালোদের সম্পদ, তাদের নিজস্ব সংস্কৃতি।

তাই মালোদের বেঁচে থাকার এই দুটি অবলম্বন একদিকে তিতাস নদীর অনুকূলতা অন্যদিকে তাদের প্রথা-সংস্কারবদ্ধ নিজস্ব সংস্কৃতি -যা তাদের এক সূত্রে গেঁথে রেখেছে। মালো জীবনের এই দুটি দিকই এখানে লক্ষণীয়। তাই তাদের জীবনের একটা সামগ্রিক চিত্র এখানে চোখে পড়ে। তিতাসের স্রোতের সঙ্গে বহমান মালোজীবনের পাকে পাকে জড়িয়ে আছে তাদের সংস্কৃতি।তাই তিতাসের বুক শুকিয়ে গেলে- মালোসংস্কৃতিতে ভাঙ্গন ধরলে-মালোদের মরণের দিন ঘনিয়ে আসে।

এখানে কোনো ব্যক্তি চরিত্রের কথা নয়, একটা সম্প্রদায়ের সামগ্রিক জীবন কথা - যার কথাকার অদ্বৈত মল্লবর্মণ। অন্ত্যজ সমাজের এই সামগ্রিক জীবনকে,দূরবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে দেখে নয়, সহানুভূতিশীল হৃদয় নিয়ে,তাদের কাছ থেকে নয়, তাদের একজন হয়ে, উপলব্ধি করেছিলেন- এই মালো সম্প্রদায়ভুক্ত লেখক অদ্বৈত মল্লবর্মণ। এই মালো সমাজে যে মানুষটির জন্ম ও বেড়ে ওঠা, যাঁর রক্তে মিশে আছে মালোদের ঐতিহ্য সংস্কার, যাঁর অভিজ্ঞতার ঝুলিতে ভরে আছে, মালোজীবনের সুখ-দুঃখের ইতিহাস-তিনি যখন উপন্যাস লেখেন তখন ঔপন্যাসিকের অন্তর্দৃষ্টি জীবনের প্রতিটি স্পন্দনকে ছুঁয়ে ছুঁয়ে যায়। কারণ এ যে নিজের মনের কথা বলার মতো, নিজের চরিত কথা লেখার মতোই তথ্যনিষ্ট ও আন্তরিক।

নদীর সঙ্গে মালোদের নাড়ির টান। নদীর বুকেই তাদের সুখ-দুঃখের ইতিহাস জড়ান। নদীর আনুকূল্যে জীবন আর নদীর প্রতিকূলতায় মরণ। জন্ম-মৃত্যু-বিবাহকে কেন্দ্র করে, মানুষের সাধারণ জীবন, এই বিশেষ অঞ্চলের প্রথা, সংস্কৃতির অপূর্ব বর্ণনা, তিতাস নদীর সঙ্গে তাদের যেন জন্ম-জন্মান্তরের সম্পর্ক, নদীর অনুকূলতায় তাদের শান্তিময় জীবনযাত্রা, দুঃখ আছে, দারিদ্র আছে কিন্তু বাইরের জগতের কোন উৎপত্তি ছিলনা তিতাস পারের মালো জীবনে। যেদিন নগরজীবনের সস্তা চটক ও কৃত্রিমতা দেখা দিল এদের জীবনে- সেদিন নদীর বুকেও চর জেগে উঠল- আর সেই দিনই মালোরা তাদের জীবনছন্দ হারিয়ে ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়ল। অন্ত্যজ সম্প্রদায়ের মানুষকে নিয়ে, তাদের সংস্কৃতির এমন স্বয়ংসম্পূর্ণ রূপ তুলে ধরে মহাকাব্যোচিত উপন্যাস সৃষ্টি বাংলা সাহিত্যে দ্বিতীয়টি নেই।

'তিতাস একটি নদীর নাম' উপন্যাসটি শুধু অনন্যতাই দাবি করে না, অন্ত্যজ মানুষের অন্ত রের ছবিটিকে স্পষ্ট করে তোলে, উপন্যাসের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে এদের হৃদয়ের স্পন্দন শোনা যায়। একটি মানবগোষ্ঠীর জীবনযাত্রার স্বয়ং সম্পূর্ণ চিত্র, তাদের জীবনের ট্র্যাজিক পরিণতি-সব মিলিয়ে উপন্যাসটিকে একটা আলাদা মাত্রা এনে দিয়েছে। এখানে আলাদা করে কোনো চরিত্র নয়- এটি একটি সম্প্রদায়ের সুখ-দুঃখের রোজনামচা, যা থেকে আমরা এই সম্প্রদায়ের প্রতিটি মানুষের অন্তরের কথা জানতে পারি; তাদের সংস্কৃতির ধারাটিকে চিনে নিতে পারি।

মালোদের উত্থান-পতনে তিতাসের ভূমিকা

তিতাস নদীর তীরে অবস্থিত মালোদের জীবন যাত্রার উত্থান পতন, সুখ-দুঃখময় জীবনের কথা এই উপন্যাসে বিবৃত । নদীর স্রোতের জোয়ার-ভাঁটার মতোই এদের জীবনে ঘটে সুখ-দুঃখের

জোয়ার ভাঁটা। তিতাস নদীর জলস্রোত তিতাস পারের মালোদের রক্ত স্রোতে মিশে গেছে। তাই তিতাসের মরণের অর্থ-এদেরও মরণ। উপন্যাসের শুরুতে দেখা যায়, সমাজের পায়ের তলায় পিষ্ট মানুষগুলির প্রতি তিতাসের অসীম করুণা। সমাজের উঁচুতলার মানুষের দ্বারা প্রতিনিয়ত অত্যাচারিত এই মানুষগুলির প্রতি প্রকৃতিও সময় বিশেষে নির্দয়। কিন্তু তিতাস এদের সুখ-দুঃখের সঙ্গী। এখানে সুখও যেমন আছে, দুঃখও আছে- আবার দুঃখকে অতিক্রম করার উপায়ও আছে। কিন্তু প্রকৃতি প্রতিকূল হলে মানুষের মতো তিতাসও হয়ে পড়ে অসহায়। তখন দুঃখকে অতিক্রম করার আর কোন উপায় থাকে না; মালোদের বেঁচে থাকার আশ্বাসটুকুও থাকে না। তিতাসের প্রাণস্পন্দন তিতাস তীরের মানুষকে এই ভাবেই বাঁচিয়ে রাখার চেষ্টা করে। ঔপন্যাসিক এখানে নদীর সঙ্গে মানুষের এক অচ্ছেদ্য সম্পর্ক গড়ে তুলেছেন।

তিতাসের চরিত্র তিতাসপারের সাধারণ মানুষগুলির মতোই। তিতাস মাঝারি নদী। মেঘনা পদ্মার বিভীষিকা তার মধ্যে না থাকলেও-'তার কূল জোড়া জল, বুকভরা ঢেউ, প্রাণ ভরা উচ্ছ্বাস।' "দুষ্ট পল্লী বালক তাকে সাঁতরাইয়া পার হইতে পারে না। আবার ছোট নৌকায় ছোটবউ নিয়া মাঝি কোনওদিন ওপারে যাইতে ভয় পায় না।" "তিতাস শাহী মেজাজে চলে। তার সাপের মত বক্রতা নাই, কৃপণের মতো কুটিলতা নাই। কৃষ্ণপক্ষের ভাঁটায় তার বুকের খানিকটা শুষিয়া নেয়, কিন্তু কাঙ্গাল করে না। শুক্লপক্ষের জোয়ারের উদ্দীপনা তাকে ফোলায়, কিন্তু উদ্বেল করে না। ... তার তীরে বড় বড় নগরী বসানো নাই। সত্তদাগরের নৌকারা পাল তুলিয়া তার বুকে বিচরণ করিতে আসে না। ভূগোলের পাতায় তার নাম নাই।... ঝরণা থেকে জল টানিয়া পাহাড়ি কুলেদের ছুঁইয়া ছুঁই উপল ভাঙিয়া নামিয়া আসার আনন্দ কোনও কালে সে পায় নাই। অসীম সাগরের বিরাট চুম্বনে আত্ম বিলয়ের আনন্দও কোনও কালে তার ঘটিবে না।" [১৪৮]

তিতাস পারের ইতিহাস হল, সাধারণ মানুষের সুখ-দুঃখের ইতিহাস। "মায়ের স্নেহ, ভাইয়ের প্রেম বৌ-ঝিয়েদের দরদের অনেক ইতিহাস এর তীরে তীরে আঁকা রহিয়াছে। সেই ইতিহাস কেউ জানে, হয়ত কেউ জানে না। তবু সে ইতিহাস সত্য।"[১৪৯]

তিতাস কিন্তু এমন নিষ্ঠুর নয়। তাই তিতাস পারের মালোরা রাতবিরেতে যখন জাল নিয়ে নদীতে যায় তখন মালোবৌদের কোন চিন্তা থাকে না। কারণ মেঘনা-পদ্মার মতো ভীষণ নদীতে যেমন পারভাঙার ভয়, নৌকা ডোবার ভয়, কুমীরের ভয়-এখানে সেই ভয় নেই।

নদীর চলার সঙ্গে মানবজীবনের চলার ছন্দকে সুন্দরভাবে মিশিয়ে দিয়েছেন লেখক। বিশেষ করে যে মানুষগুলি জলের জীব, জলের সঙ্গে যাদের প্রত্যক্ষ যোগাযোগ-নদীর কৃপণতা-অকৃপণতায় তাদের জীবনে আসে সুখ-দুঃখ, নদীর জোয়ার-ভাঁটার মত তাদের জীবনেও আসে হাসিকান্নার জোয়ার-ভাঁটা। নদী যখন বর্ষার জলে সমৃদ্ধ হয়, তখন মালোদের সমৃদ্ধশালী করে গড়ে তোলে; আবার চৈত্রের খরার দিনে যখন নদী হয় দেউলিয়া, তখন মালোরাও দেউলিয়া হয়।

তিতাস নদীর তীরের বাসিন্দারা তিতাসের করুণায় অনেকটাই সুখী । চৈত্রের খরার বৈশাখে বাউলবাতাস যখন বৃষ্টি ডেকে আনে তখন মাঠময়দানের স্রোতধারা তিতাসে বয়ে যায়,

জলের রং হয়ে যায় গেরুয়া। সেই কাদা জলে মাছেরা অন্ধের মত জেলেদের জালে আটকায়। মালোদের আনন্দের সীমা থাকে না।

তিতাস তীরবর্তী অন্ত্যজ মালোদের সমাজিক অবস্থা

ঔপন্যাসিক অদ্বৈতমল্লবর্মণ তিতাস তীরবর্তী অন্ত্যজ মালোদের জীবনের যে চিত্র এঁকেছেন, তা রূপকথার মতোই রসমধুর। এখানে সমৃদ্ধি না থাকলেও সুখ আছে। এদের জীবনযাত্রা তেমন জটিল নয়। তাই অনন্তর মাকে গোকর্ণ ঘাটের বাসিন্দারা বিনা দ্বিধায় গ্রহণ করেছিল। কালোবরণের মা সস্তায় ঘর ছেড়ে দিয়েছিল। গ্রামের অন্যান্য বধূরা তাকে ভাল মনেই গ্রহণ করেছিল। সুবলার বউ তাকে জীবিকা সংস্থানের পথ দেখিয়েছিল। এমনকি সমাজিক বৈঠকেও তাকে গ্রহণ করার সিদ্ধান্ত হয়েছে অনায়াসে । তার অতীত নিয়ে কারো যেন মাথাব্যাথা নেই - নেই কোনও সন্দেহ বা সংশয়। বরং 'এগাঁয়ে একজন নূতন বাসিন্দা আসিয়াছে, খবরটা যারাই পাইল তারাই খুশি হইল'- এখানে একটা সহজ সরল সমাজব্যবস্থা প্রত্যক্ষ করা যায়।

তিতাস তীরের জীবন যাত্রায় উচ্চ-নীচ ভেদাভেদ থাকলেও জেলে, কৃষক এই অন্ত্যজ মানুষদের মধ্যে একটা সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক তুলে ধরা হয়েছে। এমনকি হিন্দু মুসলমানের ভেদাভেদও যেন এখানে মুছে গেছে-আন্তরিকতার ছোঁয়ায়। সেই রকমই চিত্র চোখে পড়ে- কাদির ও বনমালীর আচরণের মধ্যে বা রামপ্রসাদ বাহারুল্লার আলাপ চারিতার মধ্যে দিয়ে।

কাদিরের আলুর নৌকা যেদিন সলিল সমাধির হাত থেকে বাঁচায় ধনঞ্জয় ও বনমালী, সেদিন জেলে জেলে নৌকার প্রশস্ত 'ডরা' তে বোঝাই হয় কাদিরের সকরকন্দ আলু। কাদির-বনমালী একই নৌকার ছইয়ের তলে। কাদিরের সাদাদাড়ি বেয়ে জল ঝড়ে পড়ে বনমালীর গায়ে। সে মুছে দেয় বনমালীর কাঁধে পড়া জল। বনমালীর বড় ভাল লাগে। কোথায় যেন তার সঙ্গে যাত্রা বাড়ির রামপ্রসাদের সাদৃশ্য আছে। হয়তো এই দাড়িটিই সাদৃশ্যের কারণ। তার মনে হয়, রামায়ণ-মহাভারতের মুনি-ঋষিদের উত্তরাধিকারী যেমন রামপ্রসাদ, তেমনি মিয়াও যেন পীর পয়গমবরের মতো। তার মনে হয় "বাস্তবিক যাত্রাবাড়ির রামপ্রসাদ, বিরামপুর গাঁয়ের এই কাদির মিয়া- এরা এমনি মানুষ, যার সামনে হোঁচট খাইলে হাত ধরিয়া তুলিয়া অনেক কাঁটা ঘেরা পথ পার করাইয়া দিবে।"

সমাজে উচ্চবর্গ ও নিম্নবর্গ অর্থাৎ অন্ত্যজ সম্প্রদায়ের মানুষের পারস্পারিক ভেদাভেদের রূপটি এই উপন্যাসের দু-এক স্থানে ধরা পড়েছে। ভরতের বাড়ির সমাজিক বৈঠকের চেহেরাটি প্রথমেই দৃষ্টি আকর্ষণ করে - "উঠান জুড়িয়া পাল খাটানো। মাঝখানে উত্তম বিছানায় বসিয়াছে পাড়ার গণ্যমান্য লোক কয়জনা। তাদের সবাই বড় - কেউ টাকার জোরে, কেউ গায়ের জোরে, ভাইয়ের জোরে, কেউ বুদ্ধির জোরে। তবে যাদের বিচারবুদ্ধি বা উপস্থিত কিংবা কথার প্যাঁচ খাটানো প্রতিভা আছে, সকল বৈঠকে তাদের প্রাধান্য।... আসরের চারিধারের আর যত সব নর-নারায়ণ তারা কেবল কথা শোনার লোক, তামাক টানার লোক।"

বৈঠকের নর-নারায়ণের মধ্যে একজন হল তামসীর বাপ। বৈঠকের কোন কথায় তার কাছে পৌঁছায় না। কারণ সে আত্মমগ্ন হয়ে আছে তার চিন্তার, সে জানে,তার কথা বৈঠকে উঠবে- সে অপরাধী- তার বাড়ি বাজারের কায়েতদের আনাগোনা, সেও স্বীকার করে নিয়েছে যে, সে অপরাধী। সে ভেবেছে- পাড়ার মধ্যে ঐক্য রাখা ও পাড়ার স্বার্থ দেখাই প্রথম কর্তব্য। মালোদের ঐক্য নিয়েও কথা ওঠে বৈঠকে। তাদের মধ্যে একতা আছে বলেই- তারা 'যেখানে যায়, আ-পথে পথ হয়, আ-বাজারে বাজার হয়।' এই একতা ভাঙতে চলেছে তমসীর বাপ নিজে। অথচ সে এইসব ভদ্রলোকদের সম্বন্ধে জানে- "...তারা আমার কে? তারা মালোদের ঘরে নেয়না, মালোরা কোনও জিনিস ছুঁইলে সে জিনিস তারা অপবিত্র মনে করে। পূজা-পার্বনে মালোরা তাদের বাড়ির প্রসাদ খাইলে এঁটো পাতা নিজে ফেলিয়া আসিতে হয়। সে পাতা ওরা ছোঁয় না, জাত যাইবে। এরা মালোদের কত ঘৃণা করে।মালোরা লেখাপড়া জানে না, তাদের মতো ধুতি চাদর পরিয়া জুতা পায়ে দিয়া বেড়ায় না। কিন্তু তাই বলিয়া কি তারা ছোঁওয়ারও অযোগ্য? মালোরা মালো বলিয়া কি মানুষ নহে।" অন্ত্যজ মানুষদের কাছে এইটাই হল সবচেয়ে বড় প্রশ্ন। স্ব-সম্প্রদায়ের এই অব্যক্ত বেদনাটি লেখকের লেখনীতে ব্যক্ত হয়েছে।

তামসীর বাপের এই ভাবনাটি যথেষ্ট সঙ্গত। কিন্তু সে নিরুপায়। এ ব্যাপারে দয়ালচাঁদ তাকে বুঝিয়েছে- " ভাবিয়া দেখ, কায়েতের সঙ্গে মিশিতেছ বলিয়া তারা তোমাকে কায়েত বানাইবে না। তুমি মালোই থাকিবে। তারা তোমার বাড়ি আসিলে যদি সিংহাসনও দাও, তুমি তাদের বাড়ি গেলে বসিতে দিবে ভাঙ্গা তক্তায়। তুমি রূপার হুকাতে তামাক দিলেও, তোমাকে দিবে শুধু কলকে খানা।"

সমাজের এই বিভেদের চিত্রটি খুব জটিল। সমাজে এই ছোট-বড়কে মাপা হয় বিভিন্ন মাপকাঠিতে। কখনও বর্ণ, কখনও অর্থ, কখনো গায়ের জোরে, কখনো সম্প্রদায়গতভাবে। এখানেও বিভিন্ন ধরণের চিত্র রয়েছে। এখানে যারা গায়ের জোরে বা টাকার জোরে বা বুদ্ধির জোরে বলীয়ান বলে পড়ার গণ্যমান্য ব্যক্তি তারা এই জোর খাটিয়ে যা-ইচ্ছে তাই করতে পারে। অবশ্য মাতব্বর হয়েও রামপ্রসাদ, বিধবা বিবাহ প্রচলনে ব্যর্থ হয়েছে- সে ক্ষেত্রে অবশ্য ব্রাহ্মণ পন্ডিত চক্রবর্তীর পুরোহিত দর্পনের প্রভাব আছে। সেক্ষেত্রে রামপ্রসাদ মালো অতি তুচ্ছ। মাতব্বর হলেও মালো তো বটে ! তাই মনে হয় সমাজের এই অসাম্যের রূপটি অত্যন্ত জটিল।

একটা কথা খুবই ভাবিয়ে তোলে যে, মানুষ নিয়ে গঠিত সমাজ অথচ সামাজিকতার ক্ষেত্রে এই অসাম্য। এই অসাম্য মানুষের উৎপত্তির সময় থেকেই চলে আসছে। এর সমাধান হয়তো হবেও না। কিন্তু রবীন্দ্রকথিত একটি মূল্যবান বাক্য হয়তো দৃষ্টিনন্দন কোনো সমাধান করতে পারে, "...সমাজের উদ্দেশ্যই এই যে, পরস্পরের পার্থক্যের উপর সুশোভন সামঞ্জস্যের আস্তরণ বিছাইয়া দেওয়া।"

কিন্তু কি উচ্চ-নীচ, কি হিন্দু-মুসলমান, কি ব্রাহ্মণ-শূদ্র-আমরা এই সামাজিকতার মুখোশটিও পরে থাকতে পারি না। তাই দেখা যায় - অন্ত্যজ সম্প্রদায়ের কিছু মানুষ এ ব্যাপারে সচেতন হলেও

অনেকেই এ ব্যাপারে অভ্যস্ত। তিতাসের সমাজে ও দেখা যায় কাদির মিয়া এই ব্যবধানকে স্বীকার করে নিলেও - কাদির পুত্র সেই ব্যবধান মানতে পারছে না। সে অনেক বেশী সচেতন, অনেক বেশী আত্মমর্যদাবোধ সম্পন্ন।

তিতাসের অন্ত্যজ মালোদের জীবনে এছাড়াও ছিল প্রবলের অত্যাচার। কিন্তু মালোদের একতার ফলে এই অত্যাচার ভীষণ আকার ধারণ করতে পারেনি।

অন্ত্যজ মালোদের সমস্যার আর একটি ইঙ্গিত পাওয়া যায় - সামাজিক বৈঠকে আলোচিত-বাজার বসিয়ে জমিদারের তোলা আদায়-এর বিষয়টি। অন্ত্যজ মানুষদের প্রতিবাদের একটি অভিনবরূপ লেখক তুলে ধরেছেন। "মনের অসন্তোষ বাহিরে প্রকাশের ভাষা হয়ত ইহাদের আছে।কিন্তু প্রতিষ্ঠাহীন জীবনে সাহসের স্বভাব-সুলভ অভাবই ইহাদিগকে যুগে যুগে দাবাইয়া রাখে। তাই ইহারা আগাইয়া আসিয়া সরবে মনের অলোড়নকে ভাষা দিয়া প্রকাশ করিতে পারে না। অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের সাহস হারাইলেও অন্যায়কে এরা কোনো যুগেই হজম করিয়া নেয় না। তাই কালে কালে দেশে এরা আগাইয়া সমনে আসিতে না পারিলেও এই অব্যক্তের দল প্রতিবাদ ঠিক জানায়। কোথাও হারিয়া, কোথাও কাঁদিয়া, কোথাও শিষ দিয়া। আবার কোথাও তৈজসপত্র ভাঙ্গিয়া বা দেয়ালে মাথা ঠুকিয়া ও কেরোসিন সিক্ত বস্ত্রাঞ্চলে দেশলাই কাঠি ধরাইয়া। গোকর্ণ ঘাট গ্রামের মালোদের সাধারণ স্তরের লোকেরা মাতব্বরের অন্যায় কাজের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাইল সেদিন হুকা টানিবার ছলে অনেকে একসঙ্গে কাসিয়া।"

উত্তরায়ণ সংক্রান্তিতে পিঠে তৈরীর অনুষ্ঠানে যখন একের পর এক প্রস্তাব চলে - তখন সুবলের বউ-এর মুখে সুবলের মৃত্যুর করুণ কাহিনী শোনা যায়- "... কালোবরণের বড় নৌকায় করিয়া জিয়লের ক্ষেপ দিতে গিয়েছিল। সবুল বলিয়াছিল আমাকে ভাগীদার হিসাবে নেও। তারা বলিয়াছিল নৌকা আমাদের পুঁজি আমাদের ভাগীদার হিসাবে নিব কেন? মাসিক বেতন নিব। শুনিয়া সুবলের বউ বলিয়াছিল, তবে গিয়া কাম নাই। কিন্তু বিবাহ করিয়াছে, লোকজন খাওয়াইয়াছে। হাতের টাকাকড়ি খরচ হইয়া গিয়াছে। সামনে দুরন্ত আষাঢ় মাস। এই দুঃসময়ে সে নিজে কি খাইবে বউকে কি খাওয়াইবে। কাজেই বেতনধারী হইয়া না গিয়াই বা কি করে!

এখন লোক যদি হয় বেতনধারী, পুঁজিদার হয় তার মালিক, তাকে সেই মালিক তখন চাকরের জ্ঞান করে।

মেঘনা নদীর মাঝখান দিয়া কালোবরণের নৌকা চলিতেছিল। এমন সময় আসল তুফান। ঈশাণ কোনের বাতাস নৌকাটাকে ঝাঁটাইয়া তীরের দিকে নিয়া চলিল। সকলে প্রস্তুত হইল তীরে ধাক্কা লাগিবার আগেই তারা লাফাইয়া নামিয়া পড়িবে এবং একযোগে ঠেলিয়া নৌকার গতিবেগ কমাইয়া আসন্ন দুর্ঘটনা নিবারণ করিবে। আগে সুবলের উপর আদেশ হইল, শীঘ্র লগি হাতে লাফাইয়া তীরে গিয়া পড়, আমরাও লাফ দিতেছি। বেতনধারী লোকের মনে মুনিবের প্রতি প্রবল একটা বাধ্যবাধকতা বোধ থাকে। তাই সুবল নামিল কিন্তু আর কেউ ভয়ে নামিল না। সুবল লগিটার গোড়াটা নৌকার দিকে ছুঁড়িয়া, মাঝখানটাতে কাঁধ লাগাইতে গেল, তাহাতে নৌকার বেগ যদি একটু

কমে। বেগ কমিল না। নৌকা তীরে উঠিয়া আসিল। সবুল নৌকা তলায় চাপা পারিল। আর উঠিল না।" মালিকের অন্যায় হুকুম তামিল করতে গিয়ে মারা পড়ে সুবলের মত এক বলিষ্ঠ যুবক।

অন্ত্যজ মালোদের অর্থনৈতিক অবস্থা

অন্ত্যজ মালোদের সংস্কৃতির পরিবর্তন ঘটার সঙ্গে তিতাসের বুকে চর দেখা দিল। এই দুটি বিপর্যয়কে কেন্দ্র করে এদের আর্থ সামাজিক ও নৈতিকতার ওপর দিয়ে পরিবর্তনের স্রোত বয়ে গেল। একতার অভাব, অন্তপুরের শুচিতা হানি, মায়েদের বিলাসিতা, ছেলেদের প্রবাসযাত্রা বন্ধ হওয়া, শহর থেকে ঋণদান, কোম্পানীর আগমন এই সকল পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে এল প্রবলের নতুন ধরণের অত্যাচার। মালোদের একতার অভাব, তাদের দুর্বল করে তুলল এবং এর সুযোগ করে দিল - "এই পরাজয়ের পর মালোরা একেবারেই আত্মসত্তা হারাইয়া বসিল। তাদের ব্যক্তিত্ব, বৈশিষ্ট্য, সংস্কৃতি ধীরে ধীরে লোপ পাইতে লাগিল। তাদের একটা নিজস্ব সমাজিক নীতির বন্ধন ছিল, সেইটিও ক্রমে ক্রমে শ্লথ হইয়া আলগা হইয়া গেল। একসঙ্গে কোনও কাজ করিতেই তারা আর তেমন জোর পাইত না।"

এই সমাজ একদিন দুরঙা প্রজাপতির মতো দ্বিধাবিভক্ত হয়ে যায়, বাইরের জগতের অভিঘাতে। তেলি পাড়ার সঙ্গে মালোপাড়ার বিবাদের সূত্রপাত-মালোপাড়ার তামসীর বাপকে ঘিরে। তার সঙ্গে বামুন কায়েতপাড়ার লোকেদের যোগাযোগ। তেলিপাড়ার লোক মালোপাড়ার অন্তঃপুরের শুচিতা নষ্ট করতে উদ্যোগী । বিহিত করার কেউ নেই। রামপ্রসাদ মালো বিধবা বিবাহ চালাতে গিয়ে মালোদের দ্বারা জব্দ আর দয়ালচাঁদ নিজেই যাত্রাওয়ালার দিকে। "সুবলের বউ-এর মধ্যে বিপ্লবী নারী বাস করে। সে দমিতে জানে না।

'মহনের মা, এই গাঁওয়ের মাইয়া আমি, বিয়া হইছে এই গাঁওয়ে। আমি নি ডরাই বাজাইরা লোকেরে গো।' ... 'আমি সব পারি। আর কিছু না পারি আগুন লাগাইয়া গাঁও জ্বালাইয়া দিতে পারি।'...'অপমানের বাঁচনের থাইক্যা সম্মানের মরণ ও ভালা।" সুবলার বৌ-এর কথাগুলি মালো ছেলেদের অনুপ্রাণিত করে এবং তেলিপাড়ার তিনজন লোককে মারে। মালোদের হাতে না মেরে ভাতে মেরে প্রতিশোধ গ্রহণের সংকল্প গৃহীত হয়।

দ্বিধাবিভক্ত সমাজে একতার অভাব মালোসম্প্রদায়কে দুর্বল থেকে দুর্বলতর করে। প্রবলের অত্যাচার মাথা পেতে নিতে হয়। অন্যায়ের প্রতিবাদ করার জোর তারা হারিয়ে ফেলেছে। গ্রামীণ ধনী ব্যক্তি কর্তৃক মালোদের উপর অত্যাচার; চক্রবৃদ্ধি হারে সুদ আদায়; আসল আদায়ের জন্য তাদের উপর পাশবিক অত্যাচার; তাদের ঘটিবাটি, সূতা-হাঁড়ি, জালের পুঁটলি সর্বস্ব নিয়ে পথে বসিয়ে চলে যায়।

মালো সম্প্রদায়ের বিপর্যয়কে আরো ঘণীভূত করে তোলে তিতাসের বুকে জেগে ওঠা চর। কৃষকদের সঙ্গেও তাদের সংঘর্ষ ঘটে। তিতাসের বুকে জেগে ওঠা মাটির দখল নিতে চায় কৃষকেরা। এই অন্যায়ের প্রতিবাদ করা যায় না, একতার অভাব। দুর্বল মালোদের মুখে শোনা যায় অন্য কথা-

"গাঙ শুখাইয়া জল গিয়াছে, তার সঙ্গে আমরাও গিয়াছি, এখন মাটি নিয়া কামড়া-কামড়ি করিতে আমরা যাইব না।" সেদিন যারা প্রতিবাদ করতে গিয়েছিল- তারা আর ফিরে আসেনি। এমনকি করমালী ও বন্দে আলীর মতো ভূমিহীন চাষীও মার খেয়ে এসেছিল। যারা তিতাসের বুকে ভেসে ওঠা জমির মালিকানা পেল-তাদের টাকার জোর অনেক বেশী।

তিতাসের নিষ্ঠুরতায় মালো সমাজের বিপর্যয় অচিন্তনীয়। মহাজন গ্রামের পুকুরগুলিতে পোনার চাষ করে, আর তারা হাঁড়িতে করে সেই পোনা বাঁকে বসিয়ে বয়ে আনে এদেশে। ক্ষেপপিছু একটি করে টাকা। যে মালোদের ক্ষমতা নেই, তারা শুকিয়ে মরে। মালোপাড়ার ঘরগুলি এখনো খালি ভিটা, সারি সারি নৌকার জায়গায়, দু'একটি নৌকা; জাল শুকানোর জায়গায় গরু চরে বেড়ায়; জেলেদের ঘরগুলির স্মৃতিবহন করে- কিছু গর্ত; ভাঙা তুলসীমঞ্চে কেউ প্রদীপ দেখায় না।

মালোদের সমাজে হাজারো পরিবর্তনের মধ্যেও তারা তিতাসের করুণায় টিকে ছিল। কিন্তু - ভৌগলিক বিবর্তনের ফলে তাদের জীবনে যে বিপর্যয় নেমে এসেছে - তা অতিক্রম করার কোন ক্ষমতাই তাদের নেই - তবু তাদের সমাজে কদাচিৎ কোনো শিক্ষিত মানুষ থাকলেও যেন তারা ভরসা পায়। বনমালী যেদিন ঘটনাচক্রে শিক্ষিত ভদ্রলোক হয়ে ওঠা অনন্তর সাক্ষাৎ পায়, সেদিন তাদের দুরবস্থার কথা তাকে জানায়।

মালোদের অনেকেই সপরিবারে গ্রাম ছেড়েছে। সুবলের বৌ-এর সূতা কেউ কেনে না। সে উদয়তারার সঙ্গে গ্রামে পান সুপারিও পোড়ামাটির জিনিস বেচে অন্নের জোগার করে। যাদের সে উপায় নেই, তারা পথের ভিখারী। এ দৃশ্য 'হাঁসুলীবাঁকের শেষ অংশের সুচাঁদ বুড়িকে মনে পড়ায়। মালোদের অবস্থা সত্যিই জল ছাড়া মাছের মতো। তাদের জীবন-নদীতে যেন ভাটা পড়েছে। কিছু মালো মরে বেঁচেছে কিন্তু যারা বেঁচে মরে রয়েছে মৃত্যুর অপেক্ষায়-তাদের অবস্থা মর্মান্তিক। মরে গেছে -বাসন্তীর বাবা-মা, বনমালী, মোহনের বাপ।সুবলের বউ উঠতে পারে না, অনন্তবালা গ্রাম ছেড়ে চলে গেছে। বনমালীর মৃত্যু ঘটে কাদিরের ঘরের সামনে। সে মর্মান্তিকভাবে পড়ে মরে যায়। কাদির তার ধানের গোলা খুলে দেয়, মালোদের জন্য। অনন্ত ফিরে আসে, সেই ধান সে পৌঁছে দেয় গ্রামে গ্রামে।

এরপরের দৃশ্যে মালোপাড়ায় বেঁচে থাকতে দেখা যায় দুজন-রামকেশব আর বাসন্তী। তারা সরা হাতে টলতে টলতে এসে দাঁড়ায়। একজন বাবু সেই ভাত সরায় তুলে দেয়। বাবুটি হল অনন্ত। বাসন্তী মুখ লুকিয়ে ভাত নিয়ে চলে যায়।

অন্ত্যজ মালোদের উত্তরণে অনন্তর ভূমিকা

মালোদের বিপর্যয়ের দিনে, মালোদের শিক্ষিত ছেলে তাদের আশা-ভরসা। তাই অনন্তর কাছে বনমালীর কথাগুলি অভিযোগের মতোই শোনায়- "সে কি জানে না তিতাস নদী শুখাইয়া গিয়াছে, মালোরা জল ছাড়া মীনের মতো হইয়াছে। খাইতে পায় না। মাথারও ঠিক নাই। অনন্ত লেখাপড়া শিখিযাছে, সে কেন আসিয়া গরমেন্টের কাছে চিঠি লিখিয়া, মালোদের একটা উপায় করিয়া দেয় না।"

গ্রামের লোক, বিশেষ করে স্ব-সম্প্রদায়ের লোক লেখাপড়া শিখলে অশিক্ষিত দীনহীন অত্যাচারিত মানুষগুলির তার প্রতি অনেক আশা থাকে। বনমালী সেই আশা নিয়েই কথাগুলো বলেছিলো অনন্তকে এবং সে যে ব্যর্থ হয়নি- তা অনন্তর প্রত্যাবর্তনে স্পষ্ট। শিক্ষার ছোয়ায় ভদ্রলোক হয়ে ওঠা অনন্ত, অন্ত্যজ সমাজ থেকে উত্তরণের দৃষ্টান্ত।

অনন্তর জন্ম মালোদের ঘরে কিন্তু তার পিতৃপরিচয় রহস্যাবৃত । তার শৈশবের একমাত্র আশ্রয় তার মা- সেই মায়ের প্রতি সে শ্রদ্ধাশীল কিন্তু পিতৃ-পরিচয়হীনতা তার হৃদয়ের গভীরে একটা অব্যক্ত বেদনার মতো সঞ্চিত- "বাপ নামক পদার্থটা যে কি, অনন্ত, তাহা কিছু কিছু বুঝিতে পারে। এই পাড়ার সমবয়সী অনেক ছেলেরই বাপ নামক যে একটি লোক আছে। বাজারের ঘাট হইতে ছোলা ভাজা মটর ভাজা বিস্কুট কমলা কিনিয়া দেয়। সকালে রাতের জাল বাহিয়া আসিয়া কারে বা কোলে নেয়, কারে বা চুমু খায়, কারে বা মিছিমিছি কাঁদায়। দুপুরে নিজ হাতে তেল মাখাইয়া তিতাসের ঘাটে নিয়া স্নান করায়। পাতে বসাইয়া খাওয়ায়। মাছের ডিমগুলি বাছিয়া বাছিয়া মুখে তুলিয়া দেয়। এসব অনন্তর একদিনের দেখা অভিজ্ঞতা নয়। অনেকদিন দেখিয়া মনে মনে পর্যালোচনা করিয়া তবে সিদ্ধান্তে আসিয়াছে যে, বাপেরা এসব করে ! আরো দেখিয়াছে মালো পাড়ার ছেলেদের গায়ে যে লাল-নীল জামা, এ সবও ঐ বাপেরাই কিনিয়া দেয়। যাদের বাপ আছে তারা শীতে কষ্ট পায় না। অনন্ত শীতে কষ্ট পায় তার বাপ নাই বলিয়া।" কিশোর ও অনন্তর মা-এর মৃত্যুর পর সত্যিকারের পিতৃমাতৃহীন অনন্ত আশ্রয় পায় তার মাসী- বাসন্তীর কাছে। মাসীর স্নেহের আশ্রয় ও বেশিদিন তার ভাগ্যে সহ্য হয় না- নবীননগরে বনমালীর বোন উদয়তারার কাছে আশ্রয় লাভ করে।

মালো সমাজে জন্ম নিলেও, অনন্ত আর পাঁচটা মালোছেলের থেকে আলাদা। প্রতিকূলতার মধ্যেই তার জন্ম এবং মায়ের মৃত্যুর পর, প্রতিকূলতার সঙ্গে লড়াই করে তার বেড়ে ওঠা,এই পরিবেশে। কল্পনাপ্রবণ, সুদূরের পিয়াসী, চিরচঞ্চল মনটি মালোজীবনের গন্ডীর মধ্যে আবদ্ধ নয়, এ মন নদীর স্রোতধারার মতো শুধুই বয়ে চলে, কোনো মালিন্য তাকে স্পর্শ করতে পারে না। অনন্ত যে পরিবেশ ও পরিস্থিতির মধ্যে দিয়ে বেড়ে উঠেছে-সেই পথ মোটেও সুগম নয়। সে জীবনের প্রতিটি পদক্ষেপে কঠিন বাস্তবের সম্মুখীন হয়েছে-বাস্তবে তার না-পাওয়ার বেদনাকে নিজের মতো করে উপলব্ধি করেছে।

মাসীর কাছ থেকে বিতাড়িত অনন্ত জীবনে প্রথম মুক্তির স্বাদ পায় 'অন্তহীন আকাশের তলায়, কারো পিছুর ডাকে সে সাড়া দিবে না'। কিন্তু তাকে ক্ষণিকের আশ্রয় লাভ করতে হয় উদয়তারার কাছে। অনন্তবালা তাকে জোর করে ধরে রাখার কথা বললে, সে বলে - "হে, আমাকে বাঁধিয়া রাখিবে। এক সময় হুট করিয়া কোথায় চলিয়া যাইবো, জানিলেতো।" এই বন্ধনহীন জীবনে মুক্তির দ্বার উদ্‌ঘাটিত হয় - লেখাপড়া শেখার বাসনা বৃহত্তর জগতের সন্ধান দেয়। তিতাসপাড়ের মালোদের লেখাপড়া সম্বন্ধে সচেতন রূপ পায় অনন্তর শিক্ষালাভের মধ্য দিয়ে। মালো সমাজে শিক্ষা সম্বন্ধে অজ্ঞতা ও ভীতির ব্যাপারটি লক্ষ্য করা যায় কাদির মিয়ার কথায়। কাদির তার নাতি রমুকে

মক্তবে পাঠাবে না- পাচনে হাতে গরুর পিছনে পিছনে মাঠে পাঠাবে। তার অভ্রান্ত ধারণা, লেখাপড়া শিখলে, অর্থলোভী, ঘুষখোর, সুযোগ সন্ধানী মানুষ তৈরী হবে তার নাতি-যেহেতু তার মুহুরি বেয়াই লেখাপড়া জানা লোক-তাই লেখাপড়া শিখলে তার নাতিও জোচ্চুরি করে লোক ঠকাতে শিখবে। কিন্তু ছাদির বলে- 'তারে কিতাব হাতে দিয়ে মক্তবে পাঠাইবো' পুত্র ও পুত্রবধূর ইচ্ছায় শেষে কাদিরকে এ ব্যাপারে সম্মত হতে হয়। ছাদির বুঝেছে-লেখা পড়া না শিখলে- 'দুনিয়ার হাল-অবস্থা কিছুই জানিতে পারিবে না। মানুষ হইতে পারিবে না'।

অনন্তর লেখা পড়ার প্রথমপাঠ শুরু হয় নবীননগরে গোঁসাই বাবাজীর কাছ থেকে, একে একে শিশুশিক্ষা, বাল্যশিক্ষা, ধারাপাত, যুক্তাক্ষর - সব শেষ করে ফেললো অনন্ত। ছুটির দিনে সে রামায়ণ পাঠ করে শোনায় এক নাপিতানীকে।

সেই নাপিতানী একদিন অনন্তর মনে "অনির্বাণ অগ্নি জ্বালাইয়া দিল ... তুই চলিয়া যা। এখানে তোকে দ্বিতীয় শ্রেণী পড়াইয়া জেলে-নৌকায় তুলিবে। অধিক পড়া তোর হইবে না। কিন্তু তোকে আরো শিখতে হইবে, বিদ্বান হইতে হইবে। বামুন কায়েতের ছেলের মতো এলে-বিয়ে পাশ করিতে হইবে। এই তিনকোন্না পৃথিবী, চন্দ্র, সূর্য, ভূমন্ডল, সব তোকে জানিতে হইবে। সাতসমুদ্দর তের নদীর কথা, পাহাড়-পর্বত হাওর প্রান্তরের কথা তোকে জানিতে হইবে। এ সংসারে কত বই আছে। হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ বই। এক এক বইয়ে এক এক রকম কথা, তোকে সব পড়িতে হইবে, পড়িয়া সব শিখিতে হইবে।" এই অনুপ্রেরণায় অনন্ত একদিন 'তার প্রার্থিত বস্তুর সন্ধানে পথে পা বাড়াইল।'

উপন্যাসে বর্ণিত সেই অশিক্ষিতা অথচ জ্ঞান পিপাসু নারীর এই কামনা অপূর্ণ থাকে নি। ভাবতে অবাক লাগে সে কোথা থেকে এত কথা জানতে পারল - যে যাদু কাঠিতে সে অনন্তর মনকে স্পর্শ করল- তা, সে পেল কোথায়! সেই সামান্য নারীর অনুপ্রেরণায় সত্যিই একদিন অনন্ত শিক্ষিত ভদ্রলোক হয়ে উঠল এবং সত্যিকারের মানুষ হয়ে উঠল। তাই তিতাস অবক্ষয়ের সঙ্গে সঙ্গে যখন মালো গোষ্ঠীর অবক্ষয় দেখা দিল, সেদিন সে ফিরে এল ত্রাতার রূপ ধরে। মালোদের সুসন্তান যেন ফিরে এল ভরণ পোষণ করার জন্য।

এখানে ঔপন্যাসিকের ব্যক্তিজীবনের প্রসঙ্গ আনা যেতে পারে- "গোকর্ণ গ্রামের অদ্বৈত মল্লবর্মণের পাড়াটিকে ভদ্রভাবে মালোপাড়া বলা হলেও সাধারণতঃ এটি 'গাবরদের পাড়া' বলেই বহুল পরিচিতি। 'গাবর' শব্দটি সম্ভবত গামুর (মজুর) থেকে এসেছে। শ্রমবিচ্ছিন্ন 'ভদ্র' মানুষের শ্রমজীবী মালোদের শ্রমের প্রতি ব্যঙ্গ ও অবজ্ঞা থেকেই এই নামের সৃষ্টি। বিংশ শতাব্দীর (প্রায়) অন্তিমাংশে মালোদের প্রতি যখন 'ভদ্র' মানুষের এই মনোভঙ্গী তখন অদ্বৈত মল্লবর্মণের শৈশবে, এই শতাব্দীর প্রারম্ভে, তা কেমন ছিল সহজেই অনুমেয়। এরকম অবস্থায় তাঁর শৈশব স্বভাবতই ছিল সংকুচিত ও বিড়ম্বিত। তাঁর এই বিব্রত ও এক ধরণের অপরাধবোধের সলজ্জ ভঙ্গিটি স্কুল জীবনে ও কলেজ জীবনের স্বপ্নসময়ে তাঁর সতীর্থরাও লক্ষ্য করেছেন।

অনুমান করতে অসুবিধা নেই, মালো জীবনের এক বিরুদ্ধ ও বৈরী পরিবেশে তাঁর লেখাপড়া

শুরু হয়েছিল। অতঃপর অদ্বৈত ব্রাহ্মণবাড়িয়া শহরের প্রথম মাইনর স্কুলে (বর্তমানে ব্রাহ্মণবাড়িয়া উচ্চবিদ্যালয়) ভর্তি হন। এসময় মালোদের কয়েকজন পাড়ায় ঘুরে তাঁর লেখাপড়ার খরচ সংগ্রহ করেন। মালোরা যে অদ্বৈতকে চাঁদা তুলে ব্রাহ্মণবাড়িয়া শহরে পড়তে পাঠিয়েছিল তাতে ছিল তাদের বন্দী জীবন থেকে মুক্তি লাভের আকাঙ্ক্ষা ও প্রত্যাশা। অদ্বৈত যদি লেখাপড়া শিখতে পারে তাহলে তম সুখের খত বা বেপারীর হিসাব লেখাতে তাদের আর কারো পা ধরতে হবে না। বেপারীর হিসাব বা তমসুখের খত এমনিতেই তাদের জীবনকে পঙ্গু ও বিপন্ন করে রেখেছে। তার ওপর যদি ঐ হিসাবের মধ্যে ভুল তথ্য অথবা গোঁজামিল থাকে তাহলে তাঁদের বাঁচার ন্যূনতম পথও শেষ হয়ে যায়। সে জন্য অদ্বৈতর লেখাপড়া করার মধ্যে গোকর্ণের মালোরা তাদের ন্যূনতম অর্থনৈতিক মুক্তির স্বপ্ন দেখেছিল। পরবর্তীকালে একই কারণে কোলকাতার সীমিত রোজগার থেকে অদ্বৈত উপেন্দ্রবাবুর স্বপ্ন শিক্ষিতা বিধবা প্রফুল্লকে নিয়মিত টাকা পাঠাতেন যাতে তিনি মালোপাড়ার শিশু-কিশোরদের জন্য একটা ঘরোয়া বিদ্যালয় চালাতে পারেন।" [১৫০]

আর এক জায়গায় দেখতে পায়- "... তিতাস পারের অনেক মালোপারিবার উদ্বাস্তু হইয়া পশ্চিমবঙ্গে আসিয়াছে। কাজের ফাঁকে ফাঁকে অদ্বৈত কোলকাতার বাহিরে গিয়া তাহাদের দেখিয়া আসেন তাহাদের যৎসামান্য সুবিধার জন্য দেশের সঙ্গে সঙ্গে বিশ্বভারতীতে কাজ জুটাইয়া লন, আর দুই কাজের পারিশ্রমিক হইতে শাকান্নমাত্রের বন্দোবস্ত রাখিয়া বাকি সব তাহাদের মধ্যে বিলাইয়া দেন।" [১৫১]

অন্ত্যজ সম্প্রদায়ের এই সচেতনা এবং তার ফলে ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে অনুপ্রেরণা দান- যাতে তাদের ভবিষ্যতের হাতেই তাদের অভিশাপ মুক্তি ঘটে - এই ভাবনা সম্পূর্ণ বাস্তবভিত্তিক। অন্ত্যজ মালোদের এই স্বপ্নকে সফল করতে অনন্ত বিদ্যাশিক্ষা করতে চলে গিয়েছিল গ্রাম ছেড়ে শহরে। সেখানে অনন্তর বিদ্যার্জনে জীবনের কোন সংঘাতের ছবি লেখক তুলে ধরেননি। তবে যে ভাবেই হোক, অচেনা-অজানা জায়গায় অনন্ত হয়তো পরের মাকে মা ডেকে বা পরের বোনকে বোন ডেকেই তার ভরণ পোষণের ব্যবস্থা করে নিয়েছিল। শিক্ষাই তাকে ভদ্রলোক করে তুলেছিল। তিতাসের বিপর্যয়ের দিনে অনন্ত শিক্ষালাভ করে, মানুষ হয়ে এসেছে যেন পরিত্রাতার ভূমিকা নিয়ে। অনন্ত একা মালোসমাজের সমূহ বিপদে উদ্ধারকর্তা হতে পারবে না- যেমন মালো সংস্কৃতিকে ধরে রাখতে পারেনি মোহন আর বাসন্তী। কিন্তু এই প্রচেষ্টার মধ্যে দিয়েই মালোরা আশ্বাস পেতে পারে।

শিক্ষার অভাব অন্ত্যজ মানুষের এক বিরাট অভিশাপ। এই অভিশাপ মুক্তির স্বপ্ন তারা দেখেছিল অনন্তকে ঘিরে। অনন্তই যেন এদের স্বপ্ন এদের আশা-ভরসা। নিজেরা তারা আজীবন ঠকে গেছে- তাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্ম রমু-অনন্তরা। রমুকে তাই মক্তবে যেতে দেখা যায়। কিন্তু অনন্তর জ্ঞানের পিপাসা অসীম। এই শিক্ষার দ্বারা সমাজে তার উত্তরণ ঘটেছে। যার ফলে সে মালোদের বিপদের দিনে তাদের পাশে এসে দাঁড়িয়েছে। কিন্তু এই সমূহ বিপর্যয় থেকে রক্ষা করা একা অনন্তর পক্ষে সম্ভব নয় -তবু এই পথ ধরে যদি অন্ত্যজ শ্রেণীর বঞ্চনার অবসান ঘটে।

ছয়) সতীনাথ ভাদুড়ী (১৯০৬-১৯৬৫)

প্রবাসী সাহিত্যিক সতীনাথ ভাদুড়ীর জন্ম ১৯০৬ সালে এবং মৃত্যু ১৯৬৫ সালে। তাঁর প্রায় সারাটা জীবন কেটেছে প্রবাসে,সেই কারণে বোধ হয় তাঁর প্রত্যেকটি উপন্যাসের পটভূমিই বিহার। সক্রিয় রাজনীতি করা মানুষ, রাজনীতি নিয়েও লিখেছেন, অন্য বিষয়েও লিখেছেন। কিন্তু তাঁর লেখার বিষয় একটু ভিন্নধর্মী, ভাষাও ভিন্নধরণের- যেহেতু অবাঙালী বা প্রবাসী বাঙালী চরিত্র তাঁর উপন্যাসে বেশি। সেই কারণে তাঁর লেখার জনপ্রিয়তাও খুব বেশি নয়।

'জাগরী' বাংলাসাহিত্যের প্রথম রাজনৈতিক উপন্যাস। এই উপন্যাসটি বিয়াল্লিশের আগষ্ট আন্দোলনের পটভূমিকায় রচিত। তাঁর আর একটি রাজনৈতিক উপন্যাস আছে যার নাম 'চিত্রগুপ্তের ফাইল' । কাহিনীর পরিবেশনে অভিনবত্ব আছে, কারণ প্রধান পাত্রী মিনাকুমারীর আত্মহত্যা দিয়েই গল্পের শুরু। তারপর সমগ্র উপন্যাসের কাহিনী যেন উল্টো রথের যাত্রা।

'অচিন রাগিনী' 'সংকট' এবং 'দিগ্‌ভ্রান্ত'- এই উপন্যাসগুলির প্রত্যেকটি মনস্তাত্ত্বিক উপন্যাস। মনস্তাত্ত্বিক উপন্যাস তিনটির প্রাণ, তবে তার মধ্যে জটিলতম মানসিক দ্বন্দ্ব রয়েছে বোধ হয় 'অচিন রাগিনী'তে। অন্যান্য উপন্যাসের মত বিহারই এর প্রেক্ষাপট, পাত্রপাত্রীরাও বিহার প্রবাসী মানুষ, কেবল দিদিমা বাংলা দেশের মেয়ে।

সতীনাথ ভাদুড়ীর সর্ববৃহৎ উপন্যাস 'ঢোঁড়াই-চরিত মানস' যা দু'খন্ডে সমাপ্ত এবং এই উপন্যাসের পাত্র পাত্রী সবই অন্ত্যজ সমাজের যা আমাদের আলোচ্য বিষয়। এই অন্ত্যজ সমাজে বেড়ে ওঠা পিতৃমাতৃ হারা, অনাথ বালক ঢোঁড়াই নিজের বুদ্ধির জোরে কিভাবে নিজের সম্প্রদায়ের পাঁচজনের কাছে মান্য হয়ে ওঠে, কিভাবে সে কিছুটা প্রতিষ্ঠা করে বিবাহাদি করে ইত্যাদি আমাদের আলোচ্য। এখন আমরা 'ঢোঁড়াই চরিত মানস' উপন্যাস বিশ্লেষণ করে দেখব কতটা পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে বর্ণিত হয়েছে অন্ত্যজ সমাজের চিত্র।

ক) ঢোঁড়াই চরিত মানস

'ঢোঁড়াই চরিত মানস'- এর প্রেক্ষাপট

'ঢোঁড়াই চরিত মানস' উপন্যাসের ঘটনাকাল বা প্রেক্ষাপট মোটামুটিভাবে, ১৯১২ -১৯৪৫ খ্রীঃ তেত্রিশ বছরের মধ্যে আবদ্ধ।"কিঞ্চিদধিক তিরিশ বছর সময় সীমা বেছে নিয়েছেন সতীনাথ । দেশের বড় বড় রাজনৈতিক ঘটনার উল্লেখের মধ্য দিয়ে গ্রামাঞ্চলের নিস্তরঙ্গ জীবনকে গেঁথে দিয়েছেন বাইরের ঘটনাবর্তের সঙ্গে এবং দেখিয়েছেন বাইরের ঘটনার অভিঘাত গ্রামের নিশ্চেতন জীবনকে কিভাবে সচেতন করে তুলেছেন। ঢোঁড়াইয়ের জন্ম হল ১৯১১ সালে, দিল্লীর দরবারের সময়। লেখক পাদটীকায় জানিয়েছেন জিরানিয়ার প্রথম মোটরগাড়ি আসে ১৯১৩ সালে। ১৯১৭ সালে যুদ্ধের চাঁদা সংগ্রহের জন্য টুরমন বা টুর্নামেন্ট হয়েছিল, লড়াই থামার জন্য ১৯১৮ সালে ভোজ হয়।

ঢোঁড়াই যেদিন গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়েছিল সেদিন ১৯১৯ এর অসহযোগ আন্দোলন উপলক্ষে 'হাড়তাল' ছিল। সেই সময় মাস্টারসাব সরকারী চাকরি থেকে ইস্তাফা দেন, 'সাভা' হয়, 'গানহীবাবা'র বার্তা এসে পৌঁছায়। মদের দোকানে পিকেটিং হয়। কুমড়োর উপর গান্‌হীবাবার আবির্ভাব হয় - 'বিলিতি- কুমড়োর খোসায় গান্‌হীবাওয়ার মূরত আঁকা হয়ে গিয়েছে।' মাঝে মাঝে শুনি বাল্যবিবাহ নিরোধক সর্দা আইনের কথা। ১৯৩১ সালে হয় আদমসুমারী। বৌকা বাওয়া যখন অযোধ্যাজীর উদ্দেশ্যে যাত্রা করে তখন শুরু হয়েছে লবন সত্যাগ্রহের প্রস্তুতি। ১৯৩৪ সালের ভূমিকম্প বিসকন্ধা গ্রামকে তছমছ করে দিয়ে যায়। নতুন আইন অনুসারে 'বোট' বা ভোটের বার্তা নিয়ে ইতিমধ্যে গ্রামে এসে হাজির হয় মহাৎমাজীর বলন্টিয়াররা, কাংগ্রিস সরকার নতুন ভূমিসংক্রান্ত আইন পাস করায়। কিন্তু তারপরে কংগ্রেস সরকার গদিত্যাগ করে, যুদ্ধ এসে যায়। কোয়ারী টোলাতেও একদিন বলেন্টিয়রের ব্যক্তিগত সত্যাগ্রহের উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। তারপর 'আজকাল বছরে যতদিন, তত খবর, হাটে যত লোক, তত খবর'। জাপানিরা যুদ্ধে যোগ দেয়, পাকা রাস্তা দিয়ে অষ্টপ্রহর ফৌজী হাওয়া গাড়ি চলে। 'রাজ্যিসুদ্ধ লোক ঠিকাদার হয়ে উঠেছে।' এমন সময় আসে বিয়াল্লিশের আন্দোলনের খবর। মহাত্মাজীর গ্রেপ্তারের সংবাদ এসে যায়। বিসকন্ধার লোকেরা শপথ নেয়, 'এক বাপ, এক বাত'! থানাতে স্বরাজ হয়ে গেল। ঢোঁড়াই আজাদ দস্তায় যোগ দেয়। উপন্যাস শেষ হয় তখন, যখন ব্যক্তিজীবনের নিঃসীম রিক্ততায় রাজনৈতিক জীবনের ব্যর্থ হতাশায় ঢোঁড়াই কাছারিতে সরেন্ডার করতে এগোয়। এই ভাবে, ত্রিশ বছরের কিছু বেশি সময়ের পরিধির মধ্যে ভারতবর্ষীয় ব্যক্তি ও সমাজের বির্তনকে জিরানিয়ার দর্পণে বিম্বিত করেছেন সতীনাথ।" [১৫২]

'ঢোঁড়াই চরিত মানস'- এর ঘটনাকাল বেশ বিপর্যস্ত রাজনৈতিক অবস্থার মধ্যে দিয়ে প্রবাহিত। বিবাহের অনুন্নত অন্ত্যজ সমাজ বাস্তবের ঢোঁড়াই, ঢোঁড়াই চরিতের ঢোঁড়াই বা ঢোঁড়াইরাম হয়ে উঠতে পারত না। পরিবেশ তাকে টেনে এনেছে সমরাঙ্গনে।

উপন্যাসের অন্ত্যজ সমাজের পরিচয়

'ঢোঁড়াই চরিত মানস'-এ নায়ক ঢোঁড়াই যে পরিবেশে জন্ম গ্রহণ করে, ক্রমশ বিকাশপ্রাপ্ত হয়েছে - সেই পরিবেশের প্রভাব ঢোঁড়াইয়ের জীবনে কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। অন্ত্যজ তাৎমা সমাজে জন্ম গ্রহণ করে বেড়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে তার চারপাশের জগতের পরিধি যেমন বেড়েছে, তেমনি তার মনের পরিধিও বেড়েছে। তাৎমা সন্তান ঢোঁড়াই তাৎমাটুলির নিষেধ অমান্য করে, ধাঙড়টুলিতে এসেছে- রোজগারের সন্ধানে। পাক্কীতে কাজ করতে এসে সুদূরের খবর জানতে পেরেছে, এসেছে বিসকন্ধা গাঁ-এর কোয়েরী টোলায়। এরপর তার রাজনীতির জীবন শুরু। ঢোঁড়াইকে এই পরিবেশের মধ্যে রেখেই বুঝতে হবে। তাই অন্ত্যজদের যে সমাজে সে প্রতিপালিত,সেই সমাজের চিত্রটি উল্লেখ করার প্রয়োজন। অন্যদিকে কালের পরিবর্তন অন্ত্যজ সমাজের মানুষের মনে যে সচেতনতা আনছে - সে বিষয়টিও কম গুরুত্বপূর্ণ নয়।

তাৎমাদের পরিচয়

'রামচরিত মানস' - এর জীর্ণারণ্য ঢোঁড়াই চরিত মানস- এ জিরানিয়া। এই শহরের শহরতলি হল তাৎমাটুলি। তাৎমাটুলির লোকেরা একেই টাউন বলে। তাদের কাছে জিরানিয়া হল 'ভারী সাহার'। তাৎমাটুলির পশ্চিমে শিমূলগাছে ভরা বকরহাট্টার মাঠ পেরোলেই ধাঙড়টুলি। দক্ষিণে 'কারীকোশী' নদী - স্থানীয় লোকেরা বলে 'মরণাধার', বকর হাট্টার বুক চিরে কোশী শিলিগুড়ি রোড। তাৎমারা একে বলে পাক্কী।

তাৎমারা জাতে সম্ভবত তাঁতী। পেটের জ্বালায় এরা দ্বারভাঙ্গা জেলার বোকারা গ্রামের কাছ থেকে এসেছিল। এরা চাষের কাজে আগ্রহী নয়। বসবাসের জমিটুকু এবং একবেলা আহারের ব্যবস্থা থাকলেই এরা সন্তুষ্ট। এরা জোতদার ফুকন মন্ডলের কাছে আসে। ফুকন জমিদার হওয়ার বাসনায়, নামমাত্র খাজনার বিনিময়ে এদের জমিতে রাখেন। কিন্তু চিঠির কাগজে মনোগ্রাম করা - বকরহাট্টা এস্টেট, দেউড়ি ফুকনগর টেকেনি - পরিবর্তে হয়ে গেছে তাৎমাটুলি।

রোজা, রোজগার আর রামায়ণ নিয়েই তাৎমাদের জীবন, রোজা হল গুনিন। গুনিনের প্রতি এদের অগাধ বিশ্বাস, তাই রেবণগুণির মতো শয়তান এদের শ্রদ্ধালাভ করে। তুকতাক, বাণমারা, যাদুবিদ্যায় রেবণ সিদ্ধহস্ত। বিপদে-আপদে এরা রেবণের কাছে ছুটে আসে। তার ওষুধে অনেক সময় সেরে যায় বলেই তাদের বিশ্বাস - যেমন ভাবে ঢোঁড়াই সুস্থ হয়ে উঠেছিল।

রোজগার হল ঘরামির কাজ ও কুয়োর বালি ছাঁকার কাজ। প্রয়োজন না থাকলে তাৎমারা কাজের আশায় বেরোয় না। তবে কার্তিক-আঘ্রাণ মাসে তাৎমা পুরুষদের রোজগার অনিশ্চিত হয়ে পড়লে, তাৎমানিরা ধান কাটতে যায়। ফিরে আসে পৌষ মাসের শেষে। পুরুষেরা তখন সংসার সামলায়; তাদের নেশার মাত্রা বেড়ে যায়। আর দেড়মাস পর তাৎমানিরা যখন রোজগার করে ফিরে আসে, তখন পুরুষের কাছে তাদের খাতির বেড়ে যায়- 'দশমাস পুরুষ রাজা, তো দু'মাস মেয়েরাও রাজা'।

লেখাপড়া না জানলেও রামায়ণের নজির এদের কথায় কথায়। তুলসীদাস-এর 'রামচরিত মানস' - এর থেকে ২২টি শ্লোক এখানে ব্যবহৃত হয়েছে। ঢোঁড়াইয়ের বাবা ছেলেকে মানুষ করতে এই উচ্চাশা করেছিল যে, সে দশজনকে রামায়ণ পড়ে শোনাবে। ঢোঁড়াই রামচন্দ্রজীর মতোই তার নাভীকুন্ডে তিনটি রেখা নিয়ে জন্মেছিল। বোকাবাওয়া পরবর্তীকালে অযোধ্যাজীর উদ্দেশ্যে যাত্রা করে। তাৎমাটুলিতে যখন পশ্চিমাবলী রামিয়া আসে, তখন অধিকাংশ লোকের রামায়ণ পাঠে অক্ষমতা, তাকে ব্যথিত করে। ভলেন্টিয়ারের কাছে 'ঢোঁড়াইজী', 'আপনি' সম্বোধনে কৃতার্থ ঢোঁড়াইয়ের মনে হয়- "তার নিজের এক ধুরও জমি নেই, রামায়ণ ও পড়তে জানে না। কিন্তু বলন্টিয়ারজী আজ তাকে পনর বিঘা জমিওয়ালা লোকের ইজ্জত দিয়েছে, রামায়ণ-পড়া লোকের ইজ্জত দিয়েছে।" এই ভাবেই রামায়ণ এদের জীবনে ওতোপ্রোত ভাবে জড়িত।

ধাঙড়টোলার পরিচয়

ধাঙড়দের পূর্বপুরুষেরা হল ওরাওঁ । এরা পরিস্কার-পরিছন্ন ও পরিশ্রমী। এরা পরিস্কার - পরিছন্ন ও পরিশ্রমী। এরা ঠিক সময় খাজনা দেয়। বাঙালী উকিল হরগোপালবাবু কাছারি নিলামে কেশ 'পড়তী' জমি ধাঙড়দের মধ্যে বিলি করে দেন - সেই জিনিস বর্তমানে ফুলে ফেঁপে উঠেছে। ধাঙড়দের মধ্যে কেউ খ্রীষ্টান। অধিকাংশই সাহেববাড়ি মালির কাজ করে। তাৎমাদের সঙ্গে এদের চিরকালের ঝগড়া। কাজের সন্ধানে ধাঙড়েরা বাইরের জগতের সঙ্গে পরিচিত। সহজ বিশ্বাসের সঙ্গে সঙ্গে তাদের মধ্যে সন্দেহ দেখা দেয়। তারা সমাজের সুবিধাবাদী লোকগুলোর চালাকী যেন বুঝতে পারে। তারা জানে - 'মাস্টার সাব' 'বাবুভাইয়া লোক'। তাঁদের যা করা সাজে আমাদের তা সাজে না। ঐ যে সেবার 'টুরমন' এর তামাসা হল ঝিকটিহার মাঠ ঘিরে, তাতে যে রংরেজ জার্মান লড়াই হল- আমাদের ভিতরে যেতে দিয়েছিল। তোদের যেতে দিয়েছিল? 'গিরানী'র দোকানের সস্তা চাল, তোদের দিত সে সময়? এস.ডি.ও. সাহেবের সরকারী কাছারির দোকানের 'নাট্টুমার' আর পেয়ারামার্কা 'রৈলী' আমাদের দিয়েছে কোনদিন? আবার মনে সংশয়ও আছে - বাবুভাইয়া সাদা চাল খায় বলে তারা বুদ্ধি ধরে কিন্তু জুড়ো এতোয়ারী লালচাল খেয়েও বুদ্ধিমান হয় কি করে!

বিসকন্ধার কোয়েবীদের পরিচয়

কোয়েরীরা বাস করে জাত ও জমির রাজ্যে। স্বাভাবিক কারণেই তাদের জীবনযাত্রা বেশ জটিল। "গাঁয়ের প্রাণ দলাদলি। ... বড় গ্রাম, অনেক দল, অনেক স্বার্থ। বড়র নিচে মেজ, মেজর নিচে সেজ। ... সকলেরই নজর মাটির উপর জমির উপর। মাটির রস মরলে তাকায় উপরের দিকে ... এখানকার হাসিকান্না গল্পরঙ্গ তামাশা সবই চাষবাস আর জমিদারকে নিয়ে।" [১৫৩]

জাতের দোহাই আর জমির প্রতি লোভ এখানের অন্ত্যজদের জীবনসমস্যাকে আরও জটিল করে তুলেছে।

অন্ত্যজ মানুষের বিশ্বাস ও সংস্কার

অন্ত্যজ মানুষেরা খুব সহজে সবকিছু বিশ্বাস করতে জানে। তাই এদের খুব সহজেই ঠকিয়ে নেওয়া যায়। আর সেই কারণেই তাৎমারা রেবণ গুনির মতো শয়তানকে মানে রোজা হিসাবে। এই রেবণ যখন গান্‌হীবাবার প্রতি 'লোহা মানে' তখন রেবণের চাতুরি তাৎমারা বোঝে না। রেবণ মেলায় মূর্তি দেখিয়ে কিছু রোজগার করে নেয়। ধাঙডদের মনে কিন্তু সন্দেহ দেখা দেয়, গান্‌হীবাবার নতুন ভকতের দল (ছড়িদার, মহতো) সম্বন্ধে।

অন্ত্যজ সমাজের অন্তর্গত তাৎমাদের বিশ্বাসের আর একটি জায়গা হল, বৌকাবওয়া। তাৎমাটুলির বড় রাস্তার ধারে ধারে একটি প্রকান্ড অশ্বস্থ গাছের নিচে একটি সিঁন্দুর মাখানো মাটির ঢিবিকে গোঁসাই বলে মানা হয়। গোঁসাই থানে প্রতিবছর নির্দিষ্ট দিনে হাড়িকাঠে তেল সিঁন্দুর দিয়ে নিশান পোঁতা হয়। সেইখানেই বৌকাবাওয়ার বাসস্থান। ছোটবেলায় বৌকা তার মায়ের সঙ্গে ভিক্ষা

করে বেড়াত। বড় হয়ে বৌকা একদিন একটা চিমটে আর ছোট ত্রিশূল নিয়ে গোঁসাই থানে আস্তানা গাড়ে। বৌকার মাহাত্ম্য ছড়িয়ে পড়ে সর্বত্র। খড় বাঁশ দিয়ে বৌকার আস্তানা তৈরী করে দেয় লোক।

গান্‌হীবাবার প্রতি অকৃত্রিম ভক্তি এই বিশ্বাসের আর এক রূপ। রাবিয়ার বাড়ি বিলিতি কুমড়োর গায়ে গান্‌হীবাবার আঁকা মূর্তি যখন আবিষ্কৃত হল তখন তাৎমা সমাজে ঘটে গেল বিরাট ঘটনা, এই ঘটনাকে তারা ঠাকুর দেবতার অলৌকিক ব্যাপার বলেই ধরে নিল এবং তাকে রেখে এল বাওয়ার থানে। ঢোঁড়াইয়ের সরল মনের বিশ্বাস, গানহী বাওয়া, বৌকাবাওয়ার চাইতেও গুণী। না হলে কুমড়োতে আসে ! বাওয়ার থানে কুমড়ো পূজো হয়। ঢোঁড়াই ভকত তুলসীর মালা গলায় দিয়ে কুমড়ো মাথায় চলে মিলিট্রি ঠাকুর বাড়ির উদ্দেশ্যে-পিছনে চলে তাৎমারা। কিন্তু অবাক কান্ড, সেখানে মোহান্তজী সীতারামের মূর্তির পাশে গা্‌হীবাবার মূর্তি রাখতে নারজ। " যে ঠাকুর বাড়ীতে রামসীতার 'মূরত' আছে - সেখানে গান্‌হী মহারাজের 'মূরত' রাখা ঠিক নয়। তুলসীদাসজী তাই বলে গিয়েছেন- চুথিয়া সরকার!" [১৫৪]

গান্‌হীবাবার প্রতি বিশ্বাসে তাৎমারা শপথ করে - পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকবে, রবিবার গান্ধীজীর নামে সমস্ত রোজগার বন্ধ রাখবে। কামা গণেশপুরে যে বেলগাছের পাতায় গান্ধীজীর নাম লেখা - সেখানকার মাটি তুলে আনে তারা। সমস্ত নেশার জিনিস বন্ধ করে দেয় তারা । এমনকি যেখানে লবন তৈরীর স্থান সেখানে তাৎমা ও ধাঙড়রা গান্‌হীবাবার থান মনে করে প্রদীপ দেয়।

তাৎমাসমাজে কিছু সংস্কার আছে - যেগুলি তারা মনেপ্রাণে মেলে চলে। তাৎমারা কখনোও মুসুর ডাল খায় না - এক বিশেষ সময় তাৎমানিরা ছাড়া। তাদের বিশ্বাস 'অত গরম জিনিস খেলে গায়ে কুষ্ঠ হয়ে যাবে।' ঢোঁড়াইয়ের বাবার মৃত্যুর ঘটনাকেও তারা এই রূপ দেয়। তাদের ধারণা সে নিশ্চয় পেয়ারা খেয়েছিল। তাদের বিশ্বাস - আশ্বিনের পর জ্বর হয় বাতাবিলেবু খেয়ে, আর আশ্বিনের আগে জ্বর হয় পেয়ারা খেয়ে। তাদের আরও কিছু সংস্কার আছে। চড়াই পাখী না দেখা গেলে অসুখ। এর উপর বাড়িতে নম্বর দিয়ে লোকগুনে গেলে, অসুখ তো হবেই; মৃত্যুও অবশ্যম্ভাবী। কপিলরাজার বাড়িসুদ্ধ উজার হয়ে যায় - চা -চালানের বাক্স তৈরীর জন্য বকরহাট্টার মাঠের শিমূল গাছ কেটেছিল বলে। ধাঙড়টুলির বাঁশগাছে ফুল দেখা দেওয়া অমঙ্গলের ইঙ্গিত - এই বিবেচনায় পঞ্চরা শনিচরাকে গ্রাম ছেড়ে চলে যেতে নির্দেশ দেয়। বাঁশ ঝাড়টি ছিল শনিচরার এবং ১২ বছর পর অমঙ্গল ঘনিয়ে আসবে- এই ছিল আশঙ্কা। তাদের আরও বিশ্বাস, অমাবস্যার রাতে স্কন্ধকাটা ভূতের দল চলে। এছাড়াও আছে কিচিন পেতনি, শাখরেল। জোনাকি পোকা হল খোকাভূতের চোখ। জলে ডুবে মরলে 'পানডুব্বীভূত' হয়।

অন্ত্যজ মানুষের এই অজ্ঞতার সুযোগ নিয়েছে- সুবিধবাদী শ্রেণী। সংস্কারের শিকার হয়ে, শনিচারাকে তার গ্রাম-ভিটে-মাটি ছেড়ে চলে যেতে হয়েছে। এই উপন্যাসে এই ধরণের আর একটি উদাহারণ পাওয়া যায় বিসকন্ধার জাত ও জমির রাজ্যে। বিধবার সম্পত্তির লোভে তাকে 'চুমৌনা' করতে চায় তার দেত্তর গিধর মন্ডল। বিধবা সাগিয়া মোসম্মতের মেয়ে। মোসম্মতের আছে একটি তামাকের ক্ষেত। এই জমির লোভে শেষ পর্যন্ত মোসম্মতকে ডাইনি প্রতিপন্ন করা হয়।

অন্ত্যজ মানুষের এটি আর এক কুসংস্কার। মানুষকে ডাইনি সন্দেহে নির্যাতন করা - অন্ত্যজ মানুষের এক পরিচিতি সমস্যা। মোসম্মতের নিজেরও বিশ্বাস, সে ডাইনি। তাই তার স্বামী , জানাই, নাতি কেউ বাঁচেনি। মোসম্মতের জমি দখল করার জন্য এই ডাইনি প্রথাকে কাজে লাগানো হয়েছে। মোসম্মতকে সকলের চোখে ডাইনি প্রতিপন্ন করা কঠিন কাজ নয়। কতগুলি ঘটনার পরপর বিশ্লেষণে গ্রামের লোকের আর সন্দেহ নেই যে, মোসম্মত সত্যই ডাইনি।

'ঢোঁড়াই চরিত' ও বিদ্রোহী চেতনা

ঢোঁড়াইয়ের আবির্ভাব ১৯১২ খ্রীষ্টাব্দে দিল্লীর দরবারের সময়। অনুন্নত তাতমা সমাজে,অবহেলায় প্রতিপালিত হয় ঢোঁড়াই। ঢোঁড়াই বেড়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে বৌকার কার্যে সামিল হয়। প্রতিকূল পরিবেশে পথ চলতে চলতে ঢোঁড়াই সবকিছু বুঝতে শেখে। তার সহজাত বুদ্ধি বৃত্তি এই প্রতিকূলতার অভিঘাতে বিকশিত হয়। ঢোঁড়াই যখন বেড়ে উঠেছে, সেই সময় পরাধীন ভারতবর্ষে চলছে -নানা রাজনৈতিক আন্দোলন - যার ঢেউ তাৎমা সমাজের উপর দিয়েও বয়ে গেছে, ঢোঁড়াইয়ের মনোজগতে-এর প্রভাব পড়তে বেশি সময় লাগেনি। ঢোঁড়াইয়ের মনে বিদ্রোহের বীজ ধীরে ধীরে অঙ্কুরিত হতে থাকে, তাই তাৎমা ধাঙড়দের চিরকালের বিবাদ উপেক্ষা করে, বাওয়ার উপদেশ অমান্য করে, মহাতো-নায়েবদের বিনা অনুমতিতে, সে ধাঙড়টোলায় গিয়ে পাক্কী মেরামতের কাজে যোগ দেয়। কোশী -শিলিগুড়ি রোডের ২১ থেকে ২৫ মাইলের গ্যাং-এ বহাল হয়।

ধনুয়া মহাতোর বাড়ির পঞ্চায়েতের আসরে সকলকে অবাক পরে দিতে অনুপস্থিত থাকে ঢোঁড়াই। কথায় বলে 'পঞ্চ যদি সাপকে ডাকে তো সাপ আসবে, বাঘকে ডাকে বাঘ আসবে, মানুষতো কোন ছাড়' ঐ একরত্তি ছেলের বুকের পাটা দেখে সবাই অবাক। ঢোঁড়াইয়ের এই আচরণ যে পঞ্চরা মেনে নেবে না - সেটা মহাতোর কথায় স্পষ্ট- "তাৎমা জাতের মুখে কালি দিল! এর থকে মুসলমানের এঁটো খাওয়া ভাল ছিল। আর লোকসমাজে মুখ দেখানোর মতো কিছু রাখল না তাৎমাদের। ... আরে মাটি কেটেই যদি পয়সা রোজগার করতে হয়, তাহলে আমরা এতদিন ফুলে 'ভাতি' (হাপর) হয়ে যেতাম।" অন্যদিকে তুলনা সূত্রে বাবুলালের প্রশস্তি করতে ছাড়ে না- "ছেলে বাপের হয় না; ছেলে হয় জাতের। তারপর ছেলের উপর দাবি হল টোলার। ... এই বাবুলাল তাৎমা জাতটার ইজ্জত কত বাড়িয়েছে।" -এরাই হল তাৎমা সমাজের মাথা। এই স্বার্থান্বেষী পঞ্চরা নিজেদের আখের গুছিয়ে নেয়, সরল তাৎমাদের মাথায় হাত বুলিয়ে। ঢোঁড়াই এদের চালাকিটা বুঝতে পারে বলেই, সে এদের চক্ষুশূল। ঢোঁড়াইকে শাস্তি দেওয়ার জন্য, বাওয়ার চালায় আগুন লাগিয়ে দেয়। আগুন দেখে, ধাঙড়টুলি থেকে ধাঙড়েরা ছুটে আসে, সঙ্গে ঢোঁড়াই, পুলিশ আসে তাৎমাটোলাতে; জেরা করে। ঢোঁড়াই সত্যি কথা বলতে গিয়েও, বলতে পারে না। সে ভাবে - "এতগুলো লোকের ভবিষ্যৎ এখন তার হাতে। একবার মাথা নাড়লে সে এখনই তার জাতের সেরা লোকটির পঞ্চগিরি ঘুচিয়ে দিতে পারে, জেলের হাওয়া খাইয়ে আনতে পারে, পুলিশকে দিয়ে মার খাইয়ে বেইজ্জত তো করাতেই পারে । তার মনও তাই চায়। এই পঞ্চায়েতের অত্যাচারের মাথা গুলোকে নিচু করাতে

এমন করাতে , যাতে তারা আর কোনদিন মাথা উঁচু করে যাওয়ার সঙ্গে কথা বলতে না পারে- যাতে তারা ঢোঁড়াইকে তাচ্ছিল্ল্যের চোখে না দেখতে পারে" [১৫৫]

কিন্তু বাওয়ার মুখ চেয়ে, সে একথা বলতে পারেনি। তার মনে হয়েছে- "বাওয়া নীরবে তাকে বলছে যে, জেলে ধরে নিয়ে গেলে এদের এখন ছত্রিশ জাতের ছোঁয়া ভাত খেতে হবে; কোথায় থাকবে তাৎমা জাতের গৌরব, কোথায় থাকবে, 'কনৌজি তন্ত্রিমা ছত্রিদের সুযশের সৌরভ..." [১৫৬] তবে এই ঘটনা ঢোঁড়াইকে তাদের সমাজে একটা গুরুত্বপূর্ণ স্থান করে দেয়।

এর মধ্যে ঘটে যায় 'তন্ত্রিমাছত্রিদের যজ্ঞেপবীত গ্রহণ'। ভাগলপুরের সোনবর্গা থেকে মরগামায় আসা মহগুদাসের কাছে জানা যায় - তাৎমারা যে সে জাত নয়। 'রামচরিত মানস' - এ এর নজির আছে। তন্দ্রিমা ছত্রিরা ব্রাহ্মণ না হলেও, ব্রাহ্মণের পরেই তাদের স্থান। পশ্চিম কনৌজী তাৎমারা এই নাম নিয়ে পৈতে ধারণ করেছে। ঢোঁড়াই রামিয়ারা পৈতে নিতে চায়। বাধা দেয় নায়েব-মহাতো -গোঁসাই-পুরোহিত। ঢোঁড়াই বলে, অন্য জাতের পৈতে নেওয়া পছন্দ নয় বলে, সত্যি চেপে যাওয়া হচ্ছে। ঢোঁড়াই মরগামার সিরিদাস বাওয়ার কুর্মী চেলাদের সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে সেখানেও নিষেধের বেড়াজালে আটকে যায়। তার মনে হয় -কুর্মীরা কর্মছত্রি হতে পারে কিন্তু ঢোঁড়াইরা পৈতে নিলে 'পৃথিবী ফেটে জল বেরিয়ে যাবে'- এই জেলের চার ক্রোশ দূরের তাৎমারা পৈতে নেওয়ায়, তাদের মাথায় যখন বাজ ভেঙ্গে পড়েনি, তখন ঢোঁড়াইরাই বা নেবে না কেন। ঠিক হয় পৈতে নেওয়া হবে- তবে দীক্ষাগুরুর অনুমতি চাই। অযোধ্যাজীতে অনেক চিঠি লেখালেখিতে যখন কোন উত্তর আসে না তখন ঢোঁড়ই স্থির করে , সে একাই পৈতে নেবে। সবাই তখন একমত হয়ে, গুরু গোঁসাইয়ের নাম নিয়ে, সোনগর্গ থেকে বামুন আনিয়ে একত্র, ছেলেবুড়ো সকলে উপবীত ধারণ করে। সেদিন থেকে তাৎমারা হয়ে যায় দাস; ঢোঁড়াই ভকত হয়ে যায়, ঢোঁড়াই দাস।

এই ঘটনায় ঢোঁড়াই নিজের অজান্তেই দলের নেতৃত্ব পেয়ে যায়। এমনকি পঞ্চদের বিরুদ্ধে কথা বললেও তারা ঢোঁড়াইকে কড়া কথা বলতে পারে না। এই ভাবে ঢোঁড়াইয়ের পরিবর্তন ঘটতে থাকে। পাক্কীতে কাজ করতে করতে, একাজের সমস্ত রহস্য সে জেনে ফেলে । কি করে সরকারকে ঠকানো যায়, সে বিদ্যাও তার আয়ত্তে। কিন্তু গরুর গাড়ির গাড়োয়ানদের সে ঠকাতে পারে না। পাক্কীতে কাজ, কত গাঁয়ের লোকের সঙ্গে তার গল্প- সে জানতে পারে বিভিন্ন জায়গায় কথা। তার মনের পরিধি বাড়তে থাকে। "দেশের বিরাটত্বের একটা আবছা ছায়া পড়ে তার মনের উপর।"[১৫৭]

বাবুভাইদের ঘরে ঘরে টিউবওয়েল, ঢেউখেলানো টিনের চাল। তাৎমাদের রোজগারের অবস্থা, তহশিলদারের বৈইমানি- তাদের অবস্থা ভাল নয়। ঢোঁড়াইয়ের বিয়েতে ধাঙড়ও তাৎমারা একটু কাছাকাছি আসে। বাওয়ার পায়ে গুলি লাগার ক্ষতিপূরণ ৩০০টি টাকা, বাওয়া গুনে শেষ করতে পারে না। ঢোঁড়াইদের জন্য বলদের গাড়ি কেনা হয়। সে ভাড়ার মাল নিয়ে যাতাযাত করে রোজগার করবে। তাৎমাটুলিতে, ঢোঁড়াইয়ের খ্যাতি বাবুলালের সমান। বাইরের জগতের যে গল্প সে শুনত- এখন গরুর গাড়িতে করে সে সব জায়গায় পৌঁছে যায় সে। ঢোঁড়াই অন্যয়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করতে ভয় পায় না। তার প্রতিবাদী চরিত্র, তাৎমাদের কাছে প্রকাশ হতে থাকে - ধীরে

ধীরে। সুযোগ বুঝে ঢোঁড়াই, তশীলদার ফুদনলালের বিরুদ্ধে 'চৌকিদারি ট্যাক্স্' বসাতে বেইমানির নালিশ করে হাকিমের কাছে। অবাক হয়ে যায় সকলে।

তাৎমাটুলিতে ইংরেজ সরকারের বিরুদ্ধে নানা তথ্য এসে পৌঁছায়। মাস্টার সাহেবের ছেলে বলে গেছে- "রংরেজ' সরকারের জন্যই তাৎমাদের রোজগার নেই। অনকেদিন আগে নাকি 'সরকার' তাৎমাদের হাতের বুড়ো আঙুল কেটে নিয়েছিল।... তবে একটা সুবিধে বুড়ো আঙুল না থাকলে - কেউ আর জোর করে সাদা কাগজে আঙুলের ছাপ নিতে পারবে না; না অনিরুদ্ধ মোক্তার, না সাওজী, না জমিদারবাবু। ... তারপর থেকেই তো তারা কাপড় বুনবার কাজ ভুলেছে।... কলি যুগে।... সাধে কি আর মহাৎমাজী 'রংরেজ'- এর নিমক খেতে বারণ করেছেন। সব দেখতে পান তিনি।" [১৫৮]

মরণাধারে লবণ তৈরীর কথা পুলিশ জেনে যাওয়ার পর, তাৎমাটুলির লোকেদের জানিয়ে দেওয়া হয় - সরকারের খেলাপ কাজ করলে আর কংগ্রেসের পাল্লায় পড়লে জেলে যেতে হবে। তারা এতদিনে বুঝতে পারে - " মহাৎমাজীর চেলারা, মাস্টার সাহেবের চেলারা তাহলে 'কাংগ্রিস' - এর লোক।... বাবু ভাইয়াদের কাংগ্রিস আর দারোগা হাকিম সরকার ! এদের মধ্যে লেগেছে টক্কর।" [১৫৯]

কিন্তু নিমক তৈরীর খবর পুলিশকে কে দিল - রক্ত গরম হয়ে ওঠে ঢোঁড়াইয়ের। সকলেই ঢোঁড়াইকে সমর্থন করে। গাঁয়ের লোকের এই রূপ আর ঢোঁড়াইয়ের কথা বলার কায়দা দেখে ভয় পেয়ে যায় মহতো । ঢোঁড়াইও খুশী হয় তার সাহসিকতায়। সে নিজের মধ্যেকার পরিবর্তন বুঝতে পারে। তার চারপাশের জগৎ ক্রমশ বিস্তারিত হচ্ছে। সে গরুর গাড়ি নিয়ে চলে যায় পাঁচ-সাত ক্রোশ দূরে। বাইরের জগতের সঙ্গে তার আনাগোনা সে বোঝে,'জাতপাত' আলাদা হলে কি হয়, সব জায়গায় লোকেরা হালত একই রকম। ঢোঁড়াইয়ের এই উপলব্ধি তাকে বৃহত্তর জগতের একজন করে তুলেছে।

সেইজন্য বিসকন্ধায় আসার পর ঢোঁড়াই সেখানকার 'রীতিরেওয়াজ' বুঝে নেওয়ার চেষ্টা করে। জাত ও জমির রাজ্যে জমির সঙ্গে জমিদারও এখানে আলোচনার বিষয়। ঢোঁড়াই এখানেও কিভাবে দলপতি হয়ে ওঠে। দলগঠন করে। সমস্ত জিরানিয়া জুড়ে আকাল, শুধু বাবুভাইয়াদের গোলা ভর্তি ধান । ঢোঁড়াই জমিদার বাড়ি গিয়ে, কথার মারপ্যাঁচে জমিদাররের কাছ থেকে ধান ও ধানের চারা নিয়ে আসে-টিপ সই দিয়ে। জমিদারের কূটবুদ্ধির সন্ধান সাধারণ প্রজারা পায় না। তাই টিপসইয়ের কাগজ যাতে পুরনো মনে হয়, সেই মতো ব্যবস্থা করে, জিরানিয়ার অনিরুদ্ধ মোক্তারের কাছে পাঠানো হয় বাকী খাজনার নালিশ ঠুকে। কোয়েরীদের সঙ্গে বাবুসাহেবের চলে বিবাদ। কোয়েরীরা রামনেওয়াজ মুন্সির সাহায্য নেয়। কিন্তু মোকদ্দমার খরচের কথায়-অনেকেই পিছিয়ে যায়। রাতের আঁধারে লুকিয়ে সাগিয়া তার একমাত্র সম্বল গয়নাটুকু ঢোঁড়াইকে দিয়ে যায়। কোয়েরীররা কাছারিতে যায়, অনিরুদ্ধ মোক্তারের শলা নিতে। রামনেওয়াজের কাছে তারা জানতে পারে, জমিদারের সেসরী চলে গেছে। গিধর ও জমিদার আঁতাত হয়। গিধর বিসকন্ধা

গ্রামের আমন সভার মুখিয়া হয়, সে ঢোঁড়ইয়ের প্রতি প্রতিশোধ নিতে চায়।

অন্ত্যজ জীবন চেতনার পরিবর্তনে 'ঢোঁড়াই চরিত মানস'

ঢোঁড়াইয়ের মানসিক পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে, তাৎমাদের মনেও পরবির্তন ঘটতে দেখা যায়। এর কারণ অবশ্যই যুগের প্রভাব "কিছদিন থেকে দুনিয়া দরকারের চাইতেও বেশী তাড়াতাড়ি চলতে আরম্ভ করেছে।"[১৬০]

ধাঙড়টোলা থেকে সাহেবরা চলে যাচ্ছে। ছড়িদারকে কারা যেন ঢিল মেরে মাথা ফাটিয়ে দেয়। অত্যাচারী সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে এই আচরণ গ্রামের সবাই মহাতোকে ভাবিয়ে তোলে ।

"লোকের মনে কিসের যে আগুন লেগেছে যে স্রোত এসেছে চারিদিকে, মহতো তা বুঝতেই পারে না, তো তার সঙ্গে তাল রাখবে কী করে? 'রোজ শহর থেকে নতুন খবর শুনে আসছে তৎমারা কাজে গিয়ে । ...' বেলুচী ঘোড়-সওয়ার শহরের রাস্তায় টহল দিচ্ছে।" [১৬১]

মহতো বোঝে, মহতো গিরিতে আর আগেকার মতো পয়সা নেই, সম্মান নেই, এক মুহুর্তের শান্তি নেই।

এরপর লাগে 'তের হাঁ তিরসার দ্বন্দ্ব' ঢোঁড়াইয়ের দল পৈতে নেওয়ার পর ঠিক করে, তেরদিনে শ্রাদ্ধ করবে- ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়ের মতো। এ নিয়ে গ্রামের মহতোর সঙ্গে বিরোধ ঘটে। কিন্তু ঢোঁড়াইয়ের দল ১৩ দিনেই হরখুর বাবার শ্রাদ্ধের ব্যবস্থা করে।

ঢোঁড়াইয়ের জগৎ বাড়ে ধাঙড়টোলা ও কোয়েরীটোলাকে কেন্দ্র করে। এখানেও ঢোঁড়াই দলপতির ভূমিকা নেয়। প্রবলের অত্যাচার ক্রমশ ঃ অন্ত্যজদের চেতনাকে জাগিয়ে তোলে। বিশেষ করে ছোটবেলা থেকে ঠেকে-শেখা ঢোঁড়াইয়ের নেতৃত্ব যারা লাভ করেছে- তারা এগিয়ে যেতে পিছপা হয় না। কোয়েরাটোলার ঢোঁড়াই তার সঙ্গে পায় তারই বয়সী বিল্টাকে।

ভূমিকম্পে যখন রাজপুত টোলার ঘর ভাঙে, কুয়ো বালিতে ভরে যায় তখন ভূমিকম্পের রিলিফ দেওয়া হবে বলে, রিপোর্ট যায় বাবু সাহেবরে পক্ষে। বিল্টরা মাস্টার সাহেবের আশ্রমে গিয়ে সেই রিপোর্টের খবর জেনে আসে।

" এরই নাম রপোট। তাই বল! তাই বল! যখনই লোকটা পুরি- হালুয়া খেয়েছে বাবু সাহেবের বাড়ি তখনই বোঝা উচিত ছিল। মাস্টার সাহেবের নিজে যদি রপোট লিখত,তবে মহাৎমাজীর কথা থাকত। মহাৎমাজী বলেছিলেন যে, কাংগ্রিস থেকে সাহায্য দেওয়া হবে গরীবদের যারা নিজেরা খরচ করতে পারে তাদের নয়। তাঁর কথা থাকল কই?" একটা কথা তারা বুঝতে পারেনা, "যতগুলো লোক রিলিফ পাচ্ছে, সবাই বাবুসাহেবের দিকের। এক রইল কেবল সাঁওতালটোলার কথা। তারা কী করে কাংগ্রিসে তদ্‌বির করাল।" এই সংশয় দূর হতে সময় লাগে না, "বাবু সাহেবরা সাঁওতালটোলার পাশে যে নতুন কলমবাগান করেছে, তাতেই এনে বসিয়েছে কাংগ্রিসের দেওয়া সাঁওতালটোলার টিবওয়েলটা। ঘুষ খাইয়েছে মহাৎমাজীর চেলাদের।" তারা আরো বোঝে - "টপোর্ট -টপোর্ট সব ওরা মিলে সাজশ করিয়েছে।" কেয়েরীদের নিদ্রাভঙ্গের সঙ্গে সঙ্গে ঢোঁড়াই প্রত্যক্ষ বিদ্রোহে সামিল হয়।

বাস্তবের ঢোঁড়াই ও লেখকের মানস ঢোঁড়াই

'ঢোঁড়াই চরিত মানস'- এর গ্রন্থ প্রসঙ্গতে লেখক মন্তব্য করেছেন- "ইচ্ছা ছিল আমার জ্ঞানে গ্রামের নিরক্ষর সাধারণ লোকের মন কেমন ভাবে বদলাতে দেখেছি, যেমন ভাবে তারা ভুল-ভ্রান্তির মধ্যে দিয়ে মানুষ হিসাবে নিজের অধিকার বুঝে নিচ্ছে, তাই নিয়ে একখান উপন্যাস লিখব।"

এখানে নিরক্ষর সাধারণ লোক বলতে, বিহারের অন্ত্যজ তাৎমা ও ধাঙড় সম্প্রদায়। লেখক এদের খুব কাছ থেকে দেখেছিলেন। এদের লৌকিকজীবন, ভাষা-ভঙ্গিমা, রঙ্গ-তামাসা, কথায়-কথায় রামায়ণের বুলি আওড়ানো, এদের লোকচর্চা, রীতিনীতি, প্রথা-সংস্কার-এই দিকগুলোও তাই তুলে ধরতে পেরেছেন, অনায়াসে । ঢোঁড়াইকে লেখক কিভাবে চিনতেন তা লেখকের বক্তব্য থেকেই উদ্ধার করা যাক-

"তাৎমাটুলিতে ঢোঁড়াই নামের একজন লোক সত্যিই ছিল। ... তাৎমাটুলির লোকদের কথার বহর এ অঞ্চলের বর্ধিষ্ণু ব্যক্তিদের চক্ষশূল। এ হেন বাক্‌পটু লোকদের মধ্যে ও কথার বাঁধুনীতে ঢোঁড়াই-ই ছিল সকলের সেরা।... একজন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির আম-বাগান তাৎমাটুলির লোকেরা সকালে-বিকালে নোংরা করত। একদিন তিনি জনকয়েক সেপাই নিয়ে অকুস্থলে হাজির। যারা ধরা পড়েছিল তাদের মধ্যে ঢোঁড়াইও ছিল। সকলকে এক জায়গায় দাঁড় করিয়ে ভদ্রলোক বেশ ঝাঁজালো ভাষায় জানিয়ে দিলেন যে ভবিষ্যতে তিনি এ জিনিস আর বরদাস্ত করবেন না। সকলে ভয়ে কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে। লোটা মাটিতে রেখে, দুইহাতে নিজের কান ম'লে ঢোঁড়াই বলল- 'হুজুর যখন জিভ নাড়িয়েছেন তখন আরকি এ বাগান ময়লা থাকে।' ...

বর্ষার অন্ধকার রাত্রি। জানলার বাইরে খুট খুট শব্দ ... বাইরে বেরিয়ে টর্চ ফেলতেই হুড়মুড় - ঝপাং করে একটা শব্দ হল । ... কার যেন একটা ঘোড়া হঠাৎ টর্চের আলো মুখে পড়ায়, দিশেহারা হয়ে পালাতে গিয়ে, পাশের প্রকান্ড ইঁদারাটার মধ্যে লাফিয়ে পড়েছে। ওই রাত্রিতে ওরা ইঁদারার মধ্যে থেকে একটা জল জ্যান্ত ঘোড়াকে উপরে টেনে তোলা সহজ কথা নয়।... উপায় না দেখে শেষ কালে লোক পাঠানো হল তাৎমাটুলিতে। সেখানকার লোকেরা ইঁদারার বালি তোলবার কাজ করে। তাৎমাটুলির দল আসতে, ঘন্টা দুই-তিন সময় কেটে গেল। তারপর 'খৈনী' ডলবার অজুহাতে তারা গিয়ে বসল বাড়ির কর্তার সঙ্গে মজুরি নিয়ে দর কষাকষি করতে। ঢোঁড়াই কিন্তু একমিনিটও সময় নষ্ট করেনি। জানোয়ারটা মরে যাচ্ছে যে। কারও জন্য অপেক্ষা না করে, সে 'ব্যোম শংকর' বলে নেমে গেল ইঁদারার মধ্যে। সেই নিচে থেকে খবর দল যে ঘোড়াটা মরে গিয়েছে। দড়ি বেঁধে, অনেক ধস্তাধস্তির পর মরা ঘোড়াটাকে টেনে তোলা হল উপরে। তাৎমাটুলির দলকে বাড়ির কর্তা কথা দিয়েছিলেন দশটাকা মজুরি দেবেন। কাজ হয়ে যাবার পর চাইলেন পাঁচ টাকায় রফা করতে। ঢোঁড়াই নিজের সঙ্গীদের বলল- 'দরে যখন পটছে না তখন চল জানোয়ারটাকে আবার ইঁদারার মধ্যে ফেলে দিই। না হয় ধরে নেব আমাদের এতক্ষণের মেহনত বরবাদই হল। পাড়ার অনেক দর্শক এসে জোটায় বাবুরা তখন দলে ভারী। কাজেই ছোটলোকদের মুখের এতবড়ো কথা সহ্য করতে প্রস্তুত ছিলেন না সে সময়।

'নিকলো ! অভী নিকলো মেরা হাতাসে!'

ঢোঁড়াই নিজের দলের লোকেদের বলল - 'চলে আয় বাবুর ফটকের বাইরে ! সরকারী রাস্তায় বসে থাকলে তো কেউ কিছু বলতে পারবে না। দেখি কোন ডোম মুদ্দোফরাশে ওই ঘোড়াকে আজ ওখান থেকে সরায়। আজ এই বাবুর বাড়ির ছাতে শকুনের মেলা বসিয়ে ছাড়ব।' শুধু শাসানি নয়, গিয়ে বসলও তারা গেটের বাইরে। ... বাবুসাহেবকে নরম হতেই হল।... আরও বহু মূর্তিতে আমি ঢোঁড়াইকে দেখেছি। তাকে ভিক্ষা করতে দেখেছি, ঘর ছাইতে দেখেছি, গরুর গাড়ি চালাতে দেখেছি। ইদানিং সে হয়েছিল রাজমিস্ত্রি ঠিকাদার। পায়ে মোটর টায়ারের স্যান্ডাল, মাথায় গামছার পাগড়ি, হাতে একখান কুলোয় অনেকগুলো তাজা মূলো, - 'রাজমিস্ত্রি ঠিকেদার ঢোঁড়াই এর সঙ্গে হঠাৎ একদিন দেখা পথের মাঝে। আমাকে দেখেই ঝুঁকে নমস্কার করল'। কী রে কোথায় চললি? 'চেয়ারম্যান সাহেবের বাড়িতে।' 'কেন রে' ? 'ডালি দিতে।' 'তোর বাড়িতে হয়েছিল বুঝি?' 'হুজুরের কাছে লুকিয়ে লাভ নাই তিন আনায় কিনেছি'। বাড়ির উঠোনে হয়েছিল বলেই এগুলোকে চালাতে হবে চেয়ারম্যান সাহেবের স্ত্রীর কাছে। একটা সরকারী ইদাঁরা হবে ধাঙড়টুলিতে; সেই ঠিকেটা যদি পাওয়া যায়।" [১৬২]

আর এক জায়গায় লেখক বলেন -

"ঢোঁড়াই-চরিত মানসের নায়কের চরিত্রে আমার তৃপ্তি হয়নি। কিন্তু ঢোঁড়াই নিজে খুব খুশি হয়েছিল- অবশ্যই বই না পড়েই। সে প্রথম থেকে জানত যে তাকে নিয়ে বই লেখা হচ্ছে। ... তখন থেকে সে বিনা প্রয়োজনে আমার কাছে ছড়া,গান, রামায়ণের লাইন শুনিয়ে আমাকে বোঝাতে চেষ্টা করত যে সে মূর্খ নয়। অনেক সময় বোঝা যেত যে সে তার বলা লাইন গুলোর মানে জানে না। মোটকথা তার বেশ উৎসাহ ছিল এ বিষয়ে এবং প্রয়োজনের চেয়েও বেশী সহযোগিতা করতে উৎসুক ছিল লেখকের সঙ্গে।

এরপর কিছুকাল আমি বাইরে ছিলাম। এখানে ফিরে আসারও বছর কয়েক পরের কথা। ... ঢোঁড়াই এসে একদিন নমস্কার করে দাঁড়াল। 'কী রে ঢোঁড়াই?' হুজুর জেলার মধ্যে সবচেয়ে পন্ডিত লোক একথা কেনা জানে। আমার চোখ থাকতেও অন্ধ, কান থাকতেও কালা।' ...

'হুজুর আমাকে নিয়ে যে বইখানা লিখেছেন সেখানা একবার দেখব।' বাঙলা অক্ষরের কথা দূরে থাক, 'ঢোঁড়ায় যে হিন্দীর 'অ-আ-ক-খ' জানে না। 'কেন রে ঢোঁড়াই ? '

'খুব সুন্দর সুন্দর কথা লেখা আছে বইখানার ভিতরে, না?' 'কে বলল?'

'ইস্কুলিয়া ছেলেরা আপনার লেখা বই পড়েই পাটনা- উটনার নোকরি পেয়ে যায়, সব খবর আমি রাখি।' এবার আমার সত্যিই আশ্চর্য হবার পালা। নানা রকমে তাকে জেরা করতেই হলো। সে নাকি কোন স্কুলের ছেলের মুখে শুনেছে যে ভাদুড়ীজী একেবারে 'কলমতোড়' লেখা লিখেছে তার সম্বন্ধে। আগাগোড়া সব সত্যি কথা লিখেছে; হেমবাবু যে পাগলাকুকুর ভেবে বোবা সন্ন্যাসীর গায়ে বন্দুকের গুলি মেরেছিলেন একথা নাকি বইয়ে লেখা হয়ে গিয়েছে। ...

হেমবাবুর বন্দুক ছোঁড়বার কথাটা বলতে গিয়ে ঢোঁড়াই হেসেই বাঁচে না। বিপজ্জনক বন্ধ

করবার জন্য উঠে পড়তে হলো, বাড়ির ভিতর থেকে বইখানা আনবার অজুহাতে । ঢোঁড়াই চরিত মানসের কেবল প্রথম খন্ডখানা আমার কাছে ছিল। ঢোঁড়াই বইখানা নেড়েচেড়ে দেখে বলল, 'সুন্দর নামাবলীর মত দেখতে।'

কে বলে ঢোঁড়াই চোখ থাকতে অন্ধ। হলদের উপর খয়েরী রঙের চিত্রাঙ্কণ ও লেখা সংবলিত লম্বা মলাটটার সঙ্গে সত্যিই নামাবলীর সাদৃশ্য আছে। সে না বলে দিলে আমার নজর এড়িয়ে যেত। কতটুকু জানি আমি ঢোঁড়াইকে। উত্তর ঢোঁড়াই চরিত লিখলে কখনই তার চরিত্রের একদিকটাকে অবহেলা করতাম না।" [১৬৩]

এহেন ঢোঁড়াইকে উপন্যাসের নায়ক করে তোলার কারণ কি , তাও আবার রামচন্দ্রজীর আদলে?এ প্রশ্নের উত্তরও লেখক দিয়েছেন অকপটে -

" আমার বই-এর নায়ক চরিত্রের আদরা হিসাবে ঢোঁড়াইকে বাছবার কোনও সংগত কারণ ছিল না। চোখের সম্মুখে একটা নক্শা থাকলে আঁকবার সুবিধা হয় । পরে সেটার উপর এক মেটে কর , দোমেটে কর; প্রয়োজন আর রুচি অনুযায়ী রঙ আর অলংকার দাও। নাইবা থাকল উপলেপের ফলে প্রাথমিক মূর্তির সঙ্গে কোনও সাদৃশ্য, তবু এই যেন সহজ বলে মনে হয় আমার কাছে।

ধূর্ত অথচ অকপট; নিরক্ষর অথচ জটিল প্রশ্নের সরল সমাধানে সক্ষম; নিজে অন্যায় করে অথচ অন্যায়ের বিরুদ্ধে যে কোনও সময় রুখে দাঁড়াবার সাহস রাখে, স্বার্থপর অথচ একটা অসহায় পশুর জন্য প্রাণ দিতে প্রস্তুত; রঙ্গরসে ভরা বিচিত্র এই ঢোঁড়াই-এর চরিত্র বহুদিন থেকে আমায় আকর্ষণ করত। তাই আমার কাজের পক্ষে অনুপোযোগী হলেও, রামের খোঁজে বেরিয়ে, তার কথাই আমার সবচেয়ে আগে মনে পড়েছিল।

আমার কাজ হল চেনা ঢোঁড়াইকে এমন ভাবে বদলাবো যাতে সারা দেশের সাধারণ লোকের প্রতিনিধিত্ব করতে পারে। তাদের প্রতিবেশের পূর্ণতম সম্ভাবনাটুকু, তার চরিত্রের মধ্যে দিতে হবে। ... শ্রী রামচন্দ্রকে কানা খোঁড়া দেখানো চলে না। এজন্য ঢোঁড়াই -এর স্বভাবের মারাত্মক ত্রুটিগুলো বেমালুম চেপে যেতে হলো। কর্তব্যের পথে অবিচলিত থাকবার দৃঢ়তাও যে কোনো বাধা ঠেলে পথ করে নেবার সাহস তার মধ্যে আনতে হল।

তার স্বভাবের হালকা রঙ্গরসের দিকটা যাতে উচ্চারিত না হয় সে দিকে সাজাগ দৃষ্টি রাখলাম, কেননা নেতার পক্ষেও জিনিস বেমানান হত। একটু গম্ভীর স্বভাবের না হলে তার কথা শুনে চলতে অপরে বিশ্বাস পায় না। "[১৬৪]

ঢোঁড়াইকে ঔপন্যাসিক সচেতনভাবেই এ যুগের রাম করে গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন। তিনি বাস্তবের ঢোঁড়াইয়ের মধ্যে কিছু সম্ভাবনা দেখেছিলেন। উপন্যাসের ঢোঁড়াইয়ের মধ্যেও সম্ভাবনার বীজ লুকিয়ে ছিল, যা বাস্তবের অভিঘাতে অঙ্কুরিত ও পল্লবিত হতে দেখা যায়। এই নিরক্ষর অন্ত্যজ শ্রেণীর মানুষটিকে বাস্তবে খুঁটিয়ে দেখলেও, তাকে হুবহু সেই রূপে উপন্যাসে তুলে ধরতে পারেননি- ঔপন্যাসিক। সমাজ বিবর্তন ও রাজনৈতিক স্রোত যেভাবে রয়ে গেছে এইসব অন্ত্যজ পল্লীর উপর

দিয়ে, এবং তার ফলে উপন্যাসে যে ভাবে ব্যক্তি ও সমাজের পরিবর্তন ঘটেছে- বাস্তবে সেইভাবে ঘটে না। কারণ-

"ঢোঁড়াইদের Traditional Values বিশেষ বদলায়নি জাত, সমাজ আর রামায়ণ। ... যেখানে সংকট আসে, বাছাবাছির সময় আসে, তখন আমাদের Average লোক রামায়ণ মহাভারত পুরাণের মানের মতো একটা কাহিনীর উপদেশ পেলে বর্তে যায়- খোঁজে। ওসব বইতে যা খোঁজে তাই পাওয়া যায়।" [১৬৫]

সেইজন্য উপন্যাসের ঢোঁড়াই, জাতের বিরুদ্ধে, সমাজের বিরুদ্ধে, সরকারের বিরুদ্ধে যতই বিদ্রোহ করুক না কেন, ফলাফল শূন্য- তেমন কোনো পরিবর্তন ঘটেনা, বা সুযোগ-সুবিধা পায় না তারা । এরা রাজনীতি করে, না, পক্ষান্তরে রাজনীতিতে ব্যবহৃত হয় অজ্ঞাতসারে। স্বাভাবিক কারণেই তাই ঢোঁড়াই বিশ্বাস হারিয়েছে- কি ঐতিহ্য চেতনায়, কি রাজনৈতিক চেতনায় সে যেমন রামায়ণের ওপর ভরসা হারিয়েছে, তেমনি ভরসা হারিয়েছে তার গান্‌হীবাবার প্রতি।

চতুর্থ অধ্যায়

স্বাধীনোত্তর পর্বে বাংলা ছোট গল্প ও অন্ত্যজ জীবন

চতুর্থ অধ্যায়

স্বাধীনোত্তর পর্বে বাংলা ছোট গল্প ও অন্ত্যজ জীবন

এক) স্বাধীনতা সমকালীন বাংলার সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক পটভূমিতে বাংলা ছোট গল্প:

১৯৪৭ সালের ১৫-ই আগষ্ট এলো বহু কাঙ্ক্ষিত স্বাধীনতা। মুক্তির আনন্দকে ছাপিয়ে উঠলো সর্বস্ব হারানোর কান্না। বস্তুত স্বাধীনতা বাঙালীর কাছে ভিন্নরূপে দেখা দিয়েছিল। এক রূধির স্রোতের মধ্যদিয়ে পূর্ববর্তী সাত-আট বছর বাঙালী এগিয়ে চলেছিল। স্বাধীনতা প্রাপ্তিতেও সেই স্রোত রুদ্ধ হয়ে যায়নি। জাপানী আক্রমণ (১৯৪১), আগষ্ট আন্দোলন ও মেদিনীপুরে বিধ্বংসী বন্যা (১৯৪২), পঞ্চাশের মন্বন্তর (১৯৪৩), দক্ষিণ-পূর্ব এশীয় রণাঙ্গনে সমারায়োজনের মঞ্চ রূপে কলকাতা ও বাংলাকে ব্যবহার (১৯৪১-৪৫), দেশবিভাগ, স্বাধীনতা-প্রাপ্তি ও উদ্বাস্তু আগমন(১৯৪৭-৫০), বাংলার জনজীবনে দশ বছরে যে বিপর্যয় ঘটল পূর্ববর্তী এক শতকেও বোধ হয় তা ঘটেনি। বলা যায় এই দশ বছরে (১৯৪১-৫০) বাঙালীর জন্মান্তর হল, শত প্রয়াসেও আর আমরা তিরিশের দশকের শান্তি, স্বস্তি ও মন্থরগতি জীবনে ফিরে যেতে পারি না। "শরৎচন্দ্রীয় রোমান্টিক যুগের অবসান, কল্লোলীয় বোহেমীয় পালার অবসান, বিভূতিভূষণের প্রকৃতি মুগ্ধতার অবসান : এই পটভূমিতে এলেন তরুণ গল্পকারবৃন্দ। রক্ত আর শবদেহ মাড়িয়ে মানবিক মুল্যবোধ বিসর্জনের সাক্ষী থেকে আর্থিক বিপর্যয়ে ও দেশ বিভাগের ধাক্কায় শেকল-ছেঁড়া নোঙরহীন নৌকার মতো তাঁরা জগৎ ও জীবনকে, ব্যক্তিসমাজকে নতুন চোখে দেখেছেন।" স্বাধীনতা-উত্তর বাংলা ছোট গল্পের এই মানসিক পটভূমি অবশ্য স্মর্তব্য।

রবীন্দ্রনাথ-প্রভাতকুমার-শরৎচন্দ্র বাংলা ছোটগল্পধারায় ব্যতিক্রম রূপে দেখা দিলেন কল্লোল ও বিচিত্রা গোষ্ঠীর লেখকরা। বাংলা ছোট গল্পে পালাবদলের সূচনা হয়েছে এঁদের লেখায়। 'তেলেনাপোতা আবিস্কার' (প্রেমেন্দ্র মিত্র), 'জলসা ঘর' (তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়), 'দুই বার রাজা' (অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত), 'প্রাগৈতিহাসিক' (মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়) : এই সব গল্প প্রমাণ করে সেদিন বাংলা ছোট গল্পের পালে লেগেছিল ঝোড়ো হাওয়া। শান্ত সুস্থিত নিরাপদ মূল্যবোধ ও জীবন-দৃষ্টির বন্ধন ছেড়ে অজানা বিক্ষুব্ধ জীবন সমুদ্রে বেরিয়ে পড়ার আহ্বান ছিল ঐ সময়কার গল্পে: জগদীশ গুপ্তের 'পাইক মিহির প্রামাণিক' (১৯২৯), 'শ্রীমতী' (১৯৩০), 'উপায়ণ' (১৯৩৪), 'গতিহারা জাহ্নবী' (১৯৩৫), 'মেঘাবৃত অশনি' (১৯৪১), শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়ের 'দিনমজুর' (১৯৩২), 'অসতী' (১৯৩২), 'নারীমেধ' (১৯২৮), প্রেমেন্দ্র মিত্রের 'বেনামী বন্দর' (১৯৩০), 'পুতুল ও প্রতিমা' (১৯৩২), 'ধূলিধূসর' (১৯৪৩), 'মহানগর' (১৯৪৩), মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের

'অতসী মামী' (১৯৩৫), 'প্রাগৈতিহাসিক' (১৯৩৭), 'মিহি ও মোটা কাহিনী' (১৯৩৮) 'সরীসৃপ' (১৯৩৯), 'ভেজাল' (১৯৪৪), অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের 'ইতি', 'আকাশ', 'বসন্ত', 'অধিবাস'–১৯৩২, 'ডবল ডেকার' (১৯৩৮), বুদ্ধদেব বসুর 'অভিনয়', 'অভিনয় নয়', 'রেখাচিত্র ও অন্যান্য গল্প'–১৯৩১, 'এরা ওরা এবং আরো অনেকে' (১৯৩২), 'প্রেমের বিচিত্র গতি', 'স্বেত পত্র', 'অসামান্য'–১৯৩৪, অন্নদাশঙ্কর রায়ের 'প্রকৃতির পরিহাস' (১৯৩৫), 'মন পবন' (১৯৪৬), ধূর্জ্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের 'রিয়ালিস্ট' (১৯৩৩), তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'জলসা ঘর' (১৯৩৭), 'রসকলি' (১৯৩৮), 'বেদিনী' (১৯৪০), বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'মেঘ মল্লার' (১৯৩১), 'মৌরীফুল' (১৯৩২), মনোজ বসুর 'বন মর্মর' (১৯৩২), 'নরবাঁধ' (১৯৩৩), প্রবোধ কুমার সান্যালের 'কয়েক ঘন্টা মাত্র' (১৯৩২),'সায়াহ্ন' (১৯৩৩), প্রমথনাথ বিশীর 'শ্রীকান্তের পঞ্চম পর্ব' (১৯৪৪), 'গালি ও গল্প' (১৯৪৫), স্বাধীনতা-পূর্ববর্তী দুই দশকে উক্ত গল্পগুলি এবং গল্প লেখকেরাই বাংলা ছোটগল্পের ধারক ও বাহক ছিলেন।

"কল্লোল-পরবর্তী পর্বের সূচনা দ্বিতীয় বিশ্ব সমরের আরম্ভকাল, শেষ স্বাধীনতা-প্রাপ্তি ও দেশ বিভাগ (১৯৩৯-৪৭)। অল্প বিস্তর এই দশটি বছর বাংলা সমাজে ও রাষ্ট্রে কালান্তরের পর্ব। মন্বন্তর, নিষ্প্রদীপ, বিমান হানা, কন্ট্রোল, রেশনিং, মিলিটারী সাপ্লাই, যুদ্ধকালীন কলকাতার সমাজ জীবনের অধোগতি, অর্থনৈতিক বিপর্যয়, নৈতিক মূল্যবোধের বিনষ্টি, দাঙ্গা, স্বাধীনতা প্রাপ্তি, দেশ বিভাগ ও উদ্বাস্তু-স্রোত। এই পর্বের মধ্যে দিয়ে এতো বিপর্যয়কারী ঘটনা ঘটে গিয়েছে। এই পর্বে যাঁরা গল্প লেখায় হাত দিয়েছেন, সাহিত্য চেতনা উন্মেষের সঙ্গে সঙ্গে এই আলোড়িত বিপর্যস্ত যুগের সঙ্গে তাঁদের প্রত্যক্ষ পরিচয় ঘটেছে। এই পর্বে সামাজিক বাতাবরণ অশান্ত বিক্ষুব্ধ। এই বাতাবরণ তাঁদের দৃষ্টিকে কিছুটা ব্যাহত, তীক্ষ্ণ ও আবিল করে তুলেছে।

এই অস্থির স্বৈর বৃত্ত কাল তার সমস্ত বিক্ষোভ, সংশয়, অশান্তি ও সুতীক্ষ্ণ জীবন-জিজ্ঞাসার স্বাক্ষর রেখে গেছে এই পর্বের ছোট গল্প।"

১৯৪১ (জাপানী আক্রমণ, কলকাতা তথা বাংলার জনজীবনে বিপর্যয়) থেকে ১৯৫০ (দেশ বিভাগ জনিত অর্থনৈতিক বিপর্যয় ও উদ্বাস্তু আগমন) : এই দশ বছরেই বাংলা ও বাঙালীর জন্মান্তর হয়েছিল। এই সময়ে যাঁরা ছোটগল্পের আসরে দেখা দিয়েছিলেন তাঁদের জন্ম ১৯২০ খৃষ্টাব্দের কাছাকাছি সময়ে। তাঁরা যখন তারুণ্যে পদার্পণ করেন তখনি বঙ্গদেশের পালে বিপর্যয় আর অবক্ষয়ের হাওয়া লেগেছে। সেই হাওয়া ঝোড়ো হাওয়ায় পরিণত হয়েছে দ্বিতীয় বিশ্ব সমরের অন্তিম পর্বে। তখন এই লেখকরা ২২-২৩ বছরের তরুণ। ভারসাম্যের বিচলন, মূল্যবোধের বিনষ্টি, সুস্থ জীবনবোধের অবসান, অবক্ষয়ের প্রতিষ্ঠা, বিপর্যয়ের বিজয়, স্বাধীনতা পরবর্তী ভারতবর্ষে বাংলার আর্থনীতিক রাজনীতিক মহিমার অবসান : এই পটভূমিতে আলোচ্যমান লেখকরা চোখ মেলে তাকিয়েছেন, দেখেছেন ক্ষুব্ধ স্বদেশভূমি, অবাক মেনেছেন ভাগ্যের পদাঘাতে। এই গোষ্ঠীভূক্ত লেখকেরা হলেন- নরেন্দ্রনাথ মিত্র, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, নবেন্দু ঘোষ, জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী, সন্তোষ কুমার ঘোষ, বিমল কর, সমরেশ বসু, রমাপদ চৌধুরী। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় আর সুবোধ ঘোষ

এঁদের পথিকৃৎ। সতীনাথ ভাদুড়ী, স্বরাজ বন্দ্যোপাধ্যায়, সুধীর রঞ্জন মুখোপাধ্যায়, আশুতোষ মুখোপাধ্যায়, বারীন্দ্রনাথ দাস, হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায় - এঁদেরই সহযাত্রী।

১৯৪৭ - এর ১৫ ই আগষ্ট এই দিনটি বাংলা সাহিত্যে বিভাজন–রেখা রূপে দেখা দেয়নি। স্বদেশী আন্দোলন যেভাবে বাংলা সাহিত্যকে উজ্জীবিত করেছিল, গান্ধীজীর নেতৃত্বে অসহযোগ আন্দোলন বা বহু প্রত্যাশিত স্বাধীনতা সেভাবে বাংলা সাহিত্যকে প্রাণিত করেনি। প্রাক্ স্বাধীনতা পর্বের বাঙালী গল্প লেখকদের রচনায় কোন আত্মিক সংকট দেখা দেয়নি, কারণ ব্যক্তিজীবনে ব্যক্তিগত বিশ্বাসের ক্ষেত্রে তাঁরা সংকটে পড়েননি। তিরিশের দশকে সব গল্প লেখক স্বাধীনতা মন্ত্রে উজ্জীবিত হয়েছিলেন এমন কথা নিশ্চয়ই বলা যায় না। বুদ্ধদেব বসু বা বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পর্কে সেকথা বলা যায় না। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় বা সরোজকুমার রায়চৌধুরী যে অর্থে জাতীয়তাবাদী লেখক, সে অর্থে বুদ্ধদেব বা বিভূতিভূষণকে গ্রহণ করা যায় না। তবু ব্যক্তির আত্ম সংকট সেদিন ছিল না। দেশের মাটির সঙ্গে কোথাও না কোথাও একটা যোগ ছিলই। সেই সুযোগ কল্লোল-গোষ্ঠীর গল্প লেখকদের মধ্যেও ছিল। অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, প্রেমেন্দ্র মিত্র, যুবনাশ্ব পরিচিত জীবন ও পরিবেশ থেকে নিজেদের সম্পূর্ণ সরিয়ে নিতে পারেননি। কিন্তু স্বাধীনতার পরে বিশেষ করে পঞ্চাশের দশকে, রাজনৈতিক স্বাধীনতা-প্রাপ্তির পরবর্তী সময়ে, গল্প লেখকদের কাছে আশু প্রত্যাশিত স্পষ্ট কিছু রইলো না। আদর্শবাদের অবসান, বিশ্বাসের বিদায়, সমষ্টি-জীবনের দায় দ্বায়িত্বের অস্বীকৃতি দেখা গেল। প্রাক্ স্বাধীনতা পর্বে বাংলা গল্প কবিতার বিদেশী প্রেরণা বলতে মুখ্যত ইংরেজী গল্প কবিতাকে বুঝাত। স্বাধীনতার পরে সেখানে সেই সঙ্গে দেখা দিল জার্মান রুশ গল্প-কবিতা। তাদের নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষা অনুবাদের ও অনুকরণের মাধ্যমে বাংলা ছোট গল্পের ক্ষেত্রে দেখা দিল নতুন ধরণের গল্প। বুদ্ধদেব বসুর 'সবিতা দেবী', মনোজ বসুর 'বাঘ', বিভূতিভূষণের 'আহ্বান' জাতীয় গল্প আর দেখা গেল না, এমন কি তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'শেষ কথা' বা অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের 'দুইবার রাজা' – জাতীয় গল্প বিদায় নিল।

স্বাধীনতা প্রাপ্তি মুহূর্তে যেসব গল্প লেখকের বয়স তিরিশের কাছাকাছি তাঁদের কাছে স্বাধীনতা এল বিবর্ণ অনুজ্জ্বল ধূসর দিনের ইঙ্গিত নিয়ে। তরুণ সূর্যের প্রত্যাশায় তাঁদের চিত্ত উন্মুখ হয়ে উঠেছিল; একথা বলা যায় না। স্বভাবতই এঁরা কিছুটা হতাশ, বিশ্বাসরিক্ত, পরিবেশ সচেতন এবং বাস্তববাদী। আর এঁরা সবাই এসেছেন নিম্ন মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় থেকে।

স্বাধীনোত্তর পর্বে বাংলা ছোটগল্প অন্ত্যজ শ্রেণীর মানুষদের নিয়ে প্রায় সব লেখকই গল্প লিখেছেন। যেমন– তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, নরেন্দ্রনাথ মিত্র, কমল কুমার মজুমদার, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় নবেন্দু ঘোষ, সতীনাথ ভাদুড়ী, গজেন্দ্রকুমার মিত্র, মহাশ্বেতা দেবী, মনোজ বসু, রমাপদ চৌধুরী, সন্তোষ কুমার ঘোষ, বিমল কর, সমরেশ বসু, সমরেশ মজুমদার, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ, দিব্যেন্দু পালিত, সাধন চট্টোপাধ্যায়, ভগীরথ মিশ্র, আবুল বাশার, স্বপ্নময় চক্রবর্তী, কিন্নর রায় প্রমুখ কথা সাহিত্যিকেরা।

দুই) তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৯৮-১৯৭১)

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় জন্মগ্রহণ করেন ১৮৯৮ সালের ২৩ শে জুলাই এবং মৃত্যু ১৯৭১ সালের ১৪ ই সেপ্টেম্বর। চুয়াত্তর বছরের দীর্ঘ পরিক্রমায় তিনি বহু বিচিত্র অভিজ্ঞতা ও সৃষ্টির অধিকারী। আর এই বিচিত্র অভিজ্ঞতায় তিনি লিখেছেন বহু গল্প। তিনি স্বাধীনতা পূর্বে যেমন গল্প লিখেছেন, তেমনি স্বাধীনতার পরবর্তীতেও তিনি গল্প লিখেছেন। তবে আমাদের আলোচ্য স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ের লিখিত গল্পগুলি। তাঁর গল্পের সংখ্যা ১৯০ এবং গল্পগ্রন্থের সংখ্যা ৩৫। তাঁর গল্পগুচ্ছ তিনটি খন্ডে বিভক্ত। প্রথম খন্ডে (১৯৭৫) ৬৬ টি, দ্বিতীয় খন্ডে (১৯৭৬) ৬৫ টি এবং তৃতীয় খন্ডে (১৯৭৭) ৫৯ টি গল্প। ৩৫ টি গল্পগ্রন্থের কালানুক্রমিক তালিকা এই –

১) 'ছলনাময়ী' (১৯৩৬)
২) 'জলসাঘর' (১৯৩৭)
৩) 'রসকলি' (১৯৩৮)
৪) 'তিন শূন্য' (১৯৪৩)
৫) 'প্রতিধ্বনি' (১৯৪৩)
৬) 'বেদেনী' (১৯৪৩)
৭) 'দিল্লী কা লাড্ডু' (১৯৪৩)
৮) 'যাদুকরী' (১৯৪৪)
৯) 'স্থলপদ্ম'(১৯৪৪)
১০) '১৩৫০' (১৯৪৫)
১১) 'প্রসাদমালা' (১৯৪৫)
১২) ' হারানো সুর' (১৯৪৫)
১৩) 'ইমারত' (১৯৪৭)
১৪) 'শ্রীপঞ্চমী' (১৯৪৭)
১৫) 'মাটি' (১৯৫০)
১৬) 'শিলাসন' (১৯৫২)
১৭) 'কামধেনু' (১৯৫৩)
১৮) 'বিস্ফোরণ' (১৯৫৫)
১৯) 'কালান্তর' (১৯৫৬)
২০) 'বিষপাথর' (১৯৫৭)
২১) 'মানুষের মন' (১৯৫৮)
২২) 'রবিবারের আসর' (১৯৫৮)
২৩) 'পৌষলক্ষ্মী' (১৯৬০)
২৪) 'আলোকাভিসার' (১৯৬০)

২৫) 'চিরন্তনী' (১৯৬২)

২৬)' অ্যাক্সিডেন্ট' (১৯৬২)

২৭)' তমসা' (১৯৬৩)

২৮) 'চিন্ময়ী' (১৯৬৪)

২৯) 'তপোভঙ্গ' (১৯৬৬)

৩০) 'দীপার প্রেম' (১৯৬৬)

৩১) 'জায়া' (১৯৬৭)

৩২) 'পঞ্চকন্যা' (১৯৬৭)

৩৩) 'শিবানীর অদৃষ্ট' (১৯৬৭)

৩৪) 'এক পশলা বৃষ্টি' (১৯৬৭)

৩৫) 'রূপসী বিহঙ্গিনী (১৯৭০)

গল্পকার তারাশঙ্করের শিল্পী মানসের উৎস সন্ধান করতে হলে আমাদের বার বার তাঁর লেখা 'আমার কালের কথা' (১৯৫৮)-র আশ্রয় নিতে হয়। সেই সঙ্গে আমাদের এও মনে রাখতে হবে যে, দুখন্ডে সম্পূর্ণ 'আমার সাহিত্য জীবন'। এই স্মৃতিচারণায় উদ্ঘাটিত হয়েছে অর্দ্ধ শতাব্দীর সাহিত্য সাধনার বিচিত্র কাহিনী। স্বদেশী আমলের জাগরণ মুহূর্তে তিনি ছিলেন সাত বছরের কিশোর। বীরভূমের ক্ষয়িষ্ণু জমিদার বংশের সন্তান ছিলেন তিনি। এই জমিদারী প্রথা ও সামন্ততান্ত্রিক সমাজ-কাঠামো আশ্রিত ভুস্বামীদের প্রতি তার ছিল দ্বিধামিশ্রিত আকর্ষণ। তিনি জ্ঞানে জানতেন, এ কাঠামো ভেঙে ফেলাই উচিৎ, অথচ এর প্রতি তার ছিল মমতা। কংগ্রেস কর্মী তারাশঙ্কর জমিদারী-প্রথার অবসান চেয়েছিলেন, মানবতাবাদী তারাশঙ্কর-এর মধ্যে জীবনের অনেক গভীর মুহূর্তকে পেয়েছিলেন। বীরভূমের গ্রামীণ সমাজ ও নিসর্গ তাকে আকর্ষণ করেছে, অন্যদিকে কলকাতার উচ্চশিক্ষা-সাহিত্য সংস্কৃতি-বৈদগ্ধ্য তাকে টেনেছিল। ফলে তারাশঙ্করের শিল্পজীবনে দোটানা লক্ষ্য করা যায়। কেবল উপন্যাসে নয়, ছোটগল্পেও তারাশঙ্কর দেখিয়েছেন গ্রামীণ সমাজ কিভাবে পরিবর্তিত হচ্ছে। যন্ত্রনির্ভর উৎপাদন ব্যবস্থা, আধুনিক ইন্ডাষ্ট্রী কিভাবে সংরক্ষিত গ্রামীণ সমাজের শাসন ও অবরোধকে ভেঙে দিচ্ছে, কিভাবে আধুনিক নাগরিক জীবনের সুখ স্বাচ্ছন্দ্য ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্য গ্রামের অবহেলিত মানুষকে বদ্ধ সমাজ ভেঙে আসতে প্রলুব্ধ করছে, কিভাবে জীবনের গভীরে প্রোথিত শতাব্দী-সঞ্চিত সংস্কারে ও ধর্মবিশ্বাসের ভিত্তিমূল আলগা হচ্ছে। তারাশঙ্করের গল্প ও উপন্যাসে তার চিত্র ও বিশ্লেষণ পাই।

নিজ সাহিত্য কর্ম সম্পর্কে তারাশঙ্করের বক্তব্য প্রাণিধানযোগ্য।

১) "আমার সাহিত্য কর্মের মধ্যে কালের বিবর্তন সামাজিক পরিবর্তনের মধ্যে বিলীয়মান গোষ্ঠী সম্প্রদায়, বিশেষ ধারার ব্যক্তিত্ব একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছে। ..... ক্রমশ বিলীয়মান জমিদার শ্রেণী আমার সাহিত্যে খুব বড় অংশ জুড়ে রয়েছে।"

২) "জমিদার শ্রেণী ছাড়াও বেদে, পটুয়া, মালাকার, লাঠিয়াল, চৌকিদার, ডাকহরকরা প্রভৃতি যারা সমাজের বিশেষ অংশ জুড়ে ছিল তাদের নিয়ে গল্প রচনার প্রেরণা হোক বা অভিপ্রায়ই

হোক আমার মধ্যে এসে ছিল, বোধকরি এদের কথা অন্য কেউ বিশেষ করে আগে লেখেননি বা লেখেন না বলে।"

৩) "সামাজিক পেশার প্রভাবে এরা সচরাচর মানুষ থেকে স্বতন্ত্র ও অভিনব হয়ে ওঠে। এ থেকেই আর একটি দিক আমার দৃষ্টিগোচর হয়েছিল। সেটি সময়সাময়িক বিশেষ ঘটনা, যা সমাজ-জীবনকে প্রভাবিত করে; ক্ষেত্রে ক্ষেত্রে পুরাতনকে সেই প্রভাব পরিবর্তিত করে।" (আমার সাহিত্য জীবন – দ্বিতীয় খন্ড)

এই তিনটি সূত্র অনেকেই লক্ষ্য করেছেন। তারাশঙ্করের ছোটগল্পের বিচিত্র নরনারীর জীবন এই তিনসূত্রে গ্রথিত হয়েছে। কিন্তু আমাদের আলোচ্য দ্বিতীয় সূত্রধৃত গল্প যা স্বাধীনোত্তর পর্বে লেখা হয়েছিল। দ্বিতীয় সূত্রধৃত গল্পে যে বিচিত্র চরিত্রের মেলা, তার মধ্যে দিয়ে অজ্ঞাত অবহেলিত মানুষ কথা বলেছে। ব্রাত্য, নিচ, অন্ত্যজ বলে যাদের আমরা দূরে ঠেলেছি তারা উঠে এসেছে। স্বাধীনতা পরবর্তী যেসব গল্পে অন্ত্যজ জীবনের ছবি প্রতিভাত হয়েছে, সেই সব গল্পগুলি হল 'ডাইনী', 'চোরের মা', 'চোর', 'চৌকিদার', 'মালাকার', 'জুয়াড়ী', 'প্রহ্লাদের কালী', 'বেদের মেয়ে', 'বরম লাগের মাঠ' 'স্বাধীনতা', 'কবি', 'ডাইনী' । বাংলা ছোটগল্পের সৃষ্টিলগ্ন থেকে আজপর্যন্ত প্রায় প্রত্যেক গল্পকারের গল্পেই অন্ত্যজ জীবনকথা কমবেশী স্থান পেয়েছে। ভিন্ন ভিন্ন গল্পকারের জীবন দৃষ্টির পটভূমি ভেদে তাদের ছোট গল্পে অন্ত্যজ জীবনের চালচিত্র স্বতন্ত্র রূপমূর্তি নিয়ে চিত্রিত হয়েছে। কিন্তু তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের অন্ত্যজ জীবন নির্ভর ছোটগল্প অন্ত্যজদের জীবনকে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণে ভাগ করে আলোচনা করেছি। যেমন, ব্যক্তিজীবনাশ্রিত, পরিবারাশ্রিত, ধর্মাশ্রিত, চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যাশ্রিত প্রভৃতি।

ক) ব্যক্তিজীবনাশ্রিত

তারাশঙ্করের 'স্বাধীনতা' গল্পে অন্ত্যজ সম্প্রদায়ের 'আকাল হাড়ি' মানবিক সহানুভুতি, উদারতা ও মহানুভবতার অনন্য সৃষ্টি । বাবার মৃত্যুর প্রতিশোধাকাঙ্ক্ষী অন্ত্যজ আকাল হাড়ি শুধুমাত্র উদারতার কারণে নাগালের মধ্যে পেয়েও এক ইংরেজ সাহেবকে প্রাণে বাঁচিয়ে দিয়েছেন। 'আকাল হাড়ি'র বাবা চণ্ডী হাড়িকে কুঠিয়াল সাহেব অন্যায়ভাবে গুলিবিদ্ধ করে হত্যা করেছিল। এই মৃত্যুর প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য আকাল দৃঢ় প্রতিজ্ঞ ছিল। সাহেবদের সঙ্গে সমানে সমানে লড়ার জন্য সে দুটি বন্দুক জোগাড় করল ডাকাতি করে। তার পরে তার জেল হল। জেল থেকে ছাড়া পেয়ে সে দেখল কুঠি তুলে দিয়ে সাহেবরা চলে গেছে। তবুও আকাল দমে যায়নি। সে যুদ্ধে গেল তুর্কি মুলুকে। সেখানে তুর্কি আক্রমণে দিশেহারা আকাল হঠাৎ করে কর্নেল সাহেবকে অর্দ্ধমৃত অবস্থায় সামনে পেল। প্রতিশোধাকাঙ্ক্ষী আকাল সাহেবের করুণ আর্তিমাখা চোখ দেখে মানবিক সহানুভূতিতে বিগলিত হল। মুহূর্তে তার বাবার মৃত্যোন্মুখ চক্ষুর করুণ চাউনির কথা মনে পড়ল তার। দুটি চাউনি অবিকল একই। তখন আকাল এক অদ্ভুত কাজ করল। সাহেবকে কাঁধে করে সে একটি ক্যাম্পে পৌঁছে দিল। পিতৃহত্যার প্রতিশোধ যদিও তার নেওয়া হল না, তবুও তার এই উদারতা ও মহানুভবতা তাকে অনন্য করেছে। দেশ স্বাধীন হলে সে উল্লাসিত হয়েছে এই ভেবে যে

তার বাবার হত্যাকারী সাহেবেরা তো দেশছাড়া হয়েছে। আকালের কথায়–

"ধরমরাজ আমার মান রেখেছে, বাবার মরণের শোধবোধ হয়েছে।"

(স্বাধীনতা– তারশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়)

তারাশঙ্করের 'কবি' গল্পটিতে হাড়ি বংশোদ্ভূত নিতাই কবিয়ালের প্রেম-ব্যর্থ নিরাশার কাহিনী বর্ণিত হয়েছে। প্রেমাস্পদ মুচি জাতির রমণী ঠাকুরঝিকে না পাওয়ার বেদনা নিতাই হাড়িকে যন্ত্রণাদগ্ধ করেছে। নিতাই হাড়ি তার বংশের পেশা চুরি-ডাকাতিতে না গিয়ে স্টেশনে কুলির কাজ করে। থাকে গেটম্যানের সঙ্গে। নিতাই গেটম্যানকে রাজা বলে ডাকে। স্টেশনে কুলিগিরির সঙ্গে সঙ্গে অবসরে নিতাই কবিগানের চর্চা করে। নিতান্ত ছোটজাতের মানুষ কবি হবে– এতো অসম্ভব কান্ড। তাই ঠাট্টা করে, বিদ্রুপ করে, অনেকে তাকে কবি না বলে 'কপি' বলে অর্থাৎ হনুমান বলে সম্বোধন করে। নিতাই এতো সব গায়ে মাখে না। কবিয়াল হওয়ার স্বপ্ন বুকে নিয়ে সে প্রত্যহ শাস্ত্রপাঠ ও রেওয়াজ করে চলে। সেই সাথে মনের কোণে স্বপ্ন বাঁধে ঠাকুরঝিকে নিয়ে। ঠাকুরঝি তাকে প্রত্যহ দুধ জোগান দেয়। নিতাই ঠাকুরঝিকে ভালোবাসে। ঠাকুরঝিও কবিয়ালকে ভালবাসে। একদিন কবিগান করার অভূতপূর্ব সুযোগ আসে নিতাইয়ের সামনে। চণ্ডীতলার মেলায় কবিয়াল নোটনদাস গান না করে চলে যায়। ঠিক হয় মহাদেব কবিয়ালের দলকে দু'ভাগ করে লড়াই চলবে। সে আসরে নিতাই একটা দলের দোহার হয়। কিন্তু আসরে নেমে নিতাই সবাইকে চমকে দেয়। সে দোহারীর আসনকে ছাড়িয়ে মূল গায়েনে পরিণত হয়। এলাকার ডাকসাইটে কবি মহাদেব কবিয়ালের বিরুদ্ধে এক রকম পাল্লা দিয়েই গান বেঁধে গেল নিতাই। জয় জয় পড়ে গেল তার নামে। বাবুরা নিতাইকে মেডেল পুরস্কার দেওয়ার কথা ঘোষণা করল।

নিতাইয়ের এই সাফল্যে অসম্ভব খুশি হল ঠাকুরঝি। এমন অনুকূল পরিস্থিতিতে স্বামী পরিত্যক্তা ঠাকুরঝিকে বিয়ে করার সিদ্ধান্ত নেয়। সেই মতো বন্ধু রাজাকে পাঠায় ঠাকুরঝিকে আনার জন্য। প্রেমের পরিণতি প্রাপ্তির আনন্দে সে ফুলের মালা নিয়ে স্টেশনে অপেক্ষায় থাকে। কিন্তু এই তৃপ্তি সুখকর অপেক্ষার নিবৃত্তি ঘটে না। রাজা ঠাকুরঝিকে এনে জানায় সে নিজেই ঠাকুরঝিকে বিয়ে করেছে। এ খবরে প্রচন্ড যন্ত্রণায় রুদ্ধবাক্ হয়ে যায় কবি। চলে যায় দূরে, এলাকা ছেড়ে:

"নিতাই ফতুয়ার পকেট হইতে মেডেলটি বাহির করিয়া রাজাকে দিয়া বলিল বউকে দাও রাজন্ । বলিয়াই সে ট্রেনে চড়িয়া বসিল, বলিল জংশন চললাম।"

(কবি : বন্দ্যোপাধ্যায় তারাশঙ্কর)

অপ্রাপ্তির হাহাকারে অন্ত্যজ শ্রেণীর মানুষ নিতাই কবিয়ালের জীবনটি শূন্য হয়ে গেল। প্রেমের জন্য অন্ত্যজ শ্রেণীর মানুষদের এমন এ রিক্ত-হৃদয় হওয়ার কাহিনী অন্ত্যজ শ্রেণীর মানুষদের স্বতন্ত্র জীবন-বৈশিষ্ট্যকে প্রকাশ করে।

তারাশঙ্করের 'একটি প্রেমের গল্প' গল্পটি এক সাঁওতাল নারী ফুলমণির প্রেম-পরাজয়ের গ্লানিমার ও হতাশার গল্প। ফুলমণির রূপ-যৌবন দুই-ই আছে। সে কারণে পাড়ার ছেলেদের পাত্তা না দিয়ে ভিন্ন গাঁয়ের বলিষ্ঠ পুরুষ বুধনকে বিয়ে করে। কিন্তু সুখ পায় না ফুলমণি। বুধন এক

কারখানা শ্রমিক হাসিকে 'সাঙা' করে। অবহেলিত হয় ফুলমণির প্রেম। সে সেই অবহেলার শোধ নিতে খুনের পরিকল্পনা নিয়ে হাজির হয় হাসি-বুধনের ঘরে। কিন্তু পারে না ফুলমণি। বরং ধারালো কাটারি দিয়ে নিজের কন্ঠনালী কেটে ফেলে সে। পরে সুস্থ হয়ে সে নার্স হয়েছে। লেখা পড়া শিখেছে। কিন্তু তার প্রেম মরে যায়নি। সে বুধনের সমস্ত খবরই রাখে। মনের মধ্যে তার জন্য ব্যথা পায়। অতৃপ্তির হাহাকার ও বেদনা বুকে নিয়ে ফুলমণি মানুষের সেবিকা হয়েই জীবনের পরবর্তী দিনগুলি কাটায়।

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের কিছু গল্পে আবার অন্ত্যজ মানুষদের অপত্যস্নেহ, অপার বাৎসল্য এবং মাতৃপিতৃ প্রাণের স্নেহার্তি ও আকুতি ফুটে উঠেছে। দারিদ্র লাঞ্ছিত জীবনে অন্ত্যজ শ্রেণীর মানুষদের জীবনে হাজারো বাধা বিপত্তি, অভাব-অনটনের মধ্যেও আর পাঁচজন মানুষের সঙ্গে অন্ত্যজ শ্রেণীর মানুষদের কোন পার্থক্য নেই। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'চোরের মা' গল্পটি পর্যালোচনা করলে এর সত্যতা প্রতিপন্ন হবে।

এই গল্পে এক ডোম রমণীর মাতৃ-প্রাণের অপত্য-স্নেহার্তির অভিনব প্রকাশ চিত্রিত হয়েছে। ডোম পাড়ার বিধবা ফিঙের মা কায়ক্লেশে পরের বাড়ীতে ঝি-গিরি করে সংসার চালায়। বালক ফিঙে সে বাড়ীর মাহিন্দর। কিন্তু ফিঙের মন বসে না কাজে। সে পাড়ার অন্যান্যদের সঙ্গে রাতের আঁধারে চুরি করতে বেরুতে চায়। কিন্তু মায়ের বাধাতে সে যেতে পারে না। মা কান্না কাটি করে তাকে আটকে রাখলেও ছেলের সতের বছর বয়সে মা আর তাকে আটকাতে পারে না। প্রথম দিন রাতেই সে চৌধুরী বাড়ীতে চুরি করতে গিয়ে ধরা পড়ে এবং প্রহার সহ্য করতে না পেরে মারা যায়। এখবর শুনে যেন বোবা হয়ে যায় তার মা। পাথর হয়ে যায়। তার চোখ দিয়ে এক ফোটা অশ্রুও ঝরে না। বোবা কান্না বুকে চেপে জীবন কাটে ফিঙের মা'র। কালের ফেরে চৌধুরীদের দশ বছুরে পুত্র সন্তান মারা যায়। অন্য অনেকের মতো ফিঙের মাও তাকে দেখতে যায়। সে দেখে মৃত-সন্তানের ওপর ছেলেটির মা বোবা হয়ে পাষাণের মতো পড়ে রয়েছে। ফিঙের মা বুঝতে পারে ঐ মায়ের ব্যথা ও যন্ত্রণার কথা– বুঝতে পারে নিজের জীবনের অভিজ্ঞতা দিয়ে। এতদিন পর নিজের ছেলেও ঐ অসহায় মায়ের জন্য চোখের কোণ দিয়ে জল ঝরে পড়ে আর :

"... একে বারে গ্রাম ছাড়িয়া নির্জন প্রান্তরে আসিয়া বুক ফাটাইয়া চিৎকার করিয়া উঠিল– ওরে বাচা আমার, ও মানিকরে।" – এ কান্না মনে হয় শুধু ফিঙের জন্য নয় ঐ ছেলেটির জন্যও। মাতৃপ্রাণের আকুতি ও স্নেহার্তি এ গল্পে এক নবতম মাত্রাকেই উন্মোচিত করেছে বলা যায়।

অন্ত্যজ শ্রেণীর সম্প্রদায়ের মানুষদের ব্যক্তি জীবনাশ্রিত গল্পগুলিতে ব্যক্তি জীবনের হিংস্রতা, রহস্যময়তা, ক্রূরতা প্রভৃতি স্থান পেয়েছে। যেমন তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'চোর' গল্পটি। এই গল্পটিতে শশী ডোমের জীবনের রহস্যময় চৌর্যবৃত্তির কাহিনী বর্ণিত। ডোমপাড়ার সর্দার, কৌশলী চোর শশীদের তিনপুরুষের রেওয়াজ ধান চুরি করা। শশীও তাই করে। কেউ কখনও শশীকে ধরতে পারেনি। সেই শশীই হঠাৎ করে রাতে পঙ্গু হয়ে গেল। একই সময়ে বি.এল. কেসে ডোমপাড়ার কুড়ি থেকে পঞ্চাশ বছুরে সকল পুরুষকে দীর্ঘমেয়াদি কারাবাসে জেলে ভরা হল। ফলে পাড়ার সমস্ত

কন্যা-বধূদের রুটি রুজির ভার এবং সামলে রাখার দ্বায়িত্ব পড়ল পঙ্গু শশীর উপর। এমন দুর্দিনে শশী বিধান দিল তালপাতার আসবাব তৈরী করেই যেন সমস্ত মেয়েরা জীবিকা চালায়। প্রথম কিছুদিন সব ঠিকঠাক চলল। তারপর দেহ বিক্রি করেই সুলভে টাকা রোজগারের দিকেই মেয়েরা মন দিল। এমনকি শশীর মেয়ে সরলাও সে দলে ভিড়ল। পাড়ার এই অধঃপতন দেখে ক্রোধে ফুঁসতে থাকে শশী। কিন্তু পঙ্গু দেহ নিয়ে সে কিছুই করতে পারল না। শেষে একদিন অধৈর্য হয়ে, নিজের পঙ্গুত্বের কথা ভুলে মেয়ের প্রণয়ীকে তাড়া করে শশী :

> "লোকটা ছুটিয়া পালাইল – ক্রোধে আত্মহারা শশী আত্মসম্বরণ করিতে পারিল না – সেও ছুটল" (চোর : বন্দ্যোপাধ্যায় তারাশঙ্কর)

শশী নিজেই অবাক হয়ে গেল এই দেখে যে, সেও ছুটতে পেরেছে এতদিন পর। তার মনে নতুন উদ্যম এল। শুরু হল তার রহস্যময় চুরির কাজ। রাতে গৃহস্থের বাড়ী থেকে থালা-বাসন চুরি করে সে, আর দিনে পাড়াতে পঙ্গু সেজে বসে থাকে। ফলে কেউ তাকে সন্দেহ করতে পারে না। দারোগা থেকে শুরু করে গ্রামের সব লোকের মাথা খারাপের জোগাড় হয়। চুরি হতেই থাকে – কিন্তু চোর ধরা আর পড়ে না। দারোগা শশীকে জিজ্ঞাসাবাদ করতে এলে নিজের পঙ্গুত্বের কথা জানায় সে। ক্রমে শশী আরও রহস্যময় হয়ে পড়ে। যদিও অমৃত ঘোষালের বাড়ীতে চুরি করতে গিয়ে ধরা পড়ে।

ব্যক্তিজীবনাশ্রিত অন্ত্যজ জীবন কেন্দ্রিক কোন কোন গল্পে দেখি, অন্ত্যজ শ্রেণীর মানুষদের নীতিবোধ-নীতিচেতনা গল্প-বিষয় রয়েছে। আবার কোন কোন গল্পে ব্যক্তিজীবনের শুভবোধের প্রকাশ রয়েছে। কোনো কোনো গল্প দেখি ব্যক্তিজীবনের মূল্যবোধ ও সুকুমারবৃত্তি অবলম্বনে গঠিত। আবার কোনো কোনো গল্পে দেখি ব্যক্তিজীবনের সুমতি-কুমতির দ্বন্দ বক্তব্য বিষয় রয়েছে। এমন ধারার বিষয় সত্যকে স্পষ্ট করার জন্য তারাশঙ্করের 'টহলদার' ও 'মালাকার' গল্পদ্বয়ের আলোচনা করা যেতে পারে।

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'টহলদার' গল্পটির বিষয় এক বাউলের ব্যক্তি জীবনের নীতিচেতনা, বাউলের কামনা-বাসনার মোহজালে আবদ্ধ হওয়া ও সেইহেতু তার হৃদয়ের দ্বান্দ্বিক টানাপোড়েনের কাহিনীই এ গল্পের মূল বর্ণিতব্য বিষয়। পার্থিব কামনাযুক্ত বাউল রামদাস চৌর্যকার্য্যে নিযুক্ত হতে গিয়েই সম্বিত ফিরে পেয়েছে। সে চুরি করার জন্য শশী ডোমকে বকুনি দিলেও নিজে একটা বেহালা চুরি করার জন্য তৎপর হয়েছে। যদিও টহলদার রামদাসের মনের মধ্যে এই হেতু প্রচন্ড টানাপোড়েনের সূত্রপাত ঘটেছে। নিতান্ত অনভ্যস্ত কর্মে লিপ্ত হতে গিয়ে সে হীনমন্যতায় ভুগেছে। তার মনের সুকুমার চিন্তা তাকে বাধা দিয়েছে। গল্পে দেখি, চুরি করে নেমে আসার সময় নিজেরই ছায়া দেখে সে চমকে উঠেছে :

"বৈঠকখানার শেষ সিড়িতে নামিয়া বাউল চমকিয়া উঠিল, কে ? সঙ্গে সঙ্গে তাহার আলখাল্লার ভেতর হইতে বেহালাটা পাকা সিড়ির উপর সশব্দে পড়িয়া গেল। রাস্তাটার ওপাশের বাড়ীর দেওয়াল

ঘেষিয়া কে একজন দাঁড়াইয়া ছিল।... রামদাস এতক্ষণে বুঝিল, এ তাহারই ছায়া।"

(টহলদার: বন্দ্যোপাধ্যায় তারশঙ্কর)

– অর্থাৎ গল্পে দেখা যাচ্ছে, বাউল জীবনের দ্বান্দ্বিকতার টানাপোড়েন। সুমতি ও কুমতির দ্বন্দ্বে 'টহলদার' গল্পটি গড়ে উঠেছে। আসক্তি ও আসক্তি হীনতার মাঝখানে এ গল্প লেখকের অনবদ্য শিল্প রূপায়ণ।

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'মালাকার'গল্পটির বিষয় হয়েছে রজনী মালাকারের আত্মশুদ্ধির কথা। অবক্ষয়ী মূল্যবোধ থেকে মূল্যবোধের পুনঃপ্রতিষ্ঠার কাহিনী। অবিবাহিত রজনী ডাকসাজ ও আতশবাজী তৈরীর অস্তাদ শিল্পী। এই সূত্রে তার টাকার কোন অভাব নেই। তবে চরিত্রে তার একটাই দোষ–প্রবৃত্তির দোষ। রমণী-রমণে তার সমস্ত পয়সা খরচ করে সে। চার দিকে তার মিতেনী-সাঙাৎনী। কিন্তু স্বদেশী আন্দোলন জোরদার হলে সে বিপদে পড়ে। বিদেশী রাংতা ও চুমকির সাজে এবার কেউ প্রতিমা সাজাতে চায় না। শেষ পর্যন্ত এই সংকট কাটিয়ে ওঠে রজনী। সিদ্ধান্ত নেই শুধু শোলার নক্সাতেই এবার সে প্রতিমা সাজাবে। এই সিদ্ধান্তের জন্য সে প্রচুর অর্ডার পায়। কিন্তু কাছে তার পয়সা নেই। শেষ কালে বন্ধু কালী সিংয়ের কাছ থেকে টাকা ধার নিয়ে মেলায় যায় শোলা কিনতে। কিন্তু মেলাতে গিয়ে রূপোজীবনীদের পিছনেই সমস্ত টাকা খরচ করে ফেলে। ওদিকে শোলা তো তার চাই। তাই মেলাতেই একটি ছোট্ট শিশু কন্যার গলার হার ছিনতাই করে সে শোলা কিনে ফিরে আসে। হাতির দাতের মতো সাদা শোলার কারুকার্যে সে সবাই কে মোহিত করে দেয়। ফলে প্রচুর টাকাও পায় সে। তবে এই টাকা সে আর মেয়ে মানুষের পিছনে খরচ করে না। যে মেয়েটির হার সে চুরি করেছিল, তার চোখের করুণ আর্তি তার মনকে আমূল পরিবর্তিত করে দিয়েছে। এতদিন তার যৌবনের খোরাক - যৌবনবতী মেয়েদের শাড়ি-গয়না দিয়ে তাদের মন জয় করতো সে। এবার তার ভিন্ন প্রতিজ্ঞা :

" রজনী হাসিয়া বলিল এবার থেকে মা-মণির খুকুমণিদের সাজাবো মিতেনী, তোমাদের তো সাজালাম এতদিন।" (মালাকার : বন্দ্যোপাধ্যায় তারাশঙ্কর)

–রজনীর এই সিদ্ধান্ত তার মূল্যবোধ পরিবর্তনের সূচক। প্রবৃত্তির অন্ধকার থেকে আত্মশুদ্ধির চরমে প্রত্যাবর্তনের ইঙ্গিত।

ব্যক্তি জীবনাশ্রিত অন্ত্যজ জীবনের ছবি দু'একটি গল্পে অন্ত্যজ শ্রেণীর মানুষদের অন্ধবিশ্বাস ও প্রথা গল্পের বিষয় হয়েছে। এসব ক্ষেত্রে সামাজিক প্রথা ও আচারের চাপে পিষ্ট হয়েছে অন্ত্যজ শ্রেণীর মানুষ। এইসব অন্ধ প্রথার নামে সামাজিক অত্যাচার ও বঞ্চনার শিকারও অন্ত্যজ মানুষদেরকে হতে দেখি। তারশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'ডাইনীর বাঁশি' ও 'ডাইনী' গল্প দুটি এই ধারার উৎকৃষ্ট নিদর্শন।

তাঁর 'ডাইনীর বাঁশি' গল্পে দরিদ্র ঘরের পিতৃমাতৃহীন বেনে কন্যা স্বর্ণর জীবনে ডাইনী প্রথা বিষন্ন পরিণতি নামিয়ে এনেছে। সমাজের আর পাঁচটা সাধারণ মেয়ের মতোই জীবন ছিল তার। জীবিকা-সূত্রে গ্রামের প্রতিটি বাড়িতেই তার যাতায়াত ছিল। তাই সমাজের নানান মানুষের হরেক

বাসনা পূরণের কাজে সে ছিল একটি জীবন্ত সমাধান। কোন গর্ভবতী বধূর জন্য আচার, টক, কিম্বা কোন শিশু পুত্রদের জন্য খেলনা বাঁশির যোগান দিয়ে স্বর্ণ তৃপ্তি পেত। বিশেষ করে পাশের বাড়ির শিশুপুত্র টুকুকে ঘিরে ছিল তার একটি ভিন্নতর অপত্য স্নেহের জগৎ। টুকুকে সে একটু বেশিই স্নেহ করতো ও ভালবাসতো। এভাবে আমোদ-প্রমোদ, সুখে-তৃপ্তিতেই দিন কাটছিল তার। কিন্তু বাধ সাধলো সমাজের অন্ধবিশ্বাসের একটি প্রথা। সবাইয়ের মিলিত প্রচেষ্টায় এবং অন্ধ সমাজ বিশ্বাসের আচ্ছন্নতায় ডাইনী বলে চিহ্নিত কর হল তাকে। এই আকস্মিক আঘাতে তীব্র জীবন যন্ত্রণায় ভেঙে পড়ে স্বর্ণ। উন্মাদনী প্রায় অবস্থা হল তার। তাকে একঘরে করে দিল সমাজ। ফলে এক ট্রাজিক বিষন্নতার অন্ধকারে হারিয়ে গেল স্বর্ণর অপত্য বাৎসল্যের বোধ, তার মানবীয় জীবন।

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'ডাইনী' গল্পে সোরধনী ওরফে সরা নামের এক ডোম রমণীর জীবনের করুণ কাহিনী লিপিকৃত হয়েছে। ডাইনী প্রথার নিষ্ঠুরতার শিকার সোরধনী। সেও আর পাঁচটা মেয়ের মতো একদিন, এক সময়ে, বাঁচতে চেয়েছিল। গল্পে দেখি, বাপ-মা-হারা সরা ভিক্ষা করেই দিনাতিপাত করতো। ক্ষুধার্ত পেটে অন্ন-দ্রব্যের দিকে তীক্ষ্ণ-দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকতো। এই তাকানো দেখে গৃহস্থেরা বলতো সরা খাবারে নজর দিচ্ছে। লোক বিশ্বাস - নজর লাগা খাবার যে খাবে তার মৃত্যু অনিবার্য। এমন খাবার খেয়েই নাকি সাবিত্রির ছেলে মারা গেছে, হারু সরকারের ছেলে আক্রান্ত হয়েছে। ফলে রটে গেল – সরা ডাইনী। সে জন্য তাকে গ্রাম ছাড়তে বাধ্য করালো গ্রামবাসী। মেরে তাড়িয়ে দিল তাকে। অথচ তার আকুতি ছিল মানুষের মতো বাঁচার। মানুষের মতো মানুষের সঙ্গে বাঁচার চেষ্টায় সে বোলপুরে এসে এক কারখানা শ্রমিকের সঙ্গে ঘর বেঁধেছিল। কিন্তু সে জোয়ান পুরুষটিও একদিন তার বিষ নজর লেগে মারা গেল। লোকভয়ে তারপরে সোরধনী ছাতি ফাটার মাঠের এক প্রান্তে অবস্থিত বাগানে আস্তানা গেড়েছিল। বিশাল মরুভূমির মতো ভয়ঙ্কর ছাতি-ফাটার মাঠের দিকে শূন্য দৃষ্টিতে চেয়ে সে বসে থাকতো। ভিক্ষা করে জীবন চলতো তার। কিন্তু এখানেও বিপত্তি ঘটলো তার। ভালোবাসা ও মানবিকতার টানে সে প্রণয় ব্যর্থ এক বাউরি যুবককে নিজের অলঙ্কার গুলো দান করতে গিয়েছিল। কিন্তু ডাইনীর ভয়ে যুবকটি রুদ্ধশ্বাসে পালাতে গিয়ে পায়ে হাড় ফুটে আহত ও নিহত হলো। – এই ঘটনা গ্রামের লোককে উত্তপ্ত করে তোলে। অত্যাচারের ভয়ে সোরধনী সন্ধ্যাতে ছাতিফাটার মাঠের মধ্যে দিয়ে পালাতে গিয়ে কালবৈশাখীর প্রবল ঘূর্ণীঝড়ের তান্ডবের মধ্যে পড়ে মারা গেল। – শুধুমাত্র সমাজের একটি অন্ধ প্রথার বলি হতে হয়েছে মানুষ সোরধনীকে। সমাজ প্রথা তার মানুষ রূপে বেঁচে থাকার অধিকার কেড়ে নিয়েছে।

খ) পরিবারাশ্রিত

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের অন্ত্যজ জীবনাশ্রিত স্বাধীনতা পরবর্তী অনেক গল্পেরই বিষয় হয়েছে অন্ত্যজ শ্রেণীর মানুষদের পরিবার জীবন। পরিবারাশ্রিত এই গল্পগুলির বিষয় পর্যালোচনায় দেখি, অন্ত্যজ জীবনের প্রেম-দাম্পত্য, তাদের প্রতি অত্যাচার-লাঞ্ছনা, তাদের পারিবারিক বিপর্যয়, পরিবারের আনন্দোল্লাস প্রভৃতি বিষয় গল্প গঠনে বিশেষ ভূমিকা রেখেছে।

পরিবার-জীবন কেন্দ্রিক অন্ত্যজ জীবনাশ্রিত গল্পগুলির কোন কোন গল্পের বিষয় হিসেবে অন্ত্যজ মানুষদের দাম্পত্য জীবন, দাম্পত্য প্রেম, প্রেমহীনতা, প্রেম-ঈর্ষা, প্রেমের জন্য স্বার্থপরতা, স্বামীভক্তি প্রভৃতি বিষয় গৃহীত হয়েছে। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'প্রতীক্ষা' ও 'বেদের মেয়ে' গল্প দুটিতে উল্লেখিত বৈশিষ্ট্যের আভাস পাওয়া যায়।

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'প্রতীক্ষা' গল্পে একটি বাউরি পরিবারের নিষ্ঠুরতা ও স্বার্থপরতা প্রকাশিত। বিলাসিনী বাউরি যুবতী পরী চরিত্র-ভ্রষ্টতার কারণে সমাজচ্যুত হলেও তার মনোহারী রূপের গুণে যুবসম্প্রদায়ের কাছে তার বিশেষ কদর। পরী তাদের মধ্যে আখনা ওরফে রাখনা ওরফে রাখহরীকে বিয়ে করে সুখেই সংসার করছিল। রাখনা মনিব বাড়ীতে চাকরের কাজ করতো। দারিদ্রের সংসারে সে সব সময় পরীর বায়না অনুযায়ী সৌখিন বিলাস দ্রব্য কিনে দিতে পারে না। যেমন, পরী রাখনার কাছে একটা ডুরেকাটা শাড়ি চাইলেও রাখনা তা দিতে অপারক হয়। এতে ক্ষুব্ধ হয় পরী। সে দোকানে কাপড় কিনতে বেরিয়ে যায় তৎক্ষণাৎ। রাখনা পরীকে ভালবাসে। তাই ঐ শাড়ির দাম যোগাড়ের জন্য সে রাতে চুরি করতে বেরোয়। সে ধরা পড়ে এবং তার দু-বছরের জেল হয়। কিন্তু পরীর জন্য তার হৃদয়টা খাঁ খাঁ করে। জেল থেকে ছাড়া পেয়ে সে পরীর খোঁজ করে জানতে পারে পরী সে রাত থেকেই নিরুদ্দেশ। পরীর জন্যই রাখনা খানিকটা পাগলের মতো হয়ে যায়। সে পরীর খোঁজে শহরে গিয়ে অনেক টাকা রোজগার করে তার পর নানান স্থানে পরীর খোঁজে বের হয়। পরী ছাড়া অন্য কোন নারীকে সে 'সাঙা' করতে নারাজ। দীর্ঘ খোঁজা খুঁজির পর রাখনা শোনে পরী কাটোয়ায় গঙ্গার ঘাটে আছে। শুনে আশায় ভরে ওঠে রাখনার মন। ভরে ওঠে রাখনার বুক। সে তার সঞ্চিত সব টাকা নিয়ে কাটোয়া ছোটে। মনে মনে হিসাব কষে, এবার যত ভাল শাড়িই পরী চাক না কেন এক কথায় রাখনা তাকে কিনে দেবে। নির্দিষ্ট স্থানে গিয়ে রাখানার চমক ভাঙে। সে পরীকে খুঁজে পায় ঠিকই, এ পরী তখন ভিন্ন মানুষ। সে রূপ যৌবনের কিছু আর অবশিষ্ট নেই। অন্ধ পরী গঙ্গার ঘাটে ভিক্ষাবৃত্তি করছে। মোহ ভাঙে রাখনার। যে আশা-আকাঙ্ক্ষা নিয়ে সে পরীকে নিতে এসেছিল, ততটাই বিতৃষ্ণা নিয়ে সে ফিরে যায়। যাবার সময় পরীকে সামান্য কটি পয়সা ভিক্ষাও দেয় সে:

"আখনা একটি টাকা বাহির করিল। কিছুক্ষণ ইতস্তত করিয়া সে আবার টাকাটাকে সযত্নে খুঁটে বাধিল। তার পর খুচরো পয়সার খুঁট খুলিয়া মাত্র একটি পয়সাই দৃষ্টিহীন পরীর হাতে দিয়া স্টেশনের পথ ধরিল।"

(প্রতীক্ষা: বন্দ্যোপাধ্যায় তারাশঙ্কর।)

দাম্পত্য প্রেমের এ নির্মম-নিষ্ঠুর পরিণতি। এ চরম স্বার্থপরতা। দেহজ-সুখ ও তৃপ্তির জন্য যে প্রেম একদা দু'কুলপ্লাবী ছিল, দেহজ সৌন্দর্যের অপসারণে তার চরম স্বার্থপরতা দেখালো। কোথায় এতটুকু বিবেক দংশন দেখা গেল না স্বামী রাখনার ব্যবহারে। অন্ত্যজ মানুষের দাম্পত্য প্রেম-জীবনের স্বার্থপরতা ও কদর্যতা এখানে জীবন্ত।

তারশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যয়ের 'বেদের মেয়ে' গল্পে এক বেদ দম্পতির একনিষ্ঠ প্রেমজীবনের

কথা চিত্রিত। শিবি বেদেনী রূপে মনোহারী। সে তার চেহারার ঠমকেই গুপ্ত বাড়ীর প্রভাত বাবুকে বশ করতে চেয়েও ব্যর্থ হয়। তার সঙ্গে বিয়ে হয় ভোলা ডাকাতের। প্রেমে-মমতায় বেশ সুখেই তাদের সংসার চলছিল। এর মধ্যে রাজনীতিক প্রভাতবাবু একদিন শিবির প্রচেষ্টায় পুলিশের হাত থেকে বেঁচে গিয়েছেন। শিবি এটা করেছে, তার পুরোনো ভালবাসাকে স্মরণে রেখে। হঠাৎ একদিন ভোলা ডাকাতি করতে গিয়ে বন্দুকের গুলির আঘাত নিয়ে বাড়ি ফিরলো। পিছন পিছন এল এক পুলিশ। শিবি লেপ-কাঁথার স্তুপের নিচে ভোলাকে লুকিয়ে রেখে বাঁচাতে চাইল। পারতোও সে কিন্তু পূর্ব অভিজ্ঞতার জন্য প্রভাতবাবুর এ কৌশল জানা ছিল বলে তিনি পুলিসের কাছে তা ফাঁস করে দিলেন। প্রভাতবাবুর এমন ব্যবহারে প্রচন্ড ক্ষিপ্ত হল শিবি বেদেনী। মুহূর্তে সে একটি ছুরির আঘাতে প্রভাত বাবুকে আঘাত করল। তার দিকে সবাই ব্যস্ত হয়ে পড়লে সেই ফাঁকে ভোলা অনায়াসে পালিয়ে গেল। গল্পে দেখি:

"দারোগা বললেন এ তুই কি করলি বলতো ? কি করবো ? নইলে যে ভোলাকে তোমরা ধরে ফেলতে। কিছুক্ষণ পরে বললে তোমরা তো জান গো। কি করবো ভোলার জন্য আমি মরতে পারি।"

(বেদের মেয়ে: বন্দ্যোপাধ্যায় তারাশঙ্কর)

অন্ত্যজ জীবনে এ এক অনন্য সাধারণ দাম্পত্য-প্রেমের উদাহরণ। প্রেমাস্পদ স্বামীর জন্য সর্বস্ব ত্যাগের এমন কি প্রাণ বিসর্জনের ও প্রতিজ্ঞা করার মধ্যে স্ত্রীর প্রেম - একনিষ্ঠতার পরিচয়ে শিবি উজ্জ্বল। একনিষ্ঠ দাম্পত্য প্রেমের অনবদ্য রূপায়ণ এই গল্প।

পরিবারাশ্রিত অন্ত্যজ জীবনাশ্রিত তাঁর ছোট গল্পগুলির মধ্যে বেশ কিছু গল্পের বিষয় হয়েছে পরিবারগুলির বিপর্যয়-বিধ্বস্ত অবস্থার কাহিনী। নানান কারণে অন্ত্যজ শ্রেণীর পরিবারগুলি বিপর্যস্ত-বিধ্বস্ত হয়েছে। কোন কোন গল্পে দেখি, নিয়তি-লাঞ্ছিত হয়ে অন্ত্যজ শ্রেণীর পরিবার বিধ্বস্ত হয়েছে। কোথাও পরিবারে বিপর্যয় নেমে এসেছে অর্থহীনতার কারণে। আবার কোন কোন অন্ত্যজ শ্রেণীর পরিবারের বিপর্যয়ের কারণ হল ধর্মপ্রথা ও ধর্মবিশ্বাস। আর এই রকমই একটি গল্প হল তারাশঙ্করের 'বরমলাগের মাঠ'।

তারশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'বরমলাগের মাঠ' গল্পে এক বাউরি পরিবারের বিপর্যয়-বিধ্বস্ত অবস্থার কথা প্রতিফলিত। একটি বরমলাগ ওরফে ব্রহ্মনাগ সাপ যেন নিয়তির মতো ভূমিকা পালন করেছে এই বাউরি পরিবারকে বিপর্যয়ে পতিত করতে। এক্ষেত্রে গল্পে দেখি, লাট কাস্ট গড়ার গোপের গ্রাম মৌজায় অবস্থিত বরমলাগের মাঠ। অভিশপ্ত মাঠ এটি। একটি বিশাল ব্রহ্মনাগ সাপ বাস করে মাঠের এক ধারে। লোকবিশ্বাস এই বরমলাগের বিষ প্রভাবে এ মাঠে ঘাস-গাছ-ফসল কিছুই জন্মায়না। একবার প্রবল বন্যার পর মাঠের বিশেষ স্থানে থুকথুকে কচি কচি ঘাস জন্মালে, তা খাওয়ার লোভে যত গরু সেখানে গেল সবকটিই ব্রহ্মনাগের দংশনে মারা গেল। এমন অবস্থায় দীর্ঘ পনের বছর কাঁউরের (কামাক্ষার) মন্ত্রসিদ্ধ ডাকিনী বাউরি ওরফে নটবর বাউরি গ্রামে ফিরে বরমলাগকে বশীভূত করতে গেল। কিন্তু ব্রহ্মনাগের আকার আয়তন দেখে ভয়ে নটবর ফিরে এল। তবে, নটবর

ফিরে এলেও তার বড় ছেলে বরমলাগকে বশ করতে গিয়ে প্রাণ হারালো। পুত্রশোকে ক্ষুব্ধ নটবর বাউরি প্রবল আক্রোশে বরমলাগকে আক্রমণ করে মেরে ফেলতে সক্ষম হলো। বরমলাগ মুক্ত মাঠের উর্বরা জমিতে এরপর চাষীরা প্রচুর ফসল ফলালো। কিন্তু বরমলাগের বিষ জ্বালায় নটবর বাউরি দুজনকে খুন করে ফাঁসিতে ঝুলে মৃত্যুবরণ করল। এতেও বরমলাগের অভিশাপ দমিত হল না। নটবরের নাতি বলরাম বাউরিও সে অভিশাপের কবলে পড়ল। তেভাগা আন্দোলনের শরিক হয়ে মাঠের ধান লুঠ করতে গিয়ে সে মালিকের বন্দুকের গুলিতে আহত হল :

"হাসপাতালে শিবনাথ জিজ্ঞাসা করলে, কেন, কেন এমন করলে বলরাম ? আমি তো তোমাকে বেশীই দিতে চেয়েছিলাম। উদাস দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল বলরাম। তারপর ক্ষীণ কন্ঠে বললে, বরমলাগ।" (বরমলাগের মাঠ : বন্দ্যোপাধ্যায় তারাশঙ্কর)

– অর্থাৎ দেখা যাচ্ছে বরমলাগ সাপ নিয়তির মতো এই বাউরি পরিবারকে নিয়ন্ত্রণ করছে-বিধ্বস্ত করছে।

পরিবার জীবনাশ্রিত অন্ত্যজ জীবন কেন্দ্রিক গল্পগুলির মধ্যে বেশ কিছু গল্পে দেখি, অন্ত্যজ শ্রেণীর মানুষের পরিবারের অত্যাচার-লাঞ্ছিত জীবন, দারিদ্র-লাঞ্ছিত অর্থদীর্ণ জীবন, পরিবারগুলির আশাহীনতা ও আশাভঙ্গ জনিত ব্যর্থতা গল্প বিষয় রূপে গৃহীত হয়েছে। এই পর্যায়ের কোন কোন গল্পে দেখি উচ্চতর সমাজ ও শ্রেণীর মানুষ কর্তৃক অন্ত্যজ মানুষদের উপর অন্যায়-অত্যাচারের চিত্র প্রতিফলিত। কোন কোন গল্পে দেখি তীব্র আর্থিক সংকট অন্ত্যজ শ্রেণীর মানুষের জীবনকে হতাশার আঁধারে তলিয়ে দিয়েছে। কোথাও প্রেম ব্যর্থতা কিংবা অতৃপ্ত স্নেহ বাৎসল্যের কারণে অন্ত্যজ পরিবার আশাভঙ্গের হাহাকারে যন্ত্রণাবিদ্ধ হয়েছে। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'মতিলাল' গল্পটি এই ধারার বিষয়-স্বরূপকে পরিস্ফুট করে।

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'মতিলাল' গল্পে এক অত্যাচার-লাঞ্ছিত হাড়ি পরিবারের আশা ও আশাভঙ্গের করুণ কাহিনী সুগভীর সমাজ মনস্কতায় চিত্রিত হয়েছে। গল্পে দেখি, দুই বিরাটাকৃতির কুৎসিৎ দর্শন নারী-পুরুষ ভুবন হাড়ি ও মতিলাল হাড়ি অনেক আশা নিয়ে ঘর বেঁধেছে। মতিলাল ভীষণাকৃতির পুরষ হলেও সে অলস প্রকৃতির তাই তাকে দেখা যায় 'সঙ্' সাজতে কিংবা যাত্রাদলের জোকাড়ের কাজ করতে। কিন্তু এতে উপার্জন যা হয় তা অত্যন্ত নগণ্য। দুজনের সংসার চলেনা এতে। তাই বাধ্য হয়ে হাড়ি-কন্যা হাড়ি-বধূ-ভূবন কায়িক পরিশ্রমে সংসারের প্রয়োজন মেটায়। কিছুটা শিল্পী মানসিকতায় মতিলাল –এর ফলে নিজের ধ্যানে মত্ত থাকতে পারে। মতিলাল ও ভুবনের প্রবল সন্তানের সখ। অথচ হাজার চেষ্টাতেও তাদের সংসারে সন্তান আসছে না। মতিলাল যে সঙ্ সেজে মানুষদের আনন্দ দিতে বের হয় তার মূলে রয়েছে, ভদ্রপাড়ার বাচ্চাদেরকে কাছে পাওয়ার অদম্য বাসনা। কিন্তু তার ভীষণাকৃতি চেহারার জন্য বাচ্চারা তাকে ভয় পায়। এমন কি এবারের 'সঙ্' দেখে একটি বাচ্চা ফিট পর্যন্তও হয়ে যায়। প্রবল স্নেহ-বাৎসল্যের টানে মতিলাল সাজ খোলার পর বাচ্চাটিকে একবার দেখতে ভদ্র পাড়াতে যায়। তখনই আসে বিপদ। ভদ্রপাড়ার বাবুরা বেদম প্রহার করে তাকে। সেই সাথে ভবিষ্যতে তাকে পাড়াতে ঢুকতে নিষেধ করে। এই

ঘটনায় যত না দেহে, তার অধিক মানসিক ভাবে আঘাত পায় মতিলাল। নিজের ভীষণাকৃতি-রূপের কারণে তার সন্তানাঙ্ক্ষার মর্মমূলে ফাটল ধরে। নিজের কুৎসিত দেহের প্রতি তার নিজেরই ঘৃণা জন্মে। প্রচন্ড আক্রোশে, সন্তানাঙ্ক্ষার ফল পেতে যে মাদুলি সে স্ত্রী ভুবনকে দিয়ে ছিল তা ছিঁড়ে ফেলে :

"ভুবন চকিত হইয়া বলিল ওকি মাদুলী ধরে টানছিস কেনে, ওই ? পট করিয়া মাদুলীর সুতা ছিঁড়িয়া লইয়া মতিলাল বলিল, আমাদের ছেলে আমাদেরই মতো কুচ্ছিত হবে তো ভোবন। কাজ নাই।" (মতিলাল : বন্দ্যোপাধ্যায় তারাশঙ্কর)

- এই ঘটনায় এক অন্ত্যজ পরিবারের সমস্ত আশা হুড়মুড় করে ভেঙে পড়ল। অন্ত্যজ মানুষের সাধ থাকলেও তা পূরণ হয় না। আশা তাদের কাছে থাকে অধরা হয়ে। আশাহীনতার এমন কাহিনী 'মতিলাল' গল্পে জীবন্ত রূপ পেয়েছে।

গ) ধর্মাশ্রিত

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের অন্ত্যজ জীবনের বেশ কিছু গল্পের বিষয়ের কেন্দ্রে রয়েছে অন্ত্যজ মানুষের ধর্মীয় জীবন এবং ধর্মাচরণ। কোন কোন গল্পে ধর্ম-বিশ্বাসী মানুষ ধর্মকে জীবনের মোক্ষ ভেবে ধর্মাচরণে মগ্ন থেকেছে। কোন কোন গল্পে আবার ধর্ম বিশ্বাস কে অতিক্রম করে গিয়ে বিদ্রোহ ও প্রতিবাদের মাধ্যমে অন্ত্যজ মানুষ ব্যতিক্রমী দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। কোন কোন গল্পে আবার অন্ত্যজ মানুষের বিচিত্র প্রকার ধর্মাচার গল্প-বিষয় হয়েছে। ধর্মকেন্দ্রিক যে গল্পটি আলোচিত হবে। তা হল তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'প্রহ্লাদের কালী'।

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'প্রহ্লাদের কালী' গল্পে কালী উপাসক প্রহ্লাদ ভল্লার জীবনে ধর্ম সাধনার দিকটি উন্মোচিত হয়েছে। এলাকার সবচেয়ে ভয়ঙ্কর ডাকাত প্রহ্লাদ ভল্লার শেয়ালদহড়ার জঙ্গলের সাধু ফৌজদার বাবার কাছ থেকে একটি বিচিত্র-দর্শন তলোয়ার প্রাপ্তির লোভে কালি পূজা শুরু করেছিল। ফৌজদার বাবা প্রহ্লাদকে স্পষ্ট বলে দিয়েছিল কালীর বলি ছাড়া অন্য কোন কাজে এই তলোয়ার ব্যবহার করতে নেই। শুধুমাত্র ঐ তলোয়ারের জন্যেই ভয়ঙ্কর প্রহ্লাদ ভিন্ন মানুষ হয়ে গেল। বাড়িতে প্রতিমা প্রতিষ্ঠা করে ডাকাতি ছেড়ে সে কালী-ভক্ত হয়ে গেল। দীর্ঘ কুড়ি বছর মা-কালীই তার ধ্যান জ্ঞান হল। বলি দেওয়ার দিন সে তলোয়ারখানি বের করে। ঐ তলোয়ার দেখে তরুণ ডাকাত ঘনশ্যাম জোর করে, প্রহ্লাদকে পিস্তলের গুলিতে আহত করে, তলোয়ারটি নিয়ে পালায়। প্রাণাধিক প্রিয় তলোয়ারটি হাতছাড়া হওয়ায় প্রহ্লাদ যেন উন্মাদ হয়ে যায়। তার মনে হয় তলোয়ারটির সাথে সাথে মা কালীও তাকে ছেড়ে গেছে :

" মনে হচ্ছে লম্বা পা ফেলে, হাতে খাঁড়া নিয়ে ঐ যে যাচ্ছেন; ঘনশ্যামের সঙ্গে চলে যাচ্ছেন। মা কালী, মা কালী চলে যাচ্ছেন। তাঁর মুখে হিংস্র হাসি, লক লক করছে জিভ।"

(প্রহ্লাদের কালী : বন্দ্যোপাধ্যায় তারাশঙ্কর)

প্রহ্লাদ ভল্লা যেন ঘোর গ্রস্ত হয়ে পড়ে। তদন্তে এসে দারোগা যখন জিজ্ঞাসা করে কে গুলি

করেছে, তখন প্রহ্লাদ বলে, 'কালী, মা কালী'। কালী সাধনায় ঘোর গ্রস্ত প্রহ্লাদ ভল্লা তারাশঙ্করের ব্যতিক্রমী এবং স্বতন্ত্র সৃষ্টি।

ঘ) চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যাশ্রিত

কি গল্পে, কি উপন্যাসে, কি নাটকে চরিত্র চিত্রণ একটি গুরুত্ব পূর্ণ ব্যাপার। চরিত্র-নির্মাণের নৈপুণ্যের উপর লেখকের সার্থকতা অনেকাংশেই নির্ভর করে। এই চরিত্র চিত্রণগত দিকের বিচারে বলা যায়, অন্ত্যজ জীবন নির্ভর স্বাধীনতা পরবর্তী তারাশঙ্করের ছোট গল্পগুলি বাংলা ছোট গল্পের চরিত্র চিত্রশালাকে বহুল পরিমাণে সমৃদ্ধ করেছে। বিচিত্র ধরণের অন্ত্যজ চরিত্র কখনও গল্পের কেন্দ্রে থেকে, কখনও বা পার্শ্ব চরিত্র রূপে অন্ত্যজ জীবনের অনন্দ-বেদনা-হাসি-কান্না-করুণা-মানবিকতা-সহানুভূতি-প্রতিরোধ-প্রতিবাদের চালচিত্রকে প্রস্ফুটিত করেছে। আলোচ্য পর্যায়ের গল্প-সমূহের প্রাপ্ত পুরুষ ও নারী চরিত্রের অধিকাংশই বৈশিষ্ট্যে উজ্জ্বল ও বৈচিত্র্যে আকর্ষণীয়। বৈচিত্র্যের বিভিন্নতায় বৈশিষ্টের স্বাতন্ত্র্যে অন্ত্যজ চরিত্রগুলি মানবজীবনের অপার রহস্য চেতনায় মুখর। কত ভিন্ন মন-মর্জি ও ভাবের মানুষের ভিড় এখানে। স্বাধীনতা পরবর্তী তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছোট গল্পগুলি বিশ্লেষণ করলে দেখি, চরিত্রগুলির কেউ ভন্ড-বদমায়েস, কেউ ওঝা-গুনিন, কেউ সাধাসিধে সরল মানুষ, কেউ প্রতিবাদী-সচেতন সংগ্রামী, কেউ উৎপীড়িত-লাঞ্ছিত, কেউ পতিতা-স্বৈরিণী, কেউ প্রেমিক অথবা প্রেমিকা, কেউ নিষ্ঠুর-আদিম-হিংস্র, কেউ রাজনৈতিক কর্মী, কেউ ধার্মিক ভাল মানুষ, কেউ বঞ্চিত শিশু ও নারী, কেউ বা আবার মাতৃত্বের আধার, আবার কেউবা আত্মমর্যদায় প্রতিষ্ঠিত-সম্মানিত।

আলোচনার সুবিধার জন্য বিচিত্র মতি-গতির এইসব চরিত্রকে প্রাথমিকভাবে দুটি ভাগে ভাগ করে আলোচনা করব। ভাগ দুটি হল: এক– পুরুষ চরিত্র, দুই– নারী চরিত্র।

পুরুষ চরিত্র

অন্ত্যজ জীবনাশ্রিত তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্বাধীনতার পরবর্তী বাংলা ছোট গল্পে প্রাপ্ত পুরুষ চরিত্রগুলির স্বভাব-স্বরূপ ও মনোগত বৈশিষ্ট্য বিচারে নানা রকমের মানুষের সন্ধান পাওয়া যায়। সাদাসিধে ভাল মানুষ থেকে শুরু করে আদিম হিংস্র মতিগতির বিচিত্র প্রকার মানুষ এই শ্রেণীর গল্পের আশ্রয় হয়েছে।

এই পর্যায়ের তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'স্বাধীনতা' গল্পের আকাল হাড়ি চরিত্রটি বিশ্লেষণ করলে উক্ত মন্তব্যের সত্যতা প্রমাণিত হবে। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'স্বাধীনতা' গল্পের আকাল হাড়ি মহানুভব চরিত্র। তার চরিত্র সনাতন ভারতীয় ঐতিহ্যের ত্যাগ মন্ত্রে স্নাত এক মানুষের চরিত্র। পিতৃ হত্যাকারী সাহেবকে সে কব্জার মধ্যে পেয়েও ক্ষমা করে দিয়েছে। গল্পে দেখি, মৃত্যুপথযাত্রী এক সাহেবকে সে সামনে পেয়েছে। পেয়ে পিতৃহত্যার প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য আকাল উন্মত্ত হয়ে সাহেবকে হত্যা করতে উদ্যত হয়েছে। কিন্তু সাহেবের করুণ চাহুনি আকালকে শান্ত করে দিল।

মুহূর্তেই তার বাবার মৃত্যুন্মুখ চাহুনির কথা মনে পড়ে যাওয়ায় আকাল সাহেব কে ক্ষমা করে দিল - ত্যাগ ও ক্ষমা ধর্মের বাণী যেন আকাল চরিত্রে মূর্তি ধরেছে। তার মহানুভবতা অন্ত্যজ চরিত্রে বিরল বৈশিষ্ট্যের প্রকাশে সার্থক হয়েছে।

স্বাধীনতা পরবতী তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছোট গল্পে যে সমস্ত পুরুষ চরিত্রের চিত্রণ রয়েছে, তাদের অনেকেই প্রেমিক চরিত্র। প্রেম ও প্রেম মনস্তত্ত্বের রঙে ও রেখায় এই চরিত্রগুলি জীবন্ত। প্রেম ও প্রেম মনস্তত্ত্বই এই চরিত্রগুলির গঠন ও পরিণতিকে চিহ্নিত করেছে। প্রেমের জন্যই এদের জন্ম ও মৃত্যু। আর পাঁচজন মানুষের প্রেম-মনস্তত্ত্বের মতোই এই সমস্ত অন্ত্যজ চরিত্রের মনোভূমি গল্পে বিধৃত। প্রেমের জন্য এই সমস্ত চরিত্র জীবন বিসর্জনেও অকুতোভয়। তারশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের এই পর্যায়ের গল্পগুলির মধ্যে 'কবি' গল্পটি আলোচনা করা যেতে পারে। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'কবি' গল্পের নিতাই হাড়ি চরিত্রটি দ্বিবিধ স্তর-বিভাজনে গঠিত চরিত্র। সেই দুটি ভাগ হল :

এক) তার কুলি-জন্ম। এখানে সে কেবল মাত্র একজন হাড়ি যুবক। এক মুচি বধূর সলজ্জ প্রেমিক।

দুই) তার কবি জন্ম। এখানে সে হাড়ি জীবন থেকে জন্মান্তরিত হয়ে সে বিশিষ্ট হয়েছে। প্রেমিক হিসেবে সে এখানে পূর্ণ। অধিকার সচেতন। এই স্তরে তার প্রেম যেমন পূর্ণতা পেয়েছে তেমনি তা ত্যাগের মন্ত্রে সঞ্জীবিতও হয়েছে।

আসলে নিতাই-হাড়ি কবিয়াল। সে প্রেমের মহানুভবত্বে এবং ত্যাগের মন্ত্রে উজ্জীবিত এক ট্রাজিক চরিত্র। হাড়ি বংশের সন্তান নিতাই গ্রামের চণ্ডীতলার মেলার আসরে কবিয়াল রূপে খ্যাতি পেয়ে যায়। স্টেশনের পয়েন্টস্ ম্যান রাজার বন্ধু নিতাই করতো কুলির কাজ। সে রাজার সঙ্গে তার বাড়িতেই বাস করত। সেখানে তাকে নিত্য দুধ যোগাতো রাজার দূর সম্পর্কের শ্যালিকা স্বামী পরিত্যক্তা মুচি বধূ ঠাকুরঝি। নিতাই মনে মনে ঠাকুরঝিকে ভালবাসলেও সে প্রেমকে সে কোনদিন প্রকাশ করতে পারেনি। কিন্তু কবি খ্যাতি পাওয়ার পর সে আভাসে ইঙ্গিতে ঠাকুরঝিকে তার প্রেমে উন্মত্ত মনের কথা জানিয়েছে। এই সময় তাকে প্রেমের রক্ত রাগে আলিম্পিত কৃষ্ণচূড়ার একগুচ্ছ ফুল উপহারও দিয়েছে :

"কৃষ্ণচূড়ার ফুল সদ্য দু একটি করিয়া ফুটিতে শুরু করিয়াছে। ফুল দুটি বাড়াইয়া দিয়া নিতাই বলিল– লাও। ঠাকুরঝি লজ্জায় মুখ ফিরাইয়া বলিল– না।

–তা হবে না। তা হলে আমি দুধ নোবো না।

ঠাকুরঝি ক্ষিপ্র হাতে ফুল দুটি লইয়া দ্রুতপদে গ্রামের দিকে চলিয়া গেল।"

–প্রেমের রক্তরাগে আরো বেশি করে আলিম্পিত হল নিতাই। কিন্তু মনের মধ্যে তার একটি দ্বন্দ্বও ছিল। সে দ্বন্দ্ব পরস্ত্রী প্রেমাস্পদ ঠাকুরঝিকে প্রাপ্তি-অপ্রাপ্তির হিসাবকে নিয়ে গড়ে উঠেছে। শেষাবধি ঠাকুরঝিকে বিয়ের সিদ্ধান্ত করে বন্ধু রাজাকে ঠাকুরঝির কাছে পাঠাই নিতাই। সে নিজে স্টেশনে তাদেরকে অভ্যর্থনার জন্য তৈরী থাকে। কিন্তু নিতাই কবিয়ালের এই আকাঙ্ক্ষা অতৃপ্তির

সাগরে নিমজ্জিত হয়েছে। কেন না ঠাকুরঝি বউ হয়ে এসেছে ঠিকই, তবে তার বউ হয়ে নয়, ঠাকুরঝি রাজাকেই বিয়ে করে বউ সেজে এসেছে। ফলে অভিমানে, ব্যর্থতায়, যন্ত্রণায় যেন নীল হয়ে গেল এক অন্ত্যজ চরিত্র। তার কবি হৃদয় ব্যথিত হল।

তবে তার এই অভিমান ও প্রেম-ব্যর্থতা অন্যদিক দিয়ে তাকে মহৎ করেছে। এর পরেই ত্যাগের মহনীয়তায় উত্তরিত হয়েছে সে। প্রিয়তমা নারীকে তার বন্ধু নিজের স্ত্রীরূপে গ্রহণ করলেও সে পরিণামে ক্রুদ্ধ বা নিষ্ঠুর না হয়ে প্রেমের পরাজয় মেনে নিয়ে, দেশান্তরী হয়েছে। দেশান্তরী হয়েছে এক বুক ব্যথা ও যন্ত্রণা নিয়ে।

আসলে কবি চরিত্রটির সার্থকতা এসেছে তার জন্মান্তরে। হাড়ি বংশের অপরাধ প্রবণতার নাগপাশ ছিন্ন করে কবি ও প্রেমিক রূপে তার উত্তরণই তাকে সতন্ত্র করেছে। সেই সঙ্গে প্রেমের ব্যর্থতা ও অভাবনীয় নীরবতায় তা মেনে নেওয়ার ঘটনা ট্রাজিক মহিমা এনে চরিত্রটিকে মর্মস্পর্শী করেছে, স্বাতন্ত্র্য দান করেছে।

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের অন্ত্যজ জীবনাশ্রিত গল্পগুলির পুরুষ চরিত্রগুলি পর্যালোচনার পর একটি বিশেষ সত্য আমাদের সামনে উন্মোচিত হয় যে, – অন্ত্যজ জীবন সম্পর্কে তথাকথিত ভদ্র ও সভ্য সমাজে যে ধারণা পোষণ করে তা অনেকাংশেই ভ্রান্ত। শুধুমাত্র অপরাধ প্রবণতার, হিংস্রতা, নিষ্ঠুরতার যে ছাপ্পা এদের গায়ে সেঁটে দেওয়া হয় তা যথার্থ নয়। কেননা সৎ, উদার, মহানুভব, সহমর্মী প্রচুর মানুষ অন্ত্যজ সমাজে বর্তমান।

নারীচরিত্র

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের অন্ত্যজ জীবনাশ্রিত ছোট গল্পগুলিতে চিত্রিত নারী চরিত্রগুলি বৈচিত্র্যে উজ্জ্বল ও বৈশিষ্ট্যে আকর্ষণীয়। বিচিত্র মত-মতি ও মানসিকতার নারী চরিত্রের ভিড় ছোটগল্পগুলিকে সতন্ত্র করেছে।

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'ডাইনির বাঁশি' গল্পের বেনে কন্যা স্বর্ণ সমাজের অন্ধবিশ্বাস ও আচার-সংস্কারের যূপকাষ্ঠে বলি হয়েছে। সে অবহেলিত-লাঞ্ছিত চরিত্র। অন্ধ ডাইনী বিশ্বাসের বলি হওয়ার কারণে তার জীবনে বিপর্যয় নেমে এসেছে। স্বর্ণর চরিত্র মানবীয় কোমলতা ও অন্ধসংস্কার-বিশ্বাসের দ্বন্দ্বে বিধ্বস্ত হয়েছে। তার চরিত্র দ্বিবিধ টানাপোড়েনে পড়েছে। সেই দ্বন্দ্ব, সেই টানাপোড়েন এইরকম :

এক) একদিকে সে আর পাঁচটা সাধারণ মেয়ের মতোই স্নেহে-প্রেমে-মমতায় বিগলিত প্রাণা।

দুই) অন্যদিকে তার মধ্যে সামাজিক চাপে গড়ে উঠেছে ডাইনী সংস্কার ও বিশ্বাস।

–ক্রমে সংস্কার বড় হয়ে স্বর্ণকে বিধ্বস্ত করেছে। এর মূলে যদিও রয়েছে সমাজের অন্যায় চাপ ও ভীতি প্রদর্শন। সমাজ স্বর্ণকে সন্দেহ করে, ডাইনী বলে ঘৃণার চোখে দেখে। তার উপর প্রযুক্ত ক্রমাগত সামাজিক এই চাপ ও ঘৃণা তার নিজের মধ্যেও ডাইনী সংস্কারকে জন্মিয়ে দিয়েছে।

পাড়ার মুখুজ্জেদের বউ-এর মৃত্যু, টুকুর মারাত্মক রকমের জ্বর হওয়া–ইত্যাদি ঘটনা তার মনের উপর ও বিশ্বাসের উপর চাপ ফেলেছে। চাপ করেছে তার সচেতন চিন্তার উপর। এমন কি যে বাচ্চাটিকে সে তার হৃদয়ের স্নেহরসের সমস্তটুকু নিংড়ে দিয়ে ভালবাসে তার প্রতি তার নিজের দৃষ্টিটাকে সে নিজেই ডাইনীর দৃষ্টি বলে ভেবেছে। এই কারণে মনে মনে সে অসহ্য যন্ত্রণায় কাতরায়।

স্বর্ণ চরিত্রের মধ্যে লুকিয়ে রয়েছে বাৎসল্য রসের অপার উৎস। বাচ্চা ছেলে টুকুমণির জন্য সে অসুস্থ শরীরেও ছেলেটির আবদারের সামগ্রী বাঁশি সংগ্রহ করেছে। রাত্রি-নিভৃতিতে সকলের অলক্ষ্যে সে টুকুর খেলার ঘরে সেই বাঁশি দিয়েও এসেছে। কিন্তু মনের মধ্যে ডাইনী সংস্কার জন্মে যাওয়ার কারণে টুকুকে সে আর আগের মতো আদর করার কথা চিন্তাও করতে পারে না।

এখানেইস্বর্ণ চরিত্রের ট্রাজেডি বিপর্যয়ের চরম অবস্থাপ্রাপ্ত। নিদারুণ যন্ত্রণা ও অস্থিরতার মর্মান্তিক নিষ্ঠুরতায় সে নিঃশেষিত।

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'বেদের মেয়ে' গল্পে শিবি বেদেনী মূলতঃ প্রেমিকা নারী। তবে তার চরিত্রটি দ্বিবিধ বৈশিষ্ট্যে বৈপরিত্যে-বৈসাদৃশ্যে জীবন্ত রেখায় চিত্রিত। সে বৈশিষ্ট্য দুটি এরকম:

এক) শিবি প্রেমিকা। প্রেমাস্পদ অন্তপ্রাণ সে।

দুই) শিবির মধ্যে রয়েছে এক স্বৈরিণী নারীর ছদ্মবেশ। একটা আদিম হিংস্র সরীসৃপ। যেন ঐ ছদ্মবেশের গ্রন্থীতে গ্রন্থীতে সম্পৃক্ত রয়েছে।

তবে সবকিছু ছাড়িয়ে প্রেম ও প্রেমের মহিমাই শিবিকে মহিমান্বিতা করেছে। প্রেম ও পেমাস্পদের জন্য সে সবকিছুই করতে পারে। ডাকাতি করতে গিয়ে তাড়া খেয়ে ফিরে আসা স্বামী ভোলাকে বাঁচাতে গিয়ে সে প্রয়োজনে হিংস্র ঘাতক হয়। পুরুষেরা যখন ঘরে থাকে তখন শিবিরা হিংস্র ও বন্যের মতো, সামান্য কথাতে নেকড়ের মতো ঝাপিয়ে পড়ে আক্রমণ করে। শিবিও তার ব্যতিক্রম নয় এবং শিবি প্রভাতকে খুন করে।

স্বামীর প্রতি এ তার প্রবল আনুগত্য ও প্রেমেরই বহিঃপ্রকাশ। তবে প্রভাতবাবুর প্রতিও তার মনে কিছুটা টান ছিল। তাই তার মনে হয়েছে –'ছুরি যেন সে নিজের বুকেই মেরেছে।'

শিবির চরিত্রের মধ্যে একটা স্বৈরিণীর মনোভাবও বিদ্যমান। তবে সেটা তার চরিত্র বৈশিষ্ট্য নয়– তার চরিত্রের একটা ছদ্মবেশ মাত্র। নিতান্ত বাধ্য হয়ে, অর্থ উপার্জনের জন্যই, তাকে স্বৈরিণীর আচরণ করতে হয়। বেদের মেয়ে শিবি বাইরের খোশাটা দিয়ে বাবু-পুরুষের সঙ্গে প্রেম-প্রেম খেলা করে। সেক্ষেত্রে তার বুকের ভিতরের মানুষ তার বুকের ভেতরেই থাকে। অনেক যত্নে, প্রেমের বিনিময়ে শিবির এই দশা এই ছদ্মবেশ-গ্রহণ। শিবি তাই প্রেমিকা চরিত্র হিসেবে উজ্জ্বল রেখায় অঙ্কিত।

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের গল্পে চিত্রিত নারী চরিত্রগুলি বিশ্লেষণের পর একথা বলা যায় যে, অন্ত্যজ নারীরা বৈচিত্র্য ও বৈশিষ্ট্যে খুবই আকর্ষণীয় সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। নারী সুলভ আচরণে-মানসিকতায়- কোমলতায়-কখনও প্রতিবাদ-চেতনায়, কখনও আবার সহানুভূতি-ভালবাসায় অন্ত্যজ নারীরা সঞ্জীবিত।

তিন) নরেন্দ্রনাথ মিত্র (১৯১৬-১৯৭০)

নরেন্দ্রনাথ মিত্র গল্প লিখতে শুরু করেন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সমকালে। ১৯৪৫-এ মুদ্রিত হয় তাঁর প্রথম গল্পগ্রন্থ। মৃত্যুর প্রায় আগে পর্যন্ত গল্প লিখেছেন নরেন্দ্রনাথ। ফলে, যুদ্ধ, মন্বন্তর, কালোবাজারী, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, দেশবিভাগ, স্বাধীনতা, উদ্বাস্তু সমস্যা, –এই সব সমস্যা কেমন করে জীবনকে ভেঙ্গে দিচ্ছে তা তাঁর দৃষ্টি এড়াইনি। মূলত মধ্যবিত্ত বাঙালীর জীবন নিয়েই লিখেছেন নরেন্দ্রনাথ মিত্র। কারণ সেই জীবনকে তিনি দেখেছিলেন, চিনেছিলেন গভীরভাবে। কিছু কিছু গল্পে অবশ্য এসেছে নিম্নশ্রেণীর অর্থাৎ অন্ত্যজ শ্রেণীর মানুষ। কিন্তু সব ধরণের গল্পেই তাঁর মূল অবলম্বন মনস্তত্ত্ব। মানুষের মনের জটিলতাকে তিনি শল্যবিদের মতো বিশ্লেষণ করেন নি। অসীম সহানুভূতি দিয়ে তিনি মানব "মনের প্রতিটি স্তর উন্মোচিত করেছেন। তাঁর নিজের কথায় –ঘৃণা বিদ্বেষ, ব্যঙ্গ-বিদ্রুপ-বৈরীতা আমাকে লেখায় প্রবৃত্ত করেনি। বরং বিপরীত দিকের প্রীতি প্রেম সৌহার্দ্য, স্নেহ, শ্রদ্ধা, ভালবাসা, পারিবারিক গণ্ডীর ভিতরে ও বাইরে মানুষের সঙ্গে বিচিত্র সম্পর্ক, একের সঙ্গে অন্যের মিলিত হওয়ার দুর্বার আকাঙ্ক্ষা বার বার আমার গল্পের বিষয় হয়ে উঠেছে। তা জেনেও আমি আমার সীমার বাইরে যেতে পারিনি।"

তাঁর গল্প ঘটনা প্রধান নয়, চরিত্র প্রধান। ঘটনার চমক নেই তাঁর গল্পে। কবি মনের অধিকারী হলেও কোন গল্পই নয় ভাবপ্রধান। বিচিত্র জীবিকার, আশ্চর্য মনের সফল–অসফল নরনারী নিয়ে গড়ে উঠেছে তাঁর গল্প জগৎ। এই মানুষগুলি আমাদের চেনা জগতের সাধারণ মানুষ। তাদের আশা, আশাভঙ্গজনিত হতাশা, সাধ ও সাধ্যের দুরত্ব বাস্তব হয়ে উঠেছে তাঁর গল্পে।

নরেন্দ্রনাথের গল্পগুলিকে আমরা–

ক) মধ্যবিত্ত ও নিম্নবিত্ত জীবন কেন্দ্রিক গল্প

খ) শিল্প সম্পর্কিত গল্প

গ) নারী চরিত্রমূলক গল্প এবং

ঘ) সমাজের নিম্নশ্রেণীর মানুষদের নিয়ে লেখা গল্প।

–এই চার শ্রেণীতে ভাগ করতে পারি। কিন্তু সর্বত্রই তাঁর গল্পে মনোবিশ্লেষণ এসেছে সহজভাবে।

এখন আমাদের আলোচ্য সমাজের নিম্নশ্রেণীর অর্থাৎ অন্ত্যজ শ্রেণীর মানুষদের কথা। এই অন্ত্যজ শ্রেণীর মানুষেরা কিভাবে তাঁর ছোটগল্পে উপস্থিত হয়েছে এবং তাদের মনোবিশ্লেষণই বা কতটুকু করেছেন অথবা এই শ্রেণীর মানুষের চিত্র কিভাবে তাঁর গল্পে চিত্রিত হয়েছে। তাঁর গল্পগুলিকে ব্যক্তিজীবনাশ্রিত, পরিবারাশ্রিত, চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যাশ্রিত, আর্থ-সমাজাশ্রিত, সমাজ-বৈষম্যমূলক ও সংস্কৃতি ভিত্তিক বিভিন্নভাবে ভাগ করে আলোচনা করবো।

ক) ব্যক্তি জীবনাশ্রিত

ব্যক্তি জীবনাশ্রিত অন্ত্যজজীবন নির্ভর কিছু গল্পে অন্ত্যজ মানুষের প্রেমজীবন গল্পের বিষয় হয়েছে। প্রেম-ব্যর্থতা, প্রেমজ কামনা-বাসনা, প্রেম কেন্দ্রিক মাধুকরী বৃত্তি, জীবন পিপাসা গল্পগুলিতে মূর্ত হয়েছে। কোন কোন গল্পে দেখি, অন্ত্যজ মানুষ প্রেমের জন্য ত্যাগী হয়েছে, কোথাও আবার রয়েছে প্রেমের নামে স্বৈরাচার, সুবিধাবাদ ও ভোগলিপ্সার বলিষ্ঠ প্রকাশ। এই পর্বের স্বরূপ-স্বভাবটি স্পষ্ট হয়েছে নরেন্দ্রনাথ মিত্রের 'যাত্রাপথ' ও 'সুহাসিনী ও তরল আলতা' গল্পদ্বয়ে।

'যাত্রাপথ' গল্পে দেখি, জেলে যুবক অনন্ত মালোর জীবনের প্রেম-হতাশা ও ট্রাজেডি বর্ণিত হয়েছে। অনন্ত সাহিত্যিক, গল্পকার ও কবি। যৌবনে সে বিভিন্ন সাহিত্য সাময়িকিতে বিভাগীয় সম্পাদনার কাজ, প্রুফ-রিডারের কাজ করে সংসার চালিয়েছেন। এই সময়ে তার সঙ্গে আলাপ হয়েছে এক সহকর্মীর মেয়ে গীতার সাথে। আলাপ পরে গাঢ় প্রণয়ে পরিণতি পায়নি।

গল্পে আরো দেখি, নানান প্রতিকূলতার মধ্য দিয়ে অনন্ত তার পড়াশোনার জীবন শেষ করেছে। গঙ্গাচরণ মালোর ছেলে অনন্ত ছোটবেলা থেকেই মেধাবী ও মুখে মুখে কবিতা রচনায় পারদর্শী ছিল। পাঠশালা ও স্কুলের গন্ডী অতিক্রম করে সে শহরের কলেজে ভর্ত্তি হয়েছে। অন্ত্যজ মানুষ হওয়ায় শহরে থাকার কোনো জায়গা না পেয়ে সে মফঃস্বলে তারই স্বজাতি লালমোহনের বাড়ীতে থেকে পড়াশোনা করে। লাল মোহনের মেয়ে লক্ষ্মী অনন্তকে ভালবাসে। তাকে নিয়ে ঘর করতে চাই। কিন্তু অনন্ত তাকে চায় না। ফলে লক্ষ্মীর ষড়যন্ত্রে তাকে ঐ আশ্রয় ছাড়তে হয়। বন্ধু সহপাঠী অমল তাকে বাড়িতে জায়গা দেয়। কিন্তু পরীক্ষায় অমল অসদুপায় অবলম্বন করলে অনন্তও সে অপরাধে অন্যায়ভাবে শাস্তি পায়। তার পরীক্ষাও বাতিল করে দেওয়া হয়। ব্যর্থ অনন্ত গ্রামে ফিরে পাঠশালা খোলে। কিন্তু জীবন ও জীবিকার তাগিদে শহরে এসে পত্রিকা-অফিসে কাজ নিতে হয় তাকে। সঙ্গে থাকে তার অসুস্থ মা ও এক দুশ্চরিত্রা খুড়তুতো বোন। এই সময়েই গীতার সঙ্গে অনন্ত প্রণয়-বন্ধনে বাঁধা পড়েন। গীতা উচ্চবংশজাত। মিলন তাদের মধ্যে অসম্ভব। এমতাবস্থায় দেখা যায় অনন্ত ক্ষয়রোগে আক্রান্ত। কঠোর প্ররিশ্রমের ধকল শরীর নিতে পারেনি। অন্ত্যজ সমাজের সন্তান সাহিত্যিক অনন্ত মালো এই রোগে অকাল মৃত্যু বরণ করলে; প্রেম ব্যর্থ হল।

নরেন্দ্রনাথ মিত্রের 'সুহাসিনী ও তরল আলতা' গল্পের বিষয় হয়েছে ধোপা ফটিকের জীবনের প্রেম ও প্রেমহীনতার কাহিনী। ফটিক জাতে ধোপা হলেও পদবী পরিবর্তন করে দাস হয়েছে। দেশভাগের সময় ফটিক এপারে এসে এক কলোনীতে বাস করতে শুরু করেছে স্ত্রী সুহাসিনীকে নিয়ে। কলোনীরই পবন চক্রবর্তীর কাছ থেকে টাকা নিয়ে স্ত্রীর নাম দিয়ে, আলতার ব্যবসায় নেমেছে ফটিক। সুহাসিনী তরল আলতা কাটতো বাজারে বেশ ভালো। কিন্তু খারাপ হয়েছে তার ঘর। পবন সুহাসিনীর সঙ্গে অবৈধ প্রণয়ে আবদ্ধ হয়েছে। পবন ফটিকের স্ত্রী সুহাসিনীকে নিয়ে পালিয়েও গেছে। এ ঘটনায় হতাশ হয়ে পড়েছে ফটিক। বাড়ি ছেড়ে বাউন্ডুলে হয়ে গেছে সে। কিন্তু তার 'লক্ষ্মী আলতা' বা 'সুখদা আলতা' এবারে বাজার পেল না। তাই নিতান্ত বাধ্য হয়ে ফটিক আলতার গায়ে 'সুহাসিনী তরল আলতা' লেবেল এঁটে পুনরায় বাজারে ছাড়ে। নামের গুণে আবার সে আলতা

বাজারে কাটতে শুরু করে। সুহাসিনী তার সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করলেও তার নাম ফটিকের সাফল্যের মূলে থাকলো। তবে শুধু ব্যবসাতে ফটিক সুহাসিনী নাম ব্যবহার করে না, তার মনের প্রত্যন্ত প্রদেশেও বাস্তবের সুহাসিনী এখনও বাসা বেঁধে আছে। নানান ঝামেলার মধ্যেও ফটিক তার পুরোনো স্ত্রী সুহাসিনীর খবর রাখে। খবর রাখে সুহাসিনী তার তৈরী তরল আলতাই ব্যবহার করে:

" কান্ড দেখুন কর্তা। হারামজাদী সিঁদুরের সম্পর্ক মুছে ফেলে আলতার সম্পর্কটুকু বজায় রেখেছে।" (সুহাসিনী ও তরল আলতা : মিত্র নরেন্দ্রনাথ)

ব্যক্তি জীবনাশ্রিত অন্ত্যজ জীবনের 'দ্বিচারিণী' গল্পে ঝি-তরঙ্গের সুবিধাবাদী, দ্বিচারিণী মনোভাবের কাহিনী বর্ণনা করছেন নরেন্দ্রনাথ মিত্র। দুই বান্ধবী মমতা ও অসীমার বাড়িতে ঝি-এর কাজ করে তরঙ্গ। তরঙ্গ দু'জনের প্রশংসা দু'জনের কাছে করে। উপোঢৌকন পায়। এ বাড়ি থেকে যদি একটা সুন্দর ব্লাউজ পায় তো ও বাড়ি থেকে পায় একটা মজবুত শাড়ি। সুখেই কাটছিল তরঙ্গের জীবন। হঠাৎ করেই, এই উপঢৌকন দেওয়ার সূত্রেই অসীমা ও মমতার মধ্যে অদৃশ্য ইগোর লড়াই শুরু হয়। দু'জনেই এখন তরঙ্গকে দিয়ে বেশী বেশী কাজ করিয়ে নেয়। প্রত্যেকেই ইচ্ছা করে বেশী সময় ধরে তরঙ্গকে নিজের নিজের বাড়িতে আটকে রাখে। ফলে অন্যের বাড়িতে যেতে দেরী হয় তরঙ্গের। সে কারণে দু-পক্ষই এখন তার সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করে। তার উপর টুক টাক উপঢৌকন যা পেত সে তাও বন্ধ হয়ে গেল দু-তরফেই। এমন অবস্থায় তরঙ্গ সুবিধাবাদীর নীতি গ্রহণ করল। সে দু'জনের কাছে দু'জনের নিন্দা ও কুৎসা রটাতে শুরু করলো। কখনও সে অসীমার কাছে বলে – মমতা সোমত্ত দেবরের সঙ্গে ফস্টি নস্টি করে বেড়ায়। আবার কখনও মমতার কাছে বলে –অসীমার বোনের সঙ্গে অসীমার স্বামী ঢলাঢলি করে। দ্বিচারিণী তরঙ্গের এমন ব্যবহারে দু-তরফেই তার খাতির বেড়ে যায় আবার। আবার দু-তরফ থেকে এটা ওটা উপঢৌকন পেতে শুরু করে সে। ব্যক্তিগত সুখ ও স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য তরঙ্গ এমনটি করে। করতে বাধ্য হয়।

খ) পরিবারাশ্রিত

নরেন্দ্রনাথ মিত্রের পরিবারাশ্রিত অন্ত্যজ জীবন নির্ভর ছোট গল্পগুলির মধ্যে বেশ কিছু গল্পের বিষয় হয়েছে পরিবারগুলি বিপর্যয়-বিধ্বস্ত অবস্থার কাহিনী। নানান কারণে অন্ত্যজ পরিবারগুলি বিপর্যস্ত-বিধ্বস্ত হয়েছে।

নরেন্দ্রনাথ মিত্রের 'যৌথ' গল্পে এক ছুতোর পরিবারের বিপর্যয় ও বিষাদময় পরিণতি চিত্রিত। স্ত্রী মল্লিকা, চারছেলেমেয়ে ও ছোটভাই স্বরূপকে নিয়ে অনুরূপদের সংসার ছিল সুখের। কিন্তু এই সুখী পরিবারে হঠাৎ নেমে এল বিষাদ। অনুরূপের জ্বর হয়েছে বলে ডাব পাড়ার জন্য গাছে উঠে স্বরূপ নিচে পড়ে গিয়ে দুটি পা-ই হারায়। ফলে বিপর্যয় নামে সুখী সংসারে। স্বরূপ গৃহবন্দী হয়। অনুরূপ বাইরে আয়ের সন্ধান দেখে। বাড়িতে বসে কাঠের আসবাবপত্রে নক্সা কাটার কাজ শুরু করে স্বরূপ। বৌদি মল্লিকা তার সেবা করে। ঘন্টার পর ঘন্টা দুজনে গল্প করে। এই সূত্রেই স্বরূপের মনে মল্লিকা সম্পর্কে বেশ খানিকটা প্রেম-মোহের সৃষ্টি হয়। দু-ভাইয়ের সংসারে আবার সুখ ফিরে

অসে। কিন্তু সবদিন সমান যায় না। সামান্য কারণে একদিন দুভাইয়ের মধ্যে কথা কাটা কাটির পরিনামে বিচ্ছেদ নেমে আসে। অভিমানাহত স্বরূপ নিজেকে একদম ঘরবন্দী করে ফেলে এবং শেষে মৃত্যুমুখে পতিত হয়। মারা যাওয়ার আগে সে দাদাকে তার খোদাই করা অসমাপ্ত মূর্তি সমাপ্ত করার অন্তিম ইচ্ছা জানাই। তার পর মারা যায় স্বরূপ। শোকাচ্ছন্ন কটা দিন পার করে মল্লিকা স্বামী অনুরূপকে দেবরের অন্তিম সেই অনুরোধের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। অন্ধকার ঘর থেকে মূর্তিটাকে বের করে আনা হলে অনুরূপ ও মল্লিকা দুজনেই চমকে ওঠে। মূর্তিটা যৌবনোচ্ছলা মল্লিকারই মূর্তি। এই সূত্রে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে আরো একটা ফাটলের রেখা দেখা দেয়। এখানেই গল্পের বিষাদময় সমাপ্তি।

নরেন্দ্রনাথ মিত্রের 'আবরণ' গল্পের বিষয় হয়েছে বস্ত্রহীনতা জনিত কারণে এক কৃষক দম্পতির বিপর্যস্ত হওয়ার কাহিনী। গল্পে দেখি, চারিদিকে বস্ত্রহীন মানুষের মিছিল। বাড়ির বউ-ঝিরা পরিধান হীন নগ্ন। কৃষক সন্তান বংশী একদিন মাঠ থেকে বাড়ি এসে দেখলো বউ চাঁপা সম্পূর্ণ আবরণহীন হয়ে ঘরের ঝাঁপ বন্ধ করে থাকতে বাধ্য হয়েছে। পরণের শতছিন্ন কাপড়টি সম্পূর্ণ নষ্ট হয়ে গেছে। চাঁপার আবরণহীন দেহ অবলোকন করার স্বাদ বংশীর দীর্ঘদিনের হলেও এই নগ্নতা তাকে সংকুচিত করেছে। টাকা নিয়ে সে গঞ্জে গেলেও কোথাও কাপড় মিলল না। হতাশ বংশী একটি দোকানে হঠাৎ কমলা রঙের সুন্দর শাড়ীপড়া সুখদা নামে এক পতিতাকে দেখে লুব্ধ হয়ে পড়ল। তার লোভ শাড়িতে। দু'টাকার বিনিময়ে সে সুখদার ঘরে ঢুকলো। সুখদা শাড়ি ছেড়ে তাকে আহ্বান করলে বংশী তার দেহ সম্ভোগ না করে ঐ কমলা রঙের শাড়ীটি বগলদাবা করে বেরিয়ে আসতে চায়। সুখদা চেঁচামেচি করতে গেলে বংশী সুখদার পরিধেয় গামছা ও দড়ি দিয়ে তার হাত মুখ বেঁধে দেয়। বিছানায় পড়ে থাকে নগ্ন সুখদা। এই সুযোগে কাপড়খানা নিয়ে পালিয়ে আসার মুহূর্তে নগ্ন সুখদাকে দেখে চমকে উঠে বংশী। মুহূর্তেই তার স্ত্রী চাঁপার কথা মনে পড়ে। তাই সুখদার কুৎসিত দেহটাকে ঐ শাড়ীটা দিয়েই চাপা দেয় দ্রুত তারপর বাইরে বেরিয়ে আসে। দরজায় দেখে পতিতা পল্লীর মেয়েদের ভিড় এবং থানার কনস্টেবল। সুখদার চেঁচামেচি শুনে তারা এসেছে। বংশী পুলিসের কবলে পড়ে। –এখানে দেখা যাচ্ছে কৃষক পরিবারটি বিপর্যয়ের অন্ধকারে পড়েছে। তাদের বিপর্যয়ের মূলে রয়েছে বস্ত্রহীনতার কারণ। বস্ত্র সংকট এমনই অনেক অন্ত্যজ পরিবারকে তৎকালে বিধ্বস্ত করেছিল।

গ) চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যাশ্রিত

সাহিত্যে চরিত্র নির্মাণ একটি গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার – সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। চরিত্র নির্মাণের উপরেই সাহিত্যে সার্থকতা বা বিফলতা আসে। চরিত্র নির্মাণ যদি ভাল হয় তবে আসে সার্থকতা, নয়তো বিফলতা। এখন নরেন্দ্রনাথ মিত্রের কিছু গল্পের আলোচনা করব অন্ত্যজ পুরুষ ও নারী চরিত্র, কেননা আমাদের আলোচ্য বিষয় হচ্ছে অন্ত্যজ সম্প্রদায়ের মানুষের জীবনযাত্রা।

পুরুষ চরিত্র

নরেন্দ্রনাথ মিত্রের কিছু ছোট গল্প আছে যেখানে পুরুষ ট্রাজিক বিষন্নতায় ভাস্বর। সব হারানোর ব্যথা ও অপচয় বোধের অনুভূতি চরিত্রগুলির আভ্যন্তর গঠনকে বিষন্ন করে তুলেছে। চরিত্রগুলির মূলে কাজ করেছে, কখনও চরিত্রগুলির প্রেম-ব্যর্থতা, কখনও জীবন সম্বন্ধে ব্যাপক অনীহা, কখনও বা জীবন যুদ্ধে পরাজেয়ের গ্লানি, কখনওবা অত্যাচার-অবিচার প্রাপ্তি। নরেন্দ্রনাথ মিত্রের এই শ্রেণীর গল্পগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য গল্পগুলি হল – 'যৌথ' ও 'যাত্রাপথ'।

নরেন্দ্রনাথ মিত্রের 'যৌথ' গল্পের ছুতোর মিস্ত্রি স্বরূপ একটি ট্রাজিক পুরুষ চরিত্র। সে শিল্পী। কাঠের আসবাবপত্রে সে অনায়াস দক্ষতায় ফুটিয়ে তোলে নানান ফুল-লতা-পাখি, এমনকি মানুষের প্রতিমূর্তি পর্যন্ত। স্বরূপ পঙ্গু। তার দুটি পা নেই। নারকেল গাছ থেকে পড়ে পা-দুখানি হারিয়েছে স্বরূপ। কিন্তু পা হারালেও হাত ও মনে স্বরূপ প্রচন্ড পরিমানে জীবন্ত। বৌদি মল্লিকাকে ঘিরে তার মনে প্রেম-মোহের একটা আলোড়ন তাকে সৃষ্টিশীল রেখেছে। মল্লিকার সঙ্গে কথোপকথোনে তার প্রকাশ লক্ষ্যগোচর হয় :

(এক) "ভাড়ার থেকে কিছু ডাল নিতে এসে বারান্দা দিয়ে ঘরে ঢোকার সময় মল্লিকা একটু থেমে দাঁড়ালো। স্বরূপের কাঁধের উপর মুখ বাড়িয়ে হেসে বলল... কি মনোযোগ বাপরে বাপ। একজন মানুষ গায়ের উপর পড়লেও হুঁশ হয়না। স্বরূপ বললো, হুঁশ হলেই যে গায়ের উপরটি থেকে মানুষটি আবার সরে যাবে। তার চেয়ে বেহুঁশ থাকায় ভালো।"

(দুই) "মল্লিকা অবশ্য কৌতুক করে জল না নিয়েই উপস্থিত হয়েছে, কি আবার ডাকছো কেন? জলের জন্য বললাম যে? জল আনলে না কেন? সত্যিই খুব তৃষ্ণা পেয়েছে? হ্যাঁ, কিন্তু জলেই এযাত্রা মেটাতে হবে।"

(যৌথ : মিত্র নরেন্দ্রানাথ)

–প্রেম নয়, সত্যই জল পেয়েই সন্তুষ্ট থাকতে হয়েছে শিল্পী স্বরূপকে। তার পঙ্গু জীবনে কোন নারীই প্রেম নিয়ে সর্বস্ব উজাড় করার জন্য উপস্থিত হয়নি। সমস্ত অনিষ্টের মূল তার ঐ খোঁড়া বাদ করা পা-দুটি। তার ভাগ্যে কোনো মেয়েই জোটে না। অথচ তার মনে প্রেম-নারী-ঘর-সংসারের প্রতি ষোল আনা সখ রয়েছে :

"স্ত্রী-পুত্র নিয়ে সম্পূর্ণ আপন একটি সংসারের জন্যে স্বরূপের মন হাহাকার করে ওঠে।" –নিরুপায় স্বরূপ তাই দাদা-বৌদির সংসারে আত্মনিয়োগ করে, মনে মনে বৌদির প্রেমে আবিষ্ট থেকে জীবন কাটায়। এই সময়ই ঘটে তাদের সংসারে মানস-বিচ্ছেদ। একই চালের নিচে বাস করেও অনুরূপ, মল্লিকা, স্বরূপ যেন এক একটি বিচ্ছিন্ন দ্বীপের মতো বেঁচে থাকে।

এই বিচ্ছেদের অভিমানে স্বরূপ নিজের শিল্প-কর্মে সম্পূর্ণরূপে আত্মনিয়োগ করে। সে একটি মূর্তি খোদাইয়ের কাজে রাত্রিদিন নিমগ্ন থাকে। মূর্তিটি সম্পূর্ণ করার আগে সে মারা যায়। মারা যাওয়ার আগে দাদাকে ওটি সম্পূর্ণ করার অনুরোধ জানিয়ে যায়। এই অসম্পূর্ণ মূর্তির চটের আচ্ছাদন খুলে দেখা যায়, সেটা সপ্তদশী যৌবনোচ্ছলা মল্লিকার মূর্তি। এক শিল্পী হৃদয়ের আশা-

আকাঙ্ক্ষার প্রতিমূর্তি ঐ মূর্তিখানী। এই অসম্পূর্ণ মূর্তির মধ্যেই যেন স্বরূপের অতৃপ্ত হৃদয়ের ট্রাজেডি রসমূর্তি নিয়ে উদ্ভাসিত।

নরেন্দ্রনাথ মিত্রের 'যাত্রাপথ' গল্পের অনন্ত মালো ট্রাজিক বেদনাবোধে বিষন্ন এক চরিত্র। সে কবি-সাহিত্যিক, ব্যর্থ শিল্পী। হতাশ প্রেমিক। তার জীবনে রয়েছে অনন্ত ট্রাজেডির ছোঁয়া। তার চরিত্রের ট্রাজেডি ঘনিয়ে এসেছে নানান দিক থেকে। যেমন :

(এক) দারিদ্রের হতাশা তাকে হতাশ করছে –ট্রাজিক করেছে।

(দুই) লেখা লেখির ব্যাপারে ছিল একপ্রকার বেদনাবোধ।

(তিন) সে প্রেম ব্যর্থ – তাই হয়েছে ট্রাজিক।

জেলেপাড়ার চরম দারিদ্রের মধ্যে তার জন্ম –তার বেড়ে ওঠা। কিন্তু ছোটবেলা তার মধ্যে অনন্য সাধারণ মেধার পরিচয় লক্ষ্যিত হয়েছে। অত্যন্ত বাল্যকালেই সে যখন-তখন ছড়া কবিতা রচনা করতে পারতো। বাবার সঙ্গে মাছ ধরতে বেরিয়ে নৌকার উপর বসেই সে স্লেট-পেন্সিলে পদ্য লিখেছে:

" রুই কাতলা বোয়াল-শোল কই মাগুর শিঙ্গি।
চুচড়া চাঁদা রায়াক পুঁটি টাটকিনি মলুঙ্গী ॥"

স্কুলে পড়ার সময়ে মাসিক কাগজে কবিতা লিখে সে প্রথম হয়েছে। পরবর্তী জীবনে সে গল্প-উপন্যাস লিখে অনন্য সাধারণ সাহিত্য-প্রতিভার পরিচয় দিয়েছে। যদিও সাহিত্য সাধনা করে কোনদিনই সে খ্যাতি পায়নি। এ ব্যপারে তার মনে একটা প্রচ্ছন্ন বেদনবোধ ছিল, যেটা তাকে ট্রাজিক করেছে।

অনন্ত উদার হৃদয় যুবক। সে লেখাপড়া শিখে বড় হয়েছে। কোলকাতা শহরে এসে বিভিন্ন সাহিত্যপত্র কিংবা সংবাদ সাময়িকীতে বিভাগীয় সম্পাদকের কাজ অথবা প্রুফরিডারের কাজ করেছে। তবুও নিজগ্রাম মালোপাড়া ও মালোপাড়ার দরিদ্র মানুষগুলিকে ভুলে যায়নি অনন্ত। নিজের খুড়তুতো বোন, স্বৈরিণী মলুঙ্গীকে শহরে নিজের কাছে রেখেছে বলে অনেক অপবাদ গ্রামের মানুষ দিয়েছে। তবুও অনন্ত তাদের প্রতি বিরুদ্ধ হয়ে উঠেনি। বরং নিজের অমানুষিক শ্রমের বিনিময়ে অর্জিত টাকা-পয়সা সে যখন-তখন তাদেরকে দান করেছে:

"গাঁয়ে জেলেদের মধ্যে নমঃশূদ্র আর মুসলমান চাষীদের মধ্যে ওর মুখাপেক্ষী যে কতো লোক ছিল তার আর সীমা ছিলনা। গোপনে গোপনে ও তাদের টাকা পাঠাতো।"

(যাত্রাপথ : মিত্র নরেন্দ্রনাথ)

শুধু জেলেপাড়ার লোকেরাই নয়, অনন্তের কাছে হাত পেতে দাঁড়াতো তার অনেক সহকর্মী এবং অনন্ত কাউকে ফেরাতো না। কিন্তু এ সমস্তের ফল হল মারাত্মক। অনন্ত এই কারণে চরম দারিদ্রের মধ্যে পড়লো। অতিরিক্ত পরিশ্রমে তার দেহ ভেঙে পড়ল। হতাশা তাকে গ্রাস করলো। সে মৃত্যুমুখে পতিত হল। তার চরিত্রের ট্রাজেডি এল ঘনিয়ে।

অন্ত্যজ মানুষ অনন্ত মালো ব্যর্থ প্রেমিকও। প্রেম-ব্যর্থতা তাকে হতাশার অন্ধকারের অতল গহ্বরে নিক্ষেপ করেছে। উচ্চ বংশীয় সুরেন মুখুজ্জ্যের মেয়ে গীতা অনন্তকে ভালবেসেছিল। তাদের এই প্রণয় সম্পর্ক ছিল গাঢ় বন্ধনে আবদ্ধ। গীতা ছিল তার এক বয়ঃজ্যেষ্ঠ সহকর্মীর মেয়ে। সে কারণে অনন্ত ছিল দ্বিধাযুক্ত। শেষ পর্যন্ত অনন্তের প্রখর দ্বায়িত্বশীলতা সেই প্রেমকে সার্থক হতে দেয়নি। এই জন্যও অনন্তের মন ও মননে ছিল –একটা বড় রকমের বেদনাবোধ, যা তার ট্রাজেডিকে ত্বরান্বিত করেছে। সব মিলিয়ে অনন্তের চরিত্রের ট্রাজেডি অন্ত্যজ সমাজের মধ্যে তাকে ব্যতিক্রমী করেছে। অনন্তের মতো গুণান্বিত ও হতাশ চরিত্র অন্ত্যজ জীবনে খুব কম দেখা যায়।

নারী চরিত্র

নরেন্দ্রনাথ মিত্রের অন্ত্যজ জীবনাশ্রিত ছোটগল্পে চিত্রিত নারী চরিত্রগুলির মধ্যে অল্প কিছু সংখ্যক চরিত্র ভণ্ড বদমায়েস। তারা সুবিধাবাদী। আত্মস্বার্থ ও আত্মসুখের জন্য তারা ভন্ডামির আশ্রয় নিয়েছে। প্রয়োজনে নিয়ম-নীতি-মানবতা সমস্ত কিছুকে ত্যাগ করতেও দ্বিধা করেনি। নরেন্দ্রনাথ মিত্রের 'দ্বিচারিণী' গল্পে এমন স্বভাবের নারী দেখা যায়।

নরেন্দ্রনাথ মিত্রের 'দ্বিচারিণী গল্পের ঝি তরঙ্গ সুবিধাবাদী শ্রেণীর নারী চরিত্র। তরঙ্গের চরিত্রের প্রধান বৈশিষ্ট্য হল মনে ও মননে সে দ্বিচারিণী –আত্মস্বার্থের জন্য সুবিধাবাদী। দ্বিচারিণী সে আচারে ও মানসিকতায়। একটি শব্দে তরঙ্গ চরিত্রের বৈশিষ্ট্যকে ধরতে গেলে বলতে হয় –তরঙ্গ কুট্টিনী জাতীয় চরিত্র। তার চরিত্রের গভীরে লুকিয়ে আছে একটি স্ববিরোধী অস্তিত্ব। তার নানান ঘটনায় ও কর্মে, কথায় ও আচরণে এই স্ববিরোধ প্রকট রূপে ফুটে উঠেছে। গল্প-কাহিনীতে দেখি, সে দুটি বাড়িতে ঠিকে ঝি-র কাজ করে। দু-বাড়ির কাছে ভাল থাকার জন্য, সংসারের নিত্য প্রয়োজনীয় টুকিটাকি জিনিস পাওয়ার জন্য সে একের নামে অন্যের কাছে মিথ্যা করে কুৎসা রটায়। অসীমার বিরুদ্ধে মমতার কাছে বলে। আবার মমতার বিরুদ্ধে অসীমার কাছে লাগায়। গল্প থেকে পর পর দুটি উদ্ধৃতি দিলে তরঙ্গের সুবিধাবাদী মনোভঙ্গীর পরিচয়টি স্পষ্ট হয় :

(এক) মমতার কাছে অসীমার বিরুদ্ধে :

"তরঙ্গ উৎসাহিত হয়ে বলল, মিষ্টি কথা দূরে যাউক এমন মুখ খরাপ কইরা গাইল্ দিলেন যে, কব কি বউ ঠাউরেন, সেই কথা ভদ্দরলোক ক্যান্ আমাগো মতো ঝি-চাকরের মুখ দিয়াও বাইর হয় না।"

(দুই) অসীমার কাছে মমতার বিরুদ্ধে :

"তরঙ্গ বলল, আর যা মুখ বউদিদি, কব কি আপনারে। কাজ তো আপনার বাসাও করি, দোষ তিরুটি হইলে আপনিও তো ধমক টমক দ্যান। কিন্তু এ যা মুখ। আউ আউ আউ, এমন মুখ খারাপ করতে আমরাও পারি না বউ দিদি।"

তরঙ্গের কুটিল আচরণে এই-ই মূর্তরূপ। তার এই কুটিল স্ববিরোধী আচরণই তার চরিত্রের সংকট ডেকে এনেছে। তার এই সুবিধাবাদী নীতির সুফল একদিন বন্ধ হয়ে গেছে। দ-পক্ষের কাছে

অবিশ্বাসের পাত্রী হয়ে গেছে। ফলে দু-পক্ষই যথা সম্ভব খাটিয়ে নেয় তাকে। তরঙ্গের বিপদ চরমে পৌঁছায় তখন যখন দু-পক্ষই জানিয়ে দেয়, একই দিনে দু'বাড়িতে আত্মীয় আসবে। অতএব ঐ বিশেষ দিনটিতে দুপক্ষই তরঙ্গকে বাড়িতে চায়। বিপদ ও সংকটে তরঙ্গ খানিকটা বিভ্রান্ত হয়। একা তরঙ্গ কোন দিকে যাবে। অসীমার কাছে গেলে মমতার বাড়ির কাজ চলে যাবে। আর যদি মমতার কাছে যায় তবে অসীমার বাড়ির দরজা তরঙ্গের কাছে বন্ধ হয়ে যাবে। এই সংকট থেকে উত্তীর্ণ হওয়ার জন্য তরঙ্গ চরম ভন্ডামী ও সুবিধাবাদের পথ গ্রহণ করে। সে পথ মিথ্যা দিয়ে গড়া। তরঙ্গ তার প্রতিবেশী ও সতীর্থ ঝি মানদা ও ক্ষান্তকে ডেকে স্পষ্ট জানায় তারা যেন তরঙ্গের দুই মনিব বাড়িতে জানিয়ে দেয়, অসুস্থতার জন্য ঐদিন তরঙ্গ কোন বাড়িতেই কাজ করতে যেতে পারবে না :

"তরঙ্গ বলল, আমার মনিবগো বাসাতো দুজনেই চেন? এক জন যাও হরমোন ঘোষ লেনে। যাইয়া বলবা কি, তরঙ্গ আইজ কাজে যাইতে পারবো না; কলেরায় সে মরো মরো। বিছানা ছাইড়া উঠতে পারে না কাজ উদ্ধার কইরা দ্যাও দিদিরা। পান-তামুক খাওয়ামু।"

(দ্বিচারিণী : মিত্র নরেন্দ্রনাথ)

–একদিন যার চরিত্র ছিল সততায় ভরা, সে সকলের প্রশংসা পেত, সেই তরঙ্গ সম্পূর্ণ রূপে জটিল-কুটিল চক্রান্তকারীতে পর্যবসিত। তবে তরঙ্গের এই জটিল-কুটিল মনের মধ্যে কোথায় বোধ হয় সু-চেতনা তাকে আশ্রয় করেছিল। প্রথম প্রথম সে তো অন্যরকম হতে চেয়েছিল। প্রচলিত ঝি-সংস্কারে সে বাঁধা থাকতে চায়নি। অথচ ঘটনা পরম্পরায় তাকে তাই-ই হতে হয়েছে। তাই চরম ভন্ডামীর মুহূর্তে সে যখন তার সতীর্থ মানদা ও ক্ষান্তর কাছে মিথ্যা কথা বলেছে তখন তারা উল্লসিত হয়েছে। কিন্তু তরঙ্গের মনের মধ্যে একটা কিন্তু থেকে গেছে। ঐ মুহূর্তে তার চোখে জলের আভাস ঐ কিন্তুর প্রমাণ দেয় :

"হঠাৎ দেখতে না দেখতে দুই চোখ জলে ভরে উঠল। ঠিক এমন তো সে হতে চায়নি। কেন এমন হলো?" –সুবিধাবাদী, ভন্ড, ঝি তরঙ্গ এখানেই কিছুটা ব্যতিক্রমী হয়ে উঠেছে। তার চরিত্র লেখকের অনবদ্য চরিত্র-চিত্রণ-দক্ষতার পরিচায়ক।

ঘ) আর্থ-সমাজাশ্রিত

যে কোন সমাজ-গোষ্ঠীর মানুষের জীবনচর্যার পূর্ণাঙ্গ রূপ-চিত্রাঙ্কনে আর্থ-সামাজিক অবস্থার বিচার বিশ্লেষণ সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকাটি গ্রহণ করে। সেই সমাজে বিশেষ আচার-ক্রিয়া, সমাজ-প্রথা, সংস্কার-কুসংস্কার, তাদের খাদ্য বস্ত্র-বাসস্থান এবং তাদের জীবন-জীবিকা-অর্থনৈতিক অবস্থা সমগ্র জাতি সম্প্রদায়কে অন্যান্যদের থেকে পৃথক করে রাখে। তাই বিশেষ সমাজ গোষ্ঠীর চাল-চিত্রাঙ্কনে আর্থ-সামাজিক অবস্থার আলোচনা সবিশেষ গুরুত্বের দাবি রাখে। নরেন্দ্রনাথ মিত্র অন্ত্যজ জীবনাশ্রিত ছোট গল্পগুলিতে অন্ত্যজ জীবনের রূপ চিত্রাঙ্কনে বসে বাস্তব সম্মত দৃষ্টিভঙ্গি ও সূক্ষ্ম পর্যবেক্ষণশীলতার সঙ্গে অন্ত্যজ সমাজের বাস্তব চিত্রকে ফুটিয়ে তুলেছেন।

নরেন্দ্রনাথ মিত্রের এই পর্যায়ের গল্পগুলি বিশ্লেষণে দেখি, অন্ত্যজ মানুষের খাদ্য-বস্ত্র-

বাসস্থান-জীবিকা-আচার-বিশ্বাস-সংস্কারের খুঁটিনাটি পরিচয় লিপিবদ্ধ করেছেন। অন্ত্যজ মানুষের সামাজিক অবস্থা-বিচারে বলা যায়, তারা চিরকাল বঞ্চিত-নিপীড়িত এবং অধিকারহীন। এদের বাসস্থানের বর্ণনায় দেখি, এরা ঝুপড়ি সর্বস্ব কুঁড়ে ঘরে অল্প পরিসরে কোন রকমে বাস করে। বেশীরভাগ ঘরই দেওয়লাহীন, ছিটে-বেড়ায় ঘেরা খড়ের ছাউনী যুক্ত দু-চালা ঘর। সর্বত্র নোংরা পরিবেশ।

পরিধান-প্রসাধনের ক্ষেত্রে দেখা যায়, একটুকরো কাপড় ও গামছা বেশিরভাগ পুরুষের পরিধেয় হয়েছে। মেয়েদের পরিধান হয়েছে ডুরে কাটা সব শাড়ী। একপ্রকারে বলা যায় অর্দ্ধনগ্ন অবস্থায় থেকে তারা পরিধানের প্রয়োজন মেটায়।

অন্ত্যজ মানুষের খাদ্য-তালিকা দৈন্যতায় ভরা। খাদ্যের মান অতি নিম্ন প্রকৃতির। বেশীরভাগ মানুষ তরকারী ছাড়া শুধু ভাত খাদ্য হিসাবে খেয়েছে। তার সাথে শাক-পাতা-শামুক-গুগলিও জুটেছে কখনো কখনো।

সামাজিক রীতি নীতির বিচারে প্রবৃত্ত হয়ে দেখি, অন্ত্যজ মানুষ নানান আচার-সংস্কার-কুসংস্কার ও কু-প্রথার বাঁধনে আষ্টে-পৃষ্ঠে বাঁধা থেকেছে।

অন্ত্যজ মানুষের অর্থনৈতিক অবস্থা বলতে মূলতঃ দারিদ্রের সঙ্গে তাদের সংগ্রামকে বোঝায়। বলা যায় দারিদ্রের মধ্যেই এদের জন্ম, দারিদ্রের সঙ্গেই এদের সহবাস। শেষ পর্যন্ত দারিদ্রের মধ্যেই মুখ থুবড়ে পড়ে এদের জীবনের ইতি ঘটে। অন্ত্যজ মানুষেরা এই দারিদ্রের হাত থেকে বাঁচার জন্য উদয়াস্ত কঠোর পরিশ্রম করে। তারা বিচিত্র পেশার অধিকারী। চাষাবাদ, গৃহভৃত্যগিরি, জেলেমাঝিগিরি, গুনিন পেশা, আসবাবপত্র নির্মাণের কাজ, বাজিকর বৃত্তি, শ্রমিকের কাজ, দিনমজুরী, ভিক্ষাবৃত্তি প্রভৃতি বিভিন্ন পেশায় তারা নিযুক্ত।

অন্ত্যজ মানুষের আর্থ সামাজিক অবস্থার চিত্র বৈচিত্র্য মন্ডিত। নরেন্দ্রনাথ মিত্র বিভিন্ন গল্পে এইসব বৈচিত্র্যকে তুলে ধরেছেন। এই বিচিত্র মুখী আর্থ সামাজিক গতি-প্রকৃতি এবার নানান দিক দিয়ে আলোচনা করবো।

অন্ত্যজ মানুষের অর্থনৈতিক জীবনের পর্যালোচনায় বসে একথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে চরম দারিদ্রের সঙ্গে লড়াই করে দিনাতিপাত করে এই সব অসহায় অন্ত্যজ মানুষগুলি। অর্থ-কষ্ট ও অর্থহীনতা অন্ত্যজ মানুষের স্বপ্ন সৌধকে ভেঙে চুরমার করে দেয়। এই সমস্ত অন্ত্যজ সমাজে প্রায় অস্পৃশ্য, মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষা কামনা-বাসনা-স্বাদ-আহ্লাদ আছে আর পাঁচটা সাধারণ মানুষের মতো। তাদের সাধ আছে অথচ সাধ্য নেই। সাধ ও সাধ্যের টানাপোড়েনে অন্ত্যজ মানুষের জীবন নিয়তি লাঞ্ছিত হয়। সাধ-পূরণের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ উপার্জন করতে অন্ত্যজ মানুষেরা প্রায়শঃ ক্ষেত্রে ব্যর্থ হয়।

তবুও এই ব্যর্থতার বিরুদ্ধে প্রাণান্তকর লড়াই করে ভাগ্য বিড়ম্বিত এই সব অন্ত্যজ মানুষেরা। এই লড়াইয়ের মাধ্যম হিসেবে নানান ধরণের পোষা ও কর্মকে জীবিকা হিসাবে গ্রহণ করেছে। বৈচিত্র্যমণ্ডিত এই সব জীবিকার আলোচনার মধ্য দিয়ে অন্ত্যজ জীবনের অর্থনৈতিক অবস্থার

চিত্রটি উন্মোচিত হবে। ক্রমান্বয়ে নরেন্দ্রনাথ মিত্রের গল্পের অন্ত্যজ মানুষের বৈচিত্র্যমণ্ডিত জীবিকার আলোচনা করবো।

নরেন্দ্রনাথ মিত্রের 'দ্বিচারিণী' গল্পের তাঁতি বধূ তরঙ্গ শহরের দুটি বাড়িতে ঝি-গিরি করে সংসারের হাল ধরেছে। যদিও দারিদ্রের তাড়নায় তারা শহরে রিফিউজি ক্যাম্পে এসে আশ্রয় নিয়েছে। তরঙ্গ মাসিক বারো টাকা মজুরীতে দুটি বাড়িতে কাজ করে :

(এক) "কথা বার্তা বলে ঠিক করে নিয়ো, আমরা বার টাকা করে দিচ্ছি। বাসন মাজা, জল তোলা, বাটনা বাটা, কয়লা ভাঙা-সবই করে।"

(দুই) "পরদিন থেকে মমতাদের বাসায় ও কাজ শুরু করল তরঙ্গ। বাথরুম আর মমতাদের রান্নঘর একেবারে পাশাপাশি, জল তোলায় তেমন কোন কষ্ট নেই।"

তরঙ্গর স্বামী বর্তমানে রুগ্ন। হাঁপানী ও অম্লের রোগে শয্যাশায়ী। কিন্তু রিফিউজি ক্যাম্পে আসার আগে সে গামছা বিক্রির কাজ করতো –সংসার চালাতো সেই টাকাতেই।

উক্ত গল্পে তরঙ্গের জীবন অবশ্যই সংগ্রাম মুখর, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। তরঙ্গ দিন-রাত অক্লান্ত পরিশ্রম করেছে। কিন্তু পরিতাপের বিষয় এই যে, কঠোর পরিশ্রম করেও বিনিময়ে সঠিক মজুরী পায়নি। বঞ্চিত হয়েছে, শোষিত হয়েছে।

নরেন্দ্রনাথ মিত্রের 'যাত্রাপথ' গল্পের অনন্ত মালো সাহিত্যিক। তার জীবিকা হয়েছে নানা পত্র-পত্রিকা অফিসে চাকরী। জেলে পাড়ার মধ্যে অনন্ত ব্যতিক্রম। সে লেখাপড়া শিখেছে। তাই তার জীবিকা হয়েছে স্বতন্ত্র। সে শহর কোলকাতাতে সংবাদ পত্রের অফিসে চাকরী করেছে। তার আগে অবশ্য নিজের গ্রামে পাঠশালা খুলেছে:

"মুখে যতই বলুক পৈত্রিক পেশাটা অনন্ত নিতে পারেনি। অবৈতনিক স্কুল চালিয়ে কলামূল্যে যা পাওয়া যায় তাতে পেট ভরে না।"

এ কারণেই অনন্ত চলে গেছে কোলকাতাতে। সেখানে প্রথম দিকে টিউশানি করেছে জীবিকার তাগিদে। শেষ পর্যন্ত সংবাদ সাময়িকিতে কখনও প্রুফ রিডারের কাজ করে, কখনও বিভাগীয় সম্পাদকের পদে চাকরী করে সংসারের হাল ধরেছে :

(এক) "পটলডাঙ্গা স্ট্রিটে যুবশক্তি নামে একটি সাপ্তাহিক কাগজে তিরিশটাকা মাইনের প্রুফ রিডারের চাকরী পেল অনন্ত।"

(দুই) "তিনি অনন্তকে কিছু কিছু লিখতেও দিলেন। দেখলেন চলতি ঘটনার ওপর নিবন্ধ অনন্ত মন্দ লেখে না। এমনকি প্রবন্ধের হাতও ওর ভালো। তিনি মালিককে বলে কয়ে ও সহকারী করে দিলেন। অনন্তর মাইনে বাড়লো পাঁচ টাকা।"

জীবিকার এই স্বাতন্ত্র্য অন্ত্যজ জীবনের ক্ষেত্রে বিরল ব্যতিক্রম। বস্তুত এই একটি ক্ষেত্র ছাড়া অন্য কোথাও এমনটি খুঁজে পাওয়া যায় না।

অন্ত্যজ মানুষের অনেকের জীবিকার মাধ্যম হয়েছে ছোট খাটো ব্যবসা। নিজের তৈরী উৎপাদন সামগ্রী কিংবা টুকি টাকি নিত্য প্রয়োজনীয় বিলাস-সামগ্রীর পসরা সাজিয়ে কেউ কেউ

পাড়ায় পাড়ায় ঘুরে তা ফেরি করে বেরিয়েছে। নরেন্দ্রনাথ মিত্রের 'সুহাসিনী ও তরল আলতা' এমনই একটি গল্প। উক্ত গল্পের ফটিক ধূপী নিজের জাত ব্যবসা ধোপাগিরি ছেড়ে ফেরিওয়ালার কাজকে পেশা হিসেবে গ্রহণ করেছে। সে নিজের তৈরী আলতা ফেরি করে বেড়ায় –সুহাসিনী তরল আলতা :

(এক) "চাই সুহাসিনী তরল আলতা, সুহাসিনী তরল আলতা... আলতা নেবেন বাবু? আমি একটু বিরক্ত ভঙ্গিতে মাথা নেড়ে বললাম, না। হকার নাছোড়বান্দা।"

(দুই) "ফটিক, আলতা ফেরি করতে তুমি এই পাইক পাড়ার দিকেও আসো নাকি আজকাল।"

যদিও আলতার ব্যবসাতে লাগার আগে নানাবিধ কাজে ফটিক নেমেছে। দর্জিগিরি, মুদি দোকানের জোগাড়ের কাজও সে করেছে কিন্তু কোথাও তার মন টেকেনি। শেষ পর্যন্ত ফেরিওয়ালা হিসেবে সে দিনাতিপাত করেছে।

অন্ত্যজ মানুষের আবার অনেকেরই জিবিকার বাহন হয়েছে বিভিন্ন নদী ও খাল বিল। এদের কেউ কেউ জাল-দরা নিয়ে মাছ ধরে জীবন চালায়। জীবন-জীবিকার প্রশ্নে এরা কঠোর পরিশ্রমী।

নরেন্দ্রনাথ মিত্রের 'যাত্রাপথ' গল্পের নায়ক অনন্ত মালোর বাবা গঙ্গাচরণ মালোর জীবিকা হয়েছে নদীতে মাছ ধরার কাজ। সে জেলে-মাঝি। নদীতে জাল ফেলে ঘন্টার পর ঘন্টা বসে থাকে গঙ্গায়। সঙ্গে তার শিশুপুত্র অনন্ত। নানান জাতের মাছ পড়ে তাদের জালে। গঙ্গাচরণ সে সব মাছ হাটে নিয়ে বেচে দেয়। বেচে সংসার চালায় :

(এক) "গঙ্গাচরণ উঠত ভেসালে আর অনন্ত গামছা গায়ে ডিঙি নৌকায় চুপ করে বসে থাকতো। রোদের তাপ যখন বেশি হতো পরনের ছোট্ট গামছাখানা মাথায় জড়িয়ে নিতো অনন্ত। জাল উঠে এলে উৎসুক চোখ নিয়ে কখনো বা টিনের কখনো বা বেতের সেঁচুনী হাতে জালের কাছে এগিয়ে যেত। ছোট সাদা সাদা টাটকিনিগুলি নামিয়ে রাখতো নৌকার খোলে। যখন ওর চেয়েও বড় দু-চারটা রায়াক মাছ উঠতো অনন্তদের ফুর্তির সীমা থাকতো না। কারণ রায়াক মাছের স্বাদ ভালো, বাজারে রায়াক মাছের দাম বেশী। ভাদ্র-আশ্বিনে উঠতো কালো নাইচা কাতলা আর কালবাউস।"

(দুই) "হাটের বেলা হয়ে গিয়েছিল। গঙ্গাচরণ মাছের ঝুড়ি মাথায় নিয়ে বেরিয়ে গেল।"

–এই যে সারাটাদিন জাল-দরা নিয়ে খাল-বিলে নদীতে ওৎ পেতে বসে থাকা ও তার বিনিময়ে জীবিকা নির্বাহ করা –এচিত্র অন্ত্যজ সমাজের অত্যন্ত পরিচিত চিত্র।

নরেন্দ্রনাথ মিত্রের 'যৌথ' গল্পের ছুতোর ভ্রাতৃদ্বয়ের জীবিকা হয়েছে ছুতোরগিরি। স্বরূপ এলাকার নামকরা মিস্ত্রি। সে দু'পা কাটা পঙ্গু হলেও তার হাতের কাজ অনবদ্য। কাঠের আসবাবপত্রের নানান নক্সা ও মূর্তি খোদাই করে স্বরূপ ভালোই উপার্জন করে :

(এক) "গভীর মনোযোগে মূর্তি খোদাইয়ের কাজ করতে থাকে স্বরূপ। ভিন্ন জেলার এক জমিদার বাড়ি থেকে বায়না দিয়ে পাঠিয়েছে। কাজ সুন্দর হলে টাকাও যেমন পাওয়া যাবে যশও তেমন দূরে-দূরান্তরে ছড়িয়ে পড়বে।"

(দুই) "বাড়ি থেকে বের হওয়ার আগে অনুরূপ সদ্য নির্মিত জলচৌকিখানা একাই দু'হাতে উঁচু করে নিয়ে এসে ছোট ভাই স্বরূপের সামনে ফেলে দিয়ে বলল, নে বাতার চারপাশ ঘুরিয়ে লতাপাতা ফুলটুল যা পারিস করে দিস।... বেশি খাটিসনে, পয়সা কিন্তু বেশি দেবে না।"

–ছুতোরের কাজ খানিকটা শিল্পের পর্যায়েই পড়ে। স্বরূপ তেমনই শিল্পী।

ঙ) সমাজ-বৈষম্যমূলক

অন্ত্যজ মানুষের আর্থ-সামাজিক পরিচয় উদ্‌ঘাটনে নিমগ্ন হয়ে একথা প্রথমেই বলতে হয়, অন্ত্যজদের সামাজিক অস্তিত্ব প্রতিকারহীন অত্যাচার-লাঞ্ছনা প্রাপ্তিতে মুখর। মানুষের সমাজে মানুষ হয়ে বেঁচে থাকার অধিকার তাদের নেই। সে অধিকার কেড়ে নিয়েছে এই সমাজেরই উচ্চবিত্ত এবং উচ্চবর্ণের মানুষেরা। তাই অসহায়, দরিদ্র-নিচের তলার অন্ত্যজ মানুষের সামাজিক ইতিহাস শুধুমাত্র অত্যাচার-বঞ্চনা-লাঞ্ছনা-নিপীড়ন-শোষণে ভরা ইতিহাস। উচ্চবিত্ত ও উচ্চবর্ণের মানুষের সুকৌশলী সুবিধাবাদী সামজিক বিন্যাসের চাপে সর্বহারা অন্ত্যজ মানুষেরা চিরকাল ধরেই বঞ্চিত-লাঞ্ছিত হয়ে আসছে। কখনো অন্ত্যজ মানুষ অর্থনৈতিক শোষণের শিকার, কখনো তারা সামাজিক দিক দিয়ে অবহেলিত, কখনো আবার তারা শারীরিক দিক দিয়ে রীতিমতো অত্যাচারিত ও লাঞ্ছিত হয়েছে।

নরেন্দ্রনাথ মিত্রের 'যাত্রাপথ' গল্পে অন্ত্যজ জেলে জীবনের প্রতি সামাজিক বৈষম্যের পরিচয়ের ছবি চিত্রিত আছে। অনন্ত মালো জাতিতে জেলে। সে পাঠশালার মেধাবী ছাত্র। কিন্তু সে জাতিভেদজনিত বৈষম্যের শিকার। পন্ডিত মশায় জল খেতে চাইলে কিশোর অনন্ত সরল মনে কলসী থেকে গ্লাসে জল ঢেলে মাস্টার মশাইকে খেতে দিয়েছে। এখানেই বেধেছে বিপত্তি। ব্রাহ্মণ পণ্ডিত মশাই অনন্তকে প্রচণ্ড ধমক দিয়ে উঠেছে :

"...হারামজাদা, ব্যাটা জেলে। তোর কি কোন আক্কেল বুদ্ধি জ্ঞানগম্যি হবে না? দিলি তো মাটির কলসিটাকে নষ্ট করে। গেল দু-গন্ডা পয়সা? তুই জল আনতে গেলি কোন্ আক্কেলে ? তোর হাতের জল এখানে খাবে কে?"

শিশু অনন্ত একথার প্রতিবাদ করেছে যুক্তি দিয়ে। সে পণ্ডিত মশাইকে বলেছে, কিন্তু মাষ্টার মশাই আমাদের হাতের মাছ তো আপনারা খান? অনন্তের এই যুক্তিপূর্ণ কথার উত্তরে মাষ্টার মশাই যা বলেছে তাতে আবহমান কাল ধরে চলে আসা অন্ধ জাতিভেদের নগ্নরূপটিই আরো প্রকট হয়ে ফুটে উঠেছে :

"আরে ব্যাটা, সে জলের মাছ। হাতের মাছ খাই বলে তোর হাতের জল খাবো ? আমার বাপ-দাদা কোনদিন খেয়েছে ? বামুনের ছেলের জাত মারতে চাস তুই ?"

শুধু গ্রামের পণ্ডিত মশাই নয়, শহরের শিক্ষিত মানুষদের মনেও যে এই জাতি বৈষম্য আছে তার চিত্রণও 'যাত্রপথ' গল্পটিতে রয়েছে। অনন্ত শহরে উচ্চশিক্ষার জন্য হাজির হলে, নিজের খরচ চালানোর জন্য যখন টিউশানি খুঁজছে তখন দেখা গেছে, জেলের ছেলেকে বাড়িতে রাখতে কেউই রাজি নয়। কারণ, সেই অন্ধ জাতি বৈষম্য :

"কিন্তু থাকা খাওয়ার যায়গা আর জোটে না। যারা রেসিডেন্সিয়াল টিউটর রাখে তারা কেউ জেলের ছেলেকে রাখতে চায় না। ভিন্ন জাতের ছেলে রাখা অনেক অসুবিধা।"

–অনুদার উচ্চবর্ণের সমাজ কখনই অন্ত্যজ মানুষকে মানুষের মর্যাদা দেয়নি –সে কি সামাজিক বিষয়ে, কি শিক্ষা ক্ষেত্রে। 'যাত্রাপথ' গল্পে তার সত্য চিত্র উন্মোচিত হয়েছে।

চ) সংস্কৃতি ভিত্তিক

অন্ত্যজ সংস্কৃতি বলতে বোঝানো হয়েছে অন্ত্যজ মানুষ-জনের সংস্কৃতি। অন্ত্যজ সংস্কৃতির স্বরূপ প্রকৃতি বৈশিষ্ট্য ও বৈচিত্র্যের দিকে লক্ষ্য রেখে অন্ত্যজ সংস্কৃতিকে কয়েকটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে। যেমন,

(ক) বস্তু কেন্দ্রিক সংস্কৃতি

(খ) বাক্ কেন্দ্রিক সংস্কৃতি

(গ) বিশ্বাস অনুষ্ঠান কেন্দ্রিক সংস্কৃতি

(ঘ) অঙ্গভঙ্গ কেন্দ্রিক সংস্কৃতি

(ঙ) অঙ্কন-লিখন কেন্দ্রিক সংস্কৃতি।

নরেন্দ্রনাথ মিত্রের কিছু গল্পে বস্তু কেন্দ্রিক সংস্কৃতি ও অঙ্কন লিখন কেন্দ্রিক সংস্কৃতির পরিচয় পায়। যেমন, 'যৌথ' গল্পটি। এই গল্পে ছুতোর জীবনের বস্তু কেন্দ্রিক সংস্কৃতির পরিচয় আছে। অনুরূপ ও স্বরূপ দুই ভাই, হাতের বাটালির আঁচড়ে অনায়াস দক্ষতায় কাঠের নানান আসবাবপত্র তৈরী করে। অনুরূপের থেকেও স্বরূপ নামী শিল্পী। স্বরূপ কাঠের আসবাবে ফুল-লতা-পাতার কারুকার্য ফুটিয়ে তোলে :

(এক) "বাড়ি থেকে বের হওয়ার আগে অনুরূপ সদ্যনির্মিত জলচৌকিখানা একাই দু'হাতে উঁচু করে নিয়ে এসে ছোটভাই স্বরূপের সামনে ফেলে দিয়ে বলল, নে বাতার চারপাশ ঘুরিয়ে লতা-পাতা-ফুল-টুল যা পারিস করে দিস।"

(দুই) "জল চৌকিটা টেনে নিয়ে উড্ পেনশিল দিয়ে তার পায়া আর বাতার উপর লতাপাতার নক্সা আঁকতে লাগল স্বরূপ। পরে এগুলিকে বাটালি কেটে কেটে তুলতে হবে।"

শুধু ফুল লতা পাতার নক্সা নয়, স্বরূপ বাটালির কাজে কাঠের উপর মানুষের মুখ ও খোদাই করতে পারে। একাজে তার যশ-প্রতিপত্তি বেশ ভালোই। স্বরূপ মনের অনুরাগ প্রকাশের আশ্রয় করে তার বৌদি মল্লিকার একখানি আবক্ষ মূর্তি তৈরী করেছে :

"...দেখি দেখি কি মূর্তি কেটেছে ঠাকুরপো। অনুরূপ রূঢ় কন্ঠে বলল দেখ চিনতে পার কি না। চেনা কঠিন নয়। মল্লিকারই আবক্ষ প্রতিকৃতি। এখনকার ভাঙাচোরা ক্ষয়ে যাওয়া মল্লিকার নয়, দশ বছর আগে সেই যৌবনোচ্ছলা সপ্তদশী মল্লিকা আবার এসে সামনে দাঁড়িয়েছে যেন।"

দূর-দূরান্ত থেকে মূর্তি গড়ার বায়না আসে স্বরূপের কাছে। স্বরূপ বড় একাগ্র চিত্তে কাঠ

খোদাই করে করে মূর্তি নির্মাণ করে চলে। একাজে তার অনায়াস দক্ষতা :

(এক) "কারুকার্য সত্যিই বেশ ভালো করে স্বরূপ, খাট আলমারীগুলির অলঙ্করণ ছাড়াও মাঝে মাঝে কাঠের উপর নানা রকম মূর্তি স্বরূপ বাটালি দিয়ে কুঁদে কুঁদে তুলেছে।"

(দুই) "গভীর মনোযোগে মূর্তি খোদাইয়ের কাজ করতে থাকে স্বরূপ। ভিন্ন জেলার এক জমিদার বাড়ি থেকে বায়না দিয়ে পাঠিয়েছে।"

অন্ত্যজ মানুষ হলেও স্বরূপের শিল্প সৃষ্টি অনেক উন্নত মানের। অন্ত্যজ জীবনের বস্তু কেন্দ্রিক সংস্কৃতির পরিচয়ে 'যৌথ' গল্পটি গুরুত্বপূর্ণ।

নরেন্দ্রনাথ মিত্রের 'যাত্রাপথ' গল্পে জেলে-জীবনের অঙ্কন-লিখন কেন্দ্রিক সংস্কৃতির সামান্য পরিচয় পাওয়া যায়। জেলে জাতির ছেলে কিশোর অনন্ত মালো কবি-স্বভাব কবি। সে মুখে মুখে যখন তখন ছড়া–কবিতা রচনা করতে পারে। গল্পে দেখি, বাবার সঙ্গে নদীতে মাছ ধরতে গিয়ে কিশোর বালক বয়সে অনন্ত নৌকাতে বসেই, মাছ সম্বন্ধীয় পদ্য রচনা করেছে :

" রুই কাতলা বোয়াল শোল কই মাগুর সিঙ্গি।

চুঁচড়া চাঁদা রায়াক পুঁটি টাটকিনি মলুঙ্গী ॥"

গল্পের নায়ক চরিত্রের এমন প্রতিভা যেমন তাদের সংস্কৃতির পরিচয়কে সমৃদ্ধ করে তেমনি তাদের সমাজ ব্যবস্থাকেও উন্মোচিত করে।

চার) মনোজ বসু (১৯০১-১৯৮৭)

মনোজ বসু (১৯০১-১৯৮৭) কোলকাতায় এসেছিলেন বাংলাদেশের যশোর জেলার এক গ্রাম থেকে কোলকাতার রুক্ষ বাস্তব জীবনে অভাবের বিরুদ্ধে যখন তিনি লড়াই করেছিলেন তখন তাঁর দৃষ্টি থেকে গ্রামের স্বপ্ন মায়া মোহ মুছে যায়নি। তাঁর ছোট গল্পের নিসর্গ ও পরিবেশ ঐ যশোর জেলার গ্রাম থেকেই আহরিত। পঁয়তাল্লিশ বছর বয়সে এক বেতার-ভাষণে মনোজ বসু তা স্বীকার করেছেন, "কোলকাতায় থাকি, কলেজের পড়া সমাধা হয়ে এসেছে। শহর রাজ্যের ভিতর অহরহ গ্রাম আমাকে আবিষ্ট করে রাখতো। পাড়া গাঁয়ের ছেলে, বাড়ির সামনে বিল। ছেলে বয়স থেকে ঋতুতে ঋতুতে বিলের রূপ বদলানো দেখেছি। চৈত্র-বৈশাখে ক্রোশের পর ক্রোশ ধূ-ধূ করে। রাত্রি বেলা বাইরের উঠোনে দাঁড়িয়ে দেখতাম, দূরে আগুন জ্বলে জ্বলে উঠছে।... এই ভয়ঙ্কর বিল বর্ষায় সবুজ সজল-স্নিগ্ধ। দিগন্ত ব্যপ্ত জলোস্রোত বয়ে চলে, নৌকা, ডোঙা অবিরাম ছুটাছুটি করে। ধানবনের ভিতর থেকে হঠাৎ চাষীর গলার গান ভেসে আসে –সখি সোনার প্রেম কাহিনী। আবার প্রথম শীতে পাকা ধানে বিলের গেরুয়া রঙ। বাঁক বোঝায় ভারে ভারে ধান নিয়ে আসছে, ঘরে ঘরে পাল পার্বণ ভাসান-কবি-যাত্রা-গান। ঢোল বাজছে এপাড়া-ওপাড়ায়।... এই বিল ও বিলের প্রান্তবর্তী মানুষগুলো তাদের সুখ-দুঃখ আশা-উল্লাস নিয়ে আমার মন জুড়ে রয়েছে। বিশাল বাংলাদেশকে চিনেছি আমি এদের মধ্য দিয়ে। এদের বিরহে বিষাক্ত হয়ে উঠত শহরের কলেজ জীবন। হঠাৎ মাঝে মাঝে

নিরুদ্দেশ হয়ে এদের মধ্যে অজ্ঞাতবাসে যেতাম। যেন ইট-পাথরের শুকনো ডাঙা থেকে ডুব-সাঁতার দিতে যেতাম জীবনের রসপ্রাচুর্যের ভিতর। আলাদা ছিলাম না তাদের থেকে। তাদের কথা বলতাম, গল্প লিখতে গেলেই প্রতিটি ছত্রেই তারাই এসে উঁকি-ঝুঁকি মারতো এমনি করে তাদের মানস সান্নিধ্য লাভ করতাম আমি, নাগরিক নিঃসঙ্গতার বেদনা ভুলে যেতাম। চোখের কত অশ্রু অন্তরের কত উল্লাস মিশিয়ে যে আমার সে-আমলের গল্পগুলোর সৃষ্টি!"

(৭ই জুলাই ১৯৪৫-এ বেতার ভাষণ, 'গল্প লেখার গল্প' সংকলন : সম্পাদনা জ্যোতিপ্রসাদ বসু, শ্রাবণ ১৩৫৩/১৯৪৬)

তিরিশের দশকে অভিজাত সাহিত্য পত্রিকা 'প্রবাসী'-তে মনোজ বসুর প্রথম গল্প প্রকাশিত হয়। তার ফলে যে পরিচিতি ঘটে তা পরবর্তী অর্দ্ধ শতাব্দে দিনে দিনে প্রসারিত হয়েছে। গল্পকার মনোজ বসুর প্রেরণাস্থল যে মাটি আর মানুষ, তাদের কথা আন্তরিকতার সঙ্গে বলেছেন তিনি উপরি উদ্ধৃত অংশে। এর থেকেই গল্প লেখক মনোজ বসুকে চেনা যায়। রোমান্টিক দৃষ্টি আর বুকভরা ভালোবাসা নিয়ে তিনি মাটি ও মানুষের কাহিনী লিখেছেন। তাঁর গল্পে যে কৌতুকময় কথকতার ঢঙটা পাওয়া যায় তারও উৎস ঐ পরিবেশ ও গ্রামজীবন। মনোজ বসুর গল্প সংখ্যা কম নয়। অর্দ্ধ শতাব্দ যাবৎ তিনি ছোট গল্পের চর্চা করেছেন। তাঁর গল্পগুলি প্রধানত পাঁচটি ভাগে বিভক্ত করা যেতে পারে। যেমন :

ক) ইতিহাস আশ্রয়ী রোমন্টিক গল্প

খ) দাম্পত্য প্রেমের ও ভালোবাসার গল্প

গ) রাজনৈতিক গল্প

ঘ) মধ্যবিত্ত গরীবের আনন্দ বেদনার গল্প

ঙ) অতিলৌকিক গল্প।

পঞ্চাশ বছরে মনোজ বসু প্রায় দেড়শো গল্প লিখেছেন। তাঁর গল্প গ্রন্থগুলি হল– 'বনমর্মর' (১৯৩২), 'নরবাঁধ' (১৯৩৩), 'দেবী কিশোরী' (১৯৩৪), 'একদা নিশীথ কালে' (১৯৪২), 'দুঃখ নিশার শেষে' (১৯৪৪), 'পৃথিবী কাদের' (১৯৪৮), 'উলু' (১৯৪৮), 'খদ্যোত' (১৯৫০), 'দিল্লী অনেক দূর' (১৯৫১), 'কুমকুম' (১৯৫২), 'কিংসুক' (দ্বিতীয় সং ১৯৫৭), 'মায়াকন্যা' (১৯৬১)।

মনোজ বসুর গল্পগুলিকে উপরিল্লিখিত পাঁচটি ভাগে ভাগ আমরা করেছি। পাঁচটি ভাগ নিয়ে আমরা বিস্তারিত আলোচনায় যাব না। আমাদের আলোচ্য বিষয় মনোজ বসুর গল্পে অন্ত্যজ শ্রেণীর মানুষের উপস্থিতি কতটা পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে উঠে এসেছে অর্থাৎ চতুর্থভাগে নিম্ন মধ্যবিত্ত গরীবের আনন্দ বেদনার গল্পগুলি। এই গল্পগুলিকে ব্যক্তি জীবনাশ্রিত, পরিবারাশ্রিত, চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যাশ্রিত, আর্থ-সমাজাশ্রিত, সমাজ-বৈষম্যমূলক ও সংস্কৃতি ভিত্তিক প্রভৃতি ভাগে ভাগ করে আলোচনা করবো।

ক) ব্যক্তি জীবনাশ্রিত

মনোজ বসুর ব্যক্তি জীবনকেন্দ্রিক গল্প 'বাদাবনের গান' গল্পটিতে অন্ত্যজ শ্রেণীর মানুষের

প্রেম জীবনের বিষন্ন ট্রাজিক পরিণতি সূচিত হয়েছে। সুন্দরবন এলাকার মর্জাল নদীর মাঝি ওমসা একা মানুষ। নদীটি এবং তার নিজ কন্ঠের বেতালা গান তার সাথী। এহেন ওমসা ভালবাসে তাহার পাড়ার যুবতী নারী দয়া কাওরাকে। যদিও দয়া ওমসাকে চায় না। সে চায় চৌধুরী হাটের ফটিককে। ফলে বিরহ-বেদনায় ওমসা আরো একাকী হয়ে পড়ে। এরই মধ্যে একদিন দয়াকে নিজের নৌকায় পেয়ে ওমসা তার হাত ধরেছিল। এবং হাতেনাতে দয়া একাজের শাস্তি ওমসাকে দিয়েছিল। সে ওমসার হাত কামড়ে দিয়েছিল। উপরন্তু একদিন দয়া তার প্রেমিক ফটিককে দিয়ে অপমানিতও করল ওমসাকে। শুধু তাই নয় তার প্রতি ওমসার অন্ধ প্রেমানুগত্যের সুযোগ নিয়ে ওমসার সাথে মিথ্যে প্রেমের অভিনয় করে, সে ওমসার নৌকা চড়ে রাত-গভীরে চৌধুরী হাটে ফটিকের কাছে এসেছে। এতে চরম অপমান বোধ করেছে ওমসা। প্রেমাস্পদের কাছ থেকে প্রাপ্ত এই ব্যবহারের ও অপমানের জ্বালা বুকে নিয়ে মর্জাল নদীতে বেতালা সুরে গান গেয়ে বেড়ায়। একদিন সে শোনে দয়া আত্মহত্যা করে মারা গেছে। ব্যথিত হৃদয় আরো ব্যথিত হয় ওমসার। দয়া বেঁচে নেই, সে আছে। একটা ঢোলককে আশ্রয় করে সারারাত নিজের বেসুরো গলার গান গেয়ে সে বোধহয় সেইগান অদৃশ্য দয়াকেই নিবেদন করে।

খ) পরিবারাশ্রিত

অন্ত্যজ জীবনাশ্রিত পরিবার কেন্দ্রিক মনোজ বসুর 'পৃথিবী কাদের' গল্পে এক অত্যাচার-লাঞ্ছিত চাষী পরিবারের বিনষ্টির কাহিনী বর্ণিত হয়েছে। গল্পে দেখি, জাত চাষী নটবর মণ্ডল জমিচাষ ও ফসল ফলানো ছাড়া কিছু বোঝে না। চাষবাস ও স্ত্রী সৌদামিনীকে নিয়ে চলে তার সংসার। চরম দারিদ্রের কবলে পড়ে গত তিন বছরে খাজনা সে জমিদারকে দিতে পারেনি। সে কারণে জমিদার বরকন্দাজ পাঠিয়ে নটবরকে জমি থেকে উচ্ছেদ করে দেয়। কিন্তু চাষের নেশা নটবরকে পেয়ে বসেছে। বাড়ির উঠানে তার বীজতলা। সকলকে লুকিয়ে রাতের অন্ধকারে সে জমিতে লাঙ্গল দিয়ে জমি পরিপাটি করে রাখে। তবুও তার চাষ হয় না। নিলামে তার জমি সম্পূর্ণরূপে বাজেয়াপ্ত করে জমিদার তা নিজেই দখল করে নেয়। তাতেও বকেয়া খাজনা শোধ না হওয়ায় তার বীজগুলোও এক গোয়ালার কাছে বন্দোবস্ত করে দেয় জমিদার। গোয়ালা বীজতলাতে গরু ছেড়ে দেয় খাওয়ানোর জন্য। এই অনাসৃষ্টি সহ্য করতে না পেরে নটবর লাঠির আঘাতে গোয়ালার মাথা ফাটিয়ে দেয়। তার পর জমিদারের শাস্তি এড়াতে রাতের অন্ধকারে স্ত্রী সৌদামিনীকে সঙ্গে নিয়ে নটবর গাঁ ছেড়ে চলে যায়। যাওয়ার সময় তাদের পরিত্যক্ত বাড়িটাতে আগুন ধরিয়ে দেয়। আর ভগবানের কাছে অভিযোগ জানায় :

"গিয়ে সেই পোড়া বিধাতাকে জিজ্ঞাসা করবো, পৃথিবী যদি বাটোয়ারা করে দিয়েছিস –তবে আমাদের সেখানে পাঠাস কি জন্য ?" (পৃথিবী কাদের : বসু মনোজ)

–এই সর্বস্ব শূন্য অত্যাচারিতের চরম হতাশার কথা। জমিদারের অত্যাচারের কবলে পড়ে বিপর্যস্ত বিধ্বস্ত এক অন্ত্যজ পরিবারের আন্তরিক কান্না এই গল্পে বাণীমূর্তি পেয়েছে।

গ) অর্থ ও সমস্যাশ্রিত

মনোজ বসুর 'দিল্লী অনেক দূর' গল্পের বিষয়বস্তু হয়েছে অন্ত্যজ মানুষের আর্থিক সমস্যা ও সেই হেতু তাদের সাংসারিক বিপর্যয়ের কাহিনী। এখানে দারিদ্রের বিরুদ্ধে অন্ত্যজ মানুষের সংগ্রাম মুখর জীবন কথাই মুখ্য স্থান দখল করেছে।

গল্পের নায়ক অজয়দের বাড়ির চাকর হল পবন এবং শৈলী। তাদেরই বাড়ির ঝি। দুজনে বিয়ে করে শুরু করে জীবন-সংগ্রাম-অর্থনৈতিক জীবনে প্রতিষ্ঠা-প্রাপ্তির সংগ্রাম। পবন চাকরের কাজ ছেড়ে সামান্য পুঁজি নিয়ে পান-সুপারী ফেরি করে বিক্রি করতে শুরু করেছে। মনের কোণে তার সংকল্প : একদিন না একদিন সে বড় দোকান দেবেই পান-সুপারির। এর জন্যই চলে তার দিন রাত অক্লান্ত পরিশ্রম। শৈলী নিজের প্রচেষ্টায় অজয়দের বড়বাগানের এক কোণে একটা কুঁড়ে ঘর বাঁধে। এই শেষ। দারিদ্র-লাঞ্ছিত মানুষের লড়াই আর বেশী দূর এগোতে পারে না। বড় দোকান খোলার আগেই পবন মারা যায়। নিদারুণ অর্থকষ্টের মধ্যে রুগ্ন শরীর ও একটি পুত্র সন্তান কে নিয়ে শৈলীর জীবন চলে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে। শৈলীর জীবনের এই পরাজয় ও ট্রাজিক অবস্থা আরো ঘনীভূত রূপ পায় অজয়ের চিন্তায়। স্বাধীনতা সংগ্রামে অজয়, প্রথম স্বাধীনতা দিবসের পতাকা শৈলীর বাড়িতে তুলবার মনস্থ করে শৈলীকে চিঠি দেয়। সে ভেবেছিল শৈলী গ্রামের সমস্ত মানুষকে তার বাড়িতে জড়ো করে রাখবে। কিন্তু অনাহারে-অর্দ্ধাহারে শৈলী তখন জ্বরে কাবু। অক্ষম। দরিদ্র গ্রাম তাদের জীবিকার তাগিদে ব্যস্ত। স্বাধীনতার কোন মূল্য তাদের কাছে নেই। শৈলীর অর্থ-লাঞ্ছিত জীবনে এই স্বাধীনতা বিরাট কিছু আলোড়নও তুলতে পারে না। লেখকের বর্ণনা :

"অজয়ের লজ্জা করছে পতাকা না এনে সাধ্যমতো দু'খানা কাপড় কিনে যদি বগলদাবায় করে নিয়ে আসতো।" (দিল্লী অনেক দূর : বসু মনোজ)

–এখানে অন্ত্যজ সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি শৈলী অর্থ সংকটে পড়ে দারিদ্রের সঙ্গে সংগ্রাম করে বেঁচে আছে সাধ ও সাধ্যের লড়াইতে সে নিমগ্ন। মনোজ বসু সেই লড়াইয়ের চিত্রকে অনন্য সাধারণভাবে ও রূপে তুলে ধরেছেন।

ঘ) চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যাশ্রিত

সাহিত্যে চরিত্র নির্মাণ একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় –সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। চরিত্র সৃষ্টির নৈপুণ্যের উপর নির্ভর করে গল্প সার্থকতা। মনোজ বসুর অন্ত্যজ জীবনাশ্রিত ছোটগল্পগুলিতে অন্ত্যজ সম্প্রদায়ের পুরুষ ও নারী চরিত্রগুলি কতটা সার্থকতার সঙ্গে সৃষ্টি করেছেন – তাই-ই আমরা এখন আলোচনা করবো।

পুরুষ চরিত্র

মনোজ বসুর অন্ত্যজ জীবনাশ্রিত ছোট গল্পগুলিতে প্রাপ্ত পুরুষ চরিত্রগুলির স্বভাব-স্বরূপ ও মনোগত বৈশিষ্ট্য বিচারে নানা রকমের মানুষের সন্ধান পাওয়া গেছে। এই পর্যায়েরর গল্পে মহানুভব,

সৎ, উদারহৃদয়, সাধাসিধে সাধারণ মানুষের উপস্থিতি মনোজ বসু নৈপুণ্যের সঙ্গে চিত্রিত করেছেন।

মনোজ বসুর 'পৃথিবী কাদের' গল্পে নটবর সরল, সাদাসিধে, নিরীহ সাধারণ মানুষ। তার মনের সরলমতি প্রবাহের বৈশিষ্ট্যের মধ্যে তার কথা ও কাজের অনবদ্য সাযুজ্যে নটবর চরিত্রটি বিকশিত হয়েছে। এ হেন নটবর অত্যাচার ও বৈষম্যের শিকার। তার উপর নেমে এসেছে সামন্ত বাদী অত্যাচার। জাতচাষীর ছেলে নটবর জমির খাজনা মেটাতে পারেনি বলে জমিদার জমি কেড়ে নিয়েছে। তার বীজতলা নিলামে এক গোয়ালার কাছে বেচে দিয়েছে। সে গোয়ালা চরণঘোষ গরু দিয়ে তার হাতে বোনা বীজধান খাওয়াতে শুরু করেছে। জাত চাষীর ছেলে এই অনাচার কখনও মুখ বুজে সহ্য করতে পারে না। চাষের নেশায় নটবরের হাত-পা নিশপিশ করে। ভরা চাষের মরশুমে প্রকৃত চাষী কখনও হাত পা গুটিয়ে বসে থাকতে পারে না। তাই সক্রিয় হয় নটবর। সে বাঁকের আঘাতে চরণ ঘোষকে উপযুক্ত শিক্ষা দিয়ে আহত করল। এই সূত্রে নেমে এল সাধাসিধে চাষীর জীবনের এই মর্মন্তুদ পরিণতি অন্ত্যজ জীবনের বিশেষ পরিচয়কে সাংকেতিত করেছে। নটবর চরিত্রাঙ্কনে গল্পকার মনোজ বসু সবিশেষ সফলতার পরিচয় দিয়েছেন।

মনোজ বসুর 'ধানবনের গান' গল্পের নন্দরাম গায়েন চরিত্রটি সততার বৈশিষ্ট্যে জীবন্ত। সে সৎ, সরলমতি, সাদাসিধে সাধারণ মানুষ হলেও ন্যায় নীতি ও ন্যায়বোধে সমুজ্জ্বল। ন্যায় ধর্মের কারণেই সে তার নিজ পিতার বিরুদ্ধাচরণ করতেও দ্বিধা করেনি। তার বাবা কানাই গায়েন প্রায় অন্যায় ভাবে গাঁয়ের মাতব্বর চাটুয্যে মশাই ও কাছারির নায়েবকে ঘুষ দিয়ে গ্রামেরই চাষী জীবধরের ধান হস্তগত করেছিল। নন্দ এই অন্যায় ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছে। সবাইকে অবাক করে দিয়ে সে কাছারির ম্যানেজারের কাছে নিজের বাবার বিরুদ্ধে নালিশ করেছে। সে এমনটা করেছে যেমন ন্যায় বোধের দ্বারা তাড়িত হয়ে তেমনি ফসল ও চাষের প্রতি তার অকৃত্রিম টানের কারণে। শেষ পর্যন্ত তার লড়াইতে সে জয়ী হয়েছে। বিরল সততার অধিকারী নন্দরাম অন্ত্যজ জীবনের ব্যতিক্রমী দৃষ্টান্ত।

মনোজ বসুর 'বাদাবনের গান' গল্পের ওমসা চরিত্রটি একটি প্রেমিক চরিত্র। প্রেম এবং প্রেম মনস্তত্ত্বের রঙে ও রেখায় এই চরিত্রটি জীবন্ত। প্রেমের জন্য এর জন্ম ও মৃত্যু। গল্পে দেখি, ওমসা কাহার কন্যা দয়ার প্রেমে পাগল এবং প্রেমে ব্যর্থ হয়ে উন্মাদ হয়ে গেছে। দয়ার জন্যই ওমসার জীবনে নেমে এসেছে ট্রাজিক বিষন্নতা। দয়ার জন্য ওমসা জীবনের সুস্থগতি থেকে অনেক দূরে সরে গেছে। দয়া তাকে ঠকিয়ে অন্য পুরুষকে সঙ্গী করলে ওমসার মনে আরো মারাত্মক রকমের চাপ সৃষ্টি হয়। সে সারারাত ধরে নদীতে ভেসে বেড়ায় ও গান-বাজনা করে। সারারাত ওমসার এই গান-বাজনা করার পিছনেও রয়েছে তার প্রেমাস্পদ দয়ার প্রচ্ছন্ন প্রভাব। কেননা, দয়া একদা তার গান শোনার জন্য আবদার ধরতো, তাই বর্তমানে দয়ারই অলৌকিক আত্মার উদ্দেশ্যে তার এই গান –তার হৃদয়ের সমস্ত আকুতির নিবেদন। বড়ই করুণ ও হৃদয়বিদারী এহেন পরিণতি। ব্যর্থতার হাহাকারে ও যন্ত্রণার অব্যক্ত গোঙানিতে ওমসার চরিত্রটি অন্ত্যজ সমাজ জীবনের ব্যতিক্রমী চরিত্র।

নারী চরিত্র

অন্ত্যজ জীবনাশ্রিত নারী চরিত্রগুলি মনোজ বসুর গল্পে বৈচিত্র্যে উজ্জ্বল; বৈশিষ্ট্যে আকর্ষণীয়। বিচিত্র মত-মতি ও মানসিকতার নারী চরিত্রে ভিড় মনোজ বসুর কিছু ছোটগল্পগুলিকে স্বতন্ত্র করেছে। মনোজবসুর 'ধানবনের গান' গল্পে চাষীর মেয়ে দুলি সরল, সৎ এবং সাদাসিধে ভালমানুষ চরিত্র। সে সরল-সাদাসিধে পল্লী-বালিকা হলেও মাঠ-মাটি-ধানের প্রতি এক অসম্ভব ঐকান্তিক টান অনুভব করে সে। গল্পে দেখি, গোয়ালার ছেলে নন্দর গরু তাদের ধানে মুখ দিলে সে তেড়ে আসে। অবস্থার ফেরে যখন সেই ধানের মালিক নন্দরা হয়, তখনও ধানের প্রতি দুলির সেই টান সমানে থেকে গেছে। এখানে দুলি যেন চাষী সংস্কারের প্রতীক। তার কথা :

"গরু দিয়ে ধান খাওয়ালে আমার এক একটা পাঁজরা খসে যায় যেন।"

(ধান বনের গান : বসু মনোজ)

মনোজ বসুর অন্ত্যজ জীবনাশ্রিত গল্পে প্রতিবাদী নারী চরিত্রও দেখা যায়। তারা সচেতন। তারা সংগ্রামী। নারী চরিত্রগুলি প্রতিবাদী হয়েছে আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক নানান অবস্থা ও পরিস্থিতির বিরুদ্ধে। এদের উপরে নেমে আসা অত্যাচার-লাঞ্ছনার বিরুদ্ধে সংগঠিত প্রতিবাদ প্রতিরোধে নেমেছে। অন্ত্যজ নারীদের মধ্যে এই প্রতিবাদী নারীর সংখ্যা অল্প হলেও তারা বৈচিত্র্যে ও বৈশিষ্ট্যে স্বতন্ত্র।

'পৃথিবী কাদের' গল্পে চাষী পরিবারের গৃহবধূ সৌদামিনী একটি প্রতিবাদী চরিত্র। আপাত দৃষ্টিতে শান্ত, নিরীহ এবং ভালমানুষ সৌদামিনীর প্রতিবাদী মানসিকতা অন্ত্যজ জনসমাজে তাকে ব্যতিক্রমী করেছে। তাদের জমি জমিদার নিলামে চড়িয়েছে। সে জমি তারা আর চাষ করতে পারবে না –একথা শুনে সৌদামিনী বিদ্রোহী হয়ে উঠেছে। সে দৃপ্ত কন্ঠে বলে উঠেছে :

"জমি চষতে দেবে না –হঃ বললেই হল। আমার বাবা মরেছে সাপের কামড়ে –যেকটা ধান ছিল পেটে না খেয়ে বীজতলায় ছড়িয়েছি –কেন দেবে না ?" (পৃথিবী কাদের : বসু মনোজ)

কিন্তু জমিদারের প্রকোপের সামনে এই বিদ্রোহ টিকতে পারে না। সৌদামিনী ও তার স্বামী নটবরকে ঐ অন্যায় সিদ্ধান্তের শিকার হয়ে গৃহছাড়া হতে হয়। কিন্তু প্রতিবাদী সৌদামিনী ক্ষোভে-বিক্ষোভে যেন ফেটে পড়ে। তার অসহায় ক্ষোভ তাকে এতটাই প্রতিবাদী করে তুলেছে যে, সে অন্ধকার রাত্রে নিজেদের ভিটে ছাড়ার সময় তাদের পরিত্যক্ত ভিটেতে আগুন ধরিয়ে দেয়। এতদিনকার অধিকারের ঘরে আগুন দিয়ে তার মনের ক্ষোভ ও জ্বালাকে মেটাতে চায়। সেই সাথে এই অন্যায়ের বিরুদ্ধে অসহায় এই নারী ঈশ্বরের কাছে প্রতিবাদে উজ্জ্বল আর্জি জানায়। সে গর্জে উঠে বলে :

"গিয়ে সে পোড়া বিধাতাকে জিজ্ঞাসা করবো, পৃথিবী যদি বাটোয়ারা করে দিয়েছিস –তবে আমাদের সেখানে পাঠাস কি জন্যে ?"

(পৃথিবী কাদের : বসু মনোজ)

সৌদামিনীর এই কথা গভীর ব্যঞ্জনাবাহী। তার এই আর্জি তার মধ্যেকার ক্ষোভ ও প্রতিবাদের

মূর্তিমান বাণীবিগ্রহ। পৃথিবীর অধিকার নিয়ে তার এই প্রশ্ন তাকে প্রতিবাদী হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছে।

মনোজ বসুর 'দিল্লি অনেক দূর' গল্পে শৈলী চরিত্রটি ট্রাজিক বিষন্নতায় ভাস্বর। সে নিয়তি-লাঞ্ছিত। সরল সাদাসিধে নারী, নিয়তির হাতে মার খেয়ে জীবনের দুঃখবোধ ও হতাশার মধ্যে ডুবে গেছে। গল্পে দেখি, শৈলীর ট্রাজেডি ভারতবর্ষের স্বাধীনতা-প্রাপ্তির সঙ্গে জড়িয়ে আছে। একদিকে দেশের স্বাধীনতা প্রাপ্তির শুভ মুহূর্তের উন্মাদনা ও উৎসব মুখরতা, অন্যদিকে অসুস্থ ও দারিদ্র-লাঞ্ছিত ভাগ্য বিপর্যয় ও নিয়তির হাতে লাঞ্ছনা প্রাপ্তি শৈলীর ট্রাজেডিকে মূর্ত করে তুলেছে। আসলে শৈলী দরিদ্র ভারতবাসীর প্রতিনিধি। লাঞ্ছিত-নিপীড়িত জীবন যেন ভারতবর্ষের শূন্যগর্ভ স্বাধীনতা প্রাপ্তির বিরুদ্ধে একটা মূক প্রতিবাদ। সমগ্র গ্রাম ভারতবর্ষের মানুষ ভারতের প্রথম স্বাধীনতা দিবসের দিনটিতেও জীবন-জীবিকা ও উদর পূরণের নিত্য প্রয়োজনে প্রাণপণ কাজে ব্যস্ত। স্বাধীনতার আলাদা তাৎপর্য তাদের কাছে নেই। শৈলীর জীবনের রূপায়ণের মধ্য দিয়ে এই সত্য উদ্ভাসিত হয়েছে। শৈলী স্বামী পবনকে নিয়ে অর্থনৈতিক দিক দিয়ে স্বনির্ভর হওয়ার আপ্রাণ চেষ্টা করছিল। সে পারেনি। অপুষ্টির কারণে পবন মারা গেছে। ফলে শৈলী নিদারুণ অর্থ-কষ্টের মধ্যে পড়েছে – এই সূত্রে তার ট্রাজেডি ঘনীভূত হয়েছে। স্বাধীনতা সংগ্রামী অজয়ের মনে হয়েছে, শৈলীদের জন্য পতাকা না এনে কিছু কাপড় আনা উচিৎ ছিল। এই ভাবনাই শূণ্যগর্ভ স্বাধীনতার মর্মমূলে কুঠারাঘাত করে শৈলীর ট্রাজেডিকে জীবন্ত করে তুলেছে।

ঙ) পটভূমি ভিত্তিক

সাহিত্যের যে কোন বিভাগের ক্ষেত্রে পটভূমি রচনা সবিশেষ গুরুত্ব বহন করে। বিশেষ করে গদ্য সাহিত্যের ক্ষেত্রে সুনিপুণ পটভূমি রচনা সাহিত্যিকদের সৃজন-দক্ষতার পরিচয়টিকে উন্মোচিত করে বলেই মনে হয়। গল্প কিংবা উপন্যাসের ক্ষেত্রে অবিসংবাদিতভাবে সত্য। পরিবেশ-পটভূমির সুদৃঢ় ভিত্তির উপর ভর করে গল্প উপন্যাসের বুননটি সুবিকশিত হয়ে ওঠে গল্প উপন্যাসের বিশেষ বিশেষ বিষয়বস্তু সতন্ত্র পরিবেশ রচনার দাবি করে। পটভূমি রচনায় এই সতন্ত্র দাবি সাহিত্য রচনার কলা-কৌশলের আভ্যন্তরীণ ব্যাপার। ভিতর থেকে গল্পের পটভূমি পরিবেশ ও গল্পের বিষয়বস্তু পরস্পর সহাবস্থানে এককেন্দ্রিক হয়ে গড়ে ওঠে। তেমনটি না ঘটলে গল্প গঠনে গতি আসে না –গল্প শিল্প সার্থকতার ক্ষেত্রে মার খায়। তাই কথা সাহিত্যিকেরা গল্প বিষয়ে নির্মাণের সাথে সাথে গল্পের পটভূমিকে সমান গুরুত্বে মজবুত করে তোলেন। এর ফলে গল্পগুলি শিল্পগত ঐক্যে প্রস্ফুটিত হয়। মনোজ বসুর অন্ত্যজ জীবনাশ্রিত ছোটগল্পগুলিও এই সত্যের পরিচয় বহন করে শিল্প সফলতা পেয়েছে।

অন্ত্যজ জীবনের রূপচিত্রণে পটভূমির গুরুত্ব কম নয়। পটভূমির বৈচিত্র্য ও বৈশিষ্ট্য মনোজ বসুর অনেক গল্পের কায়া ও বিষয় নির্মাণে বিশেষ ভূমিকা নিয়েছে। বিভিন্ন গল্পে অন্ত্যজ চরিত্রের আশা-আকাঙ্ক্ষা, আনন্দ-বেদনা, আদিমতা-ক্রূরতা-কোমলতা-প্রতিবাদ-প্রতিরোধ প্রকাশে পটভূমির বিশেষ অবদান রয়েছে। আলোচনার সুবিধার জন্য অন্ত্যজ জীবন নির্ভর গল্পগুলির পটভূমিকে দুটি

ভাগে ভাগ করা হয়েছে। যেমন - গ্রাম কেন্দ্রিক পটভূমি ও নগর কেন্দ্রিক পটভূমি।

গ্রামকেন্দ্রিক পটভূমি

গ্রামকেন্দ্রিক পটভূমিতে তিনি বেশকিছু গল্প রচনা করেছেন। যেমন, 'পৃথিবী কাদের', 'দিল্লী অনেকদূর', 'বাদাবনের গান'।

উপরোক্ত গল্পগুলি বিশ্লেষণ করলে আমরা দেখবো গল্প বিষয় নির্মাণে পটভূমি কতটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছে।

মনোজ বসুর 'পৃথিবী কাদের' গল্পটি গ্রামকেন্দ্রিক পটভূমির। গ্রাম্য কিশোর নটবর ও তার জীবনের অনন্ত ট্রাজেডি গল্পে বাণীমূর্তি পেয়েছে। গ্রাম্য জমিদার কর্তৃক অত্যাচার-লাঞ্ছিত হয়ে নটবর ও তার স্ত্রী সৌদামিনীকে গ্রাম ছাড়তে হয়েছে। সামন্তবাদী ব্যবস্থার এই রূপায়ণ এক সময়ের বাংলার গ্রামজীবনকে প্রতিফলিত করেছে। পটভূমি গ্রাম বলেই গল্পের বক্তব্য বিষয় এতখানি শিল্প সার্থকভাবে ফুটে উঠেছে।

মনোজ বসুর 'দিল্লী অনেক দূর' গ্রামকেন্দ্রিক পটভূমির। দারিদ্রক্লিষ্ট, অর্থলাঞ্ছিত, প্রায় নিরক্ষর একটি গ্রাম এই গল্পের পটভূমি। এই গ্রামে থাকে শৈলী। স্বাধীনতা সংগ্রামী অজয়ের বাড়ি সেখানে :

"মজা নদীর ধারে বড়-বাগান। এককালে প্রচুর আম কাঁঠাল গাছ ছিল শোনা যায়। এখন বাবলা নাটা সুঁইকাঁটা আর কাঁটা মিটকের জঙ্গলে যায়গাটা দুর্গম হয়ে আছে।"

(দিল্লী অনেক দুর : বসু মনোজ)

- শুধু পটভূমি দুর্গম নয়। গ্রামের আর্থ-সামাজিক অবস্থাও দুর্গম। সেখানে স্বাধীনতা দিবসের প্রথম পতাকা উত্তোলনের কোন মূল্য নেই। তারা উদর পূরণের ন্যূনতম উপাদান সংগ্রহে সদা ব্যস্ত। সেখানে স্বাধীন ভারতের পতাকা নয়, পরিধেয় বস্ত্রই কাম্য। স্বাধীনতা সংগ্রামী অজয়ের তাই মনে হয়েছে :

"অজয়ের লজ্জা করছে। পতাকা না এনে সাধ্যমতো দুখানা চারখানা কাপড় যদি বগলদাবায় করে নিয়ে আসতো।"

(দিল্লী অনেক দূর : বসু মনোজ)

গল্পে গল্পকারের মূল বক্তব্য এই। অর্থাৎ গল্পের যা বিষয় তা গ্রাম্য-জীবনের অন্তর্নিহিত সত্যকে প্রস্ফুটিত করেছে। গল্পের পটভূমিও সেই সত্য উদ্ঘাটনে শিল্পোত্তীর্ণ ভূমিকা নিয়ে সার্থক হয়েছে।

মনোজ বসুর 'বাদাবনের গান' গল্পের পটভূমি সুন্দরবন এলাকার মর্জাল নদী ও তার তীরবর্তী গ্রাম। নদীর সঙ্গে, নদীর স্রোতধারার সঙ্গে, নদীর চলমানতার সঙ্গে একাত্ম হয়েছে গল্পের নায়ক ওমসা বাগদীর জীবন। ব্যর্থ প্রেমিক ওমসা বাগদী নদীর উপরই বেড়ে উঠেছে। নদীতেই ঘটেছে তার জীবনের গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। কাওরার মেয়ে দয়া তাকে প্রত্যাখ্যান করেছে নদীতেই। তাই

নদী গল্পের বিষয়ের সঙ্গে গভীর একাত্মতায় এ গল্পে আবদ্ধ।

পাঁচ) রমাপদ চৌধুরী (১৯২২)

আপাত দৃষ্টিতে যাঁকে রোমান্টিক বহিরাশ্রয়ী বলে মনে হয়, তিনি মূলতঃ অন্তরাশ্রয়ী মননদীপিত ছোটগল্পকার, তাঁর নাম রমাপদ চৌধুরী। ১৯২২ সালের ২৮ শে ডিসেম্বর মেদিনীপুর জেলার খড়গপুর শহরে তারাপ্রশন্নের পুত্র রমাপদ চৌধুরীর জন্ম। ১৯৪৩ এর রবিবাসরীয় আনন্দবাজার পত্রিকায় প্রকাশিত 'বারো ঘোড়ার আস্তাবল' গল্পটি দিয়ে তাঁর সাহিত্য জীবন শুরু। তাঁর গল্পের সংখ্যা একশোরও বেশী; গল্প গ্রন্থের সংখ্যা একুশ।

গল্প সংকলন তালিকা :

১. 'তিন তারা' (১৯৪৮)
২. 'স্বর্ণ মারীচ' (১৯৫০)
৩. 'অভিসার রঙ্গ নটী' (১৯৫১)
৪. 'দরবারী' (১৯৫৩)
৫. 'কখনো আসেনি' (১৯৫৪)
৬. 'পিয়া পসন্দ' (১৯৫৫)
৭. 'আপন প্রিয়' (১৯৫৭)
৮. 'কথাকলি' (১৯৫৯)
৯. 'মুক্তবন্ধ' (১৯৫৯)
১০. 'চন্দন কুঙ্কুম' (১৯৬১)
১১. 'দেহলি দিগন্ত' (১৯৬২)
১২. 'যদিও সন্ধ্যা' (১৯৬৬)
১৩. 'সুখের পায়রা' (১৯৬৬)
১৪. 'রুমাবাঈ' (১৯৬৬)
১৫. 'লজ্জাবতী' (১৯৬৬)
১৬. 'ত্রয়োদশী' (১৯৬৭)
১৭. 'ভারতবর্ষ ও অন্যান্য গল্প' (১৯৬৯)
১৮. 'দিনকাল' (১৯৭১)
১৯. 'স্বর্ণলতার প্রেমপত্র' (১৯৭২)
২০. 'আমরা সবাই একসঙ্গে' (১৯৭৩)
২১. 'পোষ্টমর্টেম' (১৯৮২)

গল্পবৈশিষ্ট্য

রমাপদ চৌধুরী অন্তর্মুখী লেখক। ঘটনা-বাহুল্যহীন অথচ মননদীপ্তিতে উজ্জ্বল তাঁর গল্প। মূলভাবের অনুযায়ী ঘটনা আর চরিত্র রয়েছে তাঁর রচনায়। নিপুণ বিশ্লেষণে তিনি চরিত্রগুলির মনোজটিলতা স্পষ্ট করে তোলেন। কঠিন বাস্তবের নির্মমের চিত্র রমাপদ চৌধুরী নিরাশক্ত চিত্তে ভাষায় রূপায়িত করেন। তাঁর গল্পের পটভূমি বিস্তৃত, চরিত্র সমূহ বিবিধ শ্রেণীর। প্রথম যুগে তাঁর গল্পের বিষয় হিসাবে এসেছে আদিবাসী জীবন। এগুলি রাঁচি-হাজারীবাগের পটভূমিতে রচিত। তাঁর প্রথম কর্মজীবনের অভিজ্ঞতা থেকে উঠে এসেছে এইসব কাহিনী। গল্পগুলির অলংকৃত ভাষা মনে আনে সুবোধ ঘোষের রচনার স্মৃতি। পরে তাঁর গল্পে মধ্যবিত্ত বাঙালীর আশা-নিরাশা, দুঃখ-যন্ত্রণা, ত্রুটি-বিচ্যুতি প্রধান হয়ে উঠেছে। আবার যে সময়ের মধ্য দিয়ে তিনি এসেছেন, সেই যুদ্ধ-দাঙ্গা-দেশভাগ-মন্বন্তর কলঙ্কিত সময়ের অক্ষরচিত্র স্পষ্ট হয়েছে তাঁর লেখনীতে।

অতএব আমরা রমাপদ চৌধুরীর গল্পগুলিতে চার শ্রেণীতে বিন্যস্ত করতে পারি –

ক) আদিবাসী জীবনকেন্দ্রিক গল্প

খ) যুদ্ধ, দাঙ্গা, দেশভাগ, রাজনীতিমূলক গল্প

গ) মধ্যবিত্ত জীবনকেন্দ্রিক গল্প

ঘ) মনস্তত্ত্ব নির্ভর গল্প।

কিন্তু আমাদের আলোচ্য উক্ত চার শ্রেণীর গল্প নয়; আমাদের আলোচ্য রমাপদ চৌধুরীর গল্পে কিভাবে অন্ত্যজ শ্রেণীর মানুষেরা ঠাঁই করে নিয়েছে। তবে উপরিউক্ত আদিবাসী জীবনকেন্দ্রিক চরিত্র অন্ত্যজ শ্রেণীরই প্রতিনিধি, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। তাঁর অন্ত্যজ জীবন নির্ভর গল্পগুলিকে ব্যক্তি জীবনাশ্রিত, পরিবারাশ্রিত, গোষ্ঠী জীবনাশ্রিত, ধর্মাশ্রিত, চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যাশ্রিত, পটভূমিভিত্তিক, সমাজ-বৈষম্যমূলক, বিশ্বাস ও সংস্কার ভিত্তিক বিভিন্নভাগে ভাগ করে আলোচনা করবো।

ক) ব্যক্তি জীবনাশ্রিত

ব্যক্তি জীবনাশ্রিত অন্ত্যজ জীবন কেন্দ্রিক রমাপদ চৌধুরীর বেশকিছু গল্পে অন্ত্যজ মানুষের প্রেম জীবন গল্পের বিষয় হয়েছে। গল্পগুলিতে দেখি, অন্ত্যজ মানুষ প্রেমের জন্য ত্যাগী হয়েছে। এই ধরণের গল্পগুলি হল 'ইমলী' ও 'রেবেকা সোরেনের কবর'।

রমাপদ চৌধুরীর 'ইমলী' গল্পে এক বেদে কন্যা ইমলীর ব্যর্থ প্রেমের কাহিনী বর্ণিত। প্রেমাস্পদের জন্য প্রতীক্ষা করে ইমলী নিজের জীবনের বিপর্যয় ও বিনষ্টি ডেকে এনেছে। গল্পে দেখি, সুদুর সুন্দরবন অঞ্চল থেকে বছরের বিশেষ সময়ে মধু বেচতে দলের সঙ্গে ইমলী কোলকাতা এসেছে। কিন্তু মধু বেচতে এসে নিজেই মধুর সন্ধান পায় ইমলী। বাসনওয়ালা ফাল্সার সাথে মন গেঁথে যায় তার। প্রণয় গভীর হয়। একদিন ইমলী তাদের নির্দিষ্ট থাকার আশ্রয়ে না এসে ফালসার ঘরে রাত কাটায়। এর পরই এক অদ্ভুত আচরণ করে ইমলী। লজ্জায় সে ফালসার সাথে দেখা করতে সংকোচ বোধ করে। ভাবে, ফালসা নিজেই তার সাথে দেখা করতে আসবে। প্রতীক্ষার দিন

শুরু হয়। কিন্তু ফালসা আসে না। ওদিকে ইমলীর দলের সকলে দেশে ফিরে যায়। বাধ্য হয়ে সমস্ত লজ্জা ঝেড়ে ফেলে ইমলী ফালসার বাসাতে যায়। সেখানে গিয়ে শোনে, সমস্ত কিছু বেচে দিয়ে ফালসা কোথায় চলে গেছে। – ফালসার এই অনুপস্থিতি ইমলীকে চরম অসহায়ত্বের মধ্যে ফেলে দিল। জীবন চালানোয় তার কাছে দায় হল। বাধ্য হয়ে সে পতিতা বৃত্তির আশ্রয় নিল। কিন্তু অনাহার-অর্দ্ধাহারে তার হাড়-জিলজিলে চেহারায় খরিদ্দার আকৃষ্ট হয় না। চরম হতাশা ও বিনষ্টির অতল তলে তলিয়ে দিল। ব্যর্থ হল নারী জীবন।

রমাপদ চৌধুরীর 'রেবেকা সোরেনের কবর' গল্পে চন্ডাল মেয়ে রূপবতী সোরেন ওরফে রেবেকা সোরেনের একনিষ্ঠ প্রেমজীবনের কাহিনী ট্রাজিক মাহাত্ম্যে বাণীমূর্তি পেয়েছে। প্রেম ও প্রেমাস্পদের জন্য রেবেকা ওরফে রূপমতী নিজের জীবনকে পর্যন্ত বিসর্জন দিয়েছে। রূপমতীর দেহ-সৌন্দর্য্য ছিল অসাধারণ। লালোয়া কুড়ুখের সঙ্গে ছিল তার প্রেম। ওদিকে খৃষ্টান ম্যাকু সাহেবও রূপমতীর প্রেমে উন্মত্ত ছিল। রূপমতী যদিও লালোয়াকেই গভীর ভালোবাসতো। দুজনেই কুমান্ডির খনিতে গিয়ে ঘর বাঁধার সংকল্প করে। কিন্তু তাদের প্রেম জীবনের এমন অবস্থাতে আসল বিপদ। ভিখারিয়ার নাচে রূপমতী-লালোয়াকে নিয়ে বাঁধা হল গান। এতে সমাজের সম্মানের কথা তুলে মুখিয়া পঞ্চায়েত ডাকলো। এই নিয়ে গভীর গোলমাল ও মারামারি বাঁধলো। মারামারির সময় রূপমতী ম্যাকু সাহেবের হাত ধরে পালিয়ে ছিল। – এই অপরাধে চন্ডালরা রূপমতীকে সমাজচ্যুত 'বিটলা' ঘোষণা করে। তার উপর নেমে আসে অত্যাচার। কেউ আসে না সাহয্যের হাত বাড়িয়ে। এমন কি লালোয়াও না। তবে ম্যাকু সাহেব আসে। তাকে অপমানের হাত থেকে মুক্তি দিয়ে বিয়ে করে। রূপমতী খ্রীষ্টান হয়ে রেবেকা হয়। সুখেই কাটে তার সংসার। তার মাঝে লালোয়া আসে পুনরায় প্রেমের দাবি নিয়ে। কিন্তু রেবেকা তা অস্বীকার করে। সে এখন মনে প্রাণে ম্যাকু সাহেবকে ভালোবাসে। ম্যাকু সাহেব যদিও রেবেকার সাথে বিশ্বাস ঘাতকতা করে খনির ব্যবসায় লোকসান খেয়ে রেবেকার কাছে ফিরে আসার মিথ্যা আশ্বাস দিয়ে ম্যাকু পালিয়ে যায় চিরতরে। কিন্তু রেবেকা সোরেনের প্রেম গভীর। বিশ্বাস অটল। সে মনে প্রাণে বিশ্বাস করে ম্যাকু সাহেব একদিন ফিরবেই। ক্রমেই অর্থকষ্ট ও অন্নাভাবে দুর্বল হয়ে পড়ে রেবেকা। পাড়ার লোকে তাকে খনির কাজ করতে বললেও সে ম্যাকু সাহেবের সম্মানের কথা ভেবে রাজি হয় না। চরম অপেক্ষার মাঝে একদিন রেবেকা মারা যায়। তার কবরের পাশে প্রত্যহ দীপ জ্বালায় লালোয়া কুড়ুক তার অতৃপ্ত প্রেমের দাবি নিয়ে। আর কবরের মধ্যে আরো বড় প্রেমের অতৃপ্তি নিয়ে রেবেকা সোরেন শুয়ে থাকে শান্ত হয়ে।

সাঁওতাল নারী হলেও প্রেমের একনিষ্ঠতায় ও ত্যাগে এবং প্রেমের গভীরতায় রেবেকো সোরেন মহত্বে প্রতিষ্ঠিত। ট্রাজিক বিষন্নতায় মহিমা মণ্ডিত।

খ) পরিবারাশ্রিত

রমাপদ চৌধুরীর পরিবারাশ্রিত অন্ত্যজ জীবনকেন্দ্রিক ছোট গল্পগুলির মধ্যে বেশ কিছু গল্পের বিষয় হয়েছে পরিবারগুলির বিপর্যয়-বিধ্বস্ত হওয়ার কাহিনী। নানান কারণে অন্ত্যজ পরিবারগুলি

বিপর্যস্ত-বিধ্বস্ত হয়েছে। কোথাও দেখি নিয়তি লাঞ্ছিত, কোথাও অর্থহীনতা। রমাপদ চৌধুরীর 'লাটুয়া ওঝার কাহিনী গল্পটি এই ধারার বিষয়কে ধারণ করে বিশিষ্ট।

রমাপদ চৌধুরীর 'লাটুয়া ওঝার কাহিনী' গল্পের বিষয় হয়েছে এক অর্থ লাঞ্ছিত পরিবারের চরম অসহায়ত্ব ও বিপর্যয়। এক মেয়ে সুরমণি, বৃদ্ধা স্ত্রী ও নিজের অন্ধ দুচোখ নিয়ে কোনক্রমে বেঁচে আছে বৃদ্ধ লাটুয়া সাঁওতাল। লাটুয়া গুণিন। সাপে-কুকুরে কামড়ানো, পেটের অসুখ থেকে শুরু করে সমস্ত রোগের চিকিৎসা লাটুয়া নানা প্রকার গাছের শিকড়-বাকড়ে করে থাকে। গল্প কথক নিজে কুকুরের কামড়ের চিকিৎসা করাতে লাটুয়ার কাছে গিয়ে ওঝার মেয়ে সুরমণির কাছ থেকে তাদের চরম দারিদ্র ও অসহায়তার কথা জেনেছে। জেনেছে একদিন লাটুয়ার পসার ছিল রমরমা। কিন্তু ওষুধের খোঁজে ভালুকের আক্রমণে লাটুয়া এখন পঙ্গুপ্রায়। বাবাকে সান্ত্বনা দেওয়ার জন্য সুরমণি ওষুধের নামে মিথ্যা ঘাস-পাতা রেখে দেয় কৌটাতে। সুরমণি জানায় এসবে রোগ সারে না। তাই 'সন্তাল' রোগীরা এখন হাসপাতালে যায়। সে কারণে অর্থ সম্বলহীন লাটুয়ারা, নিতান্ত দীনভাবে, কায়ক্লেশে, অসহায়ভাবে দিনযাপন করে। বেঁচে থাকে মৃতের মতো। –বিপর্যস্ত-বিধ্বস্ত এই জীবন তাদের অর্থহীনতার কারণেই। অর্থহীনতার কারণেই তারা অসহায়ভাবে বেঁচে থাকে।

গ) গোষ্ঠী জীবনাশ্রিত

রমাপদ চৌধুরীর অন্ত্যজ জীবনাশ্রিত বেশকিছু গল্প আছে যেগুলি অন্ত্যজ মানুষের গোষ্ঠী কেন্দ্রিক জীবন ও সমাজবদ্ধ জীবনের কাহিনী গল্পের বিষয় হিসাবে গৃহীত। প্রায়শ ক্ষেত্রে অন্ত্যজ মানুষ সমাজের আচার-বিচার, অত্যাচারিত-শোষিত রূপ, তাদের হিংস্রতা-রহস্যময়তা, তাদের আনন্দানুষ্ঠান ও তজ্জনিত আনন্দমত্ততা কামনা-বাসনা ও মানবিকতাকে বিষয় করে রমাপদ চৌধুরীর এই পর্যায়ের গল্পগুলি রচিত। রমাপদ চৌধুরীর 'চন্দ্রভস্ম' ও 'মানুষ-অমানুষের গল্প' গল্প দুটিতে এধরণের ভাবরূপ প্রতিফলিত।

'চন্দ্রভস্ম' গল্পে অর্থ লাঞ্ছিত ভিখারিদের গোষ্ঠী জীবনের অসহায়তার কথা যেমন আছে তেমন তাদের উপর অর্থলিপ্সু ব্যবসায়ীর অত্যাচার ও লাঞ্ছনার চিত্রও বর্ণিত হয়েছে। ভিখুরাম, তাহের, পঞ্চা, রাউতি, সনকা, ম্যাংনা, পিলুয়ারা সবাই ভিখারি। সবাই তারা চাল চুলোহীন; অসহায়। মূলচাঁদ মাড়োয়ারী তাদের মালিক। মূলচাঁদের লোকজন প্রতিদিন ভোরে দুটি মোটরগাড়ীতে চাপিয়ে তাদের কোলকাতা শহরের বিভিন্ন স্থানে ছেড়ে দেওয়া হয়। সারাদিন তারা ভিক্ষাবৃত্তি করে কখনও খোঁড়া-ল্যাংড়া-অন্ধ সেজে কখনও নিজেদের যুবতী শরীরকে ইচ্ছাকৃত প্রদর্শন করে। সারাদিনের শেষে শহরে রাত নামলে গাড়িতে করে তাদের ফিরিয়ে আনা হয়। এসময় মূলচাঁদের মাইনে করা কর্মচারী জহর ও তেওয়ারী প্রত্যেকের কাছ থেকে ভিক্ষা করা অর্থ আদায় করে নেয়। প্রত্যেকেই তাদের রোজগারে অর্থ জহর ও তেওয়ারীর হাতে দিয়ে দেয়। অনেকে আবার দু-একটা লুকিয়ে রাখার চেষ্টা করে কিন্তু তেওয়ারীর তীক্ষ্ণ চোখ তা টের পেয়ে যায়। সে কারণে তেওয়ারী প্রয়োজনে তাদেরকে বস্ত্রহীন করেও খুঁজে দেখে। একদিন তো এই কারণে যুবতী ম্যাংনার দেহ থেকে পুরো

কাপড়টাই খুলে নিয়েছিল তেওয়ারী। এসবে তাদের কোন লাভ নেই। তারা এই লাঞ্ছনা মুখ বুজে সহ্য করে। তাদের উপর চলে মূলচাঁদ মাড়োয়ারীর অকথ্য হৃদয়হীন অত্যাচার, নিষ্পেষণ। ফের এতো অত্যাচার ও কষ্টের মধ্যেই চলে তাদের প্রেম-প্রীতির খেলা। এই অবৈধ প্রেমের ফলে রাউতি একটি সন্তান প্রসব করে। সেই সন্তানের পরিণতিও হয় বীভৎস। মূলচাঁদ সন্তানটিকে লেখাপড়া শেখাবার নাম করে রাউতির কাছ থেকে নিয়ে নিয়েছে। তার পর ছেলেটিকে আগামী দিনের ভিখারি বানাবার জন্য তাকে বিকলাঙ্গ করে দেয় সে। অত্যন্ত নিষ্ঠুর সেই বিকলাঙ্গ করার পদ্ধতি। সন্তানটিকে একটি ছোট হাড়ির মধ্যে বসিয়ে রেখে মূলচাঁদ বড় করে তোলে:

"কোমরের ওপর থেকে সমস্ত শরীরটা বেড়ে উঠেছে নিয়মিত পানাহারে। শুধু কোমরের নিচের অংশটার নেই পরিবর্দ্ধন। বারো বছর পরেও ওদের পা দুখানা থাকবে বারো মাসের শিশুর। লিক লিকে। অবশ্য নিম্নাঙ্গের জন্য ওরা বসতে পারবে না; দাঁড়াতে পারবে না। কিন্তু পথিকের করুণা উদ্রেক করতে পারবে। আর মূলচাঁদ মাড়োয়ারীর চামড়ার থলিটা জলভরা ভিস্তির মতো ফেঁপে ফুলে উঠবে।"

(চন্দ্রভস্ম : চৌধুরী রমাপদ)

–অন্ত্যজ মানুষের ওপর এ অত্যন্ত হৃদয়হীন-নিষ্ঠুর অত্যাচারের নিদর্শন।

রমাপদ চৌধুরীর 'মানুষ-অমানুষের গল্প' গল্পটির বিষয়বস্তু হলো বুনো আদিম অন্ত্যজ মানুষের জীবনচর্যা ও হীংস্রতা। এরা হল বানর মারার দল। গ্রামে গ্রামে বানরের উপদ্রব বাড়লে, গৃহস্থরা বানরমারা দলকে ডাকে। এদের প্রধান জীবিকা বানর তাড়ানো। গল্পে দেখি, বিশ-পঁচিশ জনের একটি দল তীর-ধনুক নিয়ে উপস্থিত শাঁখা ভাঙা গ্রামে বানর তাড়াতে। দলে পনের জন পুরুষ ও দশজন নারী। তাদের সর্দার হল বচ্চন। মজুরি নিয়ে গ্রামের মাতব্বর পক্ষে মোড়ল, চাটুজ্যে মশায়, রিদে কোটালদের সঙ্গে দলটির দর কষাকষি হয়। দর কষাকষির সময় কৌতুক করতে গিয়ে রিদে কোটাল বচ্চনের বউ টিকালীর হাতে চড় খায়। কিন্তু রিদে ব্যাপারটা গায়ে মাখে না। কেননা, ততক্ষণে তার নজর লেগেছে টিকালীর ভরা যৌবনের দিকে। শেষে ঠিক হয় দলটি বানর তাড়ানোর বিনিময়ে পাবে নগদ সাত টাকা ও তিন জোড়া গামছা।

বানর মারা দল মহা উৎসাহে বানর মারে। গ্রামের প্রান্তে একটা বকুল গাছের তলায় তারা আস্তানা গাড়ে। মেটে আলু, মেঠো ইঁদুর, খটাস পোড়া খেয়ে, হাঁড়িয়ার নেশায় বিভোর হয়ে রাতের বেলা কুন্ডলী পাকিয়ে তারা যুথবদ্ধভাবে ঘুমায়।

দিন যায়। শাঁখাভাঙা গ্রামটিকে বানর শূন্য করে ফেলে তারা। দল নিয়ে অন্যত্র চলে যাওয়ার আগে মজুরি নিতে মাতব্বরদের কাছে এসে হাজির হয়। এবং মজুরি নিয়ে একপ্রস্থ ঝামেলা বাধে। পঙ্খে মোড়লরা তাদেরকে ঠকাতে চায়। তারা বলেন নগদ সাত টাকা ও দুজোড়া মাত্র গামছা মজুরি হিসাবে দেওয়ার কথা ছিল। রিদে কোটাল সুযোগ বুঝে টিকালীর হাতে চড় খাওয়ার প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য গড় গড় করে মিথ্যা সাক্ষ্য দিয়ে পঙ্খে মোড়লের পক্ষ নেয়। অসন্তুষ্ট হয় বচ্চনের দল। পঙ্খে মোড়ল মজুরি নেওয়ার জন্য তাদেরকে পরের দিন সকালে আসতে বলে।

অসন্তুষ্ট দলটা ফিরে যায়। হাঁড়িয়া খেয়ে বেহুঁশ হয়ে ঘুমিয়ে পড়ে রাতে। পরের দিন অনেক বেলা পর্যন্ত তাদের হুঁশ আসে না। শুধু টিকালী জেগে ওঠে সকালে। সে ভাবে রিদে কোটালকে বশ করলে সম্পূর্ণ মজুরি পাওয়া যাবে। সেই মতো নিজের যৌবন-মদিরা দিয়ে রিদেকে মাতিয়ে তোলে সে। এক সময় সমগ্র দলটা জেগে ওঠে টিকালীকে না দেখে ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে। তারা টিকালীর সন্ধানে বেরিয়ে একটা বাগানে রিদে ও টিকালীকে দেখে। তীরের আঘাতে রিদের হাত এফোঁড় ওফোঁড় করে দেয়। বচ্চনের মুখে ফুটে ওঠে ঘৃণা :

"বচ্চন হিংস্র ক্রূর চোখে তাকালো রিদে কোটালের মুখের দিকে, তীররে ডগাটা মট করে ভেঙে দিয়ে তীরটা বের করল।

তার পর অসীম ঘৃণার সঙ্গে মাটিতে একদলা থুথু ফেলে বললে, বা-ন্-দ-র।

...আর সঙ্গে সঙ্গে টিকালী কটা কটা হিংস্র চোখ জোড়াও খিল খিল করে হেসে উঠল। হাসতে হাসতে বলে উঠল বা-ন্-দ-র।"

(মানুষ-অমানুষের গল্প : চৌধুরী রমাপদ)

অর্থাৎ প্রায়-অমানুষ বানর মারার দলের কাছে মানুষ পরিচয়ের রিদেরা অমানুষ, পশু, বানর হয়ে গেল। অন্ত্যজ মানুষের জীবনদৃষ্টির কাছে সভ্য মানুষ অমানুষে পর্যবসিত হল।

ঘ) ধর্মাশ্রিত

রমাপদ চৌধুরীর বেশ কিছু গল্পের বিষয়ের কেন্দ্রে রয়েছে অন্ত্যজ মানুষের ধর্মীয় জীবন ও ধর্মাচরণ। কিছু গল্পে ধর্ম-বিশ্বাসী অন্ত্যজ মানুষ ধর্মকে জীবনের মোক্ষ ভেবে ধর্মাচরণে মগ্ন থেকেছে। এই রকমই একটি গল্প হলো 'সতী ঠাকুরুণের চিতা'।

'সতী ঠাকুরুণের চিতা' গল্পের বিষয়বস্তু হয়েছে ডোম জীবনের ধর্মাচার ও ধর্মবিশ্বাস। এক ডোম যুবকের পণ্ডিত পুরোহিত হওয়ার কাহিনী যেমন এই গল্পে ফুটে উঠেছে, তেমনি উচ্চতর ব্রাহ্মণ সমাজের এক নারীর সঙ্গে তার প্রেম-প্রণয়ের বিয়োগান্ত কাহিনীটিও গল্পের কেন্দ্র হয়েছে। গল্পে দেখি, যশাই ডোম ধর্মঠাকুর বাঁকুড়া রায়ের মূর্তি প্রতিষ্ঠা করে পণ্ডিত হয়েছে। সে নিয়মিত মন্দিরের পূজা-আর্চা করে। একারণে সে ডোম সমাজে সতন্ত্র মর্যাদা পায়। শুধু ডোম সমাজে নয়, গ্রামের উচ্চ-নিচ সমস্ত জাতির মানুষ তার মন্দিরে ভিড় লাগায়। বাঁকুড়া রায় বড়ো জাগ্রত দেবতা। তাঁর প্রভাবে ও যশাই পণ্ডিতের ভক্তিতেই গ্রামের মড়ক থেমে গেছে। সাপে কাটা রোগী বেঁচে উঠেছে। এমন বিশ্বাসে গ্রামবাসী এখন যশাইকে সমীহ করে। ব্রাহ্মণ সন্তান অকলঙ্ক বাঁড়ুজ্যে মশাইয়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদে নামলে গ্রামবাসীরাই তার বিরুদ্ধাচরণ করে। উল্টে দেখা গেল, বাঁড়ুজ্যে মশাইয়ের মেয়ে কল্যাণী যশাই পণ্ডিতের প্রধানা শিষ্যা। কল্যাণীর আরতি না হলে এখন বাঁকুড়া রায়ের পূজা সম্পূর্ণ হয় না। যশাই ও কল্যাণীর মধ্যে গড়ে ওঠে প্রণয় সম্পর্ক। তা আটকাতে অকলঙ্ক বাঁড়ুজ্যে মেয়েকে এক বৃদ্ধের সঙ্গে বিয়ে দেয়। বৃদ্ধ মারা গেলে তাকে সহমরণে চড়ানোর জন্য শ্মশানে জোর করে বেঁধে রাখা হয়। এখবর শুনে যশাই পণ্ডিত উন্মত্তবৎ হয়ে ওঠে। প্রণয়িনী কল্যাণীকে বাঁচানোর

জন্য যশাই ঘোষণা করে বুড়োকে সে বাঁচিয়ে দেবে। কিন্তু সারা রাত বাঁকুড়া রায়ের আরাধনা করেও সে ব্যর্থ হয়। ফলে কল্যাণীকে সহমরণে পুড়িয়ে দেওয়া হয়। বিরহে-যন্ত্রণায় যশাই ক্ষিপ্ত হয়ে অবিশ্বাসী হয়ে, বাঁকুড়া রায়ের মন্দির ভেঙে গুড়িয়ে দেয়। এর পর সে নিরুদ্দেশ হয়। একবছর পর আবার রাজ্যের দেবমূর্তি চুরি করে নিয়ে সে দেশে ফেরে। তার পর এক অভিনব কাণ্ড বাধায় সে। বাঁকুড়া রায় সহ সমস্ত মূর্তিকে জলে ফেলে দিয়ে ঘোষণা করে যে দেব-মূর্তি আপনা থেকেই জল থেকে উঠে আসবে, যশাই তার মূর্তি প্রতিষ্ঠা করে পুজো করবে। যাত্রা সিদ্ধি দেবতা এলো জল থেকে উঠে, যশাই তার মন্দির প্রতিষ্ঠা করে আবার পূজা শুরু করে। তার পর সে মারা যায়। মারা যাওয়ার আগে সে ইচ্ছা প্রকাশ করেছিল তার মৃতদেহ যেন না পুড়িয়ে সমাধিস্থ করা হয় মন্দিরের প্রবেশ পথের নিচে। কারণ, পরজন্মে কল্যাণী যদি আবার এই মন্দিরে আসে, তবে তার পায়ের শব্দ সে সমাধিস্থ থেকেই শুনতে পাবে। – দেখা যাচ্ছে গল্পটিতে যশাই ডোমের বিচিত্র ধর্মবিশ্বাসের সাথে সাথে তার প্রণয় ব্যাকুলতাও মূর্ত রূপ পেয়েছে।

ঙ) চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যাশ্রিত

কি গল্পে কি উপন্যাসে চরিত্র চিত্রণ একটি গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার। চরিত্র নির্মাণের নৈপুণ্যের উপর লেখকের সার্থকতা অনেকাংশে নির্ভর করে। এই চরিত্র চিত্রণগত দিকের বিচারে বলা যায়, রমাপদ চৌধুরীর অন্ত্যজ জীবন নির্ভর ছোট গল্পগুলি বাংলা ছোট গল্পের চরিত্র চিত্রশালাকে বহুল পরিমানে সমৃদ্ধ করেছে। বিচিত্র ধরণের অন্ত্যজ চরিত্র কখনো গল্পের কেন্দ্রে থেকে, কখনো বা পার্শ্ব চরিত্র রূপে অন্ত্যজ জীবনের আনন্দ-বেদনা-হাসি-কান্না-করুণা-মানবিকতা-সহানুভূতি-প্রতিরোধ-প্রতিবাদের চাল চিত্রকে প্রস্ফুটিত করেছে। আলোচ্য পর্যায়ের গল্প সমূহের প্রাপ্ত চরিত্র পুরুষ ও নারী চরিত্রের অধিকাংশই বৈশিষ্ট্যে উজ্জল ও বৈচিত্র্যে আকর্ষণীয়। বৈচিত্র্যের বিভিন্নতায় বৈশিষ্ট্যের স্বাতন্ত্র্যে অন্ত্যজ চরিত্রগুলি মানব জীবনের অপার রহস্যচেতনায় মুখর। কত ভিন্ন ভিন্ন মন-মর্জি ও ভাবের মানুষের ভিড় এখানে।

রমাপদ চৌধুরীর অন্ত্যজ জীবনাশ্রিত গল্পগুলি বিশ্লেষণ করলে দেখি, চরিত্রগুলির কেউ ভণ্ড-বদমায়েস, কেউ ওঝা-গুণিন কেউ সাদাসিধে সাধারণ মানুষ, কেউ প্রতিবাদী-সচেতন সংগ্রামী কেউ উৎপীড়িত-লাঞ্ছিত, কেউ পতিতা-স্বৈরিণী, কেউ প্রেমিক বা প্রেমিকা, কেউ নিষ্ঠুর-আদিম-হিংস্র, কেউ ধার্মিক ভালো মানুষ কেউ বঞ্চিত শিশু ও নারী, কেউ বা আবার মাতৃত্বের আধার, আবার কেউ আত্ম মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত-সম্মানিত।

আলোচনার সুবিধার জন্য বিচিত্র মতি-গতির এই সব চরিত্রকে প্রাথমিকভাবে দুটি ভাগে ভাগ করে আলোচনা করা যেতে পারে –পুরুষ চরিত্র ও নারী চরিত্র।

পুরুষ চরিত্র

রমাপদ চৌধুরীর অন্ত্যজ জীবনাশ্রিত গল্পগুলির মধ্যে বেশ কিছু গল্পের বিষয় হয়েছে

অত্যাচার-উৎপীড়ন ও লাঞ্ছনা। কিছু গল্পে এই সমস্ত পুরুষ চরিত্রের অসহায়ত্ব প্রকাশ পেয়েছে যেমন – 'লাটুয়া ওঝার কাহিনী' গল্পের সঁওতাল বৃদ্ধ লাটুয়া ওঝা অসহায় এবং নস্টালজিক চরিত্র। গুণিন বৃত্তি করে একদা সে জীবিকা নির্বাহ করতো। নানান পূজাক্রিয়া ও সাধনা করে দৈবীগুণ পেয়েছে বলে তার দাবি। লোকবিশ্বাসও সেই রকম। একদা গুণিন হিসাবে তার প্রচন্ড প্রতিপত্তি থাকলেও বর্তমানে তার ক্রিয়াকলাপের গল্প করেই তার অসহায় জীবনে ক্ষণিক তৃপ্তি খোঁজে। কেমন করে সাপে কাটা মৃতদেহকে সে বাঁচিয়েছিল, কেমন করে কয়লা খনি থেকে সাপ তাড়িয়েছিল, সেসব কাহিনী স্মৃতি হাতড়ে হাতড়ে বলে লাটুয়া, কিন্তু বর্তমানে বৃদ্ধত্ব ও অন্ধত্ব নিয়ে বেঁচে থাকা লাটুয়া আজ সর্বহারা। চরম অনটন-দারিদ্র ও অসহায়ত্ব নিয়ে দিনাতিপাত করে সে। গল্পকার রমাপদ চৌধুরী অত্যন্ত বিশ্বস্ততার সঙ্গে এই সাঁওতাল বৃদ্ধের স্মৃতিভারাতুর জীবনটিকে ফুটিয়ে তুলেছেন।

রমাপদ চৌধুরীর অন্ত্যজ জীবনাশ্রিত কিছু পুরুষ চরিত্র আছে যেগুলি আদিম-হিংস্র মনোবৃত্তির অধিকারী। নির্মমতা ও নিষ্ঠুরতা তাদের চরিত্রে স্বভাব বৈশিষ্ট্য। যেমন – 'ঝুমরা বিবির মেলা' গল্পের মিঞা মাঝি কিস্কুর চরিত্রে আদিম জীবন-সত্য ও আদিম-জীবন বিশ্বাসের পরিচয় ফুটে উঠেছে। মিঞা মাঝি তুড়ুক জাতির মানুষ। তুড়ুকরা বড় সংস্কারাচ্ছন্ন জাতি। সংস্কার জনিত বিশ্বাসের কারণে তারা সমস্ত রকমের কাজই চরম অবহেলার সাথে করতে পারে, এমন কি এ কারণে নিজের জীবনটাকেও পর্যন্ত উৎসর্গ করতেও তারা দ্বিধা করে না। মিঞা মাঝি চরিত্রে আদিমতা প্রকাশ পেয়েছে এমনই বিশ্বাস ও সংস্কারের জন্য মূল্য দেওয়ার মাধ্যমে। যদিও মিঞা মাঝি নিজ পুত্র স্নেহে মাত্রাতিরিক্ত আবিষ্ট হয়ে আদিম জীবন সত্যের দাসত্ব করেছে। মিঞা মাঝি পুত্র স্নেহে যেন অন্ধ। পুত্রের জন্য, ভবিষ্যতকে সুন্দর ও সুকুমার করার জন্যে মিঞা মাঝি অবহেলায় নিজের জীবনকে বিসর্জ্জন দিয়েছে। তার বিশ্বাস ছিল তার ফাঁসি হলে তার দেহজ আত্মা ছেলের দেহে প্রবেশ করবে আর ছেলে সৎ হয়ে যাবে। শুধুমাত্র এই কারণে, সে মিথ্যা খুনের দায় নিজ কাঁধে নিয়েছে। বিচারে তার ফাঁসি হয়নি বলে শেষ পর্যন্ত জেল থেকে বেরিয়ে সে গলায় দড়ি দিয়ে আত্মহত্যা করেছে। –তার এমন কাজ অন্ত্যজ জীবনের আদিম-নিষ্ঠুর সংস্কার-বিশ্বাসের প্রকাশক। পুত্রের নিষ্ট চিন্তায় তার এমন আত্মদান, অন্ত্যজ জীবন সত্যের অনবদ্য রূপায়ণকেই মূর্ত করে তুলেছে। মিঞা মাঝি সেই সত্যের মূর্তিমান বিগ্রহ।

রমাপদ চৌধুরীর অন্ত্যজ পুরুষ চরিত্রগুলির মন-মনন ও মানসিকতার যে স্বরূপ বৈশিষ্ট্য বিভিন্ন গল্পে মূর্ত করেছেন, তা এই সমাজের বাস্তবতা যাতে পুরুষ চরিত্র পর্যালোচনার পর একটি বিশেষ সত্য আমাদের সামনে উন্মোচিত হয় যে –অন্ত্যজ জীবন সম্পর্কে তথাকথিত ভদ্র ও সভ্য সমাজ যে ধারণা পোষণ করে তা অনেকাংশেই ভ্রান্ত। শুধুমাত্র অপরাধ প্রবণতা, হিংস্রতার, নিষ্ঠুরতার যে ছাপ্পা এদের গায়ে সেঁটে দেওয়া হয় তা যথার্থ নয়। কেননা সৎ,উদার, মহানুভব, সমমর্মী প্রচুর মানুষ অন্ত্যজ সমাজে বর্তমান। তিনি সে সত্য দেখিয়েছেন। তাই একথা বলা যায় অন্ত্যজ মানুষের যথার্থ চরিত্র বৈশিষ্ট্য তার মনস্তত্ত্ব জ্ঞানের গভীরতারই পরিচয় বাহক। তা যথার্থ।

নারী চরিত্র

রমাপদ চৌধুরীর অন্ত্যজ জীবনাশ্রিত ছোট গল্পগুলিতে চিত্রিত নারী চরিত্রের স্বরূপ বৈশিষ্ট্য নির্ধারণে প্রবৃত্ত হয়ে দেখি, চরিত্রগুলি বৈচিত্র্যে উজ্জ্বল ও বৈশিষ্ট্যে আকর্ষণীয়। নারী চরিত্রগুলির স্বরূপ বিশ্লেষণে দেখা যায় কোন চরিত্র ট্রাজিক বিষন্নতায় ভাস্বর, কোন চরিত্র প্রেমময় প্রেমিকা, কোন নারী অত্যাচারিত-লাঞ্ছিত কোন নারী পতিগতপ্রাণা, ভক্তিমতি, কোন নারী স্বৈরিণী, কেউ কেউ সৎ ভালো মানুষ, কেউ বা প্রতিবাদী মানসিকতার অধিকারী। বিচিত্র এইসব নারী চরিত্রের স্বরূপ বৈশিষ্ট্যের বিশ্লেষণ নিম্নরূপ :

রমাপদ চৌধুরীর 'নারীরত্ন' গল্পের বুনো-বধূ ময়না কিস্কু স্বৈরিণী, স্বেচ্ছাচারী, ক্রূর, স্বার্থপর চরিত্র। অন্ত্যজ জীবনের হিংস্রতা, আদিমতা ও ক্রূরতার সে যেন জীবন্ত প্রতিমূর্তি। আত্মস্বার্থের জন্য, নিজে বাঁচার জন্য সে মানুষ খুন করতেও পিছপা হয় না। নিজের অবৈধ প্রেমিককে বাঁচানোর জন্য সে অনায়াসে নিজ স্বামী ভূখনকে টাঙ্গির কোপে খুন করে। আবার তার প্রেমিক এই খুনের প্রমাণ লোপাট করতে অস্বীকার করায় তাকে ঘরে তালাবন্দি করে রেখে ময়না ধুলনের উপরই হত্যার দায় চাপিয়ে দেয় নিজেকে বাঁচানোর জন্য। ধুলনের ফাঁসি হয়। গল্প কথক সুধীর বাবু ময়না সম্পর্কে বলেছে –নারী হল নরকের দ্বারী।

–ময়না সম্পর্কে এই কথা অক্ষরে অক্ষরে সত্য। নিজ ইন্দ্রিয় সুখ ও আত্মস্বার্থ সিদ্ধির জন্য সে নরকেরও অধম ক্লেদোক্ত কাজ থেকে বিরত নয়। বুনো অন্ত্যজ জীবনের নিরিখে এ কাজ স্বাভাবিক হলেও নিষ্ঠুর। ময়না কিস্কুর মেয়ে মায়ের এমন আচরণ দেখে ভীত হয়ে তাকে ডাইনী বলেছে। ময়না সম্পর্কে এ মত সত্য। ভীষণভাবে সত্য।

রমাপদ চৌধুরীর 'লাটুয়া ওঝার কাহিনী' গল্পের সাঁওতাল মেয়ে সুরমণি সরলা পল্লীবালা। সে সৎ। পাথর কালো তার যোড়শী দেহে যেমন অঢেল সৌন্দর্য তেমনি তার মনন সততার গুণে পূর্ণ। সততার মূল্যে সে নিজেদের জীবিকা নির্বাহের পথটাও পর্যন্ত ছেড়েছে। গল্পে দেখি, গল্প কথকের সহানুভূতিতে সে বিগলিত হয়ে গেছে। এই কারণে কোন রকম গোপনীয়তা না রেখে স্পষ্ট করে বলে দিয়েছে –গল্প কথক যেন কুকুরে কামড়ানোর চিকিৎসা করাতে হাসপাতালেই যায়। এতদিন তার বাবা যে সমস্ত গাছড়া ঔষুধে চিকিৎসা করাতো, তা আর অবশিষ্ট নেই। কেননা, তার বাবা অন্ধ হয়ে যাওয়ার পর ঐ সব ওষুধ আর বন থেকে তোলা হয় না। শুধু মাত্র অন্ধবাবাকে সান্ত্বনা দেওয়ার জন্য সুরমণি মিথ্য সব ঘাস-পাতা তুলে এনে রেখেছে। এসবে কোন কাজ হয় না।

–সুরমণির এ স্বীকারোক্তি তার চরিত্রের সততার দিকটিকে উন্মোচিত করেছে। অর্থাৎ দেখা যাচ্ছে, অন্ত্যজ জীবন সুলভ সরলতা ও সততায় এখানে সুরমণির চরিত্রটি তাৎপর্যপূর্ণ। কেননা প্রচন্ড রকমের দরিদ্র সুরমণিদের সংসার চলে অতি কষ্টে। গল্প কথক ওষুধের বিনিময়ে যে টাকা দিচ্ছিল তাই সুরমণিদের কাছে বেঁচে থাকার বড় রকমের সম্বল ছিল। সুরমণি সেই লোভ সম্বরণ করে অনন্যসাধারণ সততার মূল্যে জীবন্ত হয়ে উঠেছে।

রমাপদ চৌধুরীর 'রেবেকা সোরেনের কবর' গল্পের রূপমতী সোরেন ওরফে রেবেকা সোরেন

প্রেমিকা নারী। প্রেমের জন্য সে তার সারাটা জীবকেই উৎসর্গ করেছে। তার জীবনে একই সঙ্গে এসেছে দুই পুরুষ – সাঁওতাল লালোয়া কুড়ুক এবং খ্রীষ্টান ম্যাকু সাহেব। এই দুই পুরুষের মাঝখানে দাঁড়িয়ে রেবেকা চরিত্রটি দ্বিধা বিভক্ত হয়েছে। যদিও লালোয়াকে রেবেকা মন-প্রাণ দিয়েই ভালোবাসতো কিন্তু যেদিন সমাজ তাকে বিটলা ঘোষণা করে, সেদিন সম্মিলিত সামাজিক অত্যাচার ও আক্রমণের হাত থেকে তাকে বাঁচানোর জন্য লালোয়া এগিয়ে না আসায় রেবেকা তার প্রতি বিরূপ হয়ে পড়ে। মনটা তার টলে গেল। তখনই সুযোগ পেয়ে ম্যাকু সাহেব তাকেও তার সম্মানকে বাঁচিয়ে বিয়ে করল। ব্যাস রেবেকা অন্য মানুষ হয়ে গেল।

আসলে রেবেকার যেন দুটো জীবন। তার চরিত্র যেন দ্বিবিধ স্তর পরম্পরায় অঙ্কিত। যেমন :

এক) রেবেকার সাঁওতাল জীবন। এখানে সে রেবেকা সোরেন নয় –রূপমতী সোরেন। লালোয়া কুড়ুক তার আরাধ্য। লালোয়ার প্রেমই তার কাম্য। ম্যাকু সাহেব এই পর্বে লালোয়ার কাছে পারজিত। গল্পে তার সমর্থন রয়েছে। এখানে প্রেম বা প্রেমাস্পদের প্রতি বিশ্বাসহীনতার কাজ করতে কোনমতেই রাজি ছিল না রূপমতী।

দুই) রেবেকার খ্রীষ্টান জীবন। এখানে সে ধর্মান্তরিতা। রূপমতী সোরেন নয় রেবেকা সোরেন। ম্যাকু সাহেবকে বিয়ে করে সে সুখি ও সম্মানিতা। ম্যাকু সাহেব তার প্রাণ ও ইজ্জত বাঁচিয়েছে। তাই তার প্রেম এখানে লালোয়াকে ছেড়ে ম্যাকু সাহেবকে আশ্রয় করে প্রস্ফুটিত হয়েছে।

–এই যে ম্যাকু সাহেবের প্রেমে সে মশগুল হল, তার আর ইতি ঘটল না কোনদিন। এমনকি তাকে ফাঁকি দিয়ে ম্যাকু সাহেব যখন চিরকালের জন্য ব্যাঙ্গালোর চলে গেল তখনও তার প্রেম অনড় স্থির-প্রতিজ্ঞ থেকেছে। গল্পে বার বার তার সেই স্থির মতি প্রেম বিশ্বাসের কথা উচ্চারিত হয়েছে :

ক) "অবিশ্বাসের হাসি হাসল রূপমতী –ম্যাকু সাহেব মানুষটারে তুরা বুঝিস নাই বটে। ও আমারে কয়ে গেছে ফির‍্যা আসবেন।"

খ) "সোনা মিরুকে বলতো ফিরবো রে, ফিইরা আসবো।"

(রেবেকা সোরেনের কবর : চৌধুরী রমাপদ)

প্রেমের এই একনিষ্ঠ বিশ্বাস নিয়েই মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েছে রেবেকা সোরেন ওরফে রূপমতী সোরেন। তার প্রেম হয়েছে কালজয়ী –তার এই কালজয়ী প্রেম তাকে অন্ত্যজ নারীদের মধ্যে স্বতন্ত্র করেছে –উজ্জ্বল করেছে।

রমাপদ চৌধুরীর 'ইমলী' গল্পের ইমলী বেদেনী অসহায়, লাঞ্ছিত ও বিপর্যস্ত মানবতার প্রতিনিধি যেন। বেদে-বেদুইন অন্ত্যজ মানুষেরা মানব সমাজের চিরকালের অবহেলিত মানুষ। গল্পে দেখি, সুন্দর বনের ডেরা থেকে এসে ইমলী শহরে থেকে গেছে। মধু বেচতে এসে এবারে সে ডেরাতে ফেরেনি। কারণ, তার মন বাধা পড়েছিল বাসনওয়ালা ফালসার কাছে। কিন্তু ভাগ্য খারাপ তার। সে নিজের স্বভাব লজ্জার কারণে ফালসাকে হারিয়ে একাকীত্বের গভীর অসাহায়তার মধ্যে পড়েছে –চরম বিপর্যয়ের মধ্যে পড়েছে। ভিক্ষা করে তাই তার দিন কাটছিল। এই অবস্থায় খাদ্য-

সংগ্রহের বাসনায় উদ্বাস্তু শিবিরে গিয়ে সে শারীরিকভাবে লাঞ্ছিত হয়েছে। কোথাও সে বেঁচে থাকার অনুকূল পরিবেশ পায়নি। তাই সর্বস্ব শূন্য অস্তিত্ব নিয়ে সে বেঁচে থেকেছে। বলা যায় সব হারানোর বেদনা নিয়ে ট্রাজেডির অতলে হারিয়ে গেছে ইমলী।

রমাপদ চৌধুরীর অন্ত্যজ জীবনাশ্রিত ছোট গল্পে চিত্রিত নারী চরিত্রগুলির সুক্ষ্ম বিশ্লেষণের শেষে একথা বলা যায়, অন্ত্যজ নারীরা বৈচিত্র্যে ও বৈশিষ্ট্যে প্রচন্ড রকম আকর্ষণীয়। আর পাঁচজন সাধারণ নারীর মতোই ভাবের বৈশিষ্ট্যে অন্ত্যজ নারীরা সমান উজ্জ্বল। নারী সুলভ আচরণে-মানসিকতায়-কোমলতায় বা সহানুভূতি-ভালবাসায় অন্ত্যজ নারীরা সঞ্জীবিত। কিছু ক্ষেত্রে কিছু চরিত্রে যে আদিমতা, হিংস্রতা, জৈবিকতার প্রাবল্য ও উদগ্রতা দেখা গেছে তা অন্ত্যজ সমাজের পক্ষে যেমন স্বাভাবিক ভদ্র সমাজেও তা স্বাভাবিক। এমন চরিত্র ও আচরণ তাই অন্ত্যজ জীবনাচরণের ক্ষেত্রে কেবল নিন্দনীয় নয়। এচিত্র যেন ব্যতিক্রম। বাকি সব ক্ষেত্রে গল্পকার রমাপদ চৌধুরী অনবদ্য শিল্প দক্ষতায় নারী চরিত্রগুলিকে রসময় স্বার্থকতার সাথে অঙ্কন করেছেন।

চ) পটভূমি ভিত্তিক

সাহিত্যের যেকোন বিভাগের ক্ষেত্রে পটভূমি রচনা সবিশেষ গুরুত্ব বহন করে। বিশেষ করে গদ্য সাহিত্যের ক্ষেত্রে সুনিপুণ পটভূমি রচনা সাহিত্যিকদের সৃজন-দক্ষতার পরিচয়টিকে উন্মোচিত করে বলেই মনে হয়। গল্প কিংবা উপন্যাসের ক্ষেত্রে একথা অবিসংবাদিত ভাবে সত্য। পরিবেশ পটভূমির সুদৃঢ় ভিত্তির উপর ভর করে গল্প উপন্যাসের বুননটি সুবিকশিত হয়ে ওঠে। গল্প-উপন্যাসের বিশেষ বিশেষ বিষয়বস্তু স্বতন্ত্র পরিবেশ রচনার দাবী করে। পটভূমি রচনার এই স্বতন্ত্র দাবি সাহিত্য রচনার কলাকৌশলের আভ্যন্তরীণ ব্যাপার। ভিতর থেকে গল্পের পটভূমি পরিবেশ ও গল্পের বিষয়বস্তু পরস্পর-সহাবস্থানে এককেন্দ্রিক হয়ে গড়ে ওঠে। তেমনটি না ঘটলে গল্প-গঠনে গতি আসে না –গল্প শিল্প-সার্থকতার ক্ষেত্রে মার খায়। তাই কথা সাহিত্যিকরা গল্প বিষয়ের নির্মাণের সাথে সাথে গল্পের পটভূমিকে সমান গুরুত্বে মজবুত করে তোলেন। এরফলে গল্পগুলি শিল্পগত ঐক্যে প্রস্ফুটিত হয়। রমাপদ চৌধুরীর অন্ত্যজ জীবনাশ্রিত ছোটগল্পগুলিও এই সত্যের পরিচয় বহন করে শিল্প সফলতা পেয়েছে। আর এই পর্যায়ের ছোটগল্পগুলি পটভূমি রচনায় গল্পকার রমাপদ চৌধুরী সবিশেষ নৈপুণ্যের পরিচয় দিয়েছেন।

আলোচনার সুবিধার জন্যে অন্ত্যজ জীবন নির্ভর গল্পগুলির পটভূমিকে প্রধানত দুটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে – গ্রাম কেন্দ্রিক পটভূমি ও নগর কেন্দ্রিক পটভূমি।

গ্রাম কেন্দ্রিক পটভূমি

রমাপদ চৌধুরীর গ্রাম কেন্দ্রিক পটভূমি যুক্ত একটি গল্প হল 'ঝুমরা বিবির মেলা'। এই গল্পের বিষয় হয়েছে পাহাড় ও অরণ্যে ঘেরা গ্রাম। শাল শালাই-এর জঙ্গল ও ছোট ছোট টিলার কোলে অবস্থিত সোনারডি গ্রাম। এমন অরণ্য ও পাহাড় ঘেরা পটভূমির গল্প বিষয়ের সঙ্গে সঙ্গতি

রেখে চিত্রিত। পাহাড়ি ও জঙ্গুলে জাতির মানুষজন সাধারণত সৎ, সরল ও সংস্কারাচ্ছন্ন হয়। শহুরে কৃত্রিমতা ও ভণ্ডামি তাদের থাকে না। গল্পে দেখি, মিঞা মাঝি, ঝুমরা প্রমুখ চরিত্রে সেই সততা ও সংস্কারের প্রকাশ। আবার এই পাহাড়ি আদিম জাতির মানুষ হিংস্রও হয়। বুধন কিস্কু তার প্রমাণ। অর্থাৎ দেখা যাচ্ছে ময়নাগড় বরাকরডিহি এলাকা এই গল্পের পটভূমি হিসাবে মানানসই হয়েছে।

নগর কেন্দ্রিক পটভূমি

রমাপদ চৌধুরীর 'ইমলী' গল্পের পটভূমি হল শহর কোলকাতা। শহরের জীবন-সংগ্রাম, কৃত্রিমতা এবং নানান সামাজিক আচরণ গল্পের কেন্দ্রভূমিতে রয়েছে। গল্পের নায়িকা ইমলী ফুটপাথ বাসিন্দা। নায়ক ফালসা বস্তিতে থাকে। একজন মধুওয়ালী –অন্যজন বাসনওয়ালা। শহরের রাস্তাতে তারা মিলিত হয়। কাছাকাছি আসে। আবার হারিয়ে যায় একে অপরের কাছ থেকে। মধুওয়ালী ইমলী পরিত্যক্ত হয়। অসহায়া হয়। লাঞ্ছিতা হয়। বিপর্যস্ত হয়। শহরের বস্তি, অন্ধকার রাতের ফুটপাথ, সমস্ত কিছু গল্পের পটভূমিতে থেকে গল্পের কেন্দ্র বিষয়কে পুষ্টি দিয়েছে। সার্থক ভাবেই। ফুটপাথ এবং বস্তি –এই দুই জায়গা জীবনের অস্থিরতা ও ছিন্নমূল অবস্থার দ্যোতনা আনে। ফলে এখানেই যাদের বাস –তাদের বিপর্যস্ত হওয়াটা খুব স্বাভাবিক হবেই।

রমাপদ চৌধুররী গল্পগুলির পটভূমির বৈচিত্র্যের বিশ্লেষণে আমরা একথা নিঃসন্দেহে বলতে পারি, গল্পকার অন্ত্যজ মানুষের জীবনচর্যা-জীবনবৈশিষ্ট্য এবং মনোভঙ্গির সঙ্গে সঙ্গতি রেখে গল্পের পটভূমি রচনায় নিমগ্ন হয়েছেন। একাজে তাঁর শিল্পদক্ষতা নিয়ে কোন প্রকারের প্রশ্ন তোলা যায় না। কি গ্রাম কেন্দ্রিক কি নগর কেন্দ্রিক –উভয় প্রকার পটভূমি রচনায় তিনি বাস্তব জ্ঞানের পরিচয় রেখেছেন। গল্প বিষয়ের সঙ্গে সঙ্গতি রেখেই পটভূমি নির্বাচন করেছেন।

ছ) আর্থ-সমাজাশ্রিত

যেকোন সমাজ গোষ্ঠীর মানুষের জীবনচর্যার পূর্ণাঙ্গ রূপচিত্রাঙ্কণে আর্থ-সামাজিক অবস্থার বিচার বিশ্লেষণ সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকাটি গ্রহণ করে। সেই সমাজের বিশেষ আচার ক্রিয়া, সমাজপ্রথা, সংস্কার-কুসংস্কার, তাদের খাদ্য-বস্ত্র-বাসস্থান এবং তাদের জীবন-জীবিকা-অর্থনৈতিক অবস্থা সমগ্রজাতি-সম্প্রদায়কে অন্যান্যদের থেকে পৃথক করে রাখে। তাই বিশেষ সমাজ গোষ্ঠীর চাল-চিত্রাঙ্কনে আর্থ-সামাজিক অবস্থার আলোচনা সবিশেষ গুরুত্বের দাবি রাখে। রমাপদ চৌধুরী অন্ত্যজ জীবনাশ্রিত ছোট গল্পগুলিতে অন্ত্যজ জীবনের রূপচিত্রাঙ্কণে বসে তিনি বাস্তবসম্মত দৃষ্টিভঙ্গি ও সুক্ষ্ম পর্যবেক্ষণশীলতার সঙ্গে অন্ত্যজ সমাজের বাস্তব চিত্রকে ফুটিয়ে তুলেছেন।

রমাপদ চৌধুরীর 'চন্দ্রভস্ম' গল্পে অন্ত্যজ মানুষের জীবিকা হয়েছে ভিক্ষাবৃত্তি। ভিখু, তাহের, মাংনা, পঞ্চা, রাউতি, রুখন, পিলুয়া প্রত্যেকেই কোলকাতা শহরের বিভিন্ন প্রান্তে ভিক্ষা করে। তবে সে ভিক্ষার পয়সা জমা পড়ে মালিক মূলচাঁদ মাড়োয়াড়ির পকেটে। ভিক্ষার সব পয়সা জমা দিলে খাওয়া মেলে পেট ভরে। গল্পে দেখি, মূলচাঁদ মাড়োয়াড়ীর লোকদুটি মোটরগাড়ি করে এদেরকে

শহরের বিভিন্ন প্রান্তে নামিয়ে দেয়। শুরু হয় তাদের ভিক্ষাবৃত্তি:

"শহরের কলিজার মধ্যে সবচেয়ে স্বচ্ছল অংশটিতে মাংনা দাঁড়ায় তার দেহের লোভানি মেলে। রুখন, ভিখুরাম, তাহির, পঞ্চা সকলেরই একটা এক বাঁধা জায়গা আছে। সবাই ভিক্ষা করে কেউ কানা আর ভাঙা পা দেখিয়ে, কেউবা তাজা চোজ মাজা মুখ দেখিয়ে।"

(চন্দ্রভস্ম : চৌধুরী রমাপদ)

শত কসরতের ভিক্ষা লব্ধ যে টাকা তাও অন্ত্যজ মানুষের ভাগ্যে জোটে না। মালিকের উপদ্রব নখর ও থাবা নিষ্ঠুরভাবে তা কেড়ে নেয়। বঞ্চনা তাদের গ্রন্থিতে গ্রন্থিতে।

অন্ত্যজ মানুষদের মধ্যে বাজিকর, যাযাবর, যাদুকর সম্প্রদায়ের মানুষের জীবিকা হয়েছে বৈচিত্র্যমণ্ডিত। রমাপদ চৌধুরীর 'মানুষ অমানুষের গল্প' গল্পের অন্ত্যজ যাযাবর, বুনো, আদিম বানর মারার দলের জীবিকা বানর মারা ও বিভিন্ন ধরণের চামড়া বিক্রি করা। তারা গ্রামে গ্রামে বানর তাড়িয়ে বেড়ায়। এটাই তাদের জীবিকা। নারী-পুরুষ সকলে তীর-ধনুক নিয়ে বানর তাড়ানোর কাজে তারা সারাদিনটি ব্যস্ত থাকে। মজুরী নগদ সাত টাকা ও তিনজোড়া গামছা। গল্পে দেখি :

এক) "বান্দর মারা আইল গো; বান্দর মারা। পঞ্চাৎ ডাকেন গো পঞ্চাৎ। হাতে টাকা নগদ লিবো, তিনজোড়া গামছা।"

দুই) "কিন্তু আসল কাজ গাঁ থেকে বাঁদর তাড়ানো, বাঁদর মেরে সাফ করা। তার জন্য চাই সাত টাকা আর তিন জোড়া গামছা।" (মানুষ অমানুষের গল্প : চৌধুরী রমাপদ)

বনে-বাদারে ঘুরে বেড়ায় এই বাঁদর মারার দল। তীর-ধনুকে নানান পশু মারে তারা। সেই সব পশুর চামড়া বিক্রি করেও জীবিকা চালায় বাঁনর মারার দল। সাধারণত, মেয়েরাই গ্রামে গ্রামে এসব চামড়া ফেরি করে নাচে :

এক) "কেউ কেউ ঝোলা থেকে একটার পর একটা পুঁটুলী বের করে। চাম লিবে গো, চাম। বাঘের চাম, হরিণের চাম, ছাগের চাম, বান্দরের চাম –লিবে গো ? আসুন হবে খোঁকা বসবে। আসুন হবে নন্দাই বসবে, আসুন হবে মায় বহুত ঠাকুর পূজবে।"

দুই) "–লোহার আছেন গাঁয়ে? লোহার অর্থাৎ কামার থাকলে টেনে টেনে বলবে, চাম লিবে গো হাঁপোর হবে। –মৃধা আছেন গো, গাঁয়ে মৃধা ? সুর টেনে টেনে জিজ্ঞেস করে। মৃধা অর্থাৎ চামার আর মুচি। তারাই হলো সেরা খদ্দের বাঁদর মারাদের।"

(মানুষ অমানুষের গল্প : চৌধুরী রমাপদ)

অন্ত্যজ মানুষের অনেকের জীবিকার মাধ্যম হয়েছে ছোটখাটো ব্যবসা। রমাপদ চৌধুরীর 'ইমলী' এই ধরণের একট গল্প যেখানে বেদে-গোষ্ঠীর মধু বিক্রির কথা আছে। সুন্দরবনের গভীর জঙ্গল থেকে মধু ভাঙে বেদের দল। সেই মধু নিয়ে কোলকাতার রাস্তায় ফেরি করে তারা :

"আরো গভীর জঙ্গলের দিকে সরে গেল ওরা, ভাল্লুকের সঙ্গে রোষারেষি করে মৌচাক ভেঙে মধু জমালে। একবার করে শহরে এসে ফিরি করে সারা বছর চলতো কোন ক্রমে।"

(ইমলী : চৌধুরী রমাপদ)

বেদে পুরুষ ফালসা ফেরিওয়ালা। সে বেচে বাসনপত্র। মধুর ব্যবসা ছেড়ে ইমলী কিছুদিন ভিক্ষাও করেছে বাধ্য হয়ে।

অন্ত্যজ জীবনের অর্থ-লাঞ্ছিত অবস্থার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করার জন্য গুণিন বৃত্তি পেশা বেছে নিয়েছে অন্ত্যজ সম্প্রদায়ের মানুষটি। মন্ত তন্ত্র–তুক তাক-ঝাড়ফুঁক কিংবা বশীকরণের মন্ত্র আওড়ে অর্থ-উপার্জনের সুলভ রাস্তায় এরা হেঁটেছে। রমাপদ চৌধুরীর এই রকমই একটি গল্প হল 'লাটুয়া ওঝার কাহিনী'। এই গল্পের লাটুয়া হাজার রকমের তুক-তাক ও গাছড়া চিকিৎসা করে। নাগবংশী পূজা করে সে দৈবী গুণের অধিকারী হয়েছে। সাপে কামড়ালে, কুকুরে কামড়ালে বা উদরী রোগ হলে –পাথর পড়া, ডুডাং শিকড় বা আপাং পরা দেয় সে। তার বিনিময়ে জীবিকা নির্বাহের অর্থ উপার্জন করে :

"দুটি রূপোর টাকা গুঁজে দিলাম ওর হাতে ডুডাং শিকড়ের দাম"

(লাটুয়া ওঝার কাহিনী : চৌধুরী রমাপদ)

লাটুয়া ওঝা তার এমন চিকিৎসার প্রতি চরম আস্থাশীল। এসবের প্রতি রয়েছে তার আন্তরিক বিশ্বাস।

রমাপদ চৌধুরীর উক্ত গল্পগুলি পর্যালোচনা করে একটা কথায় প্রতীয়মান হলো যে অন্ত্যজ মানুষ চরম অর্থনৈতিক বিপর্যয়ের মধ্যে নিমজ্জিত থেকেই, বেঁচে থাকার সংগ্রাম শুরু করে। তাদের সংগ্রাম প্রাণান্তকর সংগ্রাম। বেঁচে থাকার প্রয়োজনেই তারা যে কোন প্রকার পেশা গ্রহণ করে। এক্ষেত্রে ন্যায়-অন্যায় শুভ-অশুভ চিন্তার কোন অবকাশই তারা পাই না। তাই দেখি, অন্ত্যজ সমাজে কিছু সংখ্যক মানুষ যেমন সৎপথে থেকে সুকুমার বৃত্তি গ্রহণ করে তেমনি কেউ কেউ আবার অন্যায় পথে দিন যাপনের রাস্তা খুঁজেছে। উপায় যায় হোক না কেন, তাদের উদ্দেশ্য প্রাণ ধারণের জন্য দু মুঠো অন্নের সংস্থান করা। এই ন্যূনতম আহার যোগাড়ের জন্য অন্ত্যজ মানুষ অক্লান্ত পরিশ্রম করে। লড়াই করে। আপসহীন লড়াই।

জ) সমাজ-বৈষম্যমূলক

রমাপদ চৌধুরীর অন্ত্যজ জীবনাশ্রিত ছোট গল্পে অন্ত্যজ মানুষের আর্থ-সামাজিক পরিচয়-দানে নিমগ্ন থেকে একথা প্রথমে বলতেই হয়, অন্ত্যজ মানুষদের সামাজিক অস্তিত্ব প্রতিকারহীন অত্যাচার-লাঞ্ছনা প্রাপ্তিতেই মুখর। মানুষের সমাজে মানুষ হয়ে বেঁচে থাকার অধিকার তাদের নেই। সে অধিকার কেড়ে নিয়েছে এই সমাজেরই উচ্চবিত্ত এবং উচ্চবর্ণের মানুষেরা। তাই অসহায়, দরিদ্র-নিচের তলার অন্ত্যজ মানুষদের সামাজিক ইতিহাস শুধুমাত্র অত্যাচার-বঞ্চনা-লাঞ্ছনা-নিপীড়ন-শোষণে ভরা ইতিহাস। উচ্চবিত্ত ও উচ্চবর্ণের মানুষের সুকৌশলী ও সুবিধাবাদী সামাজিক বিন্যাসের চাপে অন্ত্যজ মানুষেরা চিরকাল ধরেই বঞ্চিত-লাঞ্ছিত হয়ে আসছে। কখনও অন্ত্যজ মানুষ অর্থনৈতিক শোষণের শিকার কখনও তারা সামাজিক দিক দিয়ে অবহেলিত, কখনও আবার শারীরিক দিয়ে রীতিমতো অত্যাচারিত ও লাঞ্ছিত। রমাপদ চৌধুরীর এরকমই দুটি গল্প হল 'ইমলী' ও 'সতী ঠাকুরুণের চিতা'।

'ইমলী' গল্পে বেদে মেয়ে ইমলী শারীরিকভাবে লাঞ্ছিত হয়েছে। বুভুক্ষু পেটে একটু খাদ্যের আসায় সে উদ্বাস্তুদের ক্যাম্পে গিয়ে খাদ্যের লাইনে দাড়িয়েছিল। সেই অপরাধে উচ্চতর সমাজের মানুষ, স্বেচ্ছাসেবীরা তাকে লাঞ্ছিত করেছে :

"যার যা মুখে এল বলল। উত্তেজিত হয়ে উঠল সবাই। হঠাৎ কে যেন একটা ধাক্কা মারলো ইমলীকে, হাতের ঠোঙাটা পড়ে গেল দূরে। এদিক থেকে আর একজন কে ধাক্কা মারলে আবার মাটিতে ছিটকে পড়ল ইমলী নিজেই। চুল ধরে হিড়হিড় করে টেনে তুলল একজন, ঠেলে দিয়ে বললে, যা ভাগ, আবার আসিস তো মেরে হাড় গুড়ো করে দেব।" (ইমলী : চৌধুরী রমাপদ)

–ক্ষুধার অন্নতো জুটলই না, পরিবর্তে শারীরিক লাঞ্ছনা নিয়ে অপমানে জর্জরিত হতে হল অন্ত্যজ মানুষ কে। এমন ঘটনার জন্য তারা যেন সবসময় তৈরী থাকে। ইমলীর আচরণ দেখে তাই তো মনে হয়।

'সতী ঠাকুরুণের চিতা' গল্পে অন্ত্যজ মানুষের প্রতি ব্রাহ্মণ সমাজের বৈষম্যমূলক আচরণের যে চিত্র আছে, বর্তমান সমাজেও তার কোন ব্যতিক্রম নেই। ডোম জাতির ছেলে যশাই পণ্ডিত হয়েছে। ধার্মিক হয়েছে। গ্রামে ধর্মদেবতার মন্দির প্রতিষ্ঠা করেছে। গ্রামের সমস্ত মানুষের সমীহ সে আদায়ও করেছে। কিন্তু ব্রাহ্মণ অকলঙ্ক বাড়ুজ্যে যশাইয়ের এই ধর্মগুরু হওয়ার ব্যাপারকে মেনে নেয় না। বরং নানান তাচ্ছিল্যের মন্তব্য করে সে :

এক) "ডোম পল্লীর যশাই সিদ্ধ পুরুষ হয়েছে। পন্ডিত হয়েছে। লোকে সসম্মানে তাকে যশাই পণ্ডিত বলছে।

শুনে প্রথমটা হেসেছিলেন অকলঙ্ক বাড়ুজ্যে। হাসি পাবারই কথা। ডোমের ছেলে হয়েছে পূজারী ঠাকুর। কালে কালে কতই দেখতে হবে।"

দুই) "পণ্ডিত ? ক্ষিপ্ত স্বরে চিৎকার করে উঠলেন অকলঙ্ক বাড়ুজ্যে। –শালা ডোম, ভেলকি দেখিয়ে পণ্ডিত হয়েছে।"

(সতী ঠাকুরুণের চিতা : চৌধুরী রমাপদ)

অকলঙ্ক বাড়ুজ্যের এমনতর উক্তিতেই অন্ত্যজ মানুষের প্রতি তার বৈষম্যের পরিচয় প্রস্ফুটিত হয়। এ মনোভাব শুধু ব্যক্তি অকলঙ্ক বাড়ুজ্যের নয় –তার সমাজের, এমন কি বর্তমান সমাজেরও।

ঝ) বিশ্বাস ও সংস্কার ভিত্তিক

সমাজিক আচার-সংস্কার-বিশ্বাস-প্রথার মধ্য দিয়ে কোন বিশেষ জাতি সম্প্রদায়ের ও আভ্যন্তর ও বাইরের গঠনটি বিশিষ্ট হয়ে ওঠে। সমাজের বিশ্বাস সংস্কারের চিত্রণের মাধ্যমে সে জাতির মানস গঠনটিও সম্পূর্ণরূপে প্রস্ফুট হয়। রমাপদ চৌধুরীর অন্ত্যজ জীবনাশ্রিত ছোট গল্পে অন্ত্যজ জীবনের বিশ্বাস-সংস্কার, আচার-প্রথার যে চিত্রণ রয়েছে তা থেকে স্পষ্ট রূপে সিদ্ধান্ত করা যায় যে, অন্ধ আচার-সংস্কারে অন্ত্যজ মানুষ আষ্টে পৃষ্ঠে বাঁধা থাকে। শিক্ষা দীক্ষার আলোকবিহীন অন্ত্যজ মানুষ যুক্তি-বুদ্ধির তোয়াক্কা না করে আধা-ভৌতিক ও অলৌকিক বিশ্বাসে মগ্ন থাকে। কতই

না বিচিত্র আচার-প্রথা পালন করে অন্ত্যজ মানুষরা।

রমাপদ চৌধুরীর 'লাটুয়া ওঝার কাহিনী' গল্পে সাঁওতাল জীবনের বিশ্বাস সংস্কারের পরিচয় লভ্য। লাটুয়া গুণিন। নানান অলৌকিক ক্রিয়া-কলাপ এই উপলক্ষ্যে সে করেও থাকে। সাঁওতাল সমাজে একসময় তার ব্যাপক প্রভাব ছিল। মূলতঃ বিভিন্ন গাছড়া ওষুধের দ্বারা সে নানান ধরণের চিকিৎসা করতো :

এক) "মরিয়ম বললে, এ তল্লাটে নাকি অমন ওঝা আর একজনও নাই। মুর্দার বুকে প্রাণ বসাতে পারে সে। সাপকে মন্ত্র দিয়ে সে এমন বশ করে যে চুমুক দিয়ে নিজের বিষ নিজেই টেনে নেয়।"

দুই) "ওঁরাও পট্টির লালুয়া কুড়ুক ও সাই দিল। বললে, আপঙের মূলে ফুঁ দিয়ে আপনার হাতে দিয়ে দেবেন লাটুয়া ওঝা, কাঁকড়া বিছের গর্তে হাত দিলেও কিছু হবে না আপনার।"

তিন) "রতনা মাঝিন বললে, লাটুয়া ওঝার মন্ত্র পড়া পাতা দিয়ে মারাং পাড়ায় মাছ ধরি বাবু। জলে পাতা বিছিয়ে দিলে সব মাছ মরার মতো পড়ে থাকে তার উপর।"

(লাটুয়া ওঝার কাহিনী : চৌধুরী রমাপদ)

–যুক্তি-বুদ্ধির অনেক বাইরে দাঁড়িয়ে আছে অন্ত্যজ মানুষের এমন সব আচার-বিশ্বাসের ভিত। যুক্তি-বুদ্ধির বাইরে থেকেই কায়মনোবাক্যে এসবই বিশ্বাস করে তারা।

'রেবেকা সোরেনের কবর' গল্পে সাঁওতাল সমাজের এক বিশেষ আচার প্রথার চিত্র রয়েছে। সেই প্রথা হলো 'বিটলা' প্রথা। সমাজের কোন নারী যদি অন্যায় করে থাকে কিংবা জৈবিক প্রবৃত্তির জন্য জাতির মান-ইজ্জতকে নষ্ট করে, তাতে পঞ্চায়েত সেই রমণীকে 'বিটলা' ঘোষণা করে। বিটলা অর্থাৎ এক ঘরে করে দেওয়া। গল্পে দেখি, প্রেমের কারণে ও খ্রীষ্টান ম্যাকু সাহেবের সাথে থাকার কারণে রূপমতীকে 'বিটলা' ঘোষণা করেছে পঞ্চায়েত। সেই সাথে বিটলা প্রথার অঙ্গ হিসাবে তার উপর নেমে এসেছে শারীরিক লাঞ্ছনা :

"ঠাট্টা বিদ্রূপ হাসাহাসি। আর অশ্লীল গান। কেউ তীরের খোঁচা দিল, কেউ টানলো তার শাড়ির আঁচল আর মাঝে মাঝে হৈ হৈ চিৎকার।"

(রেবেকা সোরেনের কবর : চৌধুরী রমাপদ)

–এমন বিশ্বাস প্রথা ও তার বিচিত্র দিকটি অন্ত্যজ জীবনের আদিমতার সঙ্গে বেশ মানিয়ে যায়। গল্পকার রমাপদ চৌধুরী বাস্তব সম্মতভাবে এই সম্প্রদায়ের আচার বিশ্বাসের পরিচয়কে গল্পে তুলে ধরেছেন।

ছয়) সমরেশ বসু (১৯২৪-১৯৮৮)

মনন অপেক্ষা অভিজ্ঞতা, বিশ্লেষণ অপেক্ষা আবেগ নির্ভরতা, সহমর্মিতা অপেক্ষা দুঃখ বেদনার শরিকানায় যিনি ছোটগল্পকে স্বকীয়তা দিয়েছেন, তিনি হলেন সমরেশ বসু। বাংলা সাহিত্যের

বহু বর্ণময় সাহিত্য-ব্যক্তিত্ব সমরেশ বসুর জন্ম ১৯২৪ এর ১১ ই ডিসেম্বর ঢাকা জেলার মুন্সিগঞ্জ মহকুমার রাজনগর গ্রামে। মোহিনী মোহন-শৈবলীনির এই পুত্রের পরিবারিক নাম সুরথনাথ। ১৯৪৬ সালে 'আদাব' গল্পের মাধ্যমে সমরেশ বসুর সাহিত্য জীবনে আবির্ভাব এবং ১৯৭০ সালের মধ্যে অর্থাৎ ২৫ বছরে (১৯৪৬-৭০) দু'শর বেশী গল্প লিখেছেন সমরেশ বসু। এইসব গল্পে জীবনের বৈচিত্র্য, জীবনের সংগ্রাম, এদুইয়ের প্রাধান্য। বিপুল জীবন ঘনিষ্ঠ অভিজ্ঞতা কল্পনা যোগে বিশ্বাস্য ও সজীব হয়ে উঠেছে। প্রগাঢ় মানবিক আবেগ ও দুর্মদ সহানুভূতিতে লেখক তাঁর সৃষ্ট বিচিত্র চরিত্র গুলির সঙ্গে সহজেই একাত্ম হয়ে যান, তাদের জীবনের বিচিত্র সুখ-দুঃখের অংশীদার হয়ে যান। আর সেই সব সুখ-দঃখের প্রকাশে সরশে বিচিত্র প্রকরণ আশ্রয় করেছেন –বিশাল ক্যানভাস, পরিবর্তমান পটভূমি, বিশেষ পরিধি বেষ্টিত মঞ্চ। কখনও চরিত্রের আবেগ-কল্পিত বর্ণনা, কখনো-বা নিরাশক্ত বর্ণনা ও বিশ্লেষণ। সবটা মিলিয়ে অনিবার্য 'এফেক্ট' যা পাঠককে প্রবলভাবে অভিভূত করে।

সমরেশ বসুর গল্পের বিষয় ব্যপ্ত ও বৈচিত্র্য লক্ষণীয়। তাঁর তেত্রিশটি গল্পগ্রন্থ যাতে দু'শোর বেশি গল্প রচিত। ছোট গল্প সংকলনগুলির যথা সম্ভব কালানুক্রমিক তালিকা দেওয়া হল।

১. 'মরশুমের একদিন' (১৯৫৩)
২. 'অকাল বৃষ্টি' (১৯৫৩)
৩. 'ঋতু' (১৯৫৩)
৪. 'পশারিণী' (১৯৫৫)
৫. 'ষষ্ঠ ঋতু' (১৯৫৬)
৬. 'ফুল বর্ষিয়া' (১৯৫৭)
৭. 'মনোমুকুর' (১৯৫৮)
৮. 'দেওয়াল লিপি' (১৯৫৯)
৯. 'পাহাড়ী ঢল' (১৯৬১)
১০. 'সুবর্ণা' (১৯৬১)
১১. 'বনলতা' (১৯৬৭)
১২. 'পাপ পুণ্য' (১৯৬৭)
১৩. 'ছেঁড়া তমসুখ' (১৯৭১)
১৪. 'চেতনার অন্ধকার' (১৯৭২)
১৫. 'ধর্ষিতা' (১৯৭২)
১৬. 'কামনা বাসনা' (১৯৭২)
১৭. 'হেষাধ্বনি' (১৯৭৩)
১৮. 'বিদ্যুল্লতা' (১৯৭৪)
১৯. 'রজকিনী প্রেম' (১৯৭৪)

২০. 'বনের সঙ্গে খোলা' (১৯৭৪)

২১. 'বিপরীত রঙ্গ' (১৯৭৫)

২২. 'নাচঘর' (১৯৭৬)

২৩. 'কীর্তিনাশিনী' (১৯৭৬)

২৪. 'কুন্তি সংবাদ' (১৯৭৬)

২৫. 'ছোট ছোট ঢেউ' (১৯৭৭)

২৬. 'মাসের প্রথম রবিবার' (১৯৭৮)

২৭. 'আলোর বৃত্তে' (১৯৭৮)

২৮. 'অন্ধকারের গান' (১৯৮০)

২৯. 'ও আপনার কাছে গেছে' (১৯৮০)

৩০. 'বিবর মুক্ত' (১৯৮০)

৩১. 'বিকেল শোনা' (১৯৮০)

৩২. 'বিবেকবান ভীরু' (১৯৮৬)

৩৩. 'আমি তোমাদেরই লোক' (১৯৮৬)

গল্প বৈশিষ্ট্য

সমরেশ বসুর ছোট গল্পে অন্বিষ্ট মানুষ এবং মানুষের জীবন। জীবনকে জানতে জানতে তিনি নিজেকে চিনেছেন। আর নিজেকে জানতে জানতে পৌঁছে গেছেন জীবনের গভীরে। বাস্তব অভিজ্ঞতা দিয়ে জীবনকে তিনি জেনেছেন, দেখেছেন; সাহিত্যে তাকেই দিয়েছেন ভাষারূপ। তাঁর বিশ্বাস, "সাহিত্যে যা কিছু দায়, সে তো জীবনের কাছে। সাহিত্যের থেকে জীবন বড়, এ সত্যের জন্য সাহিত্যিককে গভীর অনুশীলন করতে হয় না, তা সততই অতি জীবন্ত।" [১৬৬]

রাজনীতির সঙ্গে সম্পর্ক তাঁর মানুষের প্রতি এই বিশ্বাসকে গাঢ় করে তুলেছে। –"সমস্ত তত্ত্ব বাদ দিয়ে, একান্তভাবে মানুষের প্রতি বিশ্বস্ত থেকে দেশ ও কালকে সম্যক জেনে মানবিকতাই হবে মূল তত্ত্ব। এসব সিদ্ধান্ত নিতে পার্টির অতীতের অভিজ্ঞতাই কাজ করেছে। পার্টির কাছে আমার কৃতজ্ঞ না থাকার কোন কারণ নেই।"[১৬৭]

সৃষ্টিক্ষম বড় লেখক কখনও একটি সীমায় বদ্ধ থাকতে পারেন না। জীবনকে নানাভাবে নানারূপে দেখে সঞ্চিত হয় তাঁর অভিজ্ঞতা। সাহিত্য গড়ে ওঠে সেই অভিজ্ঞতার ভূমিতে। সমরেশের ক্ষেত্রে একথা বিশেষভাবে সত্য। তিনি জীবনকে, বিশেষত মানুষকে দেখেছেন নানাভাবে। তাঁর সৃষ্টি পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে পরিবর্তিত হয়েছে তাঁর অভিজ্ঞতার সাহিত্য রূপায়ণের কাঠামো। মানুষের সত্তার সন্ধানে মানে তিনি বুঝেছেন টিকে থাকার জন্য বিরামহীন সংগ্রাম। কখনও তার সে সংগ্রাম অতি আদিম; তবে মানব সমাজের বিকাশের শক্তি সেখানেই। এই সংগ্রামের কথা এসেছে তাঁর ছোটগল্পে বিচিত্র রূপে।

তাঁর ছোট গল্পেই প্রথম উত্তর ২৪পরগণার চটকল কেন্দ্রিক শ্রমিকদের আর নিম্নবিত্তদের জীবন জীবন্ত হয়েছে। দীর্ঘদিন আতপুরের বস্তিতে বাস সম্ভবত তাঁর এ অভিজ্ঞতার উৎস। তাঁর বেশিরভাগ গল্পই প্রতিষ্ঠান বিরোধী গল্প। এবং এই বিরোধিতা কখনো আক্রমণাত্মক বা প্রত্যক্ষ নয়; সহজভাবে তা গল্পে এসেছে। বর্তমান সমাজে শিশু-কিশোরের শোষিত-নির্যাতিত জীবন তার অনেক গল্পে এসেছে খুবই বাস্তবভাবে।

নারী তাঁর গল্পে প্রায় আশ্রয়দাত্রী, মঙ্গল-উৎস। বিচিত্র বিস্তৃত অভিজ্ঞতার সঙ্গে অসামান্য তথ্যজ্ঞান অনুপুঙ্খ ব্যবহারে নিপুণতা এবং জীবন সম্পর্কে সহানুভূতি আর শ্রদ্ধা তাঁর গল্পকে করে তুলেছে অনন্য সাধারণ। মধ্যবিত্ত, ক্বচিৎ উচ্চবিত্তের ব্যক্তি জীবন তার ছোটগল্পে সমানভাবে জীবন্ত হয়ে উঠেছে।

সমরেশ বসুর ছোটগল্পগুলিকে আমরা ক) শ্রমজীবী নিচুতলার মানুষের গল্প, খ) নিম্নমধ্যবিত্ত জীবনের কাহিনী, গ) মধ্যবিত্ত জীবনকথা, ঘ) রাজনৈতিক গল্প, ঙ) বিত্তহীন শোষিত কৈশোরের গল্প, চ) সমকালীণ সমস্যা নিয়ে লেখা গল্প –এভাবে দেখতে পারি। কিন্তু উক্ত বিষয়বস্তু আমাদের আলোচ্য নয়, আমাদের আলোচ্য বিষয় সমরেশ বসুর ছোট গল্পে অন্ত্যজ মানুষেরা কিভাবে উঠে এসেছে তার অনুপুঙ্খ বর্ণনা।

সমরেশ বসুর অন্ত্যজ জীবন নির্ভর বিষয়বস্তুর পর্যালোচনায় দেখি, বিবিধ শ্রেণীর অন্ত্যজ মানুষের ব্যক্তি জীবন, পরিবার জীবন, তাদের প্রেম-দাম্পত্য, প্রেমহীনতা, লোভ-লালসা, সরলতা-কোমলতা-সহানুভূতিশীলতা, ভন্ডামী, শঠতা, ধর্মীয় জীবন, আচার বিশ্বাস বিভিন্ন গল্পে বিধৃত রয়েছে। তাঁর গল্পে উক্ত বিষয়গুলিই আমাদের আলোচ্য।

ক) ব্যক্তি জীবনাশ্রিত

সমরেশ বসুর ব্যক্তি জীবনাশ্রিত অন্ত্যজ জীবন নির্ভর কিছু গল্পের বিষয়বস্তু হয়েছে অন্ত্যজ মানুষের প্রেম জীবন। প্রেম-সফলতা, প্রেম-ব্যর্থতা, প্রেমজ কামনা-বাসনা, প্রেম কেন্দ্রিক মাধুকরী বৃত্তি, জীবন পিপাসা গল্পগুলিতে মূর্ত হয়েছে। তাঁর 'শেষ মেলায়', 'গুণিন' ও 'অকাল বৃষ্টি' গল্পগুলি আলোচনা করলে উক্ত বিষয়ের সত্যতা যাঁচাই করতে পারবো বলে আমার মনে হয়।

'শেষ মেলায়' গল্পের বিষয় হয়েছে কামার জাতির মেয়ে সুভদ্রার প্রেম-পিপাসার কাহিনী। সুভদ্রা ভালো বেসে ফেলে মোহন চিত্রকরকে। হঠাৎ করেই নাটকীয়ভাবে তাদের আলাপ। পলাশপুরের মেলাতে তাদের দুজনের প্রথম সাক্ষাৎ। আলাপের মাঝে সুভদ্রার সঙ্গে রসিকতার সীমা ছাড়িয়ে গেলে সুভদ্রা পলাশপুরের ছেলেদের ডেকে এনে মোহনকে জখম করে দেয়। যদিও এই দৃশ্য সুভদ্রার মনে অনুরাগ আনে। মোহনের সঙ্গে তার ঘনিষ্ঠতা গড়ে ওঠে। মেলার অল্প কদিন সময়, তাই চৈত্র সংক্রান্তির দিন কোপগড়ের মেলায় সাক্ষাতের অঙ্গীকার করে সুভদ্রা। কথা রাখেও সে। এমন ভাবে এক মেলা থেকে আর এক মেলাতে দেখা হয় দু'জনের। ঘনিষ্ঠতা গভীর প্রেমে পরিণত হয়। ঘর বাঁধার সংকল্প করে তারা। বাউন্ডুলে মোহন পয়সা রোজগারের দিকে মন দেয়। আশায় ভরে

ওঠে সুভদ্রার মন। মোহন ঠিক করে জয়পুর হাটের রথের মেলাতে সুভদ্রার বাবার কাছে তাদের বিয়ের প্রস্তাব করবে। প্রেমের সুখপ্রাপ্তির জন্য সুভদ্রা আকুলিত থাকে। কিন্তু আশা পূরণ হয় না তার। শারীরিক অসুস্থতার কারণে সুভদ্রার বাবা জয়পুর হাটের মেলায় আসতে পারে না। কিন্তু প্রেমের টানেই ঘর বাঁধার নেশায় সুভদ্রা হাজির হয় মোহনের সামনে। অর্থ রোজগারে মন দিয়ে মোহনের শরীর অনেকখানি ভেঙে গেছে। তারা ঠিক করে পলাশ পুরের মেলাতেই বিয়ের কথা পাকা করে নেবে। কিন্তু দিনকাল ঘুরে যায়। দুর্ভিক্ষ এসে সমস্ত লন্ডভন্ড করে দেয়। পলাশপুরের মেলা দুর্ভিক্ষের কারণে বসে না। ডুকরে কেঁদে ওঠে সুভদ্রার মন। তার অন্তরের অতৃপ্ত প্রেম দুর্বার হয়ে ওঠে। তারও চেহারা ভেঙে গেছে। তবুও কঙ্কাল চেহারা নিয়ে আশায় বুক বেধে কোপগড়ের মেলাতে হাজির হয় সুভদ্রা। যদি সেখানে মোহনের সঙ্গে দেখা হয়। দূর থেকে দেখতে পায় অসংখ্য মানুষ কালো মাথা নিয়ে মেলা প্রাঙ্গণে বসে আছে। আশাতে ভরে ওঠে সুভদ্রার মন – নিশ্চয়ই তাঁর মতো মোহন ও মেলাতে এসেছে। মেলার একটু কাছা কাছি এসেই হতাশ হয় সুভদ্রা। দূর থেকে যাদের মানুষ বলে মনে হচ্ছিল তারা আসলে শকুন। কোথাও মানুষ নেই। সর্বত্রই দুর্ভিক্ষের করাল গ্রাসে সমস্ত কিছু ধ্বংস হয়ে গেছে। তা দেখে মাটিতে হোঁচট খেয়ে আছড়ে পড়ে সুভদ্রা :

"সুভদ্রা হামলে পড়ে মাটিতে: তু খেয়ে লছিস মা ধরিত্তি, আমার ভিটে, সংসার, গণেশ ঠাকুরের প্যারা ছ্যালে... তু খেয়ে লছিস।"

(শেষ মেলায় : বসু সমরেশ)

বস্তুতঃ ধরিত্রী সবই খেয়ে নিয়েছে সুভদ্রার। ঘর বাঁধার অদম্য কামনা বুকে নিয়ে এক মেলা থেকে আর এক মেলায় যে নারী ছুটে বেড়াতো তার সেই অদম্য জীবন পিপাসার নিবৃত্তি ঘটলো না। সুভদ্রার ট্রাজেডি তাকে বাংলা সাহিত্যের অতৃপ্ত নারী চরিত্রের মধ্যে উজ্জ্বল করেছে।

'গুণিন' গল্পের বিষয় হয়েছে নকুড় দিগড়ের প্রেম-পিপাসার উদগ্রতা ও হিংস্রতা। কান্ত দিগড়ের মেয়ের সঙ্গে তার বাল্য প্রেমের সম্বন্ধ। কিন্তু নকুড় অকর্মণ্য হওয়ায় কান্ত দিগড় নকুড়ের হাতে মেয়েকে তুলে দিতে নারাজ। নিজের বাড়ির লোকেরাও একই কারণে নকুড়কে সহ্য করতে পারে না। তাই দুরন্ত অভিমানে নকুড় ঘর ছেড়ে বিবাগী হয়। কিন্তু তার বাল্য প্রেমের হতাশা তাকে তাড়িয়ে বেড়ায়। নকুড় গুণিন বৃত্তিকে পেশা করে আট বছর পর পাকা গুণিন হয়ে গ্রামে ফেরে। এবার গ্রামে তার কদর খুব। এমন কি মতি মোড়ল পর্যন্তও, নকুড়কে তার মেয়ের সাথে বিয়ে দেওয়ার প্রস্তাব দেয়। কিন্তু নকুড়ের নজর হরিমতীর দিকে – সেই কান্ত দিগড়ের মেয়ে হরিমতী। হরিমতী এই আট বছরে বিধবা হয়ে ফের বাপের ঘরে বাস করছে। আসলে নকুড়ের বুকের মধ্যে যেন বাস করছে হরিমতী। হাজার মানুষ তার কাছে আসে বশীকরণের মন্ত্র নিয়ে মনোবাসনা পূর্ণ করতে। কিন্তু যুবতী হরিমতী যেন স্বয়ং তাকেই বশ করেছে। তার সমস্ত কিছুকে বিপর্যস্ত করে দেয় এই যুবতী। সে মনে প্রাণে হরিমতীকে চায়। অথচ তার চাওয়ার কথা সে তাকে বলতে পারে না। অন্যদিকে এখন হরিমতীরও সেই একই দশা সে প্রবল ভাবে এখন নকুড়কেই চাই। কিন্তু নকুড় তার ইঙ্গিত বুঝতে পারে না। হরিমতী দিশেহারা – নকুড় বোঝে না কেন সব ? তাই সে মজা করে

নকুড়ের কাছেই বশীকরণ মন্ত্র শিখতে চায়। নকুড়কে বলে, তার মনের মানুষ তার প্রেমকে বোঝে না সেজন্য সে পিরীতের মানুষকে বশ করতে চায়। একথা শুনে সমস্ত চিত্ত বিদ্রোহ করে উঠে। সিদ্ধান্ত নেয়, হরিমতীকে সে নিজের বশ করবে –অন্য কাউকে পেতে দেবে না :

"অদ্ভুত উত্তেজনায় ঘরের মধ্যে পায়চারী করতে লাগল নকুড়।... সেই হরিমতীকে বাঁধবে আষ্টেপৃষ্ঠে।... একেবারে আসল অস্ত্রই ছাড়বে সে। যক্ষ-রক্ষ, দত্যি-দানো, যেই হও কেউ ঠেকাতে পারবে না নকুড়কে।"

(গুণিন : বসু সমরেশ)

এক অদ্ভুত ঘোরের মধ্যে নকুড় বিচিত্র আচার পালন করে। বিবস্ত্র হয়ে অমাবস্যার রাত্রে কবরের হাড় নিয়ে পুকুরে স্নান করে, বশীকরণের মোক্ষম অস্ত্র সে হরিমতীকে ছাড়বে। কিন্তু নিজের মনের বিকার ও ঘোরে সে উন্মত্তবৎ হয়ে পড়ে এবং অচৈতন্য হয়ে দীঘির জলে সলিল সমাধিপ্রাপ্ত হয়। নকুড়ের এই আচার-পালন ও বিকার গ্রস্ত হয়ে মৃত্যুমুখে পতিত হওয়ার মধ্যে অন্ত্যজ জীবনের আদিম-প্রেম-পিপাসারই প্রতিফলন রয়েছে। প্রেমাস্পদকে প্রাপ্তির উদগ্রতা তাকে মৃত্যুমুখে ঠেলে দিলো। মৃত্যু তাকে কেড়ে নিলেও তার উন্মত্ত প্রেমের সর্বগ্রাসী রূপ তাকে বিশেষিত করেছে, সার্থক করেছে।

সমরেশ বসুর 'অকাল বৃষ্টি' গল্পে সিধু ডোমের প্রেম-জীবনের ট্রাজেডি অঙ্কিত হয়েছে। শ্মশানের মৃত্যু-রেজিষ্টার ভূতেশ হালদারের অ্যাসিস্ট্যান্ট সিধু ডোম। সে মরা পোড়ায়। মরা পোড়ায় আর মদ খেয়ে মাতাল হয়ে থাকে। তার বিচিত্র নেশার মধ্যে সর্বপ্রধান নেশা হল –মাঝে মাঝেই একটা করে মেয়ে মানুষ শ্মশানে তোলা। তার সাথে ঘরবাঁধা। সে মেয়েটি চলে গেলে আবার আর একটা আনা। গল্প শুরুর মুহূর্তে আমরা দেখি, সুলোচনা নামের, এক আঁটো সাঁটো পুষ্ট যৌবনের নারীকে সিধু শ্মশানে তুলেছে। ভূতেশ এসব পছন্দ করে না। সে সিধুকে সাবধান করে দিয়ে বলে, চৈত্র মাসে বসন্ত কলেরার বাড়-বাড়ন্ত হলে সুলোচনাও অন্যান্যদের মতো অন্যত্র চলে যাবে। উত্তরে সিধু অনায়াসে জবাব দেয়, এটা গেলে সে আবার একটা মেয়ে মানুষ ঘরে আনবে। কিন্তু পরে দেখা যায় সুলোচনা অন্যান্যদের মতো নয়। শ্মশানে নিজেকে মানিয়ে নিয়েছে বেশ। সিধুকে নিয়ে সে সুখেই থাকে। ভূতেশ ও কেমন যেন সুলোচনার মোহে পড়ে। সুলোচনাকে ঘিরে, দুই পুরুষ, সিধু ও ভূতেশের জীবন মোহে ও মাতনে কাটে। তার পর চৈত্রমাস এসে উপস্থিত হয়। সঙ্গে আসে মৃত্যু। মরার মিছিল। সিধুও ভূতেশের হাতের এখন বিরাম নেই। সবার অদৃশ্যে সুলোচনা তখনই চলে গেল :

"সিধু বলল ট্যারা চোখ ছোট করে, শ্মশানেও রেহাই নেই, মেয়েটা মরে গেছে গো ঠাকুর, ওলাওঠায়।" (অকাল বৃষ্টি : বসু সমরেশ)

সিধু সুলোচনাকেও চিতায় চড়িয়ে দেয়। মনটা তার ভারাক্রান্ত। বিষাদগ্রস্ত। সন্ধার অন্ধকারে সে ছাইগাদার উপর দাড়িয়ে থাকে গ্রামের দিকে চেয়ে। ভূতেশ তার পাশে দাড়িয়ে বলে :

"জানলি সিধে, শ্মশানটা শালা সত্যি শ্মশান হয়ে গেছে।" (অকাল বৃষ্টি : বসু সমরেশ)

–একথা শুধু ভূতেশের নয়, মনে হয় সিধুরও মনের কথা। যে জীবনে সে একটার পর একটা নারীকে স্থান দিয়েছে, সেই জীবনে এই প্রথম বোধ হয়, সিধু প্রেমের গভীর টানেতে বাঁধা পড়েছে। নারী এখানে শুধুমাত্র মেয়ে মানুষ না হয়ে বোধহয় সিধুর জীবনে সত্যিকারের নারী হয়ে দেখা দিয়েছে। আর দিয়েছে বলেই এই প্রথম জীবনটা তার শ্মশান বলে মনে হয়েছে।

ব্যক্তি জীবনাশ্রিত সমরেশ বসুর অন্ত্যজ জীবন নির্ভর কিছু গল্পের বিষয় হয়েছে অন্ত্যজ মানুষের দারিদ্র-লাঞ্ছিত সাধারণ জীবন। অর্থকষ্ট হেতু অন্নকষ্টের জালে জড়িয়ে পড়া অন্ত্যজ মানুষের জীবনসংগ্রাম এপর্যায়ের গল্পের বিষয় হয়েছে। কোথাও দেখি অন্নকষ্টের ফলে অন্ত্যজ মানুষ মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েছে, কোথাও দেখি অর্থ-লাঞ্ছিত জীবনে অন্ত্যজ মানুষ সব হারানোর ব্যথা ও অপচয় বোধের অনুভূতিতে ট্রাজেডির চরমে অবস্থান করছে।

সমরেশ বসুর 'খিঁচা কবালা' গল্পে বাউরি, ডোমজাতের সন্তান রুগ্ন, পিতৃমাতৃহীন খিঁচা কবালার বিচিত্র জীবন-যাপন ও বিচিত্র মতি-গতির কাহিনী বর্ণিত এখানে। চরম দারিদ্রের হাত থেকে বাঁচার জন্য সে পকেটমারি করে জীবন চালায়। ভিড় বাসে উঠে পলকের মধ্যে সে বাবুদের টাকা ভর্ত্তি মানি ব্যাগ তুলে নিতে পারে। এমনি ভাবেই একদিন সোনামুখীগামী বাস থেকে খিঁচা কবালা একশো পঁচিশ টাকা পকেট মেরে নেয়। সমস্ত ব্যাপারটা দেখে রামসাগরের পেরকাশ বাউরি। পেরকাশ খিঁচা কবালার কাছ থেকে ঐ টাকার ভাগ দাবি করে। খিঁচা কবালা রাজি না হয়ে ছুটে পালিয়ে যায়। পরে বাসে চড়ে আরামবাগের দিকে যেতে গিয়ে দেখে একটা অ্যাক্সিডেন্টে মৃত ব্যক্তির জন্য গাড়ী বন্ধ হয়ে পড়েছে। খিঁচা কবালা বাসে থেকে নামে। নেমে দেখে, সেই পেরকাশ মুখে রক্ত উঠে মারা গেছে। মৃত প্রকাশকে দেখে দুঃখ পায় খিঁচা কবালা। সিদ্ধান্ত নেয় পেরকাশের বাড়ি গিয়ে একটা খবর অন্তত দিয়ে দেবে।

সমরেশ বসুর 'শানা বাউরির কথকতা' গল্পে শানা বাউরির লাঞ্ছিত জীবনে বিপর্যয় ও হতাশার কথা বাস্তব সম্মতভাবে চিত্রিত। রাঢ়ের এক বিখ্যাত কালীপূজার দিনে সবাই আনন্দমত্ত থাকলেও শানা সে আনন্দ-উৎসবে যোগ দেয় না, দিতে পারেও না। কেননা, সেদিনও শানাকে অর্থ উপার্জনে বেরোতে হয়েছে। গ্রামের উচ্চবংশীয় সুন্দর রায় বাস ধরতে যাবে, তারই মুটে এখন শানা বাউরি। মাথায় তার পুরো একটা গাড়ির মাল। সেই সঙ্গে আছে হারান গাঙ্গুলী ও জীবন বাড়ুজ্জ্যে। শানা তাদের কাছে আপন দুঃখের কথা জানায়। শানার বড় দুঃখ তার বউ বারে বারে ঘর ছেড়ে বাপের বাড়ি চলে যায়। কারণ হিসাবে শানা উচ্চ বংশীয় কামুক পুরুষদেরই দোষী করে। দোষী করে তার মাকেও। অর্থ উপার্জনের তাগিদে বাইরে থাকে বলে শানা এতটা খবর রাখতো না। সে রায়, বাড়ুজ্জ্যে ও গাঙ্গুলী মশাইকে উদ্দেশ্য করে বলে :

"আপনকার ঘরবাসী ব্যাটারা মায়ের হাতে দুটো পয়সা দিলে, বউকে জোর করে তুলে দেয়। শহরে বাজারে মেয়ে মানুষের পাড়া আছে, ইখ্যানে বাউরি পাড়াটো আছে।"

(শানা বাউরির কথকতা : বসু সমরেশ)

শানার এই কথা শুনে চমকে উঠে সবাই। তারা তাকে চুপ করতে বলে। সব ভুলে বউকে

ঘরে আনতে বলে। কিন্তু কোন ভ্রুক্ষেপ আনে না শানা। সে যেন নিজ মনেই কেদার মুখুজ্যের বিরুদ্ধে তার ক্ষোভের কথা বলে যায়। প্রচন্ড ঘৃণার সঙ্গে সে বলে সব কথা। বাস আসে। যেন নিস্কৃতি পায় সুন্দর রায়, হারান গাঙ্গুলি ও জীবন বাড়ুজ্যেরা। বাসে উঠে গন্তব্যের দিকে চলে যায় তারা। রাস্তার উপর একাকী দাঁড়িয়ে শানা বাউরি আর একবার বউকে বাড়ি আনার সিদ্ধান্ত নেয়।

–আসলে শানা বাউরি বিপন্ন অস্তিত্বের অন্ত্যজ মানুষ। উচ্চবংশীয়দের কামনার থাবা তার ঘরের শান্তিকে কেড়ে নিয়েছে। অন্ত্যজ সমাজে শানা একা নয়, এমন বিপন্নতা ও বঞ্চনা নিয়ে হাজারো শানা বেঁচে আছে –অর্থহীন নির্বিকারভাবে। উচ্চবংশীয় মানুষদের নির্লজ্জ কামনার শিকার হয়ে।

খ) পরিবারাশ্রিত

সমরেশ বসুর অন্ত্যজ জীবনাশ্রিত দুটি গল্পের বিষয় হয়েছে অন্ত্যজ মানুষের পরিবার জীবন। একটি গল্প হল 'প্রত্যাবর্তন', আর অন্যটি হল 'আশ্চর্য প্রদীপ'। 'প্রত্যাবর্তন' গল্পে গল্পকার সমরেশ বসু এক নাপিত পরিবারের দারিদ্র, অনটন ও অশান্তিকে অতিক্রম করে সুখ-শান্তি ও মিলনোল্লাসে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার কাহিনী বর্ণনা করেছেন। গল্পে নাপিত ঠান্ডারাম ও তার স্ত্রী সুকির মোট ছেলেমেয়ে ছয়। অর্থদীর্ণ-একান্নবর্তী এই সংসারে পাঁচজন অর্থাৎ ঠান্ডারাম, সুকি, বড়ছেলে নবা ও কেষ্ট এবং মেয়ে হারাণী, কমবেশী কিছু না কিছু আয় করে। ফলে সংসার তাদের স্বচ্ছন্দ্যে চলার কথা। কিন্তু নেতৃত্ব ও পরিচালনার অভাবে তাদের সংসারে মারামারি, ঝগড়া-ঝাঁটি, খেয়োখেয়ী নিত্য লেগে থাকে। জীবন তাদের যেন ক্লেদ পঙ্কিলতায় ভরা। এরই মধ্যে ঠান্ডারামের কিশোরী মেয়ে বাসন্তী এগিয়ে আসে সংসারের শান্তি ফেরাতে। প্রথমদিকে তাকে কেউ গুরুত্ব না দিলেও, বাসি ওরফে বাসন্তী আন্তরিক কান্নভেজা আবেদনে শেষ পর্যন্ত সবাইকে সাড়া দিতে হয়। দেখা গেল এর পর থেকে পরিবারের সবাই বাসির হাতে রোজগারের পয়সা তুলে দিয়ে নিশ্চিন্ত হয়। সংসারে সুখ ফিরে আসে। আনন্দের পরশ আসে সংসারে। এরই মধ্যে বাসির জীবনে আসে প্রেম। প্রেমিক পবন বাসিকে ঘর ছেড়ে তার সঙ্গে চলে যেতে বলে। অনেক দ্বন্দ্বের পর বাসি পবনের সঙ্গে বেরিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়। বেরিয়ে পড়েও একদিন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সে যেতে পারে না। আনন্দোচ্ছল সংসার যেন তার পা চেপে ধরে। সে পবনকে বলে :

"আমি পারব না মিস্তিরি। এত খোনে ওরা না জানি কি করছে। ওরা নিশ্চয় মারা মারি করছে, মরছে বুঝি মারামারি করে।" (প্রত্যাবর্তন : বসু সমরেশ)

শেষ পর্যন্ত ফিরে আসে বাসি। ফিরে আসে সংসারের প্রয়োজনে। ফিরে আসে তার নিজ হাতে গড়া আনন্দ নিকেতনে। নিজের ব্যক্তিগত সুখকে বিসর্জন করেই ফিরে আসে সে। আনন্দ ও শুভবোধে উত্তরিত হয়, প্রতিষ্ঠিত হয় একটি অন্ত্যজ পরিবার।

সমরেশ বসুর 'আশ্চর্য প্রদীপ' গল্পের বিষয় হয়েছে, অর্থ-লাঞ্ছিত এক অন্ত্যজ পরিবারের খুশি ও আনন্দপ্রাপ্তির কাহিনী। মাত্র আট-দশ বছরের বালক রবীন্দ্রনাথ। তার মা পরের বাড়িতে

ঝি-গিরি করে। বাবা অলস-অকর্মা। মদ খেয়ে পড়ে থাকে ঘরের বাইরে। মদ খেলে মা, বাবাকে ঘরে যায়গা দেয় না, একথা বালক জানে। কিন্তু তাকে প্রত্যহ অনেকটা পথ হেঁটে বাবার জন্য মদ আনতে যেতে হয়। একদিন মদ নিয়ে ফেরার পথে সে দেখে পাশের গ্রাম তালতোড়ে শুটিং হচ্ছে। দীন-দরিদ্র বালক শুটিং দেখার জন্য টিন হাতেই শুটিং স্থলে হাজির হয়। সেখানে গিয়ে ঘটে আর এক কান্ড। শুটিং এর দৃশ্যে তাকেও অভিনয়ের জন্য পরিচালক মনোনীত করে। অভিনয় কিছু নয়। নায়ক একটা গরুর গাড়িতে শুয়ে গ্রামে ঢুকছে। রবীন্দ্রনাথকে ঐ গাড়ির পিছন ধরে ছুটে যেতে হবে। শুটিং শেষে তাকে দু'টাকা মজুরী দেওয়া হয়। টাকা নিয়ে বাড়ি আসতে গিয়ে বালক দেখে শুটিং দলের কেউ তার টিন থেকে সবটুকু মদ ফেলে দিয়েছে। তা দেখে ভীত হয় বালক। মদ না নিয়ে গেলে বাবা তাকে আস্ত রাখবে না। ফলে সে কাঁদতে থাকে। তাকে সান্ত্বনা দেওয়ার জন্য নায়ক তাকে দশটি টাকা দেয় সেই সাথে দেয় নিজের ব্যবহারের দামী সেন্টের শিশিটাও। বালক সেটা পেয়ে মহা খুশি। সে সেন্ট নিজের গায়ে মাখে। বাড়ি এসে তার মাকেও মাখায়। খুশিতে ভরে ওঠে সারা সংসার। যে সংসারে মদের ক্লিন্নতা ছড়ায়, সেখানে এই সেন্টের সুবাস একটি মুহূর্তের জন্যে হলেও আনন্দ এনে দেয় অন্ত্যজ পরিবারটিতে।

গ) অর্থ ও সমস্যাশ্রিত

সমরেশ বসুর অন্ত্যজ জীবন কাহিনী নিয়ে রচিত বেশ কিছু গল্পের বিষয় হয়েছে, অন্ত্যজ মানুষের আর্থিক সমস্যা ও সেই হেতু তাদের সাংসারিক বিপর্যয়ের কাহিনী। এই পর্যায়ের গল্পে দারিদ্রের বিরুদ্ধে অন্ত্যজ মানুষের সংগ্রাম মুখর জীবনকথাই মুখ্য স্থান দখল করেছে। সমরেশ বসুর এমন বিষয় ভিত্তিক দুটি গল্প হল 'এস্‌মাগ্‌লার' ও 'পাড়ি'।

'এস্‌মাগ্‌লার' গল্পের বিষয় হয়েছে, অর্থনৈতিক টাপাপোড়েনে বিপর্যস্ত ও লাঞ্ছিত এক কিশোরের বেঁচে থাকার লড়াই ও অত্যাচার লাঞ্ছনা প্রপ্তির কাহিনী। কিশোর গৌরাঙ্গ দাস ওরফে গোরাচাঁদ এস্‌মাগ্‌লারের কাঁধে ভর করে তার পরিবারের টিকে থাকার যন্ত্রণা ও যন্ত্রণা অতিক্রমী সংগ্রাম, এই গল্পে রূপ পেয়েছে। গোরাচাঁদের বাবা অকর্মণ্য। মা অনেকগুলো ছোট বাচ্চাকাচ্চা সমেত আবারও পোয়াতী। ফলে মাত্র তেরো-চোদ্দ বছর বয়সেই গৌরাঙ্গকে সংসারের দ্বায়িত্ব কাঁধে তুলে নিতে হয়। সে চালের চোরাচালানকারী। দূর মফঃস্বল শহর থেকে চাল বয়ে নিয়ে যায় অন্য অনেকের সঙ্গে। সে সেই চাল বেচে গঞ্জের হাটে। মাত্র পনের কিলো চাল বেচে যে লভ্যাংশ থাকে তাই-ই তাদের সংসার নির্বাহের মূল রসদ।

ট্রেনে হৈ-হুল্লোড় করতে করতে যায় তাদের দলটা। হাজারো লোকের লাথি-ঝাঁটা মাথায় নিয়েও তারা মহানন্দে যায়। একে অন্যের সঙ্গে রসিকতা করে। তবে সবদিন মসৃণ যায় না। যে কোন সময় নেমে আসে মোবাইল আর সিভিল সাপ্লাইয়ের বিপদ। ধরা পড়লে সব যাবে। প্রাণের থেকে অধিক মূল্যবান মূলধন যাবে। জেল হবে। তাই যে দিন মোবাইল চেক হয় সেদিন গোরা জীবনের ঝুঁকি নেয়। পনের কিলো চালের প্যাকেটটা বগলে ঝুলিয়ে চলন্ত ট্রেনের পাদানীতে ঝুলে

চাকার সামান্য উপরের রডে বসে লুকিয়ে থাকে। সামান্য অসাবধান হলে খেল খতম। কিন্তু এত করেও অন্য সকলের সঙ্গে গোরাচাঁদও ধরা পড়ে। সবার মতো তারও চাল কেড়ে নেয় চেকার। তার উপর উলঙ্গ করে বেত দিয়ে মেরে রক্তাক্ত করা হয় তাকে । এত অত্যাচার গোরা মুখ বুঁজে সহ্য করে। সে কাঁদে না। পাথর হয়ে সব সহ্য করে। সহ্য করে পাঁচ ভাইবোনসহ মা-বাবার আকাঙ্ক্ষিত অসহায় মুখগুলির কথা মনে রেখে:

"গোরার শূন্য চোখে ভাসছে, সে কারখানার রাবিসের জলার ধারে, অন্ধকার আকাশের তলায় দুটো দিশেহারা চোখের অসহ্য প্রতীক্ষা।" (এস্‌মাগ্‌লার : বসু সমরেশ)

–অর্থ-লাঞ্ছিত অন্ত্যজ জীবনের এ এক জীবন্ত ছবি। এ ছবি দাঁতে দাঁত চেপে অত্যাচার সহ্য করেও বেঁচে থাকার দ্যোতনা প্রকাশী ছবি।

সমরেশ বসুর দ্বিতীয় গল্প 'পাড়ি'। এই গল্পটিতে নট জাতের এক অর্থ-লাঞ্ছিত পরিবারের জীবন সংগ্রামের অনবদ্য কাহিনীকে বিষয় করে রচিত। দরিদ্র এক দম্পতি গ্রামের এক বাবু সাহেবের বাড়িতে শূকর চড়ানোর কাজ করে। লন্‌কু সর্দার বেশী অর্থ রোজগারের লোভ দেখিয়ে তাদেরকে শহরে এনে কাজ দেয়। কিন্তু মাত্র মাস দেড়েকের মধ্যেই তারা বেকার হয়ে পড়ে। পেটে দুদিনের ক্ষুধা নিয়ে তারা গঙ্গার ধারে পেটিয়ে পড়েছিল। এমন সময় এক শূকর ব্যবসায়ি শূকর পিছু এক আনা মজুরীর বিনিময়ে উনত্রিশটা শূকরকে গঙ্গা পার করিয়ে দিতে বলে। প্রস্তাব পাওয়া মাত্র শুধু পেটভরে খেতে পাওয়ার আশায় দুটিতে রাজি হয়। এর পর শুরু হল গঙ্গার বিরুদ্ধে একপাল শূকর নিয়ে বেঁচে থাকার লড়াই। ঘূর্ণি ঢেউ, গভীর নদী, বেগবান বাতাসের দাপট, ভয়ঙ্কর মেঘেদের ক্রূরতা – সমস্ত কিছুর বিরুদ্ধে তারা যুঝে চলে। শরীর অবসন্ন হয়ে আসে। তবু এক মুহূর্তের তরেও তারা পরাজয় মানে না। দু-গ্রাস অন্নের জন্য, দু'টো টাকার জন্যই তারা জয়ী হতে চায়। হয়ও। উনত্রিশটা শূকর সামনে নিয়ে পাশবিক লড়াই জিতে তারা পাড়ে ওঠে। মত্ত গঙ্গাকে পাড়ি দিয়ে তারা জীবনের পাড়ে পৌঁছায়। জীবন যুদ্ধের সুবিপুল প্রান্তর এভাবেই পাড়ি দেয় তারা। এভাবেই জেতে তারা। জেতার পর রক্তে রক্ত যোগ করে বাঁচার অভিব্যক্তিকে অনুভব করে :

"তার পরে দুজনে রক্তে রক্ত যোগ করে অনুভব করতে লাগল বাঁচাটা।"

(পাড়ি : বসু সমরেশ)

অথ- লাঞ্ছিত অন্ত্যজ জীবনের স্বতন্ত্র স্বরূপের পরিচয় দানে এ গল্প সার্থক।

সমরেশ বসুর এ পর্যায়ের গল্পগুলি বিশ্লেষণে দেখা যাচ্ছে, অন্ত্যজ জীবনের প্রায় সমস্ত মানুষেরাই অর্থ সংকটে পড়ে দারিদ্রের সঙ্গে সংগ্রাম করে বেঁচে আছে। সাধ ও সাধ্যের লড়াইতে তারা নিমগ্ন। সমরেশ বসু সে লড়াইয়ের চিত্রকে অনন্য-সাধারণভাবে ও রূপে তুলে ধরেছেন।

ঘ) চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যাশ্রিত

সাহিত্যে চরিত্র চিত্রণ একটি গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার। চরিত্র নির্মাণের নৈপুণ্যের উপর লেখকের সার্থকতা অনেকাংশেই নির্ভর করে। এই চরিত্র চিত্রণগত দিকের বিচারে বলা যায়, অন্ত্যজ জীবন

নির্ভর সমরেশ বসুর ছোট গল্পগুলি বাংলা ছোটগল্পের চরিত্র চিত্রশালাকে বহুল পরিমানে সমৃদ্ধ করেছে। বিচিত্র ধরণের অন্ত্যজ চরিত্র কখনো গল্পের কেন্দ্রে থেকে কখনো গল্পের পার্শ্ব চরিত্র রূপে অন্ত্যজ জীবনের আনন্দ-বেদনা-হাসি-কান্না-করুণা-মানসিকতা-সহানুভূতি-প্রতিবাদ-প্রতিরোধের চালচিত্রকে প্রস্ফুটিত করেছে। আলোচ্য পর্বের গল্পসমূহে প্রাপ্ত পুরুষ ও নারী চরিত্রের অধিকাংশই বৈশিষ্ট্যে উজ্জ্বল ও বৈচিত্র্যে আকর্ষণীয়। সমরেশ বসুর গল্পগুলি আলোচনা করলে উক্ত মন্তব্যের সত্যতা প্রকাশিত হবে।

পুরুষ চরিত্র

অন্ত্যজ জীবনাশ্রিত গল্পগুলিতে পুরুষ চরিত্র নির্মিতির ক্ষেত্রে দেখি, গল্পে চিত্রিত চরিত্রগুলি আত্ম মর্যাদায় আসীন। আত্ম মর্যাদা রক্ষার কারণে তারা প্রতিবাদী। তারা নিজেদের উপর নেমে আসা অত্যাচার-অবিচারের বিরুদ্ধে রুখে দাড়িয়ে নিজেদের প্রতিবাদী ও সংগ্রামী মনোভঙ্গির পরিচয় দিয়েছেন। আবার কেউবা প্রেমিক। এই পর্বের কিছু তাৎপর্যপূর্ণ চরিত্র হল 'পাড়ি' গল্পে নটজাতের পুরুষ, 'শানা বাউরির কথকতা' গল্পে শানা চরিত্র ও 'গুনিন' গল্পে নকুড় চরিত্র

সমরেশ বসুর 'পাড়ি' গল্পের নট জাতের পুরুষ লোকটি যেমন সংগ্রামী তেমনি প্রেমিক চরিত্রের। সে অর্থ লাঞ্ছিত নিষ্পেষিত সমাজের প্রতিভূ। বেঁচে থাকার সংগ্রামে সে কোন বাধাকে বাধা বলে মানে না। দু'দিন অভুক্ত থাকার পর সে শুধুমাত্র খাদ্য সংগ্রহের জন্য একপাল শূকর নিয়ে গঙ্গাতে নামে। গঙ্গার ঘূর্ণির স্রোতের বিরুদ্ধে লড়াই করে জেতে। ক্ষুধার্ত দেহ-মন নিয়েই খাদ্যের উৎস সন্ধানে ভয়ঙ্কর লড়াইতে সে হিংস্র পশুর মতোই হয়ে যায়। নদীতে ঘূর্ণি ঢেউয়ের সঙ্গে যখন সে বাঁচার লড়াই শুরু করে তখন তাকে মানুষ বলে মনে হয় না, পারাপারের জন্য যে শূকরের পালকে নিয়ে সে সাঁতার দিতে শুরু করেছিল তাদেরই একটি বলে মনে হয় তাকে :

"হঠাৎ পুরুষটি ঝাপটা দিয়ে মাথা তুলল। তার চেহারা শুয়রের চেয়েও ভয়ঙ্কর দেখাচ্ছে।"

(পাড়ি : বসু সমরেশ)

এক ভয়ঙ্কর খিদের সামনে যে তলিয়ে যাচ্ছিল, সেই ভয়ঙ্করতার বিরুদ্ধে সে ভয়ঙ্করভাবে ও রূপে লড়াইতে নেমেছে। এ লড়াইতে সে জিতেছে।

লোকটি শুধু যে সংগ্রামী মনোভঙ্গির তা নয়, সে প্রেমিকও। তার স্ত্রীকে সে প্রচন্ড রকম ভালোবাসে। গঙ্গা পারাপারের ফলে ঘূর্ণি স্রোতের মুখে স্ত্রীর খোঁজ নেওয়ার সময় তার মনোভঙ্গিতে যে উৎকন্ঠা ও উদ্বিগ্নতা দেখা গেছে তার মধ্যে তার এই ভালোবাসার যর্থার্থতা লুকিয়ে রয়েছে :

"কোথায় গেলি ?

এই যে।

না ডোবে নি। ... এতক্ষণে মেয়টাকে হারাবার ভয় হয়েছে।

বলল, কি তখলিফ হচ্ছে।" (পাড়ি : বসু সমরেশ)

-সংগ্রামী ও প্রেমিক এই পুরুষটি জীবনের তাপে-উত্তাপে গল্পকার সমরেশ বসুর অনন্য সৃষ্টি।

'শানা বাউরির কথকতা' গল্পের শানা প্রতিবাদী চরিত্র। অত্যাচারিত ও লাঞ্ছিত হতে হতে যখন তার পিঠ দেওয়ালে ঠেকে গেছে তখন শানা সমগ্র বাউরি সমাজের প্রতিনিধি হয়েই যেন উচ্চতর সমাজের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করে উঠেছে। এতদিনকার সামন্তবাদী জমিদারী ব্যবস্থায় শানাদের বেগার খেটে হদ্দ হতে হতো। তবে কালক্রমে বেগার খাটার প্রথা উঠে গেলেও তাদের ঘরের ইজ্জত লোটার কাজে মেতে উঠেছে বাবু সমাজ। শানাদের ঘরে বউ-ঝিদেরকে বেশ্যাবৃত্তিতে নামাচ্ছে উচ্চবংশীয় বাবু সমাজ। এ সমস্ত দেখে উচ্চবংশীয় রায়, বাড়ুজ্জে, গাঙ্গুলিদের উদ্দেশ্যে শানার নিরীহ কিন্তু প্রতিবাদী প্রশ্ন– 'জমীদারিটা উঠেছে পাপটা উঠেনি কেন?" –এই প্রশ্নের কোন উত্তর শানা পায় না। সে বারে বারে তাই এই প্রশ্ন করে যায়। হাজার বার তাকে চুপ করতে বললেও সে নীরব হয় না। বরং নিজের জীবনের সমস্ত ক্ষোভ ও ঘৃণা এবং প্রতিশোধাকাঙ্ক্ষাকে উগরে দিতে থাকে শানা। তার বউয়ের ইজ্জত নিয়ে খেলা করে যে কেদার মুখুজ্জে, তার উপর সমস্ত ক্ষোভ প্রকাশ করে সে :

এক) "কিন্তুক ক্যাদারটো তবে মরবেক শানা বাউরির হাতে, আপনকারা বুঝেনা। হঁ...।"

দুই) "তার পর হঠাৎ গলাটা কেমন হিংস্র হয়ে ওঠে শানার, আপনকারা এত বলি দিলেন মার থানে, ক্যাদার পাহাঁকে বলি দিলেন কেনে না?" (শানা বাউরির কথকতা : বসু সমরেশ)

দেড়শো বছর ধরে উচ্চবংশীয়রা দমিয়ে রেখেছে শানাদের। শানা সেই দমন ভেঙে প্রতিবাদ করে উঠেছে। গল্পকার সমরেশ বসু এখানেই শানাকে স্বতন্ত্র করেছেন।

'গুনিন' গল্পের নকুড় দিগড় এক প্রেমোন্মত্ত চরিত্র। পেশাতে সে গুনিন হলেও প্রেমিকা নারীকে না পাওয়ার জন্য উন্মাদ হয়ে গেছে। কান্ত দিগড়ের মেয়ে হরিমতীকে না পেয়ে সে একদিন গৃহছাড়া হয়েছিল। আট বছর পরে গৃহে ফিরে এসে হরিমতীকে দেখে, নকুড় পুরাতন বাল্য প্রেমে আবারও উন্মত্ত হয়ে পড়ে। এই প্রেমোন্মত্ততার এমনই শক্তি যে সে নিজের জীবনটাকে বলি দিল তার জন্য।

প্রেমের উন্মত্ত গতি যে একটি জীবনকে বিপর্যয় ও বিনষ্টির অতল প্রেমের গহ্বরে নিমজ্জিত করে দেয়, উন্মত্ত প্রেম যে মানুষকে হিতাহিত জ্ঞানশূন্য করে দেয় তার প্রমাণ নকুড় দিগড়। গৃহত্যাগী হওয়ার আট বছর পর গৃহে ফিরে সে নতুন করে স্থায়ী জীবন শুরু করার মনস্থ করেছিল। কিন্তু তার পুরাতন প্রেমিকা, বর্তমানে বিধবা-যুবতী হরিমতী তার সমস্ত চিন্তার মর্মমূলে কুঠারাঘাত হানল। হরিমতীকে দেখে বিপর্যস্ত হল নকুড়। রহস্যময়ী নারীর আবরণে মোড়া হরিমতী তাকে পাগল করল :

"ঠান্ডা হয় না হরিমতী। হায়, সে গুনিনি কি না কে জানে, কিন্তু সে গুণ করেছে গুনিনকে। কাজে ভুল, মন্তরে ভুল, সব গোলমাল হয়ে যায়।" (গুনিন : বসু সমরেশ)

আসলে রহস্যময়ী নারীর ছলনার কাছে বিপর্যস্ত হয়েছে উন্মত্ত প্রেমিক নকুড়। হরিমতীও যে নকুড়ের মতো প্রবলভাবে নকুড়কে চায় একথা নকুড় বুঝতেই পারেনি। হরিমতী আভাসে-ইঙ্গিতে নকুড়কে তার মনের কথা জানিয়েছে। কিন্তু নকুড় সে ইঙ্গিত বুঝতে না পারলে হরিমতী নকুড়ের

কাছে রঙ্গ করে বলেছে, নকুড় যেন হরিমতীকে বশীকরণ মন্ত্র শিখিয়ে দেয়, যার দ্বারা সে তার প্রেমিককে বশ করতে পারে। হরিমতীর এই রঙ্গকে ভূল বোঝার ফলে নকুড়ের সবকিছু ওলট পালট হয়ে যায়:

"সব –সমস্ত কিছু গোলমাল হয়ে গেছে নকুড়ের, ছিঁড়ে গেছে মনের সব আটঘাট। কিছুক্ষণ সে কথা বলতে পারলনা। তার চোখে হঠাৎ রক্ত উঠে এসেছে, দপ্ দপ্ করছে মাথার শিরাগুলি।"

(গুনিন : বসু সমরেশ)

–এই ভুলের জন্য প্রেমোন্মত্ত নকুড়ের জীবনে নেমে এল ট্রাজেডি। তুক-তাক-মন্তর-তন্তর করে হরিমতীকে লাভ করার উদ্দেশ্যে বিচিত্র আচার-বিশ্বাসের রূপায়ণ ঘটাতে গিয়ে দিঘির জলে ডুবে মারা গেল নকুড়। পিছনে পড়ে থাকলো তার অতৃপ্ত প্রেমোন্মত্ত আত্মার হাহাকার।

নারী চরিত্র

সমরেশ বসুর অন্ত্যজ জীবনাশ্রিত ছোটগল্পে চিত্রিত বেশকিছু নারী চরিত্র সরল, সাধাসিধে ভালমানুষ। মানবিকতা ও সততার গুণে এই শ্রেণীর চরিত্রগুলি অন্ত্যজ জীবনে নবলেখা হয়েছে। আবার কেউবা প্রেমিকা নারী। তারা তাদের প্রেম মনস্তত্ত্বের প্রকাশে ও প্রেমিকা সত্তার উন্মেষণে জীবন্ত। প্রেমের ত্যাগ-তিতিক্ষায় তারা প্রাণবন্ত। এই ধরণের গল্পগুলি হল –'প্রত্যাবর্তন' ও 'শেষ মেলায়' গল্পদ্বয়।

'প্রত্যাবর্তন' গল্পের কিশোরী এক নাপিত কন্যা বাসন্তী ওরফে বাসি চরিত্রটি সৎ, মানবিক ও ভালমানুষ। সে দ্বান্দ্বিক চরিত্র। দ্বান্দ্বিকতার টানাপোড়েনে জীবন্ত বাসি গল্পকারের অনবদ্য সৃষ্টি। তার চরিত্রে দ্বন্দ্ব এসেছে তার দ্বিবিধ বৈশিষ্ট্যের টানাপোড়েনকে আশ্রয় করে। যেমন–

বাসন্তী ওরফে বাসি = ১. একদিকে গৃহীসত্তা। ঘরের প্রতি ও ঘরের আত্মীয়দের প্রতি মানবিক দায়িত্ব ও ভালবাসা।

২. অন্যদিকে তার ব্যক্তি সুখ ও ব্যক্তি প্রেম। প্রেম ও প্রেমাস্পদের প্রতি তার অদম্য আকর্ষণ।

–এই দ্বিমুখী আকর্ষণ বাসিকে দ্বান্দ্বিক করেছে। শেষ পর্যন্ত তার গৃহী সত্তা জয়ী হয়েছে এই টানাপোড়েনে ও দ্বান্দ্বিকতার চূড়ান্তে পৌঁছানোর পরেই বলা যায় বাসি ওরফে বাসন্তী চরিত্রটি আত্মত্যাগে উদ্বুদ্ধ এবং গৃহী সত্তায় ভাস্বর নারী চরিত্র। নিজ সুখ-শান্তি ও প্রেমাস্পদের সঙ্গ ছেড়ে সে অনায়াসে নিজেদের অনাহারক্লিষ্ট নিত্য অশান্তির গৃহের টানেই সংসারে থেকে গেছে। বাসি তাই পুরোদস্তুর গৃহী নারী। অন্ত্যজ মানুষ ঠান্ডারাম নাপিতের সংসারে নিত্য ঝগড়া ও মারামারি লেগে থাকতো শক্ত হাতে হাল ধরে হৃদয়-বেদনার অব্যক্ত নিবেদন ও আকুতিতে, সে নিজেদের সংসারের ঝগড়া থামানোর মতো অসাধ্য সাধন করেছে। ছিন্ন হয়ে যাওয়া ভেঙে পড়া এক সংসার নতুন করে বেঁচে ওঠে বাসিকে কেন্দ্র করে। সন্ধ্যাতে কাজ ছেড়ে ফিরে সবাই তার হাতেই টাকা তুলে দেয়। সুখের পরশে ও আবহে চলে তাদের সংসার। বাসি তৃপ্ত হয়। কিন্তু পরক্ষণেই গভীর দ্বন্দ্বে পড়ে

বাসি। প্রেমে পড়ে সে। প্রেমিক পবন তাকে নিয়ে আলাদা ঘর বাঁধতে চায়। বাসির মনেও তার দোলা লাগে। আর এই সূত্রে তার মনে দ্বন্দ্বেরও প্রকাশ ঘটে। একদিকে তার নবগঠিত সংসার, তার শান্তি, অন্যদিকে প্রেমাস্পদের আহ্বান, সুখ। দুইয়ের দ্বন্দ্বে চরিত্র আবর্তে পড়ে। এবং শেষ পর্যন্ত সমস্ত দ্বন্দ্বকে অতিক্রম করে সে তার গৃহকে বেছে নিয়েছে।

এখানেই বাসি অন্ত্যজ নারী চরিত্রগুলির মধ্যে স্বতন্ত্র হয়ে পড়ে। তার ট্রাজেডি মর্মস্পর্শী হয়। গল্পকার সমরেশ বসু বাসি চরিত্র-সৃজনে অনবদ্য শিল্প মহিমার ছাপ রেখেছেন।

আবার সমরেশ বসুর 'শেষ মেলায়' গল্পের কামার কন্যা সুভদ্রা প্রেমিকা নারী। গৃহী নারী। সন্তান ও সংসারের প্রতি তার অদম্য টান। সে বিধবা। তবুও মেলায় মেলায় পসরা সাজিয়ে ঘোরা মোহন চিত্রকরের সঙ্গে হৃদয়ের টানে একাকার হতে চায় সে। সুখ শান্তির একটা সংসার ও গণেশ ঠাকুরের মতো একটা ছেলের স্বপ্ন মোহন চিত্রকর দেখিয়েছে তাকে। সুভদ্রা সেই স্বপ্ন পূরণের জন্য, শুধুমাত্র মোহনের সাথে দেখা করার জন্য এক মোলা থেকে আর এক মোলায় সারাটা বছর ঘুরে ঘুরে বেড়ায়। মোহন তাকে আশ্বাস দেয়। আশার কথা শোনায়। কিন্তু এত আশা, এত আশ্বাস সব শেষ হয়ে যায়। দুর্ভিক্ষের করাল থাবা সমস্ত কিছু ভেঙে চুরমার করে দেয়। ব্যর্থতার হাহাকারে নিঃশেষিত হয় এক প্রেমময়ী নারীর জীবনের সমস্ত সাধ-আহ্লাদ, আশা-আকাঙ্ক্ষা। অতৃপ্তির হাহাকারে চরম ট্রাজেডির অতল তলে তলিয়ে যায় সুভদ্রা। মাটি মায়ের উপর সে আছড়ে পড়ে –তীব্র যন্ত্রণার সাথে তার আশাভঙ্গের কথা জানায়। ধরিত্রী মাতৃকার বিরুদ্ধে সে সকাতরে অভিযোগ করে :

"নির্জন মেলায় উত্তপ্ত মাটিতে ভেঙে পড়ল সুভদ্রা : আমার ভিটে, সম্‌সার, গণেশ ঠাকুরের প্যাড়া ছ্যালে খেয়ে লিছিস তু মা ধরিত্তি।" (শেষ মেলায় : বসু সমরেশ)

এ যেন প্রেমময়ীর প্রেম ব্যর্থ সুভদ্রার প্রতিবাদ। গৃহ-আকাঙ্ক্ষী নারীর জীবন উজাড় করা হাহাকার। ভেঙে পড়ার বিরুদ্ধে চরমভাবে ভেঙে পড়েই যেন প্রতিবাদ ধ্বণিত হয়েছে সুভদ্রার এই হাহাকারের মধ্যে দিয়ে।

ঙ) পটভূমি ভিত্তিক

সাহিত্যের যে কোন বিভাগের ক্ষেত্রে পটভূমি রচনা সবিশেষ গুরুত্ব বহন করে। বিশেষ করে গদ্য সাহিত্যের ক্ষেত্রে সুনিপুণ পটভূমি রচনা সাহিত্যিকের সৃজন-দক্ষতার পরিচয়টিকে উন্মোচিত করে বলেই মনে হয়। গল্প কিংবা উপন্যাসের ক্ষেত্রে একথা অবিসংবাদিতভাবে সত্য। পরিবেশ-পটভূমি সুদৃঢ় ভিত্তির উপর ভর করে গল্প-উপন্যাসের বুননটি সুবিকশিত হয়ে ওঠে। গল্প উপন্যাসের বিশেষ বিশেষ বিষয়বস্তু স্বতন্ত্র পরিবেশ রচনার দাবী করে। পটভূমি রচনার এই সতন্ত্র দাবী সাহিত্য রচনার কলা কৌশলের আভ্যন্তরীণ ব্যাপার। ভিতর থেকে গল্পের পটভূমির পরিবেশ ও গল্পের বিষয়বস্তু পরস্পর সহাবস্থানে এককেন্দ্রিক হয়ে গড়ে ওঠে। তেমনটি না ঘটলে গল্প গঠনে গতি আসে না –গল্প শিল্প-সার্থকতার ক্ষেত্রে মার খায়। তাই কথা সাহিত্যিকরা গল্প বিষয়ের নির্মাণের সাথে সাথে গল্পের পটভূমিকে সমান গুরুত্বে মজবুত করে তোলেন। এর ফলে গল্পগুলি শিল্পগত

ঐক্যে প্রস্ফুটিত হয়। সমরেশ বসুর অন্ত্যজ জীবনাশ্রিত গল্পগুলি এই সত্যের পরিচয় বহন করে শিল্প সফলতা পেয়েছে।

অন্ত্যজ জীবনের গল্পে পটভূমির গুরুত্ব যেমন অনেকখানি, বৈচিত্র্যও তেমনি যথেষ্ট। আলোচনার সুবিধার জন্য অন্ত্যজ জীবন নির্ভর গল্পগুলির পটভূমিকে দুটি ভাগে ভাগ করে আলোচনা করবো। যেমন– গ্রাম কেন্দ্রিক পটভূমি ও নগর কেন্দ্রিক পটভূমি।

গ্রামকেন্দ্রিক পটভূমি

সমরেশ বসুর 'শেষ মেলায়' গল্পের বিষয় হয়েছে ভিন্ন ভিন্ন গ্রামের মেলা। পলাশপুরের মেলা থেকে শুরু করে তার পর একে একে এসে গল্পের শেষ। কোপগড়ের মেলায় মোহন-সুভদ্রার প্রতিষ্ঠা–আশার শুরু। পরবর্তী কোপগড়ের মেলায় সব শেষ। দুর্ভিক্ষ এসে গ্রাস করে নিয়েছে সব। মেলা মানুষের ক্ষণিক মিলনের তৃপ্তি দেয়। চিরস্থায়ী সুখ ও শান্তির বাতাবরণ মেলা এনে দেয় না। গল্পে দেখি, মেলাতে পরিচিত হওয়া দুই নরনারী চিরস্থায়ী গৃহকোণ রচনায় প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়েও ব্যর্থ হয়েছে। দুর্ভিক্ষ এসে সব লন্ড ভন্ড করে দিয়েছে। অর্থাৎ দেখা যাচ্ছে, মেলা কেন্দ্রিক পটভূমির সঙ্গে সঙ্গতি রেখেই বিষয়বস্তুর সত্যতা প্রকাশিত হয়েছে। অর্থাৎ, পটভূমি এই গল্পে রসময় সার্থকতা পেয়েছে একথা নিঃসন্দেহে বলা যায়।

'গুনিন' গল্পের পটভূমি গ্রাম কেন্দ্রিক। বেনাপুর ও পানদিঘি গাঁয়ের গোরস্থান ও গ্রাম গল্পের পটভূমি হয়েছ। গোরস্থানের হাড়, কবর প্রভৃতি যে বীভৎসতা ও ভয়ঙ্করতা ফুটিয়ে তোলে, গল্পের নায়ক চরিত্র গুনিন নকুড়ের মনোভঙ্গির সঙ্গে ও পরিণতির সঙ্গে তা মানানসই হয়েছে। তাই গল্পের পটভুমি এক্ষেত্রে শিল্প সার্থক হয়েছে।

সমরেশ বসুর 'অকাল বৃষ্টি' গল্পের পটভূমি গ্রাম্য শ্মশান। শ্মশানের বীভৎসতা, নিষ্ঠুরতা, গল্পের প্রেক্ষিতে খুব সুন্দরভাবে এসেছে। যদিও গল্প বিষয়ের সঙ্গে এই শ্মশান পটভূমির দৃঢ় যোগ রয়েছে। গল্পের তিন প্রধান পাত্র-পাত্রী শ্মশানে তাদের জীবন কাটায়। সিধু ডোম ও সুলোচনা শ্মশানের বটগাছের নিচেকার চালাঘরে থাকে। গল্পে দেখি, সিধু ডোমের জীবনে রসময় উপস্থিতি নিয়ে এসেছিল সুলোচনা। সেই সুলোচনা মারা গেছে। সিধুর জীবনে শ্মশান নেমেছে। গল্প বিষয়ের সঙ্গে এখানে পটভূমি পরিপূরক সম্পর্কে আবদ্ধ যেন।

উক্ত গল্পগুলির অধিকাংশেরই পটভূমি গ্রামবাংলা, গ্রাম্য পরিবেশ –পরিবেশ এইসব গল্পের ক্ষেত্রে বিষয় নির্মাণে ও চরিত্র সৃজনে বিশেষ ভূমিকা নিয়েছে। কোন গল্পে গ্রাম্য বাড়িঘর-নদী-দিঘি গল্পের পটভূমি হিসাবে ব্যবহৃত হয়ে গল্পের বিষয় ও চরিত্রের পুষ্টি দান করে সার্থক হয়েছে।

নগর কেন্দ্রিক পটভূমি

সমরেশ বসুর অন্ত্যজ জীবনাশ্রিত গল্পগুলির পটভূমি বিশ্লেষণে দেখি, গ্রাম কেন্দ্রিক পটভূমিকা যুক্ত গল্পের তুলনায় নগর কেন্দ্রিক পটভূমিবিশিষ্ট গল্পের সংখ্যা তুলনায় অনেক কম। নগর কেন্দ্রিক

পটভূমিকাযুক্ত 'পাড়ি' গল্পের পটভূমি হয়েছে শহরের উপকন্ঠে অবস্থিত গঙ্গানদী –তার উত্তাল স্রোতের ঘূর্ণি :

এক) "আষাঢ়ের গঙ্গা। অম্বুবাচির পর রক্ত ঢল নেমেছে তার বুকে। মেয়ে গঙ্গা মা হয়েছে। ভারী হয়েছে, বাড় লেগেছে, টান বেড়েছে, দুলছে, নাচছে, আছড়ে পড়ছে। স্রোত সর্পিল হচ্ছে।"

দুই) "স্রোত আরো বাড়ছে। জল ছুঁতে চাইছে আকাশকে, আকাশ জলকে। জল ঝাপটা দিচ্ছে তলে। তলে তলে, ঠ্যাঙে, পেটে, বুকে। স্রোতের চরিত্র আবার বদলেছে।"

(পাড়ি : বসু সমরেশ)

পটভূমির এই ঘূর্ণিরূপ গল্পের ভাবসত্যের সঙ্গে সঙ্গতি রেখেই চিত্রিত। কেননা, গল্পে দেখি, দুই ক্ষুধার্ত নরনারীর জীবন সংগ্রামের তীব্রতা চিত্রিত। হাজার ঘূর্ণি ও মাতনকে অতিক্রম করে তারা জীবনে বেঁচে থাকার তীরে পাড়ি দিয়েছে। দু'দিনের অভুক্ত তারা, উত্তাল গঙ্গা পার হয়ে তারা খাদ্যের মুখ দেখেছে। জীবন সংগ্রামের তীব্রতা গল্পের বিষয়। পটভূমি তারই পুষ্টি দিয়েছে।

সমরেশ বসুর অন্ত্যজ জীবনাশ্রিত গল্পগুলির পটভূমি বৈচিত্র্যের বিশ্লেষণের শেষে আমরা একথা নিংসন্দেহে বলতে পারি তিনি অন্ত্যজ মানুষের জীবনচর্যা-জীবনবৈশিষ্ট্য এবং মনোভঙ্গির সঙ্গে সঙ্গতি রেখেই গল্পের পটভূমি রচনায় নিমগ্ন হয়েছেন। একাজে তার শিল্প দক্ষতা নিয়ে কোন রকমের প্রশ্ন তোলা যায় না। কি নগর কেন্দ্রিক কি গ্রাম কেন্দ্রিক –উভয় প্রকার পটভূমি রচনায় তিনি বাস্তব জ্ঞানের পরিচয় রেখেছেন। গল্প বিষয়ের সঙ্গে সঙ্গতি রেখেই পটভূমি নির্বাচন করেছেন।

চ) আর্থ-সমাজাশ্রিত

যে কোন সমাজ-গোষ্ঠীর মানুষের জীবনচর্যার পূর্নাঙ্গ রূপ-চিত্রাঙ্কনে বসে আর্থ-সামাজিক অবস্থার বিচার-বিশ্লেষণ সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকাটি গ্রহণ করে। সেই সমাজের বিশেষ আচার ক্রিয়া সমাজ-প্রথা, সংস্কার-কুসংস্কার, তাদের খাদ্য-বস্ত্র-বাসস্থান এবং তাদের জীবন-জীবিকা-অর্থনীতিক অবস্থা সমগ্র জাতি-সম্প্রদায়কে অন্যান্যদের থেকে পৃথক করে রাখে। তাই বিশেষ সমাজ-গোষ্ঠীর চাল-চিত্রাঙ্কণে আর্থ-সমাজিক অবস্থার আলোচনা সবিশেষ গুরুত্বের দাবি রাখে। সমরেশ বসু অন্ত্যজ জীবনাশ্রিত ছোট গল্পগুলিতে অন্ত্যজ জীবনের রূপ-চিত্রাঙ্কনে বসে তিনি বাস্তব সম্মত দৃষ্টিভঙ্গি ও পর্যবেক্ষণশীলতার সঙ্গে অন্ত্যজ-সমাজের বাস্তব চিত্রকে ফুটিয়ে তুলেছেন –তাঁর গল্পগুলি আলোচনা করলেই উক্ত মন্ত্যব্যের সত্যতা বুঝতে পারবো।

সমরেশ বসুর 'প্রত্যাবর্তন' গল্পে এক নাপিত পরিবারের বিভিন্ন সদস্য ভিন্ন ভিন্ন পেশাকে জীবিকা হিসাবে গ্রহণ করেছে। কেউ খুলেছে সেলুন, কেউ রিক্সা চালায়, কেউ কারখানার মিস্ত্রি, কেউ ঠিকে ঝিয়ের কাজ করে, কেউবা ঘুঁটে কুড়নি। বাড়ির কর্তা ঠান্ডারাম ও গিন্নি সুকি যথাক্রমে সেলুনের ও ঠিকে ঝিয়ের কাজ করে পয়সা রোজগার করে:

এক) "ঠান্ডারাম একটা সেলুনে কাজ করে, ওটা তার জাত-ব্যবসা।"

দুই) "সুকুমারী করে ঠিকে ঝিয়ের কাজ করে।" (প্রত্যাবর্তন : বসু সমরেশ)

এই গল্পে অন্ত্যজ মানুষের জীবিকার পরিচয় থেকে একটা ব্যাপার স্পষ্ট হয় যে সকলের সম্মিলিত চেষ্টায় একটা সংসার চলছে।

সমরেশ বসুর 'শানা বাউরির কথকতা' গল্পে শানা বাউরি গরুরগাড়ি চালিয়ে, যাত্রী বয়ে জীবিকা চালায়। প্রয়োজনে সে মুটে-মজুরী খেটেও প্রয়োজনীয় পয়সা আয় করে। গল্পে দেখি, সুন্দর রায়ের বাক্স প্যাটরা বয়ে বাসস্ট্যান্ডে নিয়ে গেছে মাত্র চার আনা পয়সার বিনিময়ে :

এক) "সুন্দর বললেন, আরে আমাকে জামসেদপুর যেতে হবেক নাই ? শানার জবাব এল গাড়ির তলা থেকে, এক্কা নাই, গাড়ি টানবে কে ? কুথা গেল ? কুন শালা লিয়ে গেলছে। তবে মোটর বাসে তুলে দিয়ে আসবি চ। মালটা লিতে হবেক।"

দুই) "শানা সুন্দর রায়ের উঠোনে এসে দেখল, এক গরুর গাড়ির মাল। কোনো কথা না বলে, মাথায় ট্রাঙ্ক আর বিছানা নিল, দু-হাতে নিল সুটকেশ, আর বড় একটা পুটুলি।"

(শানা বাউরির কথকতা : বসু সমরেশ)

অন্ত্যজ মানুষের খাটুনির এ যেন চরম অবস্থার রূপায়ণ। যে মাল বইতে একটা গরুর গাড়ি লাগে, তা একা শানা বয়ে দেয় –শুধুমাত্র অর্থ উপার্জনের কারণে। অন্ত্যজ মানুষের অর্থনৈতিক অবস্থা কতটা সঙ্গিন, এই ঘটনায় তার প্রমাণ মেলে।

সমরেশ বসুর 'শেষ মেলায়' গল্পের মোহন চিত্রকরের জীবিকা বিচিত্র। সে বিভিন্ন মেলাতে মাটির হাড়ি সরার উপর পটের ছবি এঁকে বিক্রি করে :

"গোলা খড়ি মাটির পোঁচ দেওয়া মাটির হাড়ি আর বাসনগুলোকে একাগ্রচিত্তে রঙিন তুলির চিত্রাঙ্কন করে চলেছিল মোহন, জৌলুস বাড়াবার খাতিরে সামনে মাদুর পেতে ছড়িয়ে রেখেছিল –কিছু রঙিন কাঁচের চুড়ি।" (শেষ মোলায় : বসু সমরেশ)

পলাশপুর, কোপগড়, জয়পুর বিভিন্ন মোলাতে মেলাতে সারা বছর পটের পসরা সাজিয়ে বেড়ায় মোহন। এটাই তার জীবনধারণের পথ :

"আগামী কালের কাজ সারছে মোহন –ছড়ানো চুড়ি আর আঁকাজোকা মাটির বাসনের মাঝখানে। মাঝে মাঝে খদ্দেরের সঙ্গে কথা বলছে, জিনিস দিচ্ছে আর কোলের হাড়ি নিয়ে ঝুঁকে পড়েছে তুলি নিয়ে।" (শেষ মেলায় : বসু সমরেশ)

–রঙ-তুলির শিল্পী মোহনের জীবিকা অন্ত্যজ জীবনের বিরল ব্যতিক্রমী জীবিকা।

ছ) সমাজ বৈষম্যমূলক

অন্ত্যজ মানুষের আর্থ-সামাজিক পরিচয় উদ্‌ঘাটনে নিমগ্ন হয়ে একথা প্রথমেই বলতে হয়, অন্ত্যজদের সামাজিক অস্তিত্ব প্রতিকারহীন অত্যাচার-লাঞ্ছনা প্রাপ্তিতেই মুখর। মানুষের সমাজে মানুষ হয়ে বেঁচে থাকার অধিকার তাদের নেই। সেই অধিকার কেড়ে নিয়েছে এই সমাজেরই উচ্চবিত্ত ও উচ্চবর্ণের মানুষেরা। তাই অসহায়, দরিদ্র –নিচের তলার অন্ত্যজ মানুষের সামাজিক ইতিহাস শুধুমাত্র অত্যাচার-বঞ্চনা-লাঞ্ছনা-নিপীড়ন-শোষণে ভরা ইতিহাস। উচ্চবিত্ত ও উচ্চবর্ণের

মানুষের সুকৌশলী ও সুবিধাবাদী সমাজিক বিন্যাসের চাপে সর্বহারা অন্ত্যজ মানুষেরা চিরকাল ধরেই বঞ্চিত-লাঞ্ছিত হয়ে আসছে। কখনও অন্ত্যজ মানুষ অর্থনৈতিক শোষণের শিকার, কখনো তারা সামাজিক দিক দিয়ে অবহেলিত, কখনও আবার তারা শারীরিক দিক দিয়ে রীতিমতো অত্যাচারিত ও লাঞ্ছিত হয়েছে। সমরেশ বসুর গল্প আলোচনা করলে এর সত্যতা প্রমাণিত হবে।

সমরেশ বসুর 'এস্‌মাগ্‌লার' গল্পে দেখি, অন্ত্যজ মানুষ উঁচুতলার ভদ্র মানুষের কাছে শারীরিকভাবে লাঞ্ছিত হয়েছে। চালের যে বে-আইনী পাচারকারী শিশু গোরাচাঁদ ট্রেনের একজন যাত্রীর কাছে প্রচন্ড মার খেয়েছে:

"আর শালা বলেছিল যে লোকটা, সে একেবারে ঝাঁপিয়ে পড়ল এসে গোরার উপর। চলল কিল,চড়, লাথি, ঘুষি আর গালাগালি।" (এস্‌মাগ্‌লার : বসু সমরেশ)

প্রতিকার-প্রতিবাদহীন এমন অত্যাচার-বৈষম্যপ্রাপ্তি যেন অন্ত্যজ জীবনের ক্ষেত্রে সতঃসিদ্ধ ঘটনা।

জ) বিশ্বাস-সংস্কার ভিত্তিক

সামাজিক আচার-সংস্কার-বিশ্বাস-প্রথার মধ্য দিয়ে কোনো বিশেষ জাতির আভ্যন্তর ও বাইরের গঠনটি বিশিষ্ট হয়ে ওঠে। সমাজের বিশ্বাস-সংস্কারের চিত্রণের মাধ্যমে সে জাতির মানস গঠনটিও সুস্পষ্টরূপে প্রস্ফুট হয়। সমরেশ বসুর অন্ত্যজ জীবনাশ্রিত ছোটগল্পে অন্ত্যজ জীবনের বিশ্বাস-সংস্কার-আচার-প্রথার যে চিত্র রয়েছে তা থেকে স্পষ্টরূপে সিদ্ধান্ত করা যায় যে, অন্ধ আচার-সংস্কারে অন্ত্যজ মানুষ আষ্টে পৃষ্ঠে বাঁধা থাকে। শিক্ষা দীক্ষার অলোক বিহীন অন্ত্যজ মানুষ যুক্তি বুদ্ধির তোয়াক্কা না করে আধা-ভৌতিক ও অলৌকিক বিশ্বাসে মগ্ন থাকে। কতই না বিচিত্র আচার-প্রথা পালন করে অন্ত্যজ মানুষেরা। সমরেশ বসুর গল্প বিশ্লেষণে অন্ত্যজ জীবনে বিশ্বাস-সংস্কারের যে রূপরেখা পাব তার স্বরূপ উদ্‌ঘাটনের চেষ্টা করবো।

দিগড় সম্প্রদায়ের মানুষের বিচিত্র আচার-বিশ্বাস ও অন্ধসংস্কারের পরিচয় লভ্য। গুনিন নকুড় দিগড় –দিগড় পাড়ার বহুবিধ সমস্যার সম্মুখীন হয়ে নানান তুক-তাকে নিদান দেয় :

"সে কাউকে মাদুলী দেয়, জল পড়া দেয়। তবু রোগের ঝামেলার চেয়েও বেশি আসে সব অন্য ফিকিরে। বলে বশীকরণ শিখিয়ে দাও।"

(গুনিন : বসু সমরেশ)

প্রিয় মানুষ অথবা নারীকে পাওয়ার জন্য দলে দলে সবাই তুক-তাকের আশ্রয় নেয়। বিধান দেয় নকুড়। ত্রিস্তর ধাপের বিধান। প্রথম স্তরে দেয় পেতলের বাটিতে একটু তেল পড়া। তাতে না হলে সিঁদুর পড়া দেয়। সবশেষে মোক্ষম ব্যবস্থা, গভীর অমাবস্যার রাতে কবরে হাড় তুলে তাকে মন্ত্র পড়ে দেওয়া :

এক) "গুনিন গম্ভীর হয়ে ব্যবস্থা দেয়, পেথমে ছোট পেতলের বাটিতে একটু তেল নেবে। সে তেল আমি দেব, গুণ তেল। নেয়ে শুদ্ধ হয়ে না খেয়ে ভোর বেলা পূবমুখে বসবে। সামনে তেল

রেখে সূর্যের দিকে চেয়ে একহাজার আটবার এই বলবে।"

এর পর নকুড় মন্ত্র বলে দেয় :

"শিব ঠাকুরের পাথর ঘষে,
গৌরী ছোটে কৈলাসে।
বাঁশি বাজায় কেষ্ট বসে;
আয়ানের বউ ছুটে আসে।
আমি ভূতের মাথার ঘিলু নিয়ে,
ছিটা দিলাম অমুকের গায়ে।"

(গুনিন : বসু সমরেশ)

অমুক মানে বশীকরণের লক্ষ্য তাকে এই তেলে ছিটা দিলে বশ অবধারিত।

দুই) "শুধু তেল নয়, কাউকে কাউকে সে সিঁদুর দেয়। সে সিঁদুরটি দেখলেই জন্ম শত্রুও নাকি বশ মানবে।"

তিন) " যখন কোন কিছুতেই হয় না, তখন নকুড় শেষ ব্যবস্থার কথা বলে। বলে অমাবস্যার দিন মাঝ রাতে মাটি খুড়ে মানুষের হাড় তুলতে হবে। ... গায় কিন্তুন বস্তুর থাকবে না। যেমনি হাড় তুলবে, অমনি একদমে ছুটে গিয়ে হাড়শুদ্ধ জলে ডুব দিয়ে উঠবে। খবরদার দম ছেড় না, পেছন থেকে কতজনা ডাকবে, কিন্তুক ফিরে তাকাবে না, সাড়া দেবে না। সামনে কেউ দাড়ালে থুতু দিয়ে এগিয়ে যাবে। তার পর সে হাড় নে যদি একবার উঠতে পার সোজা চলে আসবে আমার কাছে। যা করবার আমি করবো।" (গুনিন : বসু সমরেশ)

অন্ত্যজ সমাজের এ এক অদ্ভুত আচার। বিশ্বাস-অবিশ্বাসের তোয়াক্কা না করে অন্ত্যজ মানুষেরা এমন সব অত্যাচার বিশ্বাসের অন্ধ ভক্ত হয়ে পড়ে।

সমরেশ বসুর অন্ত্যজ জীবনাশ্রিত গল্পগুলি পর্যালোচনা করার পর একথা অবশ্যই বলা যায় যে, সাধারণত এরা বঞ্চিত লাঞ্ছিত জীবন যাপন করে। উচ্চবিত্ত ও উচ্চবর্ণের মানুষের অত্যাচার অবিচারের শিকার তারা। তারা অধিকারহীন, স্বাধীকারহীন। যুগ যুগ ধরে প্রাপ্ত বঞ্চনা-শোষণ ও লাঞ্ছনা নীরবে সহ্য করে তারা। তাদের উপর উচ্চবর্ণের মানুষেরা যে নিষ্ঠুর অত্যাচার-লাঞ্ছনা চালায় তার বিরুদ্ধে সাধারণত কোন রকমের প্রতিবাদ-প্রতিরোধ তারা গড়ে তোলে না। এই ক্ষেত্রে সামাজিক ও রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের সাথে সাথে অন্ত্যজ মানুষের অধিকার বোধের সচেতনতা কিছুটা বৃদ্ধি পেয়েছে। সাঁওতাল বিদ্রোহ, তেভাগা আন্দোলন, নকশাল আন্দোলন প্রভৃতি সামাজিক আন্দোলন অন্ত্যজ মানুষের আর্থ-সামাজিক জীবনকে অনেকখানি পাল্টে দিয়েছে। ফলে কিছু কিছু ক্ষেত্রে অন্ত্যজ মানুষ অত্যাচার লাঞ্ছনার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ চেতনায় মুখর হতে চেয়েছে। তবে এই প্রতিবাদ-প্রতিরোধের চিত্র খুবই নগণ্য।

সমরেশ বসুর জীবনদৃষ্টির মধ্যে ছিল জীবনকে শ্রদ্ধা আর সহানুভূতির দৃষ্টিতে দেখার মন এবং তাকে সাহিত্যে রূপায়িত করার সাহস। মানুষের জীবন যত অধঃপাতিত, লজ্জিত হোক না

কেন, শেষ পর্যন্ত জীবনেরই জয় হবে; এই পরম আশ্বাস তাঁর অন্ত্যজ জীবনাশ্রিত গল্পগুলিতে ধ্বনিত। তাই তাঁর গল্প আমাদের ফিরে ফিরে পড়তে হয়। আর প্রতিপাঠেই বহুপল হীরকের মতো ঝলসে ওঠে জীবনের মুক্ত উজ্জ্বল নতুন রূপ। এখানেই তাঁর সাহিত্যের সার্থকতা।

সাত) সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ (১৯৩০)

১৯৩০ এর ১৪ই অক্টোবর মুর্শিদাবাদ জেলার খোশবাগপুর গ্রামে সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজের জন্ম। শিক্ষিত ও সম্ভ্রান্ত মধ্যবিত্ত পরিবারে বড় হয়েছিলেন তিনি। তাঁর সাহিত্য জীবনের শুরু কবিতা রচনার মধ্য দিয়ে। কিন্তু পঞ্চাশের দশকে তিনি গল্প-উপন্যাস লিখতে শুরু করেন। 'ভারতীয় গণনাট্য সংঘ' -এর সংযোগ গড়ে ওঠায় এই সময়ে তিনি উত্তর রাঢ়ের লোকনাট্য দল 'আলকাপ'-এর সঙ্গে নিবিড়ভাবে যুক্ত হন। ফলে নিচের তলার সাধারণ মানুষের জীবনের যথার্থ পরিচয়ে সমৃদ্ধ হয় তাঁর সৃষ্টিশীল মন। কবিতার পরিবর্তে গল্প-উপন্যাস লেখায় মনোনিবেশ করেন সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ।

তাঁর প্রথম প্রকাশিত উপন্যাস 'নীল ঘরে নটী' (১৯৬৬)। গল্প-উপন্যাস মিলিয়ে প্রায় দু'শোর বেশী গ্রন্থ রচনা করেছেন তিনি। তবে ছোট গল্প রচনায় তিনি স্ববৈশিষ্ট্যে সমুজ্জ্বল।

গল্প বিশেষত্ব

সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজের ছোটগল্পের প্রধান বিশেষত্ব জীবন সম্পর্কিত অনুভবের বিচিত্র, বিস্তৃত রূপায়ণ প্রকৃতি আর মানুষ এবং মানব নির্মিত সমাজে উদ্ভাসে দীপ্ত তাঁর রচনা। মানুষের নানা রূপ দেখেছেন তিনি, দেখেছেন তার লোভ, বাসনা, হিংস্রতা, আবার তারই মধ্যে মানবিকতার আশ্চর্য প্রকাশ।

রাঢ় বাংলার সীমান্তবর্তী এক বিশেষ অংশের গ্রামীণ প্রকৃতি আর নরনারীর জীবন বাস্তব হয়ে উঠেছে তঁ ার গল্পে। এখানে আছে বিশাল নদীর আদিম সৌন্দর্য। তারই সঙ্গে কালিমাঘন হয়ে উঠেছে। ভারত আর বাংলাদেশের সীমান্ত রয়েছে এই অঞ্চলে। ফলে চোরা চালান হয়ে উঠেছে জীবন বাঁচাবার অঙ্গ। আইন এখানে চলে না। সাধারণ মানুষ পায় না শ্রমের মূল্য। যেন বেঁচে থাকায় এখানে অধিকাংশ মানুষের কাছে একমাত্র সত্য। সভ্যতা এখানে মানব পকৃতির আদিম প্রকাশের কাছে পরাজিত। সভ্য সমাজের নিয়ম নীতি এখানে অর্থহীন হয়ে যায়। মানুষের টিকে থাকার রক্তাক্ত সংগ্রামের কাছে। এই বিশেষ অঞ্চলেই তিনি বড় হয়ে উঠেছেন। এবং এই অঞ্চল –বিশেষত্ব উপলব্ধি করেছেন গভীরভাবে। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যায় ১৩৮৩ (১৯৭৬) বঙ্গাব্দে 'দেশ' সাহিত্য সংখ্যায় মুদ্রিত এই অঞ্চলের মানুষ সম্পর্কে সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজের বিবৃতি। তার মতে এখানে মানুষের মনে আছে সভ্যতাপূর্ব কালের আদিম স্বাধীনতা। "প্রকৃতি সঞ্জাত এই স্বাধীনতার স্বাদ মানুষকে প্রেমিক করে আবার যোদ্ধাবেশধারী হত্যাকারীও করে। মানুষ তখন রাষ্ট্র ও অন্যের প্রভুত্ব অস্বীকার করে। সে তখন নিজেকে এমন এক বিশ্বের বাসিন্দা করে সেখানে রাষ্ট্র নেই, আইন নেই, সমাজ

নেই, তথাকথিত ধর্ম নেই তার ঈশ্বর সে নিজে। এবং সে প্রকৃতির সন্তান বলে তার কাছে শ্লীলতা অশ্লীলতা নেই। শুধু আছে জীবন –মুক্ত উদ্দাম জীবন। এই জীবন আমি ভালবেসেছি। তাদের কথাই বলতে চেয়েছি।"

নগর আর নাগরিক মানুষের তুলনায় পল্লী মফস্বলের মানব বৃত্তান্ত রচনায় –সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ অধিকতর স্বাচ্ছন্দ্য দেখিয়েছেন। এই মানব কাহিনীর মধ্যে জীবনের আদিম উপলব্ধি নানা ভাবে বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষের জীবনচিত্রের মাধ্যমে চিত্রিত করেছেন। এই মানুষগুলির মধ্যে আছে প্রচুর ভূমির অধিকারী জোতদার, তার বেতনভুক্ত রক্ষা বাহিনী। ধনী ও মাঝারী মাপের ব্যবসায়ী, বিত্তহীন শ্রমজীবি, নিরন্ন ভিক্ষুক আর গণিকা। এই বিবরণে শ্রেণী সংঘর্ষ, শক্তিমানের শোষণ-পীড়ন, বলহীনের অসহায়তা –সবই স্থান পেয়ে যায় কিন্তু বিশেষ মতবাদ তাকে চালিত করে না। নির্দিষ্ট কোন নিয়ম দিয়ে জীবনের স্বাভাবিক প্রকাশকে নিয়ন্ত্রিত করা যায় না –এ সত্য তিনি উপলব্ধি করেছেন এবং সাহিত্যে তাকেই রূপ দিয়েছেন সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ। এবং আমাদের আলোচ্য সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজের গল্পে অন্ত্যজ জীবনের ছবি কিভাবে উঠে এসেছে তার পুঙ্খানুপুঙ্খ বিররণ।

বাংলা ছোট গল্পের সৃষ্টিলগ্ন থেকে আজ পর্যন্ত প্রায় প্রত্যেক গল্পকারের গল্পেই অন্ত্যজ জীবনকথা কমবেশী স্থান পেয়েছে। ভিন্ন ভিন্ন লেখকের জীবনদৃষ্টি ও জীবনদৃষ্টির পটভূমি ভেদে তাদের ছোট গল্পে অন্ত্যজ জীবনের চালচিত্র স্বতন্ত্র রূপমূর্তি নিয়ে চিত্রিত হয়েছে। ঠিক তেমনি ভাবেই সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজের গল্পে বিবিধ শ্রেণীর অন্ত্যজ জাতির মানুষের ব্যক্তিজীবন, পরিবার জীবন, তাদের প্রেম-দাম্পত্য, প্রেমহীনতা, লোভ-লালসা, সরলতা, কোমলতা, সহানুভূতিশীলতা, ভন্ডামি, শঠতা, ধর্মীয়জীবন, আচার-বিশ্বাস কতটা নিপুণতার সঙ্গে চিত্রিত হয়েছে তার স্বরূপ উদ্ঘাটিত করবো।

ক) ব্যক্তি জীবনাশ্রিত

সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজের অন্ত্যজ জীবনাশ্রিত কিছু গল্পের বিষয় হয়েছে অত্যাচার-লাঞ্ছিত ব্যক্তি জীবন। এই সব গল্পের বিশ্লেষণে দেখা যায়, অন্ত্যজ মানুষ উঁচুসমাজের বা উচ্চ শ্রেণীর মানুষের দ্বারা শারীরিকভাবে, মানসিকভাবে অত্যাচারিত-লাঞ্ছিত হয়েছে। আবার কেউ হীংস্র হয়েছে, ক্রূর হয়েছে। তাদের ব্যক্তি জীবনে সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যে ও ভোগলিপ্সার চরিতার্থতার জন্য অন্ত্যজ মানুষ ক্রূর ও হিংস্র হয়েছে। উদাহরণ হিসাবে 'অঘ্রাণে অন্নের ঘ্রাণ' ও 'বৃষ্টিতে দাবানল' গল্পদ্বয় আলোচনা করা যেতে পারে।

'অঘ্রাণে অন্নের ঘ্রাণ' গল্পের বিষয় হয়েছে অর্থবান মানুষ কর্তৃক এক অন্ত্যজ নারীর উপর বলাৎকারের কাহিনী। পিতৃহীন, অন্ন ও অর্থ লাঞ্ছিত আদরী বেওয়ার মেয়ে চিরুণী নবান্ন খেতে মাসির বাড়ি ধামালিতলাতে যাচ্ছিল। যাচ্ছিল মোড়ল ধনহরির সাথে। মোড়লের গরু হারিয়ে গেছে –তাই গরুর খোঁজে সেও যাচ্ছিল ধামালিতলার গুনিন বাড়ি। ফাঁকা মাঠের মধ্য দিয়ে যেতে যেতে সদ্য যৌবনা চিরুণীর প্রতি কামনায় উন্মত্ত হয় ধনহরি। হা-অন্নে চিরুণীকে গুড়-মুড়ি খেতে দেওয়ার

মূল্যে সে চিরুণীর সারা দেহে হাতের খেলা খেলে নেন। এর পর উদ্যত হয় চিরুণীর সতীত্ব খুবলে নিতে। এবার চিরুণী বাধা দিতে থাকে। সে বাধা না মেনে জোর করতে থাকে ধনহরি। তেমন সময়ে অসহায় চিরুণীকে রক্ষা করে এক মুনিশ। কিন্তু সবকিছু দূরে ঠেলে চিরুণী ধামালিতলায় ছোটে নবান্ন খাওয়ার বাসনা বুকে নিয়ে –গল্প কাহিনী এখানেই সমাপ্ত। গল্পে দেখা যাচ্ছে, অর্থবান মানুষ অর্থ ও অন্নের জোরে অন্ত্যজ মানুষের সতীত্ব-সম্ভ্রমকে ভোগ করতে সক্ষম। অন্ত্যজ মানুষ সেখানে নিতান্ত অসহায়। শুধু পেটে দুমুঠো খাওয়ার জন্য তারা নিজেদের দেহকেও সঁপে দেয়–লাঞ্ছিত হয় –অপমানিত হয় অনিচ্ছা সত্ত্বেও।

সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজের 'বৃষ্টিতে দাবানল' গল্পের বিষয় হয়েছে নারায়ণ ওরফে নারাং বাউরির উন্মত কাম পিপাসা ও তার চরিতার্থতার জন্য পাশবিক হিংস্রতা। গল্পে দেখি, টিপ টিপে একঘেয়ে বৃষ্টির দিনে নারাংয়ের মনের কামনার আগুন জেগে ওঠে। নারাং একা থাকে। দু-দুবার বিয়ে করলেও তার বউ টেকেনি। লম্বা তালগাছের মতো ঢ্যাঙা তার চেহারা। নানা কাজ করে সে কোন রকমে তার একার পেটটা চালায়। আজ এই টিপটিপানি বৃষ্টির দিনে পথে বেরিয়ে নারাং দেখে জগতের সবাই নিজ নিজ সঙ্গী-সঙ্গিনী নিয়ে মহাসুখে আছে। শুধু নারাংয়ের মাথায় দাউ দাউ আগুন জ্বলে। তার কেউ নেই। এমন পরিস্থিতিতে সে গ্রামের বিধবা যুবতী স্বৈরিণী সরলা ওরফে সল্লাকে নির্জনে পেয়ে তাকে চেপে ধরে। সরলার দেহ-ব্যাপারে কোন কালে অরুচি নেই, কিন্তু সে নারাংকে সরিয়ে ফেলে দিয়ে পালিয়ে গেল। এতে অপমান বোধ করে নারাং। তখন সে কামোত্তেজনায় উন্মাদ। সে সোজা সরলার বাড়ি যায়, সেখানে একাকী সরলার বোবা মেয়েকে পেয়ে ধর্ষণ করে এবং পালিয়ে যায়। ভোগলিপ্সার চরম সুখ নিতে নারাং হিংস্রতার চরমে পৌঁছে গেছিল। যদিও শেষ পর্যন্ত সরলার অভিযোগক্রমে পুলিশ তাকে জেল-হাজতে ভরে দিয়েছে। কিন্তু নারাংয়ের এমন ব্যবহার আদিম মানুষের ক্রূরতা ও হিংস্রতা মনে করিয়ে দেয়।

খ) পরিবারাশ্রিত

সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজের পরিবার কেন্দ্রিক অন্ত্যজ জীবনাশ্রিত কিছু গল্পের বিষয় হয়েছে অন্ত্যজ পরিবারের দারিদ্র-লাঞ্ছিত অর্থদীর্ণ জীবন, পরিবারগুলির আশাহীনতা ও আশাভঙ্গজনিত ব্যর্থতা। কোথাও আবার দেখা যায় তীব্র অর্থ সংকট যা পরিবারগুলিকে হতাশার আঁধারে তলিয়ে দিয়েছে।

সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজের এ ধরণের একটি গল্প হল 'বুঢ়া পীরের দরগা তলায়' এই গল্পে এক অর্থ-লাঞ্ছিত অন্ত্যজ পরিবারের চরম ট্রাজেডি বর্ণিত। নিদারুণ অর্থাভাবে পড়ে, শুধুমাত্র অর্থ উপার্জনের লোভে, এক অন্ত্যজ পিতা আর এক শিশুপুত্রকে একরকম বেচেই দিয়েছে বলা যায়। গল্পে দেখি, অন্ধ-বেন্দাবন ছোট ছেলে নেম্মলের হাত ধরে বুঢ়া পীরের দরগা তলায় বসে ভিক্ষা করে। যারা পীরের কাছে মানত করতে আসে তারা ভিক্ষা দেয়, কখনো কখনো মানত করা খাবারও জোটে কপালে। একদিন এক নিঃসন্তান হাজি সাহেব সন্তানাকাঙ্ক্ষায় মানত করতে এসে নেম্মলকে

ভালবেসে ফেলে। হাজি সাহেব নেম্মলকে বাড়ি নিয়ে যাওয়ার প্রস্তাব দেয়। সেই সাথে টাকাও দেয় নগদ। মাসে মাসে টাকা পাঠানোর প্রতিশ্রুতিও দেয়। হাজি সাহেব বলেছিল তার বাড়ি রূপপুর-কাঁকসা। সেখানে ছোটে নেম্মলের মা সুখেশ্বরী, গিয়ে শোনে সে গ্রামে কোন হাজি নেই। পাষাণ হয়ে যায় বেন্দাবনের স্ত্রী সুখেশ্বরী। স্বামীকে অভিযোগ-বিদ্ধ করে। হতাশায় ভেঙে পড়ে বেন্দাবন। পিতামাতার হৃদয়ের চরম হাহাকার ধ্বনিত হয়েছে এই গল্পে। অর্থদীর্ণ পরিবারের এ এক মর্মান্তিক করুণ চিত্র।

গ) ধর্মাশ্রিত

সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজের অন্ত্যজ জীবনাশ্রিত কিছু গল্পের বিষয় ধর্মীয় জীবন ও ধর্মাচরণ। কিছু গল্পে ধর্মবিশ্বাসকে অতিক্রম করে গিয়ে বিদ্রোহ ও প্রতিবাদের মাধ্যমে অন্ত্যজ মানুষ ব্যতিক্রমী দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। এই রকম একটি গল্প হল –'সোনার পিদিম'।

সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজের 'সোনার পিদিম' গল্পটি বারিক-বাড়ির পুরাতন গৃহভৃত্য জনাইয়ের ধর্মজীবন কেন্দ্রিক গল্প। জনাইয়ের সাধু-সন্ত হওয়ার ঘটনা ও সে কারণে তার বিনষ্টির কাহিনী এ গল্পের মূল বিষয়। পৌঢ় জনাই দিন দিন উদাসীন হয়ে পড়েছে দেখে, মন্মথ বারিক ওরফে বুড়ো বাবা তাকে এমন উদাসীনতার কারণ জিজ্ঞাসা করে, উত্তরে জনাই জানায় : সে সন্ন্যাসী হতে চায়। কিছুদিন পরে দেখা যায় –জানাইয়ের ভর করেছে। তার ভর ঝাড়ানোর জন্য ওঝা ডাকা হয়। গ্যাদা বাউরি ওঝাকে জনাই এক উঠোন লোকের সামনে জানায় –সে এখন কালীপাঠের সাধুবাবা। এই কালীপাঠের স্বতন্ত্র রহস্যমাখা ইতিহাস আছে। লালদিঘীর ধারে জঙ্গলের মধ্যে অবস্থিত কালীপাঠ মন্দির। মন্দিরে মাটির দেওয়ালের উপরে পাতার ছাউনি একদা ছিল –এখন নেই। এই মন্দিরের সাধু একদা জানতে পেরেছিল –মন্দিরের প্রতিমার নিচে একটা প্রকান্ড বড় সোনার পিদিম আছে। সাধুবাবা পিদিমটাকে রক্ষা করার জন্য অন্যত্র সরিয়ে রাখে। কিন্তু ততদিনে পিদিমটার উপর মন্মথ বারিকের লোভী দৃষ্টি পড়েছে। পিদিমটাকে হস্তগত করার জন্য বারিক মশাই সাধুবাবাকে বিষ প্রয়োগে হত্যা করেছিল – এই ইতিহাস সমস্তই জনাইয়ের জানা। সাধু হয়ে জনাই প্রথমেই ঘোষণা করে দেয়, সে পিদিমটা মন্দিরের অনতিদূরে অশ্বত্থ তলায় আছে। মন্মথ বারিক আবার লুব্ধ হয় এই কথা শুনে। সে বার বার জনাই কে অনুরোধ করে, পিদিমের সত্যকার অবস্থাটা দেখিয়ে দেওয়ার জন্য। কিন্তু জনাই রাজী না হলে মন্মথ বারিকের ছেলে সুবোধ বারিক জনাইকে হত্যা করে। অন্ত্যজ মানুষ জনাই লোভ লালসার শিকার হয়ে মারা যায়।

ঘ) চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যাশ্রিত

কি গল্পে কি উপন্যাসে চরিত্র চিত্রণ একটি গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার। চরিত্র নির্মাণের নৈপুণ্যের উপর লেখকের সার্থকতা অনেকাংশে নির্ভর করে। এই চরিত্র চিত্রণগত দিকের বিচারে বলা যায় অন্ত্যজ জীবন নির্ভর সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজের ছোট গল্পগুলি বাংলা ছোটগল্পের চরিত্রশালাকে বহুল

পরিমানে সমৃদ্ধ করেছে। বিচিত্র ধরণের অন্ত্যজ চরিত্র কখনো গল্পের কেন্দ্রে থেকে, কখনো বা পার্শ্ব চরিত্র রূপে অন্ত্যজ জীবনের আনন্দ-বেদনা-হাসি-কান্না-করুণা -মানবিকতা-সহানুভূতি-প্রতিরোধ-প্রতিবাদের চালচিত্রকে প্রস্ফুটিত করেছে। আলোচ্য পর্যায়ের গল্পসমূহে প্রাপ্ত পুরুষ ও নারী চরিত্রে অধিকাংশই বৈশিষ্ট্যে উজ্জ্বল ও বৈচিত্র্যে আকষর্ণীয়। বৈচিত্র্যের বিভিন্নতায়, বৈশিষ্ট্যের স্বতন্ত্র্যে অন্ত্যজ চরিত্রগুলি মানব জীবনের অপার রহস্য চেতনায় মুখর।

পুরুষ চরিত্র

সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজের অন্ত্যজ জীবনাশ্রিত ছোটগল্পগুলির পুরুষ চরিত্রগুলি বেশ কিছু চরিত্র ধর্মপ্রাণ। ধর্মকে আশ্রয় করে এই শ্রেণীর চরিত্রগুলি নির্মাণের শুরু ও সমাপ্তি। আবার কিছু পুরুষ চরিত্র ট্রাজিক বিষন্নতায় ভাস্বর। সব হারানোর ব্যথা ও অপচয় বোধের অনুভূতি এইসব গল্পের চরিত্রের আভ্যন্তর গঠনকে বিষন্ন করে তুলেছে। চরিত্রগুলির ট্রাজেডির মূলে কাজ করেছে অপরিসীম দারিদ্র ও দারিদ্রের ফলে সৃষ্ট লোভ। এই ধারার একটি গল্প হল 'সোনার পিদিম'।

'সোনার পিদিম' গল্পের গৃহভৃত্য জনাই ধর্মভীরু ধার্মিক মানুষ। জীবনের বেশীরভাগ সময় বারিক বাড়িতে গৃহভৃত্যগিরি করে কাটানোর পর, পৌঢ় বয়সে, জনাইয়ের ধর্মে মতি ফেরে। সে পুরোদস্তুর এক সন্ন্যাস নিয়ে কালীপাঠের মন্দিরে সাধুবাবাতে পরিণত হয়। এখানেই জনাইকে অসাধারণত্বে প্রতিষ্ঠিত করেছেন লেখক। সাধুগিরির সূত্রেই জনাই উচ্চবিত্ত সমাজের মানুষের মুখোশ খুলতে ব্যবহৃত হল। লোকশ্রুতি কালীপাঠের মন্দিরের নিচে কোথাও একটা সোনার পিদিম আছে। এই সোনার পিদিমটা আত্মসাতের জন্য জনাইয়ের প্রভু মন্মথ বারিক কালীপাঠের আগের সাধুবাবাকে হত্যা করেছিল। এই ইতিহাস জনাইয়ের জানা। আজও মন্মথ বারিকের –সে লোভ মরেনি। এবার ঐ পিদিমটা আত্মসাতের জন্য মন্মথ বারিক ও তার ছেলে সুমথ বারিক জনাইকে খুন করল। ধনী মানুষের ধন প্রাপ্তি লালসার শিকার হল ধর্মপ্রাণ জনাই। নিতান্ত সাধাসিধে ধর্মপ্রাণ মানুষ জনাই চরিত্রটি লেখকের বিশেষ শিল্প উদ্দেশ্য সিদ্ধ করে গল্পে নবলেখা হয়েছে।

নারী চরিত্র

সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজের অন্ত্যজ জীবনাশ্রিত গল্পগুলিতে নারী চরিত্রের স্বরূপ বৈশিষ্ট্য নির্ধারণে প্রবৃত্ত হয়ে দেখি, চরিত্রগুলি বৈচিত্র্যে উজ্জ্বল, বৈশিষ্ট্যে আকর্ষণীয়। বিচিত্র মতি-গতি ও মানসিকতার নারী চরিত্রের ভিড় ছোট গল্পগুলিকে স্বতন্ত্র করেছে। নারী চরিত্রের স্বরূপ বিশ্লেষণে দেখা যায় কোন চরিত্র ট্রাজিক বিষন্নতায় ভাস্বর, কোন নারী অত্যাচারিত-লাঞ্ছিত। কোন নারী পুরুষের কামনা-বাসনার বলি তারা। এই সমস্ত বঞ্চিত-লাঞ্ছিত-অবহেলিত নারীরা প্রায়শ মুখ বুজে সহ্য করেছে, আবার কেউ প্রতিবাদী। এই ধরণের একটি গল্প হল– 'অঘ্রাণে অন্নের ঘ্রাণ'।

'অঘ্রাণে অন্নের ঘ্রাণ' গল্পে চিরুণী হত-দরিদ্র, অত্যাচার-লাঞ্ছিত চরিত্র। সে অর্থবান উঁচু জাতির পুরুষ, তাদের গ্রামের ধনহরি মোড়লের কামনা-বাসনার শিকার। দারিদ্র ও অন্নহীনতার

পটভূমিতে চিত্রিত করে চিরুণী চরিত্রটিকে লেখক অনবদ্যভাবে ও মেজাজে গড়েছেন। শুধুমাত্র উদর পূরণের তাগিদে, দরকার হলে যে চিরুণীর মতো অর্থ-লাঞ্ছিত ও অন্ন-লাঞ্ছিত মেয়েরা সাময়িক হলেও দৈহিক সূচিতার প্রতি শিথিল মনোযোগী হয়ে পড়ে –তার প্রমাণ চিরুণী চরিত্র। একদিকে উদরের শান্তি, অন্যদিকে ইজ্জত। দুয়ের মাঝখানে দাঁড়িয়ে চিরুণীরা হয়ে পড়ে চরম অসহায়:

"চিরুণী একবার ভাবে সরে বসবে –আবার ভাবে মোড়ল বুড়োর মুড়ি আর গুড়টা ছেড়ে যাওয়া ঠিক হবে না। তবু তার মুখে লালচে ছটা ফোটে। লজ্জা-দ্বিধা-শঙ্কা তার বুকের ভেতরটা কাঁপায়। সে সরে বসে না। বাধা দিতে পারে না। যতক্ষণ খাদ্যটা না ফুরায়, ধনহরি তার শরীর নিয়ে খেলে।" (অঘ্রাণে অন্নের ঘ্রাণ : সিরাজ সৈয়দ মুস্তাফা)

এই খেলা চরমে পৌঁছাতে চাইলে চিরুণী প্রতিবাদী হয়ে ওঠে। ততক্ষণে গুড় মুড়ি খেয়ে, হরিণ মারার বিলের জল পান করে চিরুণী সতেজ হয়ে উঠেছে। কিন্তু বাধা মানে না মোড়ল। জোর করে চিরুণীকে ভোগ করতে চায়।

যদিও শেষ পর্যন্ত ধনহরি তার কামনা ও ভোগাকাঙ্ক্ষার নিবৃত্তি ঘটাতে পারেনি। সে এক অন্ত্যজ বালিকার ইজ্জত-লুটের কাজে সম্পূর্ণ সফল হয়নি। ধনহরির এ হেন ঘৃণ্য ও ভোগ উন্মত্ত কাজ অন্ত্যজ জীবনের প্রতি অবিচার ও লাঞ্ছনার নগ্ন সত্যকেই উন্মোচিত করে। উচ্চবিত্ত সমাজের কামনার খাদ্য হিসাবে চিরকাল, এমন ভাবে ব্যবহৃত হয় অন্ত্যজ মানুষেরা। চিরুণী সেই অত্যাচার-লাঞ্ছিত সমাজের প্রতিনিধি স্থানীয়া।

ঙ) পটভূমি ভিত্তিক

সাহিত্যের যে কোন বিভাগের ক্ষেত্রে পটভূমি রচনা সবিশেষ গুরুত্ব বহন করে। বিশেষ করে গদ্য সাহিত্যের ক্ষেত্রে সুনিপুণ পটভূমি রচনা সাহিত্যিকদের সৃজন-দক্ষতার পরিচয়টিকে উন্মোচিত করে বলেই মনে হয়। গল্প কিংবা উপন্যাসের ক্ষেত্রে একথা অবিসংবাদিতভাবে সত্য। পরিবেশ-পটভূমির সুদৃঢ় ভিত্তির উপর ভর করে গল্প-উপন্যাসের বুননটি সুবিকশিত হয়ে উঠে। গল্প-উপন্যাসের বিশেষ বিশেষ বিষয়বস্তু স্বতন্ত্র পরিবেশ-রচনার দাবি করে। পটভূমি রচনার এই স্বতন্ত্র দাবি সাহিত্য রচনার কলাকৌশলের আভ্যন্তরীণ ব্যাপার। ভিতর থেকে গল্পের পটভুমি পরিবেশ ও গল্পের বিষয়বস্তু পরস্পর সহাবস্থানে এক কেন্দ্রিক হয়ে গড়ে ওঠে। তেমনটি না ঘটলে গল্প-গঠনে গতি আসে না –গল্প শিল্প সার্থকতার ক্ষেত্রে মার খায়। তাই কথা সাহিত্যিকরা গল্প-বিষয়ের নির্মাণের সাথে সাথে গল্পের পটভূমিকে সমান গুরুত্বে মজবুত করে তোলেন। এর ফলে গল্পগুলি শিল্পগত ঐক্যে প্রস্ফুটিত হয়। সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজের অন্ত্যজ জীবনাশ্রিত ছোটগল্পগুলিও এই সত্যের পরিচয় বহন করে শিল্প সফলতা পেয়েছে। এবং ছোট গল্পের রচনায় তিনি সবিশেষ নৈপুণ্যের পরিচয় দিয়েছেন।

তাঁর অন্ত্যজ জীবনাশ্রিত গল্পের পটভূমির গুরুত্ব যেমন অনেকখানি, বৈচিত্র্যও তেমনি যথেষ্ট্য। আলোচনার সুবিধার জন্য তার অন্ত্যজ জীবন নির্ভর গল্পগুলির পটভূমিকে প্রধানত দুটি ভাগে ভাগ করতে পারি– গ্রাম কেন্দ্রিক পটভূমি ও নগর কেন্দ্রিক পটভূমি।

গ্রাম কেন্দ্রিক পটভূমি

সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজের 'অঘ্রাণে অন্নের ঘ্রাণ' গল্পের পটভূমি হয়েছে গ্রাম্য প্রান্তর। গুনুটির বিশাল মাঠ। ধানভরা সবুজ শ্যাওলা, নির্জন মাঠ। এই মাঠের উপরই সংঘটিত হয়েছে গল্পটির সমস্ত ঘটনা। জনহীনপ্রায় মাঠে গুনুটির মোড়ল ধনহরির সাথী হয়েছে অন্ত্যজ দরিদ্র মেয়ে চিরুণী। হরিণমারা বিল ও গুনুটির বিলে নির্জনতায় ধনহরির গ্রাম্য চঞ্চল মেয়ে চিরুণীর উপর বলাৎকারের চেষ্টা করে। যদিও শেষ পর্যন্ত ধনহরি বিফল হয়েছে। এক মুনিশ চিরুণীকে সতীত্ব লুঠের হাত থেকে বাঁচিয়েছে। এই ঘটনা, নারীর সম্মান রক্ষার কাজ, গ্রামবাংলার সবুজ শ্যামল প্রান্তরের মতোই জীবন্ত একটা অনুভূতি। তাই গল্পের পটভূমি এখানে মানানসই –সুপ্রযুক্ত।

'বুড়া পীরের দরগাতলায়' গল্পের পটভূমি একটা প্রান্তর ও এক পীরের দরগাতলা। শূন্য নির্জন মাঠ ও দরগাতলার গল্পটির কেন্দ্রীয় আশ্রয়ও। এই দরগাতলাকে কেন্দ্রকরে গল্পের প্লটের অগ্রগতি ও পরিণতি। এই দরগাতলাতেই গল্পের কেন্দ্রীয় চরিত্র বেন্দাবনের কর্মস্থল। এই দরগাতলাতে তার জীবিকা। আর এই দরগা তলা থেকেই শুরু হয়েছে তার জীবনের ট্রাজেডি। তাই নিঃসন্দেহে বলা যায় গল্পটির পটভূমি হিসাবে দরগাতলা সার্থক হয়েছে।

চ) আর্থ-সমাজাশ্রিত

যে কোন সমাজ-গোষ্ঠীর জীবনচর্যার পূর্ণাঙ্গ রূপ-চিত্রাঙ্কনে আর্থ-সামাজিক অবস্থার বিচার বিশ্লেষণ সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ পটভূমিকাটি গ্রহণ করে। সেই সমাজের বিশেষ আচার-ক্রিয়া, সমাজ-প্রথা, সংস্কার-কুসংস্কার, তাদের খাদ্য-বস্ত্র-বাসস্থান এবং তাদের জীবন-জীবিকা-অর্থনৈতিক অবস্থা সমগ্র জাতি সম্প্রদায়কে অন্যান্যদের থেকে পৃথক করে রাখে। তাই বিশেষ সমাজ-গোষ্ঠীর চাল চিত্রাঙ্কনে আর্থ-সামাজিক অবস্থার আলোচনা সবিশেষ গুরুত্বের দাবি রাখে। অন্ত্যজ জীবনাশ্রিত বাংলা ছোট গল্পগুলিতে অন্ত্যজ জীবনের রূপচিত্রাঙ্কনে বসে সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ বাস্তব সম্মত দৃষ্টিভঙ্গি ও সূক্ষ্ম পর্যবেক্ষণশীলতার সঙ্গে অন্ত্যজ সমাজের বাস্তব চিত্রকে ফুটিয়ে তুলেছেন। তার গল্পগুলি আলোচনা করলেই তা আমরা বুঝতে পারি।

'অঘ্রাণে অন্নের ঘ্রাণ' গল্পে দেখি, অন্ত্যজ মানুষ আদুরী ও তার মেয়ে চিরুণী মাঠে-বিলে ধান কুড়িয়ে, শাক তুলে, মাছ ধরে, তার সাহায্যে জীবিকার্জন করেছে। চিরুণী ধানের মরশুমে ধান কুড়োয় মাঠে মাঠে:

"চিরুণী ধান কুড়িয়ে বেড়াচ্ছিল মাঠে। এখন তাদের মতো মেয়ের সুদিন।... চুরি করে শামুকের খোলায় কুটুস করে ধানের শিষ কেটে নেয় কুড়ুনিরা।"

চিরুণী ও তার মা খাল-বিল সেঁচে মাছ ধরে। এই কাজ তাদের জীবিকার বড় অবলম্বন :

"হিজলতলা এখনও কিছু দূরে। পরশু হিজলতলার জল কাদা হাতড়ে তারা মায়ে ঝিয়ে মিলে অনেক মাছ ধরেছিল।" (অঘ্রাণে অন্নের ঘ্রাণ : সিরাজ সৈয়দ মুস্তাফা)

'বুড়া পীরের দরগা তলায়' গল্পে বেন্দাবনের জীবিকা মূলতঃ ভিক্ষাবৃত্তি। যদিও প্রথম

জীবনে সে জন-মজুরী খেটে সংসার চালাতো। কিন্তু দুচোখ অন্ধ হয়ে গেলে দরগাতলায় বসে সে ভিক্ষা করে :

এক) "সে তো জন্মকাল থেকে কানা নয়। গতবছরও মাঠে মুনিশ কেটেছে, ফসল পাহারারও কাজ করেছে।"

দুই) "আওয়াজ পেয়ে অন্ধ বেন্দাবন বুলি বলে পীর বাবার দয়া লাগে, অন্ধকে একটা দুটো পয়সা।"(বুঢ়া পীরের দরগাতলা : সিরাজ সৈয়দ মুস্তাফা)

তবে ভিক্ষাবৃত্তিতে বড় লজ্জা পায় বেন্দাবন। তাই শিশুপুত্র নেম্মলকে হাজী বাড়িতে রাখার বিনিময়ে প্রাপ্ত পঞ্চাশ টাকা দিয়ে সে বিড়ি বাধার সরঞ্জাম কিনেছে। দরগা তলাতেই বসে সে বিড়ি বাধে। ভিক্ষাবৃত্তির সাথে সাথে এভাবেও কিছু উপার্জন করে বেন্দাবন।

ছ) বিশ্বাস ও সংস্কার ভিত্তিক

সামাজিক আচার-সংস্কার-বিশ্বাস-প্রথার মধ্যে দিয়ে কোন বিশেষ জাতি সম্প্রদায়ের আভ্যন্তরীণ ও বাইরের গঠনটি বিশিষ্ট হয়ে ওঠে। সমাজের বিশ্বাস-সংস্কারের চিত্রণের মাধ্যমে সে জাতির মানস গঠনটিও সুস্পষ্ট রূপে প্রস্ফুট হয়। সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজের ছোট গল্পে অন্ত্যজ জীবনের বিশ্বাস-সংস্কার-আচার-প্রথার যে চিত্রণ পাওয়া যায় তা থেকে স্পষ্টরূপে সিদ্ধান্ত করা যায় যে, অন্ধাচার-সংস্কারে অন্ত্যজ মানুষ আষ্টে পৃষ্ঠে বাঁধা। শিক্ষা দীক্ষার আলোক বিহীন অন্ত্যজ মানুষ যুক্তি-বুদ্ধির তোয়াক্কা না করে অলৌকিক বিশ্বাসে মগ্ন থাকে। কতই না বিচিত্র আচার প্রথা পালন করে অন্ত্যজ মানুষেরা। তাঁর 'সোনার পিদিম' গল্পটি আলোচনা করলে উক্ত মন্তব্যের স্বরূপ উদ্ঘাটিত হবে।

'সোনার পিদিম' গল্পে অন্ত্যজ মানুষের বিশেষ বিশ্বাস-সংস্কারের পরিচয় লিপিবদ্ধ। গল্পে দেখি জনাইয়ের ভর হয়েছে :

"কতক্ষণ পরে এক নাতনী পুঁচকি বলল, ঠাকুর্দা, ও ঠাকুর্দা। দেখবেন আসুন জনাই দা কি করছে। মন্মথ আঁৎকে উঠে বলেন, কি করছে রে।

উঠোনে বসে মাথা নাড়ছে খালি। আর কি সব বলছে। মা বলল, জনাইকে ভূতে ধরেছে। তাই ওঝা ডাকতে গেল ছোট কাকু।"

(সোনার পিদিম : সিরাজ সৈয়দ মুস্তাফা)

ভর লাগা জনাইয়ের চিকিৎসার জন্য গ্যাঁদা ওঝাকে ডাকা হয়েছে। ভুত ঝাড়ানোর যে বিচিত্র ক্রিয়া কান্ডের পরিচয় এখানে আছে, তাতেও অন্ত্যজ সমাজের বিচিত্র আচার-সংস্কারের পরিচয় মেলে। গল্পে দেখি, গ্যাঁদা ওঝা নারকেল ছোবড়ার আগুন জ্বেলে, জনাইয়ের চোখে লঙ্কাগুড়া ছড়িয়ে চিকিৎসা করেছে।

অন্ত্যজ মানুষের জীবনাচারের সঙ্গে এমন আচার প্রথা বেশ মানানসই হয়েই চিত্রিত।

সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজের গল্পগুলি বিশ্লেষণ করলে দেখি, অশিক্ষা ও কুশিক্ষার কারণে

অন্ত্যজ সমাজে অন্ধ আচার সংস্কার প্রথায় আমূল বিশ্বাসী। তাদের এই বিশ্বাস তাদের অন্তরেরই বিশ্বাস। অন্ত্যজ মানুষ সাধারণত আনন্দানুষ্ঠান প্রিয়। সাধ্য তাদের না থাকলেও অর্থ লাঞ্ছিত জীবনে যতটুকু পারা যায় জীবনের আনন্দময় দিকটিকে তার উপভোগ করে। দুঃখক্লিষ্ট জীবনে সুখের সামান্য পরশ তাদের নানা উৎসবে ও অনুষ্ঠানে পাই। অন্ত্যজ মানুষের সংস্কৃতির এই দিকটি গুরুত্বপূর্ণ যেমন, তেমনই তা এই বিশেষ শ্রেণীর মানুষের সমাজিক দলিলও।

আট) দেবেশ রায় (১৯৩৬)

১৯৩৬ এর ১৭ই ডিসেম্বর বর্তমান বাংলাদেশের পাবনা জেলার বাগমারা গ্রামে দেবেশ রায়ের জন্ম। দেশভাগের পর তাঁরা চলে আসে উত্তর বাংলার জলপাইগুড়ি শহরে। এখানেই দেবশে রায়ের পড়াশোনা, রাজনীতি আর সাহিত্য চর্চার শুরু। দাদা দীনেশ চন্দ্র রায়ের প্রভাবে স্কুলে পড়ার সময়ই দেবেশ রায় কমিউনিস্ট দলের সক্রিয় কর্মী হয়ে উঠেন। স্বাধীনতার পর কমিউনিস্ট দল বেআইনী ঘোষিত হলে, তিনি বাইরে থাকার সুবাদে কিছু কাজ করেছিলেন। এই রাজনীতি চর্চার ফলে তিনি জলপাইগুড়ির গ্রামে রাজবংশী অধিবাসী, তাদের মুখের কথা, চা বাগানের শ্রমিক, ডুয়ার্স অরণ্যের জীবজন্তু, মানুষজন, তিস্তা নিয়ন্ত্রিত জলপাইগুড়ির জনজীবন –এই সবের সঙ্গে ঘনিষ্ট হতে পেরেছিলেন। ফলে তাঁর ছোট গল্পগুলি অন্ত্যজ মানুষদের নিয়ে সমৃদ্ধশীল হয়েছে।

গল্প বৈশিষ্ট্য

কোন খ্যাতনামা সহিত্য পত্রে খুব বেশী গল্প মুদ্রিত হয়নি দেবেশ রায়ের ছোট গল্পগুলি। কাহিনীবৃত্ত প্রধান গল্প রচনা করেননি তিনি। নির্মম জটিল বাস্তব তাঁর গল্পে রূপায়িত হয়েছে নানাভাবে। আবার অনুভব গাঢ় কাহিনী নির্মাণেও তিনি দক্ষ। তাঁর গল্পে সমকালের রাজনীতির সজীব রূপায়ণ আছে। উত্তর বাংলার রাজবংশী অর্থাৎ অন্ত্যজ সমাজের জীবন সংগ্রাম, ভাষা আর পরিবেশ উঠে এসেছে তাঁর গল্পে। আবার মধ্যবিত্ত মানুষের ভীরু আত্মপরায়ণ জীবনচিত্র তিনি এঁকেছেন বলিষ্ঠ ভাষায়। সময়ের পরিবর্তন কেমন করে বদলে দিচ্ছে মানুষকে, বিশ্বায়ণের ধাক্কায় কিভাবে চূর্ণ হয়ে যাচ্ছে জীবনের চিরাচরিত কাঠামো, তার বিবরণ রয়েছে দেবেশ রায়ের গল্পে। দেবেশ রায়ের গল্পের মূল বিষয় মানুষ। অনুপুঙ্খ বর্ণনার মধ্যদিয়ে মানুষ আর পারিপার্শ্বের সঙ্গে তার সম্পর্কে লিপিচিত্র নির্মাণে নিপুণ দেবেশ রায়।

বাংলা ছোট গল্পের সৃষ্টিলগ্ন থেকে আজ পর্যন্ত প্রায় প্রত্যেক গল্পকারের গল্পেই অন্ত্যজ জীবনকথা কমবেশী স্থান পেয়েছে। ভিন্ন ভিন্ন লেখকের জীবনদৃষ্টি ও জীবনদৃষ্টির পটভমি ভেদে তাদের ছোট গল্পের অন্ত্যজ জীবনের চালচিত্র স্বতন্ত্র রূপমূর্তি নিয়ে চিত্রিত হয়েছে। সেই রকমই দেবেশ রায়ের গল্পে বিবিধ শ্রেণীর অন্ত্যজ জাতের মানুষের ব্যক্তি জীবন, পরিবার জীবন, তাদের প্রেম-দাম্পত্য, প্রেমহীনতা, লোভ-লালসা, সরলতা, কোমলতা, সহানুভূতিশীলতা, ভন্ডামী, শঠতা,

ধর্মীয় জীবন, আচার বিশ্বাস কতটা নিপুণতার সঙ্গে চিত্রিত হয়েছে তার স্বরূপ উদ্‌ঘাটন করবো।

ক) ব্যক্তি জীবনাশ্রিত

দেবেশ রায়ের ব্যক্তি জীবন কেন্দ্রিক অন্ত্যজ জীবনাশ্রিত কিছু গল্পে দেখি, অন্ত্যজ মানুষের নীতিবোধ-নীতিচেতনা গল্পবিষয় হয়েছে। আবার কোথাও ব্যক্তি জীবনের শুভবোধের প্রকাশ রয়েছে। আবার কোথাও ব্যক্তিজীবনের মূল্যবোধ ও সুকুমারবৃত্তি অবলম্বনে গঠিত। এই ধারার দেবেশ রায়ের একটি গল্প হল 'দুর্ঘটনা ও তার প্রতিকার'।

'দুর্ঘটনা ও তার প্রতিকার' গল্পে ডোম জীবনের অস্তিত্ব ও অস্তিত্বহীনতার এক রহস্যময় জীবনকথা চিত্রিত। আদিবাসী কৃষক আকালু মারা গেল ট্রেন দুর্ঘটনায়। তার দেহ ছিন্নভিন্ন হয়ে গেছে। সেই দেহের ফটো তোলার জন্য ডোম সখিচাঁদ বিচ্ছিন্ন দেহাংশ জোড়া দিয়ে পুনরায় একটি মানুষ তৈরী করল। তারপর দেহাংশগুলো বস্তায় ভরে তা মর্গে ফেলে দেয় সখিচাঁদ। এবং তখন যেন জীবন ও মৃত্যুর মাঝখানকার স্থানে দাঁড়িয়ে থাকে সখিচাঁদ। সে তখন না-লাশ – ঘরের না বাইরের পৃথিবীর। সখিচাঁদের আইডেনটিটির প্রশ্ন আসলে সমগ্র অন্ত্যজ সমাজেরই আইডেনটিটির প্রশ্নে উত্তরিত। 'দুর্ঘটনা ও তার প্রতিকার' গল্পে যখন এক আইডেনটিটির অভাব তেমনি 'অসংরক্ষণ' গল্পে এই আইডেনটিটি অন্ত্যজদের গর্বে বুক ভরে ওঠে।

অমল-সুমিতার ছেলে অমিত মাধ্যমিক পরীক্ষা পাশ করার পর নিজের স্কুলের একাদশ শ্রেণীতে ভর্ত্তি হয়। এই শ্রেণীতে ভর্ত্তি হয় ৭৭৪ নম্বর অর্থাৎ শতকরা ৮৬ নম্বর নিয়ে পাশ করে আসা উত্তর বাংলার আদিবাসী কিশোরের রামসাই বসুতামারি। মুক্ত সহপাঠিদের এই ফরসা ছোট ছেলেটি জানিয়েছে বিশাল রামসাই অরণ্য থেকে এসেছে, তাই তার নাম রামসাই। আর বসুমতির অর্থাৎ পৃথিবীর সন্তান বলেই তার পদবী বসুতামারি। তার স্বগর্ব ঘোষণা –"আমরা আদিবাসী –আমরা নদী বন পাহাড়ের সন্তান।" –আপ্লুত করে দেয় তার সহপাঠিদের। রামসাইয়ের মাধ্যমে তারা অনুভব করে এক বিরাট দেশের বিপুল বিস্তার –সীমাহীন বিস্তৃতির অনুভব সমস্যা –সঙ্কুল সংশয়ী নাগরিক সভ্যতার ফাঁকিকে ভেঙে দেবে। গড়ে উঠবে এক উজ্জ্বল এক মানব, ভবিষ্যতের আশার ইঙ্গিতে শেষ হয়েছে গল্পটি।

খ) পরিবারাশ্রিত

দেবেশ রায়ের অন্ত্যজ জীবনাশ্রিত ছোট গল্পগুলির মধ্যে বেশ কিছু গল্পের বিষয় হয়েছে অন্ত্যজ মানুষের পরিবার জীবন। পরিবার কেন্দ্রিক এই গল্পগুলির বিষয় পর্যালোচনায় দেখি, অন্ত্যজ জীবনের প্রেম-দাম্পত্য, তাদের প্রতি অত্যাচার-লাঞ্ছনা, তাদের পারিবারিক বিপর্যয়, পরিবারের আনন্দোল্লাস প্রভৃতি বিষয় গল্প-গঠনে বিশেষ ভূমিকা রেখেছে। দেবেশ রায়ের এই রকম একটি গল্প হল 'হাড়কাটা'।

'হাড়কাটা' গল্পের বিষয় এক কাহার দম্পতির প্রেম-প্রণয়মূলক মধুর জীবনালেখ্য। গল্পে

দেখি, নায়ক কাহার পেশায় কসাই। তবু সে প্রেম-পরিণয়ের সূত্রে কোন এক তারাপুর গ্রামের মেয়ে গাঁধুলিকে স্ত্রীরূপে ঘরে তোলে। নান্‌কুর প্রকৃতি বড়ই নিষ্ঠুর। কসাইয়ের কাজ করে মনটাও যেন তার কসাই হয়ে গেছে। স্ত্রী গাঁধুলি আবদার করে তার কাছে রূপোর হাসুলি চাইলে, সে গাঁধুলির গালে প্রচন্ড এক চপেটাঘাত কষিয়ে দেয়। পরেরদিন সে শুধু শুধু দোকানে বসে ধারালো ছুঁরি ছুড়ে মেরে একটি কুকুরকে আহত করে। কুকুরটি ও একটি পাগল প্রত্যহ তার দোকানের সামনে দাঁড়াতো। –মনটা নান্‌কুর এমনই বদরাগি ও নিষ্ঠুর। কিন্তু সেদিন মাংস বেচতে বেচতে একটা অদ্ভুত দৃশ্য নান্‌কু দেখে ফেলে। দেখে তার দোকানেরর সামনে ফাঁকা জায়গায় কুকুরটি স্থির হয়ে শুয়ে আছে, আর পাগলটা রাজ্যের কচু পাতার ডাঁটা এনে তার রস কুকুরটির ক্ষতস্থানে লাগিয়ে দিচ্ছে। এই দৃশ্য দেখে অনুতপ্ত হয় নান্‌কু। হঠাৎ করে তার স্ত্রী গাঁধুলির কথা মনে এল। এল ভাবনা। ভাবনার সূত্রে এল নিজের প্রেম জীবনের স্মৃতির দৃশ্যাবলীগুলো। এবার মুহূর্তেই কসাই নান্‌কু অন্য মানুষ হয়ে গেল। কুকুরটাকে একদলা মাংস খেতে দিয়ে বাকি মাংস গামছায় বেঁধে বাড়ি নিয়ে গেল। হঠাৎ বউ দেখার সাধ জেগে উঠেছিল মনে :

"নেরে বউ, খুব ভাল করে রাঁধবি বুঝলি, পুটলিটা রেখে নান্‌কু বলল। চমকে উঠে পিছন ফিরে একগাল হাসি হেসে ফেলল গাঁধুলি।

ওর সামনে মাটিতে বসে পরে নান্‌কু বলল, খুব লেগেছিল কাল রাত্তিরে না ? ইস্ গালে একেবারে দাগ পড়ি গেছে – ধেৎ – আঁচল দিয়ে মুখ ঢাকলো গাঁধুলি। ছলাৎ করে উঠল দশ বছর আগের তালপুকুরের ঢেউ।" (হাড়কাটা : রায় দেবেশ)

–অন্ত্যজ জীবনের দাম্পত্য প্রেমের এ এক অভিনব মাত্রার পরিচয়। দারিদ্র ও সেই হেতু অনটনের মধ্যে স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক এ সমাজে সবদিন সমান থাকে না। হাজার টানাপোড়েন ও অশান্তির মধ্যে দিয়ে হঠাৎ হঠাৎ-ই যেন পবিত্র প্রেমের এক ঝলক ঝলকানি এসে এ জীবনকে মধুর করে। নান্‌কুর গাঁধুলির দাম্পত্য প্রেম তেমনি এক সুমধুর আলোর হঠাৎ আসার ঝলকানি।

গ) অর্থ ও সমস্যাশ্রিত

দেবেশ রায়ের অন্ত্যজ জীবনাশ্রয়ী কিছু গল্পের বিষয়বস্তু হয়েছে অন্ত্যজ মানুষের আর্থিক সমস্যা ও সেই হেতু তাদের সাংসারিক বিপর্যয়ের কাহিনী । এই পর্যায়ের গল্পে দারিদ্রের বিরুদ্ধে অন্ত্যজ মানুষের সংগ্রামমুখর জীবন কথাই মুখ্য স্থান দখল করেছে । এমন বিষয়ভিত্তিক দেবেশ রায়ের একটি গল্প হল 'মৃত জংশন ও বিপজ্জনক ঘাট ' ।

এই গল্পটিতে রাজ বংশী আদিবাসী সমাজের মানুষের জীবন ধারণের তীব্র ও প্রাণান্তকর সংগ্রামের একটি অনবদ্য রূপায়ণ আছে । বার্নেশ ঘাট থেকে জলপাইগুড়ি , যাবার একমাত্র পথ হল নৌকা পথ , ধুপগুড়ি , লাটাগুড়ি , চ্যাংরাবান্ধা , মেখলিগঞ্জ থেকে বাসপথের যত যাত্রী আসে , জলপাইগুড়ি যাওয়ার জন্য তারা সবাই বার্নেশ ঘাট থেকে নৌকা ধরে ।

তিস্তা যখন বিপজ্জনক হয়ে ওঠে তখন রাজবংশী আদিবাসী ভাদুই খগিন, মহিন্দির, রাবণ,

চ্যারকেটু, আমনরা তিস্তার ঘাট আর নদীতে লাফিয়ে পড়ে । শুরু হয় তাদের জীবন সংগ্রাম বিপজ্জনক যাত্রা । এরা মাঝি । জমিতে ক্ষেত মজুরী করে সারাবছর কাজ জোটে না । তাই পেটের দায়ে নদীতে নামতে হয় । ভাদুই বাচ্চা ছেলে । সে বার্নেশ ঘাটের স্থায়ী বাসিন্দা । কখনো সে বাসের যাত্রী জোগাড় করে দেয় , কখনো দেয় নৌকার যাত্রী জোগাড় করে । কোন নির্দিষ্ট নৌকা ধরা নেই তার । যখন যার সঙ্গে চুক্তি হয় , তখন তার নৌকায় খাটে সে । তার কাজ শুধু যাত্রী ধরা। নদীতে যখন নৌকা সচল হয় তখন বিপজ্জনক তিস্তার সাথে লড়াইতে নামে মাঝিরা । গল্পে দেখি, রাবণ ও উভার সিং দুটি নৌকার মাঝি । রাবণ নিজের নৌকার মাঝি , কিন্তু উভার সিং মহাজনের নৌকা চালায় । দুটি নৌকায় বার্নেশ ঘাট থেকে পর পর ছাড়ে । দুটি নৌকার মধ্যে চলে প্রতিযোগিতা। বিপজ্জনক ভাবে । যখন - তখন তাদের নৌকা নদীতে উল্টে যেতে পারে তলিয়ে যেতে পারে , ঘূর্ণিতে পড়ে । নৌকার দাঁড়িরা কখনো তিস্তার চর বরাবর নৌকা টানে , কখনো চড়াতে নেমে গুন টেনে , কখনো আবার প্রবল স্রোতের মধ্যে নেমে নৌকা এগিয়ে যায় । এভাবেই পৌঁছে যায় জলপাইগুড়িতে । শুধুমাত্র অর্থ ও জীবকিার তাগিদে চ্যারকেটু , খগিন , রাবণদের মত রাজবংশীরা তিস্তার সঙ্গে লড়াইতে নামে । তিস্তাকে জয় করতে নামে ।

ঘ) চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যাশ্রিত

কি গল্পে কি উপন্যাসে চরিত্র চিত্রণ একটি গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার । চরিত্র নির্মাণের নৈপুণ্যের উপর লেখকের সার্থকতা অনেকাংশেই নির্ভর করে । এই চরিত্র চিত্রণগত দিকের বিচারে বলা যায় - দেবেশ রায়ের অন্ত্যজ জীবন নির্ভর ছোটগল্পগুলি বাংলা ছোটগল্পের চরিত্রশালাকে বহুল পরিমানে সমৃদ্ধ করেছে । বিচিত্র ধরণের অন্ত্যজ চরিত্র কখনো গল্পের কেন্দ্রে থেকে কখনো বা পার্শ্বচরিত্র রূপেঅন্ত্যজ জীবনের আনন্দ-বেদনা-হাসি-কান্না-করুণা-মানবিকতা-সহানুভূতি-প্রতিরোধ-প্রতিবাদের চালচিত্রকে প্রস্ফুটিত করেছে । আলোচ্য গল্পে পুরুষ , নারী চরিত্রের অধিকাংশই বৈশিষ্ট্যে উজ্জ্বল এবং বৈচিত্র্যে আকর্ষণীয় । বৈচিত্র্যের বিভিন্নতায় ও বৈশিষ্ট্যের স্বাতন্ত্র্যে অন্ত্যজ চরিত্র গুলি মানব জীবনের অপার রহস্য চেতনায় মুখর । কত ভিন্ন মন-মর্জি ও ভাবের মানুষের ভিড় এখানে । তাঁর গল্প গুলি বিশ্লেষণ করলে উক্ত মন্তব্যের সত্যতা যাঁচাই করতে পারব ।

পুরুষ চরিত্র

দেবেশ রায়ের অন্ত্যজ জীবনাশ্রিত ছোটগল্প গুলিতে প্রাপ্ত পুরুষ চরিত্র গুলির স্বভাব -স্বরূপ মনোগত বৈশিষ্ট্য বিচারে নানা রকমের মানুষের সন্ধান পাওয়া গেছে । সাদাসিধে ভাল মানুষ থেকে শুরু করে আদিম হিংস্র মতি-গতির বিচিত্র প্রকার মানুষ এই শ্রেণীর গল্প গুলির আশ্রয় হয়েছে । বিচিত্র মতি-গতির বেশ কিছু চরিত্র মহানুভব , সৎ , উদার হৃদয় , সাদাসিধে সাধারণ মানুষের উপস্থিতি । কেউবা আবার প্রেমিক চরিত্র , কেউবা আবার রহস্যময় । দেবেশ রায়ের গল্প গুলি আলোচনা করলে আমরা উক্ত মন্তব্যের সত্যতা যাঁচাই করতে পারব ।

' রাখি পূর্ণিমার রাত ' গল্পের রথু লোহার খেটে খওয়া সাধারণ মানুষ। চরিত্রের আভ্যন্তর-গঠনে সে যেমন সাধাসিধে তেমন বোকা - হাবাও । তার এই সাধাসিধে জীবন-যাপন ও মাত্রতিরিক্ত সরলতাই তার জীবনের বিনষ্টি ডেকে এনেছে । তার সরলমতি জীবনের রাজনীতির ঘূর্ণাবর্তে পড়ে সে মৃত্যু মুখে পতিত হয়েছে । ষাটের দশকের শেষের দিকে যে সমস্ত কৃষক জমির লড়াই করেছিল 'রথু লোহার ' তাদেরই একজন । নেতা বিশু বাবুর নেতৃত্বে সে জমির আন্দোলনে নেমে দুবিঘা খাস জমি ঝান্ডা পুঁতে দখল করে নেয় । এর পরেই চক্রান্তের শিকার হয় রথু । ভানুবাবু বিশুবাবুর বিরোধী -নেতা । ভানুবাবু হীন রাজনীতিক উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য রথুর স্বজাতি বুধারুকে দিয়ে রথুর অধিকৃত জমিতে দখলের ঝান্ডা পুনরায় পোঁতায় । ফলে একটা বিরোধ বাধার উপক্রম হয় । কিন্তু ঠিক সময়ে বিশুবাবুর হস্তক্ষেপে ঝামেলা মিটলেও এই সূত্রেই বথুর জীবনে ট্র্যাজেডি নেমে এল । সে মারা গেল । মারা গেল অনন্য সততার নজির হয়ে । কেন না , তুখোড় রাজনীতিবিদ ভানু বাবু ঐ জমি দখলের রাজনীতি ফায়দা তোলার জন্য বুধারুর সমর্থনে মিছিল বের করে । মিছিলে স্লোগান দেওয়া হয় - রথু বুধারুকে খুন করেছে । মিছিলের এমন বক্তব্য শুনে রথু আকণ্ঠ মদ পান করে , মিছিলের উদ্দেশ্যেই হেঁকে বলেছে - সে বুধারুকে মারেনি । বরং আজ রাখি পূর্ণিমার দিনে তারা ঝান্ডার কাপড দিয়ে হাতে রাখি বেঁধেছে । এরকমই মাতাল অবস্থায় তিস্তা নদী পার হতে গিয়ে রথু তিস্তাতেই ভেসে যায় । মারা যায় । ইতি ঘটে গেল সরল সৎ কৃষকের জীবনের।

দেবেশ রায়ের 'অনৈতিহাসিক ' গল্পের ভাসিন্দির পরিশ্রমী মেহনতী সাদাসিধে , সরল সাধারণ মানুষ । ভিটেমাটিহীন ভাসিন্দির তিস্তার চরের খাস জমিতে বাস করে । তিস্তাকে আশ্রয় করে সে বেঁচে থাকে । কায়ক্লেশে সংসার চালায় । অর্থ-দীর্ন জীবন তার । সব দিন খাওয়া জোটে না তার সংসারে । তিস্তার স্রোতে ভেসে আসা কাঠ বেচেই চলে তার সংসার -তার জীবন - জীবিকা । ভাসিন্দির তিস্তার স্রোতের সাথে উদয়াস্ত লড়াই করে । দিন রাত্রি ভয়াল স্রোতের সঙ্গে লড়াই করে তার অন্তর দহনে ক্ষয়ে ক্ষয়ে যায় সে । তার এক মাত্র শিশু পুত্র অপুষ্টিতে ভোগে । ডাক্তার বাবু তাকে পেট ভরে ভাত খাওয়াতে বলেছে । তাই ভাত সংগ্রহের লড়াইতে ভাসিন্দির অতিকায় হয়ে ওঠে । প্রাণান্তকর এই লড়াই যেমন সে করে , তেমনই তার মনের কোণে সর্বক্ষণ বর্তমান থাকে । দুদিন অভুক্ত স্ত্রী -পুত্রের জন্য কাতর চিন্তা ও সহানুভূতি । সহানুভূতির জ্বালা । বিপর্যয়ের আশঙ্কা । - এখানেই তিস্তার সন্তান ভাসিন্দির অনন্য হয়ে ওঠে । সে যেন সে মুহূর্তে ইতিহাসের বাইরে কার প্রাণী । তিস্তার স্রোতে জীবন ধারণের জন্য তার লড়াই যেন অনৈতিহাসিক যুগের ও জীবনের প্রতীতি দেয় । সরল সাদা সিধে ভাসিন্দির এই খানেই স্বতন্ত্র । অন্ত্যজ জীবনের নিতান্ত সরলতার গভীরে যে দিবারাত্র এই অনৈতিহাসিক লড়াইয়ের সামনে ক্রিয়াশীল ভাসিন্দির এর জীবন্ত দলিল ।

দেবেশ রায়ের 'হাড়কাটা' গল্পের নানকু কাহার মূলত প্রেমিক চরিত্র । প্রেম সত্তা দিয়ে তার জীবনের শুরু প্রেম-সত্তায় উত্তীর্ণ হয়েই তার চরিত্রের পূর্ণতা । মাঝে কসাইয়ের কাজ করে যদিও তার মনে নির্মম - নিষ্ঠুরতার জন্ম হয়েছে , তবুও শেষ পর্যন্ত প্রেমের তৃপ্তিপূর্ণ আবেশে

চরিত্র শ্রান্তি লাভ করেছে ।

নানকু ছিল এক ঠিকাদারের জোগাড়ে । যুদ্ধের বাজারে , মাংসের যখন প্রবল চাহিদা । সেই সময় ঠিকাদারকে ছাগলের জোগাড় দিত নানকু । ছাগলের খোঁজ করতে গিয়ে নানকু উত্তরবঙ্গের কোন এক তারাপুর গ্রামে খুঁজে পেয়েছিল গাঁধুলিকে ঃ

" দেখেছিল , গাঁধুলির হাসির গমকে , কেমন করে তার সারাটা শরীর টয়ম্বুর কাল পুকুরের মত টলমলিয়ে উঠল । দুটো উতরোল সন্ধ্যা । গ্রাম্য প্রেম প্রাথমিক প্রস্তুতির পরই ঘর বাঁধার স্বপ্ন । এক মাতাল রাত্রিতে গাঁধুলিকে নিয়ে পাড়ি জমাল নানকু । "

(হাড়কাটা ঃ রায় দেবেশ)

যদিও নানকুর এই উত্তাল প্রেমে , মাঝে ক্ষণিক ভাটা পড়েছে । কসাইয়ের কাজ করতে করতে মনটা , হৃদয়টা , তার কসাই হয়ে গেছে । তার এত সাধের গাঁধুলিকে সে মারধর করেছে । কিন্তু পরক্ষণেই এই কারণে নানকু অনুতাপে দগ্ধ হয়েছে । দশ বছরের কসাই জীবন তাকে নির্মম এবং নিষ্ঠুর করলেও , তার প্রেমসত্তাকে একোবারে দলে-পিষে শেষ করে দিতে পারেনি । নিষ্ঠুরতার প্রবল প্রবৃত্তিকে অতিক্রম করে শেষ পর্যন্ত প্রেম জয়ী হয়েছে । কসাইখানা ফেলে নানকু এই প্রেমের নব উন্মোচনের মূল্য দিতে ছুটে গেছে গিন্নী গাঁধুলির কাছে । সস্নেহ প্রেমময় - অনুতাপজর্জর হৃদয়ে নানকু গাঁধুলির কাছে সমর্পিত ।

" ... মাটিতে বসে পড়ে নানকু বলল ঃ খুব লেগেছিল কাল রাত্তিরে না ? ইস , গালে একেবারে দাগ পড়ি গেছে - " (হাড়কাটা ঃ রায় দেবেশ)

এই সহানুভূতি ও অনুতাপের সূত্রে নানকুর জীবনে পুনরায় প্রেম এসেছে প্রবল হয়ে । বসন্ত বাতাসের আবহে তা উদ্দাম হয়ে নেচে উঠেছে নানকুর দেহ-মনে ঃ

" তার পর ? হাড়কাটা কসাই নানকু কাহার আর তারাপুর গঁয়ের শ্যামলা মেয়ে - গাধঁলীর প্রেম সম্মিলন কেমন হল , ইতিহাস তা বলে না । সেই ঝিরিঝিরি সজনে পাতা ওড়া ফাল্গুনের সকালে আড়াই হাতি ঘরে মুখোমুখি বসে থাকা ঐ দুটি লৌহ যুগের নরনারী , তার নায়ক - নায়িকা, তার সাক্ষী ।" (হাড়কাটা ঃ রায় দেবেশ)

পৃথিবীর কেউ কোনদিন এই প্রেমের কথা জানেনা । নানকু সেই অপ্রকাশিত প্রেমের নতুন সম্রাট ।

দেবেশ রায়ের 'দুর্ঘটনা ও তার প্রতিকার' গল্পের ডোম সখিচাঁদ চরিত্রটি রহস্যময় প্রতীকি চরিত্র। মর্গের ডোম সখিচাঁদের মধ্যে রহস্যময়তার প্রকাশ ঘটেছে জীবনের অস্তিত্ব ও অস্তিত্বহীনতার টানাপোড়েনের চিত্রণে। যখন দুর্ঘটনার কারণে মৃত ছিন্ন ভিন্ন দেহগুলিকে মর্গের ঘরে ফেলে দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে সখিচাঁদ সে দিকে তাকিয়ে থাকে তখন তাকে রহস্যময় বলে মনে হয়; তাকে তখন অচেনা লাগে। একদিকে অস্তিত্বহীন মৃত মানুষের ছিন্নভিন্ন দেহ-দেহাংশ, অন্যদিকে সখিচাঁদ। দুয়ের মাঝ খানে দাঁড়িয়ে সে যেন এই বাস্তবলোক ছেড়ে এক পারলৌকিক জগতে চলে যায়। তখন সে অচেনা অস্তিত্ব। এই সখিচাঁদ ছিন্ন ভিন্ন মানুষের দেহাংশ জুড়ে মানুষ তৈরী করে ঃ

" ডান হাতটাকে নামিয়ে - পাশ বরাবর করে দিল । বাঁ বুকটাকে ডান বুকের কাটার সঙ্গে মিলিয়ে , বাঁ হাতটাকে কাঁধের সঙ্গে , দু - তিনটি টুকরো নিয়ে পেটের জায়গায় তল পেটের জায়গায় হাঁটুর থেকে কাটা পাটা নিয়ে বাঁ কি ডান ঠাহর করে বসায় । একটা মানুষ তৈরি করা হচ্ছে ।"

(দুর্ঘটনা ও তার প্রতিকার ঃ রায় দেবেশ)

- আমরা বলি একটা অস্তিত্ব তৈরী করছে সখিচাঁদ । নিজে অপার রহস্যময়তার - জায়গায় - দাঁড়িয়ে জীবনের অস্তিত্বকেই বোধ হয় চিনে নিচ্ছে সে । আসলে জীবনও মৃত্যুর মাঝখানকার আস্তিত্ব এটি । কিংবা জীবন ও মৃত্যুর মধ্যবর্তী কোন আলো আঁধারীময় তৃতীয় অস্তিত্বের দ্যোতনা এখানে প্রতীতি - স্বরূপে ধরা পড়েছে । কে এই তৃতীয় অস্তিত্ব, সখিচাঁদ আর মরার পুটুলিটার মাঝ খানে ?

- এই প্রশ্নের সঠিক উত্তর বোধ হয় - রহস্যময় মৃত্যু, যা রহস্যাবৃত সখিঁচাদের আদলে রূপ নিয়েছে। কিংবা এটা বোধ হয় মৃত্যু অতিক্রমী সেই জীবন-সত্য যা সখিচাঁদ ডোম তার গানেই ধরতে জানে শুধু -

" আমার জন্মের পর, ঈশ্বর, আমি তোমাকে খুঁজছি, পাইনি। আমার মৃত্যুর পর ঈশ্বর, আমি তোমাকে খুঁজছি, পাইনি। আবার মৃত্যুর পর ঈশ্বর তুমি জন্ম নিও, যাতে তুমি আমাকে খঁজে পাও।"

(দুর্ঘটনা ও তার প্রতিকার ঃ রায় দেবেশ)

- সত্যই সত্যই মৃত্যুর পর জীবনের যে পরিনাম, তা ধরার জন্যই যেন সখিচাঁদ এই দ্বৈত ভূমিকা । তা রহস্যময় - জীবনের পরিচয়বহ। চরিত্রএখানে যেন নব লেখায় জীবন্ত ।

ঙ) পটভূমিভিত্তিক

সাহিত্যের যে কোন বিভাগের ক্ষেত্রে পটভূমি রচনা সবিশেষ গুরুত্ব বহন করে। বিশেষ করে গদ্য - সাহিত্যের ক্ষেত্রে, সুনিপুণ পটভূমি রচনা সাহিত্যেকদের সৃজন-দক্ষতার পরিচয়টিকে উন্মোচিত করে বলেই মনে হয় । গল্প কিংবা উপন্যাসের ক্ষেত্রে একথা অবিসংবাদিদত ভাবে সত্য। পরিবেশ পটভূমির সুদৃঢ় ভিত্তির ওপর ভর করে গল্প উপন্যাসের বুননটি সুবিকশিত হয়ে ওঠে। গল্প উপন্যাসের বিশেষ বিশেষ বিষয়বস্তু স্বতন্ত্র পরিবেশ রচনার দাবি করে। পটভূমি রচনার এই স্বতন্ত্র দাবি সাহিত্য রচনার কলা-কৌশলের আভ্যন্তরীণ ব্যাপার। ভিতর থেকে গল্পের পটভূমি পরিবেশ ও গল্পের বিষয়বস্তু পরস্পর সহাবস্থানে এককেন্দ্রিক হয়ে - গড়ে উঠে । তেমনটি না ঘটলে গল্প-গঠনে গতি আসে না - গল্প শিল্প সার্থকতার ক্ষেত্রে মার খায়। তাই কথা সহিত্যিকরা গল্প-বিষয়ের নির্মাণের সাথে সাথে গল্পের পটভূমিকে সমান গুরুত্বে মজবুত করে তোলেন । এর ফলে গল্প গুলি শিল্পগত ঐক্যে প্রস্ফুটিত হয় । দেবেশ রায়ের অন্ত্যজ জীবনাশ্রিত ছোটগল্পগুলিও এই সত্যের পরিচয় বহন করে শিল্প সফলতা পেয়েছে । এই পর্যায়ের ছোটগল্পগুলির পটভূমি রচনায় তিনি সবিশেষে নৈপুণ্যের পরিচয় দিয়েছেন ।

অন্ত্যজ জীবনের গল্পে পট ভূমির গুরুত্ব যেমন অনেকখানি বৈচিত্র্যও তেমনি যথেষ্ট।

আলোচনার সুবিধার জন্য অন্ত্যজ জীবন নির্ভর গল্প গুলির পটভূমিকে দু'ভাগে ভাগ করা হয়েছে - যথা - গ্রাম কেন্দ্রিক পটভূমি ও নগর কেন্দ্রিক পটভূমি ।

গ্রামকেন্দ্রিক পটভূমি ঃ

দেবেশ রায়ের 'অনৈতিহাসিক' গল্পের পটভূমি রঙ ধামালি হাট সংলগ্ন তিস্তা নদী এবং নদী তীর ও ভামনিবন। নদীর খরস্রোতে, বালিয়াড়ি, বালুচর, গল্পের মূল বিষয় । গল্পের নায়ক ভাসিন্দিরের জীবনের সমস্ত কিছ এই নদী নির্ভর ঃ

"গর্ত, খানাখন্দ, নালী তো আছেই, মাঝে মাঝেই তিস্তা কোন খাঁড়ি চরের ভিতর ঢুকে পড়েছে, কোন খাঁড়ি ভর্তি জল, কোন খাঁড়িতে জল নেই কাদা, কোন খাঁড়িতে শুকনো বালি চিক চিক কিন্তু পা দিলেই পা গেড়ে যায় , কোন খাঁড়িতে স্রোত যেন উথলে গেছে আর বালিগুলি তেমনি স্রোতসম ।" (অনৈতিহাসিক ঃ রায় দেবেশ)

তিস্তা মাতাল । ঘর, বাড়ি, চর, সব ভাসিয়ে নিয়ে যায় । মানুষের অস্তিত্বকে বিপন্ন করে। বালুচরাতে ভাসিন্দিরের বাস । স্রোত যেমন বালি সরিয়ে সব কিছুকে চূর্ণ করে, তেমনি, ভাসিন্দিরের জীবনও বিপর্যস্ত হয় । ভাসিন্দিরের জীবন ও যেন বালির ওপর । স্থিরতা নেই । যেন অস্তিত্বহীন সেও তার পরিবার । অর্থাৎ গল্প পটভূমির তিস্তা নদী ও তার চরা গল্প বিষয়ের সঙ্গে সাযুজ্য রেখে চিত্রিত। তা সার্থক ।

নগরকেন্দ্রিক পটভূমি

দেবেশ রায়ের 'হাড়কাটা' গল্পের উত্তরবঙ্গের জলপাইগুড়ি শহর। হলদি বাড়ি শিলিগুড়ি প্রভিন্সিয়াল হাইওয়ের ওপর শহর জলপাইগুড়ি । এই রাস্তা থেকে নেমে গেছে ছোট ছোট গুঁই সাপের বাচ্চার মত একটা গলি। সেই গলি ও তৎসংলগ্ন বাজার 'হাড়কাটা' গল্পের পটভুমি ঃ

"রূপ খালাসি নদীর পারের তারাপুর গাঁয়ের কালো কিশোরী গাঁধুলি আর রাঢ় বঙ্গের নানকু কাহার এসে ছিটকে পড়ল উত্তরবঙ্গের অরণ্য-ঘেরা শহরের অজগর গা থেকে ছিটকে বেরুনো গুঁইসাপ গলিটার মধ্যে ।" (হাড়কাটা ঃ রায় দেবেশ)

পাথরের কাঠিন্য ও অরণ্যের কোমলতায়-ঘেঁরা শহর জলপাইগুড়ি । কাঠিন্য ও কোমলতার এই নির্মাণ গল্পের নায়ক চরিত্রে ও বর্তমান । গল্পে দেখি, নায়ক নানকু কাহার কখনো নিষ্ঠুর-কঠিন, কখনো প্রেম কোমলতায় বিগলিত । অর্থাৎ দেখা যাচ্ছে পটভূমির বিশেষ গঠনটি গল্প চরিত্রের - মানস-গঠনের সমান্তরাল। তাই নিঃসন্দেহে বলা যায় পটভূমির নির্মাণ এ গল্পে শিল্প রসময়-সার্থক।

'মৃতজংশন ও বিপজ্জনক ঘাট' গল্পের পটভূমি জলপাগুড়ি সংলগ্ন বার্ণেশ ঘাট ওরফে বার্ণেশ জংশন শহর। তিস্তার ওপর অবস্থিত বার্ণেশ ঘাট । তিস্তা - তিস্তার ভয়ঙ্করতা স্রোতের ঘূর্ণি ও আবর্তন গল্পের প্রেক্ষিত রচনা করে দিয়েছে । মাতাল, উত্তাল, ক্ষুধার্ত নদীর বর্ণনা বারে বারে গল্পের অঙ্গ জুড়ে আছে ঃ

এক) " আর নদীর জল ছল ছলাৎ, ছল ছলাৎ, নদীর জল নিষ্ঠুর নির্মম নিষ্পলক ।"

দুই) " আর লগির খোঁচা খেয়ে স্রোত বিদ্যুৎচ্চালিত কারখানার মত ছন্দে ছন্দে নৌকাটাকে ঘিরে ঘিরে চলেছে । তিস্তার স্রোত যেন নাকে দড়ি দেয়া ভালুক ।"

তিন) তিস্তার জল দুটো নৌকার দু - পাশ দিয়ে হাঙরের মত নিষ্পলক নিষ্ঠুরতায় খলবল করতে করতে চলেছে ... । "

(মৃতজংশন ও বিপজ্জনক ঘাট ঃ রায় দেবেশ)

নদীর স্রোতের এই ভয়ঙ্করতা গল্প-বিষয়ের অঙ্গও । কেননা রাজবংশী মাঝি-দাঁড়িরা জীবনে বেঁচে থাকার জন্য এই ভয়ঙ্করতার সঙ্গে লড়াই করে । তাকে জয় করে । তাই বলা যায় গল্প বিষয়ের ও চরিত্রের আভ্যন্তর উন্মোচনে পটভূমি এখানে শিল্প রসোত্তীর্ণ মাত্রা নিয়ে চিত্রিত ।

দেবেশ রায়ের অন্ত্যজ জীবনাশিত গল্প গুলির পটভূমি বৈচিত্র্যের বিশ্লেষণের শেষে আমরা একথা নিঃসন্দেহ বলতে পারি, তিনি অন্ত্যজ মানুষের জীবন চর্যা - জীবনবৈশিষ্ট্য এবং মনোভঙ্গীর সঙ্গে সঙ্গতি রেখেই গল্পের পটভূমি রচনায় নিমগ্ন হয়েছেন । এ কাজে শিল্প দক্ষতা নিয়ে কোন প্রকারের প্রশ্ন তোলা যায় না । কি গ্রাম কেন্দ্রিক কি নগর কেন্দ্রিক - উভয় প্রকার পটভূমি রচনায় তিনি বাস্তবজ্ঞানের পরিচয় রেখেছেন । গল্প বিষয়ের সঙ্গে সঙ্গতি রেখেই পটভূমি নির্বাচন করেছেন।

চ) আর্থ- সমাজাশ্রিত

যে কোন সমাজ গোষ্ঠীর মানুষের জীবন চর্যার পূর্ণাঙ্গ রূপ চিত্রাঙ্কনে আর্থ-সামাজিক অবস্থার বিচার বিশ্লেষণ সব থেকে গুরুত্ব পূর্ণ ভূমিকাটি গ্রহণ করে । সেই সমাজের বিশেষ আচার-ক্রিয়া , সমাজের প্রথা, সংস্কার-কুসংস্কার, তাদের খাদ্য-বস্ত্র-বাসস্থান এবং তাদের জীবন-জীবিকা অর্থেনৈতিক অবস্থা সমগ্র জাতি সম্প্রদায়কে অন্যান্যদের থেকে পৃথক করে রাখে। তাই বিশেষ সমাজ গোষ্ঠীর চাল চিত্রাঙ্কনে আর্থ-সামাজিক অবস্থার আলোচনা সবিশেষ গুরুত্বের দাবি রাখে । দেবেশ রায়ের অন্ত্যজ জীবনাশ্রিত ছোটগল্পগুলিতে অন্ত্যজ জীবনের রূপ চিত্রাঙ্কনে বসে তিনি বাস্তবসম্মত দৃষ্টিভঙ্গি ও সূক্ষ্মপর্যবেক্ষণশীলতার সঙ্গে অন্ত্যজ সমাজের চিত্রকে ফুটিয়ে তুলেছেন ।

তাঁর অন্ত্যজ জীবনাশ্রিত ছোট গল্পগুলি থেকে অন্ত্যজ জীবনের আর্থ-সামাজিক অবস্থার একটি পূর্ণাঙ্গ পরিচয় পাওয়া যায় । এই পর্যায়ের গল্প বিশ্লেষণে দেখি, অন্ত্যজ মানুষের খাদ্য-বস্ত্র -বাসস্থান-জীবিকা-আচার-বিশ্বাস-সংস্কারের খুঁটিনাটি পরিচয় বিভিন্ন গল্পে লিপিবদ্ধ হয়েছে । গল্পগুলি বিশ্লেষণ করলে উক্ত মন্তব্যের যথার্থতা যাঁচাই করা যাবে।

দেবেশ রায়ের 'অনৈতিহাসিক' গল্পের ভাসা ওরফে ভাসান ওরফে ভাসিন্দিরের জীবিকা বিচিত্র । তিস্তা নদীতে যে সমস্ত জঙ্গুলে কাঠ ভেসে আসে , তাই তুলে বিক্রি করে ভাসিন্দির কোন রকমে সংসার চালায় ঃ

এক) "তিস্তায় বৃষ্টি নেমেছে।... জঙ্গলের কাঠ, চরভূমির জঙ্গল ভেসে আসছে। সেই কাঠ

ধরার জন্য সেই শেষরাত থেকে ভাসিন্দির তিস্তার পাড়ে বসে ।"

দুই) "ভাসা কাঠ গুলো ধরে ধরে ছড়াতে শুরু করে রোদে শুকিয়ে নেবার জন্য ।... শুকানোর পর বেঁধে ভাসা শহরে নিয়ে যাবে ।.... যে গুলো চেলাকাঠ হিসাবে বিক্রি হবে সেগুলো ভাসা চোলাকাঠের দোকানে নিয়ে গিয়ে বেচে দেবে ।.... আর বড় বড় কাঠ গুলো দোকানে নিয়ে গিয়ে বেচতে হবে।" (অনৈতিহাসিক ঃ রায় দেবেশ)

একাজ হাড়ভাঙা পরিশ্রমের কাজ । দিনরাতের ভেদ না করে ভাসিন্দির লড়াই করে যায় পরিশ্রমকে পুঁজি করে । কিন্তু এমন ভাবে তিস্তার কাঠ তুলেও সংসার ঠিকমতো চলে না ভাসিন্দিরের। তাই ধান রোয়ার কাজও ভাসিন্দির করে কখনো কখনো ঃ

"ব্লক অফিসের পাশের জমিতে বিলাতি ধানের রোয়া গড়ার কাজ পেয়েছিল ভাসা, সেখানেই সে বিলাতি ধানের ব্যাপার স্যাপার শেখে।" (অনৈতিহাসিক ঃ রায় দেবেশ)

দেবেশ রায়ের 'দুর্ঘটনা ও তার প্রতিকার' গল্পের আকালু চাষী । সে জোতদারের জমি চাষ করে, নিজের ও নিজের পরিবারের জীবিকা নির্বাহ করে ঃ

" আকালু উত্তরবঙ্গের জলপাইগুড়ি জেলার মশুলঘাট নামক একটি গ্রামের অধিবাসী । সে বিঘা দশেক জমি চাষ করে । জোতদারবাবু এই অঞ্চলের প্রচলিত নিয়ম অনুযায়ী তাঁকে চাষ বাসের জমি, ঘর চাষের লাঙল বলদ বিছন সবই দিয়েছেন।"(দুর্ঘটনা ও তার প্রতিকার ঃ রায় দেবেশ)

এই সঙ্গে আকালুর স্ত্রী বাড়ি সংলগ্ন জমিতে নানান সবজি চাষ করে । তা বিক্রি করেও সংসার চলে তাদের ঃ

" নিজের বাড়ি সংলগ্ন জমিতে আকালুর দুই স্ত্রী আনাজের বাগান করে বারমাস । আকালু সেই গুলি শহরে বিক্রি করতে আনে ।" (দুর্ঘটনা ও তার প্রতিকার ঃ রায় দেবেশ)

দেবেশ রায়ের 'রাখি পূর্ণিমার রাত' গল্পের রথুর জীবিকা প্রথমদিকে চৌকিদারি হলেও তার জীবিকার মূল বাহন হয়েছে চৌর্যবৃত্তি । দীর্ঘ দশ বছর সে রায়পুর বাগানের চৌকিদার ছিল । পরে বাগানের চৌকিদারি চলে গেলে, রথু তিস্তা নদীতে ভেসে আসা কাঠ বা জঙ্গলের কাঠ চুরি করে বেচে সংসার চালিয়েছে ঃ

" তিস্তার কাঠ ধরে চেরাই করে হাটে , বা জঙ্গল থেকে কাঠ এনে বেচেছে ।"

(রাখি পূর্ণিমার রাত ঃ রায় দেবেশ)

- জঙ্গলের কাঠ চুরি করে জীবিকা চালানোর মত চৌর্যবৃত্তির কাজ রথুর কাছে অত্যন্ত স্বাভাবিক ব্যাপার ।

দেবেশ রায়ের 'মৃতজংশন ও বিপজ্জনক ঘাট' গল্পের রাজবংশী আদিবাসীর জীবিকা হয়েছে তিস্তা নদীতে মাঝিবৃত্তির কাজ । বর্ষার সময় যখন নদী বিপজ্জনক হয়ে ওঠে ও সরকারী পরিবহন ব্যবস্থা বাতিল হয়ে যায়, তখন নদীতে নৌকা নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে রাজবংশী মাঝিরা। তারা বার্ণেশ ঘাট থেকে জলপাইগুড়ি শহর পর্যন্ত জলপথে নৌকা করে যাত্রী পারাপার করে, রাজবংশীদের কেউ কেউ ক্ষেতমজুরের কাজ করে । গল্পে দেখি, যারা পাট ক্ষেতে কাজ পায়নি তারা মাঝিবৃত্তিতে

নিযুক্ত হয়েছে ঃ

এক) " ... সেই নির্জন প্রাকৃতিকতায় মন্ডিত নদীটাকে আপন করে নেবার জন্য মহাজনের নৌকা নিয়ে ঘাটে আসে রাজবংশী বাঝি । তখন অবশ্যি ধান পাটের চাষের সময় । কিন্তু সারাদিন নৌকা বাওয়া আর সারাদিন পাট ক্ষেতে কাজ করার এই মজুরি ।"

দুই) " সরকারী খেয়াঘাট বন্ধ । কবে খুলবে কিছু ঠিক নেই কিন্তু বাসে করে যাত্রী আসছে । এখন রাজবংশী মাঝিরা বেসরকারী নৌকা চালাচ্ছে।"

(মৃত জংশন ও বিপজ্জনক ঘাট ঃ রায় দেবেশ)

- সারাদিন নৌকা চালানোর হাড়ভাঙা খাটুনির মজুরি এই রাজবংশীরা না পেলেও - তারা নির্বিকারে কাজ করে যায় - কাজ করে যায় শুধুমাত্র উদর পূরণের তাগাদায় ।

দেবেশ রায়ের 'হাড়কাটা' গল্পের নানকু কাহার কসাই । সে জলপাইগুড়ি শহরের মিউনিপ্যাল মার্কেটে ছাগল কেটে তার মাংস বেচে ঃ

এক) " আয়রে - বলে আরেকটার ঘাড় ধরে একটা হেঁচকা টান দিল মিউনিসিপ্যাল মার্কেটের লাইসেন্সিয়েট কসাই নানক ।"

দুই) "কত করে হে - তিন টাকা করে দেবে নাকি এক বাবু এসে জিজ্ঞেস করে । কতখানি বাবু-ব্যাগ্র হাতে দাড়ি - পাল্লাটা টেনে নেয় নানকু । আপত্তি না করায় - আশ্চর্য হয়েই ভদ্রলোক বললেন, দাও সের দু'য়েক ।" (হাড়কাটা ঃ রায় দেবেশ)

নিজে কসাইগিরি করে জীবিকা চালানোর আগে নানকু এক ঠিকেদারকে ছাগল জোগাড় করে দিত তাতেই তখন জীবন চলত তার ।

দেবেশ রায়ের অন্ত্যজ জীবনাশ্রয়ী গল্পের অন্ত্যজ জীবনের অর্থনৈতিক অবস্থার পর্যালোচনায় এ কথা স্পষ্ট রূপে প্রতীয়মান হল যে অন্ত্যজ মানুষ চরম অর্থনৈতিক বিপর্যয়ের মধ্যে নিমজ্জিত থেকেই, বেঁচে থাকার সংগ্রাম শুরু করে। তাদের সংগ্রাম প্রাণান্তকর সংগ্রাম। বেঁচে থাকার প্রয়োজনেই তারা যে কোন প্রকার পেশাকেই অবলম্বন করে ।

এক্ষেত্রে ন্যায়-অন্যায় শুভ-অশুভ চিন্তার কোন অবকাশই তারা পায় না । তাই দেখি, অন্ত্যজ জন সমাজের বহুল সংখ্যক মানুষ যেমন সৎ পথে থেকে জীবন-জীবিকার প্রশ্নে সুন্দর ও সুকুমার সব বৃত্তি গ্রহণ করেছে, তেমনি কেউ কেউ অন্যায় পথে, হিংস্রতা ও বর্বরতার সঙ্গে, দিন যাপনের রাস্তাটাকে খুঁজে নিয়েছে । উপায় যাই হোক না কেন, তাদের উদ্দেশ্য - প্রাণ ধারণের জন্য শুধু দুমুঠো অন্নের সংস্থান করা । এই ন্যূনতম আহার জোগাড়ের জন্য অন্ত্যজ মানুষ অক্লান্ত পরিশ্রম করে। লড়াই করে। আপসহীন লড়াই ।

আর আধুনিক বিশ্বে কোন মানুষই নিজের বৃত্তে সীমিত হয়ে থাকতে পারে না । তাকে বাইরের জগতের সঙ্গে যুক্ত হতেই হয় কোন না কোন ভাবে । তবু তার মধ্যে মানুষ সন্ধান করে হৃদয়ের সান্নিধ্য । সমস্যাকীর্ণ, সংশয়ী, অন্বেষণ প্রবণ, সংগ্রামী মানব মানসকে বিশ্বপ্রেক্ষিতে চিত্রিত করার কঠিন কর্মে রত দেবেশ রায় । তাঁর অন্ত্যজ জীবনাশ্রিত ছোট গল্প গুলি সেই কর্ম প্রবাহের স্তরগুলি ধরে রেখেছে । স্ববিশ্বাস আর স্বীয় অভিজ্ঞতায় জারিত বলেই তাঁর গল্প বাংলা সাহিত্যে হয়ে উঠেছে অনন্য । এখানেই তাঁর শিল্প সফলতা ।

নয়) মহাশ্বেতা দেবী (১৯২৬)

বাংলা সাহিত্যে সামাজিক বাস্তবতার সার্থক শিল্পী ও রূপকার মহাশ্বেতা দেবীর জন্ম ১৯২৬ খ্রীষ্টাব্দের ১৪ ই জানুয়ারী । জন্ম স্থান ঢাকা, পৈতৃক নিবাস পাবনা জেলার ভারেঙ্গা গ্রামে । পিতা মনীশ ঘটক (যুবনাশ্ব) ছিলেন কবি, সাহিত্যিক এবং 'বর্তিকা' নামে বহরমপুর (মুর্শিদাবাদ) থেকে মুদ্রিত পত্রিকার একদা সম্পাদক । মাতা ধরিত্রী দেবী ও ছিলেন সাহিত্যিক , লিখতেন 'জয়শ্রী' ও 'পরিচয়' পত্রিকায় । 'মাসিক বসুমতী' পত্রিকায় তিনি পার্ল বার্ক-এর রচনার অনুবাদ করেছিলেন । সমাজ সেবাও সাধ্যমতো করতেন । প্রখ্যাত চলচ্চিত্রকার ঋত্বিক ঘটক ছিলেন তাঁর পিতৃব্য ।

মহাশ্বেতা দেবীর পরিবারে ছিল সাহিত্য মনস্কতা । তাই বেলতলা গার্লস হাইস্কুলে পাঠের সময়ই সহপাঠিনী পরবর্তীকালের কবি রাজলক্ষী দেবীর সঙ্গে তিনি হাতে লেখা একটি পত্রিকা 'ছন্দছাড়া' (১৯৩৯) প্রকাশ করেছিলেন । খগেন্দ্রনাথ সেন সম্পাদিত 'রংমশাল' পত্রিকায় (১৯৩৯) সালে রবীন্দ্রনাথের 'ছেলেবেলা' বইটি নিয়ে মুদ্রিত লেখাটিই মহাশ্বেতার প্রথম প্রকাশিত রচনা।

তাঁর প্রথম মুদ্রিত গ্রন্থ 'ঝাঁসির রাণী' নামের জীবনীটি । ১৯৫৬ সালে এ গ্রন্থ প্রকাশের পরই তিনি গ্রন্থ রচনাকে জীবিকা নির্বাহের অন্যতম পথ হিসেবে গ্রহণ করেন । তাঁর প্রথম মুদ্রিত উপন্যাসের নাম 'নটী' (১৯৫৭)।

১৯৮০ থেকে 'বর্তিকা' নামের ত্রৈমাসিক পত্রিকাটি তিনি সম্পাদনা করে চলেছেন । মহাশ্বেতা দেবীর মুদ্রিত নিম্নে গল্প গ্রন্থের একটি তালিকা দেওয়া হল। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য ইংরেজী ছাড়া জাপানী, ফরাসী এবং হিন্দি, তেলেগু, ওড়িশি, মারাঠি, পাঞ্জাবী প্রভৃতি ভারতের অন্যান্য প্রদেশের ভাষায় অনূদিত হয়েছে তাঁর বিভিন্ন রচনা ।

গল্প সংকলন তালিকা ঃ

১) 'সোনা নয় রূপো নয়' -	১৯৬০
২) 'সপ্তপর্ণী'-	১৯৬১
৩)'অগ্নিগর্ভ'	১৯৭২
৪) 'অনবরতর অবিশ্বাস্য'	১৯৭২
৫) 'সুভগা বসন্ '	১৯৮০
৬) 'সুরুজ গাগরাই'	১৯৮১
৭) ' বেহুলা'	১৯৮১
৮) 'মায়ের মূর্তি'	১৯৮২
৯) 'স্তনদায়িনী ও অন্যান্যগল্প'	১৯৮২
১০) 'মূর্তি'	১৯৮৩
১১) 'পাঁকাল'	১৯৮৩

১২) 'দৌলতি' ১৯৮৪

১৩) 'নৈঋতে মেঘ' ১৯৮৭

১৪) ' ইটের পর ইট' ১৯৮৭

১৫)'কি বসন্তে কি শরদে' ১৯৮৮

১৬) 'প্রথম পাঠ' ১৯৮৮

১৭) ' ঘাতক' ১৯৮৯

১৮) 'তালাক ও অন্যান্য' ১৯৯২

রচনা বিশেষত্ব

মহাশ্বেতা দেবী একই সঙ্গে লেখক ও মননদীপ্ত গবেষক । বহু বিস্তৃত তাঁর কর্মক্ষেত্র । আদিবাসীদের মধ্যে আদিবাসীদের উন্নয়নের জন্য তিনি কাজ করেছেন । আবার - এই অবহেলিত মানুষগুলি, পিছিয়ে থাকা জনগণ, অবহেলিত, উপেক্ষিত, আত্যাচারিত মানুষগুলি তাঁর লেখার বিষয়। তাঁর পিতা মনীশ ঘটক (ছদ্মনাম যুবনাশ্ব) চোর, ভিখারী পকেটমার, রূপজীবা - সমাজ বিন্যাসের এই নিম্নস্তরের মানুষগুলিকে নিয়ে লিখেছিলেন 'পটলডাঙার পাঁচালী'। তাঁর মা ধরিত্রী দেবী নিয়মিত সাহিত্যচর্চার সঙ্গে সমাজ সেবাও করেছেন । বলা যায় সভ্যতার 'পিলসুজ মাথায় নিয়ে' যারা দাঁড়িয়ে আছেন তাদের জীবনকে লেখার বিষয় করার বা তাদের জন্য কাজ করার প্রেরণা ছিল তাঁর স্বভাবের অন্তর্গত।

বৃহৎ একান্নবর্তী পরিবারে কেটেছিল তাঁর শৈশব, সে পরিবারে কেউই ছিল না অবাঞ্ছিত । ভৃত্য - পরিচারিকারাও সেখানে হয়ে গিয়েছিল পরিবারের সদস্য । তাই তাঁর মনের মধ্যে কোন সংকীর্ণতা ছিলনা । মহাশ্বেতা দেবীর লেখক জীবনকে দুটি অধ্যায়ে বিভক্ত করা যায় । পঞ্চাশের দশকের মাঝামাঝি থেকে সতরের দশকের মাঝামাঝি পর্যন্ত একটি অধ্যায়। সওর দশকের মধ্যভাগ থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত আর একটি অধ্যায় ।

প্রথম অধ্যায়ের গল্প উপন্যাসের মধ্যে নির্যাতিত, নিপীড়িত অন্ত্যজ মানুষগুলির জীবনচিত্র ততটা প্রবল নয় । তবে এ আধ্যয়েও ভারতবর্ষের বিচিত্র সংস্কৃতির বিভিন্ন মানুষকে জানার আগ্রহ ছিল তাঁর মনে। আর বিভিন্ন স্তরের নরনারীর উপর অত্যাচারের দিকটিও উপেক্ষিত হয় নি এ সময়ের রচনায় । এই সময়েও তাঁর ইতিহাসবোধ প্রবল । তিনি যে অভিজ্ঞতার সভ্যতার ভিত্তিতে নির্মাণ করেছেন সাহিত্য - এটা তখনই স্পষ্ট হয়ে গিয়েছিল ।

দ্বিতীয় পর্বে তিনি অভিজ্ঞতা - অর্জনকে করে নিয়েছেন জীবনের অঙ্গ এবং রচনা করেছেন সেই জীবনের ভাষারূপ । ষাটের দশকের শেষ দিক থেকেই আদিবাসী, অন্ত্যজ, নিপীড়িত, ভূমিদাস মানুষগুলির দুঃখদীর্ণ জীবন সম্পর্কে অভিজ্ঞতা অর্জনে উদ্যোগী হয়েছিলেন তিনি । এজন্য তিনি পায়ে হেঁটে ঘুরেছেন বিহার আর বাংলার দরিদ্র, আদিবাসী অধ্যুষিত স্থানগুলি । তাদের সঙ্গে বাস করেছেন দীর্ঘকাল । স্বাধীনতার অর্ধশতক পরেও যে মানুষগুলি জীবনধারণের ন্যূনতম প্রয়োজন

মেটাতে পারে নি, বরং উচ্চবর্ণের শোষণ, লালসার শিকার হয়ে আছে - সেই লোধা, শবর, গঞ্জু, দুসাদদের জীবনচিত্র বাস্তব হয়ে উঠেছে তাঁর গল্পে । চরিত্র এবং তার প্রেক্ষিত - উভয়ই তাঁর রচনা গুণে । হয়ে উঠেছে বলিষ্ঠ এবং সুন্দর । তাঁর গল্পের কেন্দ্র বিন্দু বিত্তহীন অন্ত্যজ শ্রেণীর অনন্ত দুঃখ, যন্ত্রণা এবং অত্যাচারী বিত্তবান উচ্চবর্ণের মানুষ ।

মহাশ্বেতা দেবীর গল্পে বার বার আসে প্রশাসনের নিষ্ক্রিয়তা আর পক্ষপাতিত্ব কিভাবে পিছিয়ে পড়া মানুষগুলির জীবনকে আশাহীনতায় নিমজ্জিত করে রাখে তার চিত্র । তাদের জন্য খাতায়-কলমে প্রণয়ন হয় আইন । তৈরী হয় নানা প্রকল্প । কিন্তু বাস্তবে দেখা যায় না তার প্রয়োগ । শোষক শ্রেণী বুঝিয়ে দেয় কলেরার ইনজেকশন নিলে তাদের পুরুষত্ব নষ্ট হবে , লেখা পড়া শিখতে চাইলে তাদের উপর নেমে আসে মৃত্যু ।

এখন আমাদের আলোচ্য মহাশ্বেতা দেবীর ছোট গল্পে অন্ত্যজ শ্রেণীর মানুষেরা কি ভাবে ঠাঁই পেয়েছে এবং কতটা পুঙ্খনুপুঙ্খ ভাবে বর্ণিত হয়েছে ।

বাংলা ছোটগল্পের সৃষ্টিলগ্ন থেকে আজ পর্যন্ত প্রায় প্রত্যেক গল্পকারের গল্পেই, অন্ত্যজ জীবনকথা কমবেশি স্থান পেয়েছে । ভিন্ন ভিন্ন লেখকের জীবনদৃষ্টির পটভূমিভেদে তাঁদের ছোটগল্পে অন্ত্যজ জীবনের চালচিত্র স্বতন্ত্র রূপমূর্তি নিয়ে চিত্রিত হয়েছে । সেই রকমই মহাশ্বেতা দেবীর অন্ত্যজ জীবনাশ্রয়ী গল্পে বিবিধ শ্রেণীর অন্ত্যজ জাতের মানুষের ব্যক্তি জীবন, পরিবার জীবন, তাদের প্রেম-দাম্পত্য, প্রেম হীনতা, লোভ-লালসা, সরলতা, কোমলতা, সহানুভূতিশীলতা, ভন্ডামি, শঠতা, ধর্মীয় জীবন, আচার-বিশ্বাস কতটা বিশ্বস্ততার সঙ্গে চিত্রিত হয়েছে তার স্বরূপ আলোচনা করব ।

ক) ব্যক্তিজীবনাশ্রিত

মহাশ্বেতা দেবীর অন্ত্যজ জীবনাশ্রয়ী ব্যক্তি জীবন কেন্দ্রিক কিছু গল্পে অন্ত্যজ মানুষের প্রেম জীবন গল্পের বিষয় হয়েছে । প্রেম-সফলতা, প্রেম-ব্যর্থতা , প্রেমজ-বাসনা প্রেম কেন্দ্রিক মাধুকরী বৃত্তি, জীবন পিপাসা গল্প গুলিতে মূর্ত হয়েছে । আবার কোথাও ব্যক্তি জীবন অত্যাচরিত, লাঞ্ছিত। এই সব অন্ত্যজ মানুষরা উচ্চতর শ্রেণী ও সমাজের মানুষের দ্বারা শারীরিকভাবে ও মানসিক ভাবে কিংবা অর্থনৈতিক দিক দিয়ে লাঞ্চিত হয়েছে, অত্যাচারিত হয়েছে । আবার কোথাও গল্প বিষয় হয়েছে ব্যক্তি জীবনের হিংস্রতা, রহস্যময়তা, ক্রূরতা। আবার কোথাও গল্প বিষয় হয়েছে অন্ত্যজ মানুষের আনন্দ উল্লাস। মহাশ্বেতা দেবীর 'জনি ও উর্বশী', 'সমাজবাদ বুবুয়া', ' পিন্ডদান' ও 'লাইফার' গল্পগুলি আলোচনায় উক্ত বিষয় গুলি স্পষ্ট হবে ।

'জনি ও উর্বশী' গল্পে বাজিকর জনির প্রণয় গভীরতা ও সেই হেতু তার বিপর্যয়ের অবস্থা চিত্রিত হয়েছে । জনি ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রান্তে গান গেয়ে দর্শকদের আনন্দ দিয়ে বেড়ায় । নানান মেয়ে তার সঙ্গ চায় । নৌটঙ্গির ফুলকলিয়া তার জন্য সর্বস্ব ছাড়তেও প্রস্তুত । বাড়িওয়ালী কানী মোতি তাকে নিয়ে ঘর বাঁধার স্বপ্ন দেখে । কিন্তু জনি কোন দিকেই নজর না দিয়ে বোম্বাই থেকে

উর্বশীকে সঙ্গিনী করে আনে । উর্বশী শুধু নামেই নয়, রূপেও উর্বশী । জনি ও উর্বশী একত্রে নাচে, গান গায় । প্রচুর দর্শক হয় তাদের নাচ-গান দেখতে । কিন্তু হঠাৎ করে একদিন উর্বশীর গলা রুদ্ধ হয়ে গেল । সুমধুর স্বরের পরিবর্তে ফ্যাসফ্যাসে শব্দ বেরুতে লাগল কণ্ঠে । জনি উর্বশীকে নিয়ে ডাক্তার বাড়ি গেলে ডাক্তার জানিয়ে দেয়, উর্বশীর গলায় ক্যানসার হয়েছে । তার মৃত্যু অনিবার্য । ভেঙে পড়েনি জনি । কাঁদে - খুব করে কাঁদে । পরিচিত জনেরা উর্বশীকে ছেড়ে মোতিকে সাঙা করতে বলে । কিন্তু জনি তাতে রাজি হয় না । সে উর্বশীকে ভালোবাসে । তাই সবাইয়ের মুখ বন্ধ করার জন্য উর্বশীকে নিয়ে একটা শেষ আসর করতে চায় । সবাইকে জানিয়ে দিতে চায় উবর্শীর কণ্ঠে এখানো মধুর স্বর আছে । প্রচুর লোক আসে । উর্বশী শুরু করে গান - নাচ। কিন্তু কয়েক মুহূর্তের পর তার বাকরুদ্ধ হয়ে যায় । বুকফাটা কান্নায় উর্বশী নিজেই জানিয়ে দেয় সে আর কোন দিন গান করতে পারবে না । এই কথা ও দৃশ্য জনির বুকে শেল হানে যেন । সে আসরের মাঝখানেই ড্রপসিন ফেলে দিয়ে উর্বশীকে ঢলতে ঢলতে বুক ফাটা কান্নায় আর্তনাদ করে ওঠে । এই আর্তনাদ তার হতাশা ও বিপর্যস্ততারই প্রকাশ ।

'সমাজবাদ ববুয়া' গল্পটি সরল সাধাসিধে সাঁওতাল পুরুষ জংলী বেরসার জীবনের অত্যাচার -লাঞ্ছনা প্রাপ্তির কাহিনী । যদিও এই অত্যাচার লাঞ্ছনা প্রাপ্তির সূত্রে এটি তার শ্রেণী চেতনায় উত্তরণের ও কাহিনী । হাতিবান্ধা চামারকাশীর জংলী বেরসা নিতান্ত সাধারন এক খেটে খাওয়া মানুষ - পেটের জ্বালায় সে আসানসোল, ধানবাদ, সাঁওতাল পরগণা - বিভিন্ন স্থানে ঘুরে বেরিয়েছে। তাদের গ্রামের সুরেন সিং এককালে রাজনীতি করত । সে-ই তাকে সমাজবাদের গান গেয়ে শুনিয়েছেন । জংলী সে সব গানের অর্থ অতশত বোঝে না । কিন্তু গানের সুরের টানে জংলী সে গান কে নিজের সঙ্গী করে নিয়ে যখন তখন গেয়ে উঠত ঃ 'সমাজবাদ ববুয়া, ধীরে ধীরে আই' । গল্পে দেখি, এই গান তার জীবনের কাল হয়েছে । জংলী যখন কয়লাখাদানে কাজ করে তখন খাদানে মারপিট বেঁধেছিল । এই গোলমালের দোষচাপে জংলীর কাঁধে ঐ গানের কারণেই ।

"পালের গোদা জংলীকে ধরো । বেটা রাতদিন সমাজবাদ ববুয়া গান গায় ।"

(সমাজবাদ ববুয়া ঃ মহাশ্বেতা দেবী)

শ্রমিক খেপানোর দায়ে তাকে থানায় আনা হয় । মেরে তার কপাল ফাটিয়ে দেওয়া হয় । পিঠে সেলাই পড়ে । পায়ের আঙুল ভেঙে দেওয়া হয় । এই কারণে তার আবার জেলও হয় । জেল থেকে ছাড়া পেয়ে সে এক চা - দোকানে জোগাড়ের কাজ নিয়েছে । সবজি বেচা কেনার কাজ করছে । তবুও সে সব সময় গুন গুন করে সমাজবাদের গান গায় ঃ

"সমাজবাদ ববুয়া ..... লাঠিসে আই ..... মামাসে আই ..... জেলে জেলে ঘুরি ঘানি ঘুরাই, সমাজবাদ হে ।" (সমাজবাদ ববুয়া ঃ মহাশ্বেতা দেবী)

এরপর জংলী সাঁওতাল পরগণাতে যায় মাটি কাটার কাজে । মনের আনন্দে কাজ করে আর গান গায় - 'সমাজবাদ ববুয়া ঠেকাদারসে আই'। এখানে জংলীকে সবাই সমীহ করে চলে । কিন্তু এখানে ও বিপত্তি । মাটি চাপা পড়ে মারা যায় । ১৮জন কর্মী । ঠিকাদার মুটুকলালের দোষেই

এমনটি ঘটে । জংলীর চোখ জ্বলে ওঠে। সে ঠিকাদার মুটুকলালকে আচ্ছা করে ধোলাই দিল । ঠিকাদার মৃতপ্রায় হল । কিন্তু পাল্টা মার জংলীকে ও খেতে হল । ঠিকাদারের ভাড়া করা মস্তানরা তাকে হাড়ে মাসে এক করে দিল ।

এতে ও দমে যায় না জংলী । সুস্থ হয়ে কালী বাড়ি -কালীবাড়িতে ঘোড়ার গাড়ি চালাতে শুরু করেছে । ঘটনা ক্রমে এক রাতে তার গাড়ির সাওয়ার হয়েছে ঠিকাদার মুটুকলাল । সর্বাঙ্গে চাদর মোড়া ছিল বলে প্রথমে সে ঠিকাদারকে চিনতে পারেনি। মুটুকলাল জংলীকে চিনেছে এবং সঙ্গে সঙ্গে গাড়ি থেকে লাফ দিয়ে পালাতে শুরু করেছে । জংলী তাকে চিনেছে এবার । চিনেই প্রতিশোধ নেবার জন্য তারা করেছে । - গল্পের কাহিনী এই টুকু । গল্পটি বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় । নিরীহ জংলী বারে বারে অন্যায় ভাবে অত্যাচারিত হয়েছে । তার ওপর অত্যাচার-লাঞ্ছনা করাটা যেন বাবু শ্রেণীর মানুষের অধিকারের মত হয়ে গেছে ।

মহাশ্বেতা দেরীর 'পিন্ডদান' গল্পের বিষয় হয়েছে অন্ত্যজ মানুষ দশরথের জীবনের আপাত রহস্যময় আচরণ । দশরথের বড় সখ মরণের পর ছেলের হাতের পিন্ড নিযে সে উদ্বার পাবে । তার একটা মাত্র ছেলে রামলাল । পাল বাবু তাকে বলেছে তার ছেলে দুবছর ধরে জেল খাটছে । দশরথের পেশাও বড় বিচিত্র । সে বিভিন্ন পুকুর থেকে নরকঙ্কাল তুলে পালবাবু, বোসবাবুদের কাছে বেচে । পালবাবুরা নিখুঁত কঙ্কাল চায় -- পণর্নাঙ্গ মানুষের নিখুঁত কঙ্কাল । দশরথ জানে নিখুঁত পূর্ণাঙ্গ কঙ্কালের দাম অনেক । সেও খোঁজে একটি পূর্ণাঙ্গ কঙ্কাল । শেষে একদিন ওষধ কোম্পানীর বাগান পুকুরে সে একটি নরকঙ্কাল খুঁজে পায় । কঙ্কাল উপরে তোলার পর দেখে কঙ্কালের গায়ে জড়িয়ে আছে একটা রূপোর পদক । আর তার ওপর 'রামলাল' নামটি খোদাই করা। দশরথ যেন বোবা হয়ে যায় । তার ছেলে রামলাল তারই কঙ্কাল তার হাতে । বোবা প্রাণ দিয়ে দশরথ কঙ্কালটাকে পাল বাবুর কাছে বেচে দেয়। অনেক টাকা পায় সে। সেই টাকায় দশরথ মদ কিনে আকণ্ঠ খেয়ে বুঁদ হয়ে যায় এবং দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রীর কথায় - উত্তর দেয়ঃ

"দশরথ বলল, চুপ যা মাগী। ই মদ নয়,আমার আমি পিন্ড দিচ্ছি।"

(পিন্ডদান ঃ দেবী মহাশ্বেতা)

- দশরথ নিজেকেই নিজে পিন্ড দিচ্ছে। তার বড় ইচ্ছা ছিল ছেলের হাতে পিন্ড নেওয়া । সেই অতৃপ্ত কামনার প্রকাশ তার এই রহস্যময় আচরণে যেন মূর্ত হয়েছে । তার ট্রাজেডি যেন মূর্তি ধরে যন্ত্রণা দগ্ধ এই বাক্যে - 'ই মদ লয়, আমারে আমি পিন্ড দিচ্ছি।'

মহাশ্বেতা দেবীর 'লাইফার' গল্পে মাগন সাঁওতালের নিজ সম্প্রদায়ে ফিরে যাওয়ার কারণে তার মনের উল্লাসের পরিচয় লিপিবদ্ধ । মাগন লাইফার - জেল কয়েদি ছিল। নিজ স্ত্রী দনিকে হত্যা করার দায়ে তার যাবজ্জীবন জেল হয় । জেলে সে জেলার বাবুর বাগানের কাজ করত । জেল ফেরত সে নিজ গ্রাম বড়শুড়িতে ফিরে দেখে তার স্বজাতির কেউ সেখানে নেই । সব উচ্ছেদ হয়ে কোথায় চলে গেছে । কেউই তাদের হদিশ জানে না । মাগন ঘুরতে ঘুরতে বট বাড়ি আসে একটি বাড়িতে জল তোলার কাজ নিয়ে । এখানে সে শোনে বটবাড়ির ফরেস্ট থেকে সাঁওতালরা গাছ

কেটে নিয়ে যায় । সাঁওতাল নাম শুনে মাগন পুলকিত হয় । কত দিন দেখা হয়নি স্বজাতির মানুষের সাথে। একদিন ভোরে মাগন চুপি চুপি তাদের সঙ্গে দেখা করে । না, তারা বড় শুড়ির মাগনের নিজ গ্রামের লোক নয় । মাগন চলে যায় তাদের সঙ্গে । মাগন দিব্যি শেকড় গেড়ে নিতে পারবে সে সমাজে ।

খ) পরিবারাশ্রিত

মহাশ্বেতা দেবীর অন্ত্যজ জীবনশ্রয়ী পরিবার কেন্দ্রিক কিছু গল্পের বিষয় পরিবার গুলির বিপর্যয়-বিধ্বস্ত হওয়ার কাহিনী । পরিবার গুলির বিপর্যস্ত হওয়ার মূলে তাদের ধর্মপ্রথা ও ধর্ম বিশ্বাস । আবার কোন পরিবার অত্যাচারিত - লাঞ্ছিত । এই অত্যাচার ও লাঞ্ছনার প্রতিশোধ নিতে দেখা যায় কিছু গল্পে । এই পর্যায়ের গল্প গুলি হল - 'বায়েন' ও 'ধীবর'।

মহাশ্বেতা দেবীর 'বায়েন' গল্পটি কে ডোম পরিবারের বিপর্যয়ের কাহিনী । এই বিপর্যয়ের মূলে রয়েছে ডোম সমাজের বিশ্বাস-বায়েন প্রথা । গল্পে দেখি, মলিন্দর গঙ্গাপুত্র ও চন্ডীদাসের সুখের সংসার ছিল । মলিন্দর সরকারী লাশ ঘরের ডোম । আর চন্ডীর বাবা ছিল শ্মাশান ডোম । মৃত বাচ্চাদের মাটিতে পুঁতে দেওয়াই ছিল চন্ডীর বাবার কাজ । বাবা মারা গেলে চন্ডী সে কাজের ভার নেয় । এই ভাবে মলিন্দার চন্ডীর দিন চলছিল সরেস গতিতে । এর মধ্যে চন্ডীর এক পুত্র সন্তান জন্মাল - ভগীরথ । ভগীরথ-এর জন্মের পর নিজ পেশায় নিষ্ঠুরতা চন্ডী ডোমকে উন্মনা করে দিল। এর মধ্যে চন্ডীর ননদ তার ফুটফুটে মেয়েকে নিয়ে গ্রামে এলে প্রবল বসন্তের প্রকোপে মেয়েটি মারা গেল । ঐ মেয়েটিকে মাটিতে পুঁতে দেওয়ার সময় নাকি চন্ডীর বুকের দুধ গাড়িয়ে পড়েছিল, অন্য একদিন জল - বৃষ্টির রাতে গ্রামবাসী সকলে চন্ডীকে শ্মশানে দেখল একটি বাচ্চার মৃতদেহ ডাল - কাঁটা দিয়ে ঢেকে দিচ্ছে, এ দৃশ্য অন্য সকলের সঙ্গে মলিন্দারও দেখে । ঐ অবস্থায় চন্ডীর বুক থেকে দুধ ঝরে পড়েছে । লোকে প্রচার করল, চন্ডী মৃত বাচ্চাকে দুধ খাওয়াচ্ছে । ফলে গ্রামাবাসীর সাথে মলিন্দার বিশ্বাস করল তার বউ বায়েন ।

" ঢোলে কাঠি দিয়ে গ্রাম কাঁপিয়ে চেঁচিয়ে উঠেছিল আমি মলিন্দার গঙ্গাপুত্র শোহরৎ দেয়, আমার বউ বাঁয়েন হ্যাছে গো বাঁয়েন হয়্যাছে ।"

বায়েনকে গ্রামে থাকতে নেই । গ্রামের বাইরে জঙ্গলের মধ্যে চলে যেতে বাধ্য হল চন্ডী । ভেঙে গেল তার সুখের সংসার । নিজ পুত্র ভগীরথের জন্য তার হৃদয় স্নেহ বুভুক্ষায় বিদীর্ণ হলেও ছেলেকে কাছে পাওয়ার দাবি তার নেই । সমাজের অন্ধ প্রথা তা কেড়ে নিয়েছে । মলিন্দার ভালবাসত স্ত্রীকে । ভেঙে পড়ল মালিন্দারও । একদিন দুর্বৃত্তদের হাত থেকে ট্রেন অ্যাক্সিডেন্ট বাঁচাতে গিয়ে চন্ডী ট্রেনের ধাক্কায় মারা গেল । - ধ্বংস হয়ে গেল একটি সুখী ডোম পরিবার, বিপর্যয়ের অন্ধকার এ বিনষ্ট হল সুখী দাম্পত্য জীবন ।

মহাশ্বেতা দেবীর 'ধীবর' গল্পে অত্যাচারিত লাঞ্ছিত এক ধীবর পরিবারের বিনষ্টির কথা যেমন চিত্রিত তেমনি সে অত্যাচার লাঞ্ছনার বিরুদ্ধে প্রতিশোধ গ্রহণের কথাও অঙ্কিত । গল্পে

দেখি, থানা পুলিশ জগৎ সাঁর রাজনীতি করা ছেলেকে খুন করেছে । জগৎ সাঁ মানুষটা সাদাসিধে । পুলিশের ইনফরমেশনে রায়পুকুরের তলা থেকে খুন হওয়া মৃত লাশ তোলা তার পেশা; এতদিন জগতের মাথায় ঢুকত না এত লাশ রায় পুকুরে আসে কোথা থেকে । ছেলে অভয় খুন হওয়ার পর থেকে সে সমস্তই আন্দাজ করতে পারে । তাই সে থানায় যায় । বড় দারোগাকে ছেলের কথা জিজ্ঞাসা করে আর এই প্রথম থানার পক্ষ থেকে তার সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করা হয় । ফিরে আসে জগৎ । তবে প্রতিশোধ গ্রহণের জ্বালা বুকে নিয়ে তক্কে তক্কে থেকে সে পুত্রের মৃত্যুর শোধ নেয় । সাইকেল শুদ্ধ থানার বড় বাবুকে রায় পুকুরের নিচে পুঁতে ফেলে । সে প্রতিশোধ নিয়ে তৃপ্তির হাসি হাসে ঃ

"জগৎ একটা দুর্বোধ্য হাসি হাসে । ছেলে মরে যাওয়ার পর এত সদ্য সদ্য ওর মুখের হাসি দেখে ছোট দারোগাবাবু আজ অবাক হয়ে যায়।" (ধীবরঃ দেবী মহাশ্বেতা)

- সত্তরের দশককে মুক্তির দশক বানাতে যে সমস্ত যুবক একদিন আন্দোলনে মেতে ওঠেছিল তাদের উপর নেমে এসেছিল পুলিশের বুলেট, নিশ্চিত অত্যাচার ও মৃত্যুর করাল থাবা । 'ধীবর' গল্পে সেই অত্যাচার লাঞ্ছনার চিত্র বাস্তব সম্মতভাবে চিত্রিত ।

গ) গোষ্ঠীজীবনাশ্রিত

মহাশ্বেতা দেবীর অন্ত্যজ জবীবনাশ্রয়ী অনেক গল্পে যেমন অন্ত্যজ মানুষের ব্যক্তি জীবন ও পরিবার জীবনের কথা সুচিত্রিত তেমনী বেশ কিছু গল্পে অন্ত্যজ মানুষের গোষ্ঠী কেন্দ্রিক জীবন ও সমাজবদ্ধ জীবনের কাহিনী বিষয় হিসেবে গৃহীত । প্রায়শ ক্ষেত্রে অন্ত্যজ মানব সমাজের আচার-বিচার, অত্যাচারিত-শোষিত, রূপ তাদের প্রতিবাদ-সংগ্রাম, হিংস্রতা, রহস্যময়তা; তাদের আনন্দানুষ্ঠান ও তজ্জনিত আনন্দমত্ততা এবং মানবিকতাকে বিষয় করে এই পর্যায়ের গল্প রচিত হয়েছে । মহাশ্বেতা দেবীর 'চড়ক' গল্পটিতে অন্ত্যজ জীবনের এরূপ ভাবরূপ প্রতিফলিত ।

'চড়ক' গল্পটিতে রঙ্কেশ্বরী নদীর তীরে অবস্থিত শাঁকাটা গ্রামের ডোমদের গোষ্ঠীবদ্ধ জীবনের পতন - বিপর্যয় ও তাদের প্রতিবাদ চেতনার কথা বিষয় হিসেবে গৃহীত হয়েছে। শাঁকাটা গ্রাম শাসন করে ধনী গৃহস্থ হরিপদ ডোম । রাজনীতির সুবিধাবাদী অবস্থান সুযোগ নিয়ে হরিপদ ফুলে ফেঁপে উঠেছে ।গ্রামে টিউবওয়েল বসানোর ঠিকাদারী নিয়ে সে বহু টাকা মুনাফা পায় । অথচ টিউবওয়েল গুলো অতি সত্তর বিকল হয়ে পড়ে । ডোম যুবক বুধিরাম হরিপদের এমন ফাঁকিবাজির বিরুদ্ধাচারণ করে । সে বি. ডি. ও . কে বলে গ্রামে দশটা কুয়ো খুঁড়িয়ে নেয় । বুধিরামের এমন ব্যবহারে হরিপদ অসন্তুষ্ট হয় । অসন্তোষ ক্রোধে পরিণত হয় । যখন সে দেখে ডোমরা আগের মতো বাবু বলে সম্মান দিতে অস্বীকার করছে। বুধিরামের সঙ্গে হরিপদের বিরোধ তুঙ্গে ওঠে । রঙ্কেশ্বরীর খাশ জমির বাঁশ কেনা বেচাকে কেন্দ্র করে । বাঁশ-ঝাড় হরিপদ লিজ নিয়ে রেখেছে। হরিপদ হঠাৎ বাশেঁর দাম বাড়িয়ে দেয় । বুধিরামের নেতৃত্বে ডোমেরা বাড়তি দাম দিতে অস্বীকার করে । তারা জোর করে বাঁশ কাটে । নইলে জীবিকা চালানো দায় হয়ে পড়ে । হরিপদকে পুরনো দামে বাঁশের

দাম দেয়। এ ঘটনায় হরিপদ থানায় গিয়ে বুধিরামের নামে ডায়েরি করে রাখে। কিছু দিন বাদে, অজ্ঞাত আততায়ী কর্তৃক হরিপদ আহত হয়ে বুধিরামের নামে থানায় ডায়েরি করে। পরিনামে বুধিরামকে বিনা-বিচারে আট-আটটি বছর জেল খাটতে হয়। এর মধ্যে তার সংসার ধ্বংস হয়ে যায়। বউ বিলাসী পাড়ার কোন এক যুবক ছেলের সাথে শহরে পালিয়ে গেছে। জেল-ফেরত বুধিরাম নিজের ভাঙা ঘর পুনরায় বাধে। ততদিনে ডোম সমাজ অর্থাভাবে ছিন্ন ভিন্ন হয়ে যাবার মুখে। এরই মধ্যে এসে পড়ে তাদের সব থেকে বড় পরব চড়ক উৎসব। ডোমেরা আগে মৃত দেহের হাত-পা-মাথা নিয়ে এই উৎসবে নৃত্য-গীত করত । এখন করে খড়ের তৈরী মানুষের হাত, পা, মাথা নিয়ে। এবারের চড়কের বুধিরাম যোগ দেয় । নাচতে নাচতে সে হঠাৎ উধাও হয়ে যায়। কিছুক্ষণ পরে সে একটা রক্তমাংসের মানুষের কাটা মুন্ড এনে নাচতে শুরু করে । সবাই দেখে মুন্ডটি হরিপদ ডোমের । সবাই উল্লাসিত হয়ে ওঠে এত দিন কার বঞ্চনার প্রতিশোধ নিতে সবাই সেই মুন্ড নিয়ে সংঘবদ্ধ নৃত্যে মাতোয়ারা হয়ে ওঠে ।

ঘ) ধর্মাশ্রিত

মহাশ্বেতা দেবীর অন্ত্যজ জীবনাশ্রয়ী কিছু গল্পের বিষয়ের কেন্দ্রে রয়েছে অন্ত্যজ মানুষের ধর্মীয় জীবন ও ধর্মাচরণ । কোন গল্পে ধর্ম বিশ্বাসী মানুষ ধর্মকে জীবনের মোক্ষ ভেবে ধর্মাচরণে মগ্ন থেকেছেন । কোথাও আবার ধর্ম বিশ্বাসকে অতিক্রম করে গিয়ে বিদ্রোহ ও প্রতিবাদের মাধ্যমে অন্ত্যজ মানুষ ব্যতিক্রমী দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে । এই ধরণের একটি গল্প হল 'বড়াম মায়ের থানে'।

'বড়াম মায়ের থানে' গল্পের বিষয় হয়েছে –কীভাবে এক সাঁওতাল যুবক, দেবী বড়াম মাকে ব্যবহার করে তাদের ওপর নেমে আসা অত্যাচারকে রুখে দিয়েছে - সেই কাহিনী । গল্প কাহিনীতে দেখি, মোহনচাঁদ বাড়ি গ্রামের উচ্চবর্ণীয় হরকান্ত মহাপাত্রজীর পারিবারিক মন্দিরের দেবতা মোহনচাঁদজীউ এর সোনার মূর্তি ও সোনার গয়না চুরি গেছে । এই চুরি মন্দিরের পুরোহিত ও তার ভাইপো মিলে করলেও, দোষ হয়েছে সাঁওতালদের। পুলিশ এসে সমস্ত সাঁওতালকে আটকে রেখেছে। যুরক রতন হেমব্রম এর বিরোধিতা করে। সে পুলিশ কে জানায় কোন সাঁওতালই হরকান্তজীর বাড়িতে ঢোকেনা - তাই - এ-চুরি সাঁওতালরা করে নি । কিন্তু রতনের কথা ধোপে টেকে না । বরঞ্চ পুলিশের হাতের চপেটাঘাত রতনকে হজম করতে হয় । এই ঘটনায় সাঁওতালরা ক্রুদ্ধ হয় । তারা পুলিশকে অমান্য করে বেরিয়ে আসে। এর মধ্যে রতন নিখোঁজ হয় । সে ছাউনিহীন তাদের দেবী বড়াম - মায়ের থানের কাছে অবস্থিত একটা বড় গাছের ডালে বসে এই ঘটনার প্রতিকারের উপায় খুঁজতে থাকে । যখন ঘোর- চিন্তামগ্ন তখনই শোনে গাছের নীচে দাঁড়িয়ে মোহন চাঁদজীউ মন্দিরের পুরুত ও তার ভাইপো সনাতন ষড়যন্ত্র কষছে । তাদের কথোপকথনে রতন জেনে নেয় সোনার ঠাকুর এবং সোনার গয়না সব রয়েছে পুরুত - ঠাকুরের ঘরের দাওয়ায় পোতা। মুহূর্তেই রতনের মাথায় বুদ্ধি খেলে যায় । সে তার অন্য বন্ধুদের সঙ্গে যুক্তি করে ঠিক করে পুরুতকে ধরিয়ে দেওয়ার আগে হরকান্তজীর কাছ থেকে বড়াম মায়ের মন্দিরটা পাকা করে নিতে হবে । সেই সাথে আদায়

করতে হবে নগদ টাকা ।

ছক অনুযায়ী সে দিন সন্ধ্যা বেলা রতনের ওপর বড়াম মায়ের ভর হয় । গ্রামবাসীরা ছুটে আসে । ছুটে আসে ধর্মাপ্রাণা হরকান্তজীর মা। সঙ্গে দারোগা ও হরকান্তবাবু স্বয়ং । নিজেদের গৃহদেবতা মোহনচাঁদজীউকে উদ্ধারের আশায় রতন রূপী বড়াম মায়ের কাছে কেঁদে পড়েন হরকান্ত বাবুর মাতা ঃ

" বল মা কি করতে হবে ?

- এই যে আমি ভাঙা ঘরে থাকি , আমার ভক্তজন এসে জলে ভেজে রোদে পোড়ে .....

- মাগো পাকা মন্দির করে দেব , সামনে ছাউনি দেওয়া চাতাল থাকবে ।

-পূজা হলে পূজা পাঠাস ?

- পাঠাবো গো মা ।

.....

-ঠাকুর পেলে আমাকে মন তুষ্ট করে পূজো দিবি ? পাঁচশো একটাকা দিয়ে ?

- দেব গো মা ।" (বড়াম মায়ের থানে ঃ দেবী মহাশ্বেতা)

হরকান্তবাবুর মা একটার পর একটা প্রতিশ্রুতি দিয়ে যাচ্ছেন শুনে স্বয়ং হরকান্তবাবু ভীত হয়ে পড়েন। কিন্তু সম্পত্তি সব তাঁর মায়ের - এই সমস্ত কিছু মেনে নিতে হচ্ছে তাঁকে । সমস্ত প্রতিশ্রুতি আদায় করে নেওয়ার পর রতন আসল কথা ফাঁস করে বলে দেয় ; হরকান্তবাবুদের ঠাকুর রয়েছে মন্দিরের পুরুত ঠাকুরের বাড়িতে, ঘরের মেঝের নিচে। দারোগা তৎক্ষনাৎ সেখানে ছোটেন। মাটি খুঁড়ে সব পাওয়াও যায় । দারোগা পুরুত ও তার ভাইপোকে ধরে নিয়ে য়ায় । এই উপলক্ষ্যে বড়াম মায়ের থানে জোর পূজা হয় । ভোজ হয় । গ্রামের রতনের মর্যাদা বেড়ে যায়। - অর্থাৎ দেখা যাচ্ছে এখানে দেবতা বড়াম মাকে তথা ধর্মকে ব্যবহার করে অন্ত্যজ সাঁওতালরা নিজেদের অস্তিত্বকে শক্ত পোক্ত করে নিয়েছে ।

ঙ) চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যাশ্রিত

কি গল্পে কি উপন্যাসে চরিত্র চিত্রণ একটি গুরুত্ব পূর্ণ ব্যাপার । চরিত্র নির্মাণের নৈপুণ্যের উপর লেখকের সার্থকতা অনেকাংশেই নির্ভর করে । এই চরিত্র চিত্রণগত দিকের বিচারে বলা যায়, মহাশ্বেতা দেবীর অন্ত্যজ জীবন নির্ভর ছোট গল্প গুলি বাংলা ছোট গল্পের চরিত্রশালাকে বহুল পরিমানে সমৃদ্ধ করেছে । বিচিত্র ধরণের অন্ত্যজ চরিত্র কখনো গল্পের কেন্দ্রে থেকে, কখনো বা পার্শ্বচরিত্ররূপে অন্ত্যজ জীবনের আনন্দ-বেদনা-হাসি-কান্না-করুণা-মানবিকতা-সহানুভূতি-প্রতিশোধ -প্রতিবাদের চালচিত্রকে প্রস্ফুটিত করেছে । আলোচ্য পর্যায়ের গল্প-সমূহে পুরুষ ও নারী চরিত্রের অধিকাংশই বৈশিষ্ট্যে উজ্জ্বল এবং বৈচিত্র্যে আকর্ষণীয় । বৈচিত্র্যের বিভিন্নতায়, বৈশিষ্ট্যের স্বাতন্ত্র্যে অন্ত্যজ চরিত্র গুলি মানব জীবনের অপার রহস্য চেতনায় মুখর । কত ভিন্ন ভিন্ন মন মর্জি ও ভাবের মানুষের ভিড় এখানে ।

পুরুষ চরিত্র

মহাশ্বেতা দেবীর অন্ত্যজ জীবনাশ্রয়ী ছোট গল্পগুলিতে প্রাপ্ত পুরুষ চরিত্র গুলির স্বভাব ও স্বরূপ মনোগত বৈশিষ্ট্য বিচারে নানা রকমের মানুষের সন্ধান পাওয়া যায় । সাদা-সিধে ভাল মানুষ থেকে শুরু করে আদিম-হিংস্র মতি গতির বিচিত্র প্রকার মানুষ এই শ্রেণীর গল্পের আশ্রয় হয়েছে ।

এই পর্যায়ের কিছু গল্পে । কেউ মহানুভব, সৎ , সাদা-সিধে । কেউবা আবার মর্যাদায় আসীন। আর আত্মমর্যাদা রক্ষার কারণে প্রতিবাদী । কেউবা আবার ট্র্যাজিক চরিত্র । তাদের ট্র্যাজেডি ঘনীভূত হয়েছে। তাদের আকাঙ্ক্ষার নিবৃত্তি না ঘটার কারণে । মহাশ্বেতা দেবীর গল্প গুলি বিশ্লেষণ করলে উক্ত চরিত্র গুলির পরিচয় পাব।

মহাশ্বেতা দেবীর 'সমাজবাদ ববুয়া' গল্পের জংলী বেরসা সরল সাধাসিধে সাধারণ মানুষ। যদিও তার চরিত্রের আপাত সরলতার মধ্যে একজন সচেতন মানুষের মননটি প্রচ্ছন্ন ভাবে তার চিন্তায় ও ভাবনায় লুকিয়ে রয়েছে । নিতান্ত দীন-দরিদ্র খেটে খাওয়া মেহনতি মানুষ জংলী দিনের পর দিন অত্যাচার - অবিচার সহ্য করতে করতে প্রতিবাদী চরিত্রে পরিণত হয়েছে সাঁওতাল। সন্তান জংলী বেরসা তার গ্রামের সুরেন সিংহের নিকট থেকে একটি সমাজবাদ মূলক গান শিখেছিল। জংলী গানটির অর্থকে হৃদয়ঙ্গম করতে না পারলেও সর্বক্ষণ গুন গুন করে তা গাইতে । আর এই গানের কারণেই সে একের পর এক অত্যাচারের সামনে পড়েছে । শারীরিকভাবে লাঞ্ছিত হয়েছে । অবশ্য ,এই অত্যাচার লাঞ্ছনা প্রাপ্তির ফলেই সে প্রতিবাদী হয়ে উঠেছে । ঠিকাদার মুটুকলালকে সে শারীরিক ভাবেই আঘাত করেছে। কেননা, মটুকলালের কারণেই ১৮ জন মজুর মাটি চাপা পড়ে মৃত্যুমুখে পতিত হয় এই ঘটনা সরলমতি জংলীকে বিদ্রোহী করে তুলেছে। সে বাঘের মতো হিংস্রতা নিয়ে মুটুকলালকে আক্রমণ করেছে ঃ

" জংলী বাঘের মতো ছুটে গিয়েছিল , মুটুকলালকে পিটাতে লেগেছিল ।"

(সমাজবাদ ববুয়া ঃ দেবী মহাশ্বেতা)

জংলী বেরসার চরিত্রের এই উত্তরণ তাকে সচেতন - সংগ্রামী চরিত্রে জন্মান্তরিত করেছিল। জংলী বেরসা মহাশ্বেতা দেবীর অনবদ্য চরিত্র নির্মাণ দক্ষতার পরিচয়বহ ।

মহাশ্বেতা দেবীর 'লাইফার' গল্পের মাগন সাঁওতাল নিতান্ত সাদাসিধে সরল সাঁওতাল যুবক। স্বজাতের মানুষের প্রতি তার রহস্যময় ও ঐকান্তিক টান তাকে বিশিষ্ট করে তুলেছে । জীবনের সূচনালগ্নে স্ত্রী দনিকে হত্যা করে সে লাইফার হয় । তার পর জেল - ফেরত সে বড় একা হয়ে পড়ে। কেননা , তার বেঁচে থাকার জায়গা , শেকড় ছড়াবার মাটি যে সাঁওতাল পল্লী তা নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে । ফলে শূন্য ও উৎকণ্ঠিত - অনুসন্ধানী হৃদয় নিয়ে মগন তার নিজস্ব ভূমির খোঁজে ঘুরে বেড়ায়। স্বজাত - স্বজন সাঁওতালদের সান্নিধ্য পাওয়ার জন্য সে অস্থির হয় । স্বজাতির প্রতি অমোঘ টান অনুভব করে সে । গল্পে তার এমনতর মানসিক অবস্থার পরিচয় সুবিকশিত ঃ

" কে আছ গো সন্তাল হড় । সাড়া দেওগো । ...কতকাল স্বজাতির মুখ দেখি না , স্বজাতির ভাষা শুনি না , বড় ঘর পোড়া হয়ে আছে , দয়া করগো ।" (লাইফার ঃ দেবী মহাশ্বেতা)

- এ এক স্বজন হারা মানুষের অসহায় কান্নার করুণ রাগিনী । হৃদয়ভ্যন্তরের গহন প্রদেশ থেকে উত্থিত হয়েছে এই কান্না মাখা আর্তি । এক শিকড়হীন মানুষের শিকড় সন্ধানের আকুতি এখানে যেন জীবন্ত হয়ে ফুটেছে । শেষ পর্যন্ত অবশ্য মগন শেকড় ছাড়ার মতো স্বজাতের সন্ধান পেয়ে যায় । নিজের পরিচিত পরিজনদের খুঁজে না পেলেও সে অন্য একদল সাঁওতালদের পেয়ে যায় । অত্যন্ত স্বাভাবিকভাবে সে তাদের সঙ্গে মিশেও যায় । গল্পের মগন সঁওতাল আত্মানুসন্ধানী চরিত্র হিসেবে জীবন্ত - অনবদ্য ।

মহাশ্বেতা দেবীর 'ধীবর' গল্পের ধীবর জাতির পুরুষ জগৎ সাঁ প্রতিবাদী চরিত্র। নিতান্ত সাধাসিধে ভীরু স্বভাবের জগৎ একদিন অবস্থা ফেরে সাহসী ও প্রতিবাদী হয়েছে। জগতের পেশা লাশ তোলা। খুনের পর যে সমস্ত লাশকে বিভিন্ন পুকুরে ডুবিয়ে দেওয়া হয়, পুলিশ তাকে দিয়ে সেই সব লাশ তোলায়। থানা থেকে এর জন্য জগৎকে নগদ পারিশ্রমিক দেওয়া হয়। জগৎ এই দুঃসাহসিক কাজ পেশার কারণে করলেও স্বভাবত সে ভীরু। সে বোকা। তাই এতসব খুনোখুনিকে পাপ বলে ভাবে এবং এই পাপ ও নিষ্ঠুরতাকে সে ভয় পায় । ছেলে অভয়ের সঙ্গে কথোপকথনে সে তার এই ভয়ের কথা জানায় ঃ

"আমার ভয় করে অভয় ।
ভয় করে ?
মানুষকে । এই এত পাপ বাবা । এত পাতক ।"

(ধীবর ঃ দেবী মহাশ্বেতা)

শেষ পর্যন্ত এই পাপ ও ভীরুতার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ায় জগৎ । ধনুকের ছিলার মতো টান টান হয়ে ওঠে মেরুদন্ড । তার ছেলে অভয়কে পুলিশ খুন করেছে । এই কৈফিয়ৎ নিতে গিয়ে থানা থেকে তাড়া খেয়ে ফিরে আসে জগৎ । শুধু ফিরে আসে না । ফিরে দাঁড়ায়ও । ভীরুতার মুখোশ খুলে বেরিয়ে আসে এক প্রতিবাদী চরিত্র যে পুত্র হত্যার প্রতিশোধ নিতে থানার বড় বাবুকেই লাশ করে দেয় । রায় পুকুরে তলিয়ে দেয় ঃ

" জলের নিচে সব সবুজ শান্ত , অপার্থিব । দারোগাবাবু আর সাইকেলটা জড়িয়ে বাঁধা । অভয়ের গামছা দিয়ে ।" (ধীবর ঃ দেবী মহাশ্বেতা)

দারোগাকে লাশ করে দিয়ে অভয় - তৃপ্তি পায় । হাসে । দুর্বোধ্য হাসি হাসে । এখানেই জগৎ প্রতিবাদী চরিত্র হিসাবে সার্থক হয়ে ওঠে ।

মহাশ্বেতা দেবীর 'তরাস' গল্পের ডোম জাতের পুরুষ ডাকাত প্রতিবাদ - চেতনায় উদ্দীপ্ত চরিত্র । পেশাতে সে ক্ষেত- মজুর । কিন্তু নিজের গ্রামে সে উপযুক্ত মজুরী পায় না বলে পাশের গ্রামে মজুর খাটতে গেছে । এই সুযোগে ডাকাতের স্ত্রীর ইজ্জত নষ্ট করেছে গ্রামের ধনী বাসিন্দা পরিক্ষিত দত্ত । এই সংবাদ শুনে ডাকাত হিংস্র হয়ে উঠেছে । প্রতিবাদের আগুন বুকে নিয়ে গ্রামে ফিরে সে পরীক্ষিতকে খুন করেছে ঃ

" ডাকাত এতকথা বোঝে নি ।.... তখনই সে টাঙি মারে ছুঁড়ে, পরীক্ষিতের পায়ের হাড়ে

বসে যায় টাঙি । পরীক্ষিত মরে যায় রক্ত বিষিয়ে, মাস খানো পড়ে ।" (তরাস ঃ দেবী মহাশ্বেতা)

- এই খুনের দায়ে ডাকাতের জেল হয়েছে । বিচারাধীন বন্দীরূপে সে জেলে গেছে ।- এই ডাকাত সচেতন চরিত্রও । তাদের ফুরন চুক্তির কাজে লাগিয়ে জমির মালিকেরা যে ঠকিয়ে নেয় তা সে তার সচেতনার কারণেই বুঝতে পারে বলেই মনি নস্করকে তার প্রতিকার করতে বলে । একা প্রতবাদী সচেতন চরিত্র হিসাবে ডাকাত চরিত্রটি মহাশ্বেতা দেবীর সার্থক সৃষ্টি।

মহাশ্বেতা দেবীর ' চড়ক ' গল্পের বুধিরাম ডোম প্রতিবাদ - চেতনায় উজ্জীবিত এক বলিষ্ট চরিত্র । সুবিধাবাদী রাজনীতির ফায়দা লুটে তাদের সমাজের হরিপদ ডোম স্বজাতির মানুষের উপরে যে শোষণ চালায় সাতাশ বছরে বুধিরাম তার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ায় । সে নিজ সমাজের উন্নতির স্বার্থেই নিজেকে নিয়োজিত করে । টিউবওয়েল বসানোর ঠিকাদারি নিয়ে অধিক পরিমান মুনাফা লাভের আশায় হরিপদ যেমন তেমন করে টিউবওয়েল বসায় । দুদিনেই তা বিকলও হয়ে পড়ে । এই ফাঁকিবাজির বিরুদ্ধে পাড়ার পাঁচজনকে নিয়ে বুধিরাম মহকুমা হাকিমের কাছে দরখাস্ত দেয় । সেই সাথে হাকিমের কাছ থেকে দশটি কুয়ো কাটানোর আবেদন পাশ করিয়ে আনে । ফলে হরিপদ ব্যবসায়ীর ঠিকাদারি ব্যবসা মার খায় বুধিরামের প্রতিবাদী মানসিকতার জন্য । অন্ত্যজ জনসমাজে বুধিরামের মতো সচেতন ও প্রতিবাদীচরিত্র খুব কম দেখা যায় । কারণ নিজ উদ্যোগে সে যে এমন কাজ করেছে তেমন উদাহারণ এই সমাজে বিরল । বুধিরাম হরিপদর বিরুদ্ধে দ্বিতীয়বার সংগ্রাম ও সংঘর্ষে নামে বাঁশ কাটা ও বাঁশের দাম বৃদ্ধির প্রতিবাদের নেতৃত্ব দিয়ে । বঙ্কেশ্বরীর খাস জমি ইজারা নিয়ে তার বাঁশের দাম হঠাৎ করে হরিপদ বাড়িয়ে দিলে বুধিরাম সক্রিয় হয় । প্রথমে, হরিপদকে বুঝিয়ে বলার পর তাতে কাজ না হওয়ায় বুধিরাম পাড়ার লোকজন নিয়ে পুরানো দাম দিয়েই জোর করে বাঁশ কাটে । এতে আর্থিক সংকটের হাত থেকে ডোম সমাজ রেহাই পায় ।

- এভাবেই বুধিরামের প্রতিবাদী মানসিকতা পুষ্টি পায় । যদিও তার প্রতিবাদ চেতনার চরম উগ্রতা ও হিংস্রতা প্রকাশ পায় অন্যায় ভাবে আটবছর জেল খেটে সে বাড়ি ফেরার পর । হরিপদ প্রতিশোধাকাঙ্ক্ষায় অন্যায় ভাবে বুধিরামকে জেলে পাঠিয়েছিলেন । সেই হিসাব বুধিরাম কড়ায় - গন্ডায় বুঝে নেয় হরিপদকে খুন করে তার ছিন্ন মুন্ড নিয়ে উদ্দাম নৃত্য করে । ডোমদের বিখ্যাত চড়ক পরবে এককালে মৃত মানুষের ছিন্ন হাত পা মাথা নিয়ে নৃত্য করার রেওয়াজ থাকলেও বর্তমানে সবাই খড়ের তৈরী নকল মানুষের হাত-পা-মাথা নিয়ে আনন্দ করতেই অভ্যস্ত । কিন্তু জেল ফেরত সর্বশান্ত বুধিরাম প্রতিবাদের আগুনে এমন উত্তপ্ত ছিল যে এবারের পরবে হরিপদকে খুন করে তার কাটা মুন্ড নিয়ে নাচতে আসে ঃ

"বুধিরাম সেখানে নরমুন্ড ধরে নাচতে নাচতে ঢোকে । উন্মত্ত নাচ । ওরে শালারা , খড়ের মাথা লিয়ে লাচ করিস ? বুধিরাম খড়ের মাথা লিবে নাই । আমার হাতে শত্তুরের মাহারে , শত্তুরের মাথা ।" (চড়ক ঃ দেবী মহাশ্বেতা)

-প্রতিশোধ নিয়ে , শত্রু নিধন করে উন্মত্ত নাচ নাচে বুধিরাম । তার সঙ্গে যোগদান করে সমস্ত ডোম সমাজ । এখানেই বুধিরাম ব্যক্তি থেকে সমগ্র সমাজের প্রতিনিধি হয় । তার প্রতিবাদী মানসিকতাই তাকে এমন উত্তরণে উন্নীত করেছে ।

মহাশ্বেতা দেবীর 'বড়াম মায়ের থানে' গল্পের রতন হেমব্রম প্রতিবাদী ও যুক্তিবাদী চরিত্র। সে ধর্ম অবিশ্বসী চরিত্র। যদিও যে সাঁওতাল সমাজে রতনের বাস,তারা সবাই বড়াম মায়ের ভক্ত। সাঁওতালদের মতে বড়াম মা বড় জাগ্রত দেবতা। অন্যদিকে গ্রামের ধনী মানুষ হরকান্ত মহাপাত্রের গৃহদেবতা মোহনচাঁদ জীউও বড় জাগ্রত দেবতা বলে লোকবিশ্বাস। কিন্তু স্কুলে পড়া যুবক রতন হেমব্রম এই সব দেবতার উপর চরম অবিশ্বাসী। তার ভাবনায় ও কথায় এই অবিশ্বাসী ধরা পড়েঃ

এক) " রতন বলে , হ্যাঁ , খুব জাগ্রত। তাতেই যারা বড়াম মায়ের ভক্ত তাদের পেটে ভাত নেই। যারা বড়ামকে মানে না , সেই হরকান্তবাবু রোজ ভাত খায়।"

দুই) " মোহনচাঁদ জীউ বা কেমন জাগ্রত ? পুরুত বলে , খুব জাগ্রত। তখন রতন বলে, সনাতন যখন বাসন চুরি করছিল তখন জাগ্রত ঠাকুর কি মজা দেখছিল ?"

(বড়াম মায়ের থানেঃ দেবী মহাশ্বেতা)

- এমনই যুক্তিবাদের উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে রতনের মন - মানসিকতা। যখন রতনরা সপরিবারের কোন রকমে দু মুঠো অন্ন মুখে তোলে তখন পিতলের ঠাকুরের জন্য রাজ ভোগের বন্দোবস্ত দেখে রতনের মন বিদ্রোহ করে ওঠে। ধর্ম ও দেবতার পতি তার অবিশ্বাস আরও বেড়ে যায়। রতনের এমন অবিশ্বাসী স্বভাব ও মনোধর্ম সাঁওতাল সমাজে তাকে স্বতন্ত্র বলে প্রতিপন্ন করেছে। সাঁওতাল সমাজের ধর্ম বিশ্বাসের মর্মমূলে কুঠারাঘাত হেনেছে রতনের একটি অভিনয়। হরকান্তবাবুর বাড়ির সোনার ঠাকুর ও তার বাসন পত্র চুরি করেছিল ঠাকুরের পুরুত ও তার ভাইপো সনাতন যোগ সাজস করে। রতন তাদের শলা - পরামর্শের কথা শুনে ফেলেছিল। শুনে ফেলেছিল , লুক্কায়িত ঠাকুর ও বাসনপত্র কোথায় আছে সেই গুপ্ত স্থানটির ঠিকানাও। এরপর রতন তার বন্ধুদের সঙ্গে পরামর্শ করে ঘোষণা করে , তার উপর বড়াম মায়ের ভর হয়েছে। এই ভরের অনুষ্ঠানে রতন সব ফাঁস করে দেয়।

- রতনের এ সমস্ত কাজ সবই তার যুক্তিবাদী মানসিকতাকেই প্রকাশ করে। সে অন্ত্যজ সাঁওতালদের জীবনদর্শন ও জীবন ভাবনার বাইরেকার সৃষ্টি হিসাবে সার্থক ও জীবন্ত।

নারী চরিত্র

মহাশ্বেতা দেবীর অন্ত্যজ জীবনাশ্রয়ী ছোটগল্পে চিত্রিত নারী চরিত্রের স্বরূপ ও বৈশিষ্ট্য নির্ধারণে প্রবৃত্ত হয়ে দেখি, চরিত্র গুলি বৈচিত্র্যে উজ্জ্বল, বৈশিষ্ট্যে আকর্ষণীয়। বিচিত্র মত-মতি ও মানসিকতার নারী চরিত্রের ভিড় ছোট গল্প গুলিকে স্বতন্ত্র করেছে। ছোট গল্পে চিত্রিত নারী চরিত্রের অধিকাংশই অত্যাচারিত, অবহেলিত, লাঞ্ছিত চরিত্র, কখনো পুরুষের কামনা-বাসনার বলি তারা, কখনো অর্থহীনতার কারণে লাঞ্ছিত। কেউবা আবার মানবিক আবার কেউবা সৎ, ভালমানুষ। মহাশ্বেতা দেবীর 'তারাস' ও 'বায়েন' গল্প দুটি বিশ্লেষণ করলেই উক্ত মন্তব্যের যথার্থতা বুঝতে পারব। 'তরাস' গল্পের সাজু বাগদি চরিত্রটি দ্বিবিধ বৈশিষ্ট্য জীবন্ত, যেমন -

এক) সাজু অত্যাচারিতা - লাঞ্ছিতা চরিত্র।

দুই) সাজু অনন্য জীবনী শক্তির অধিকারিণী

এই দুই বৈশিষ্ট্যের মেল বন্ধনে সাজু জীবনবাদের প্রতিভূ। ধনিক শ্রেণীর মানুষের ও পুলিশের হাজারো লাঞ্ছনার বিরুদ্ধে গিয়ে সাজু মাথা তুলেছে বেঁচে থাকার জীবনভূমিতে ।

সাজুমণি ওরফে বাগদি অত্যাচার-লাঞ্ছিত নিপীড়িত নারী। তার যুবতী বয়স। সোমত্ত শরীর। স্বামী তার জীবিকার তাগিদে দূর দেশে থাকে । এই সুযোগে ধনিক শ্রেণীর প্রতিভূ জমির মালিক পরীক্ষিত দত্ত তার ইজ্জৎ লুটে নেয়। শুধু পরীক্ষিত দত্ত নয়, থানার পুলিশও তার দেহে বসায় লালসার নখর ঃ

এক) "সেদিনই সাজুর ঘরে হঠাৎ করে ঢুকে পড়ে পরীক্ষিৎ। সেদিন সাজুর কোমরে কাটারি থাকেনা।"

দুই) "রাতে দারোগা বিবাদী পক্ষে যোগ দেয়, সাজুমণিকে যথেচ্ছ ছিঁড়ে খুঁড়ে এজাহার নেয়। তার পর তুলে দেয় কনস্টেবলের হাতে।" (তরাস ঃ দেবী মহাশ্বেতা)

আসামি পরীক্ষিত দত্ত সাজুর স্বামী ডাকাত বাগদীর হাতে এই কারণে খুন হলে কেস উল্টে যায় । কোন সুবিচার পায় না সাজু । বরং চরম দারিদ্রের মধ্যে পড়ে অর্ধাহারে অনাহারে দিন কাটাতে থাকে । এটাই অসহায় সাজুর লাঞ্ছনা প্রাপ্তির চরম উদাহরণ।

কিন্তু এতে দমে যায় না সাজু । তার জীবনীশক্তি অদম্য। অত্যাচার-লাঞ্ছনাকে দূরে সরিয়ে সাজু বেঁচে থাকার লড়াই শুরু করে । বেঁচে থাকার অদম্য ইচ্ছা শক্তি নিয়ে রাতের আঁধারে খাদ্যের অনুসন্ধানে নামে । দুদিনের উপবাস কাটিয়ে সে পরীক্ষিত দত্তের শ্রাদ্ধ - উপলক্ষ্যে অশরীরি আত্মাদের প্রদত্ত খাদ্য 'তরাস' খেয়ে দেহে শক্তি সঞ্চয় করে । তার পর নিজের শ্রমের বিনিময়ে সংসারকে বাঁচিয়ে রাখার প্রতিজ্ঞায় দৃঢ়বদ্ধ হয়। এখানে এই প্রতিজ্ঞার মধ্যেই সাজু চরিত্রের আশাবাদ প্রোথিত। তার স্বাতন্ত্র্যও এই সূত্রে সূচিত ।

মহাশ্বেতা দেবীর 'বাঁয়েন' গল্পের ডোম কন্যা ও ডোমবধূ চন্ডী গঙ্গাদাসী মানবীয় বৃত্তি ও মানবীয় বৈশিষ্ট্যে উজ্জ্বল। মানুষ-সুলভ আচার-আচরণেই তার চরিত্র বৈশিষ্ট্য মন্ডিত হয়েছে । অথচ সমাজ তাকে লাঞ্ছিত করেছে, অত্যাচারিত করেছে। চন্ডীর পেশা ছিল ভয়ানক। যে সমস্ত মৃত বাচ্চাদের পোড়নো হত না, তাদের একটি নির্দিষ্ট স্থানে পুতে দেওয়াই ছিল চন্ডীর কাজ। এ কাজে তার কোন ভয় ছিল না। বরং খানিকটা নিষ্ঠুর ও ভয়ানক ছিল সে। যদিও তার এই নিষ্ঠুরতা ও ভয়ঙ্করতার অবসান ঘটে তার অপত্য বাৎসল্য-প্রেমের উদ্বোধনের পর। পুত্র ভগীরথকে জন্ম দেওয়ার পর তার মনে-মননে যে মাতৃপ্রেমের জন্ম হয়েছিল, সেই মাতৃস্নেহই চন্ডীকে তার নিষ্ঠুর পেশার বিরুদ্ধে নিয়ে গেছে । সে এখন ঐ নিষ্ঠুর পেশাকে অবলম্বন করতে চায় না ঃ

" ভগমান - ভগমান- ভগমান ... চন্ডী গুন গুন করে কাঁদত । এক ছুটে চলে আসত বাড়ি।... এই সময়ে চন্ডী সব সময়ে কামনা করত গ্রামের প্রতিটি শিশু যেন অখন্ড পরমাত্মা নিয়ে বেঁচে, জীয়ে থাকে ।" (বাঁয়েন ঃ দেবী মহাশ্বেতা)

- শেষ পর্যন্ত চন্ডী ছেড়েও দেয় এই নিষ্ঠুর কাজ । মানবিকতায় উত্তীর্ণ এক নারী এখন ঐ নিষ্ঠুরতার

আবেশের মধ্যে থাকতে চায় না । ছোট ছোট শিশু সন্তান গুলোর প্রতি এক ধরণের অপত্য টান অনুভব করে চন্ডী । এই অপত্য স্নেহের টানেই সে পেশা ছেড়ে দেওয়ার পরও বটতলার শ্মশান ভূমিতে যেত । উদ্দেশ্য - সদ্যমৃত কোন শিশুকে শিয়ালে টেনে নিযে গেল কিনা তা পর্যবেক্ষণ করা । এতো চরম মানবিক সহানুভূতি ও চরম অপত্য স্নেহের পরিচায়ক । কিন্তু চন্ডীর এই কাজকে লোকে ভুল বুঝলো । লোকে তাকে বাঁয়েন বলে ঘোষণা করল ও পরিত্যক্ত করল , তাকে বাড়ি ছাড়া করে গ্রামের বাইরে করে দিল ।

কিন্তু এমন ভয়ঙ্কর সাজা প্রাপ্তিতেও চন্ডীর মধ্যেকার মানবিকতাবোধ লুপ্ত হল না। বরং এই সূত্রে তার জীবনে ট্র্যাজেডি নেমে এল। চন্ডী সম্পূর্ণ রূপে মানুষ হতে চেয়েছিল, ঘরকন্না করতে চেয়েছিল। অথচ তাকে বাঁয়েন ঘোষণা করে তার মানবীয় বৃত্তির মর্মমূলে আঘাত করা হল। যদিও সমাজ প্রদত্ত এই আঘাত তার মানবিক বৃত্তিকে নিবৃত্তি করতে পারে নি । বাঁয়েন জীবনে, নির্বাসনে থাকা কালীনও তার অপত্য স্নেহানুভূতি লুপ্ত হয়ে যায়নি। বরং তা বেড়ে গেছে অনেকাংশে। নিজের ছেলে ভগীরথ তার সঙ্গে দেখা করতে এলে সে স্বামীর ওপর রাগ করেছে। কারণ সে তো এখন বাঁয়েন। তাই তার আশঙ্কা নিজের অজান্তে যদি ছেলের কোন অনিষ্ট করে ফেলে। এমন চিন্তা তার হৃদয়ের সুপ্রচুর মানবিকতার প্রকাশক।

শুধু তাই নয়, মানুষ ও মানবিকতার স্বার্থে সে নিজের জীবনটাকে ও পর্যন্ত উৎসর্গীকৃত করেছে । এক রাতে চন্ডী হঠাৎ করেই দেখে ফেলেছিল, ওয়াগন ব্রেকাররা রেলগাড়ি আটকানোর জন্য লাইন অবরোধ করেছে। দুর্ঘটনা অনিবার্য। যার ফল হবে মারাত্মক। অনেক মানুষ মারা যাবে। চন্ডী নিজের জীবনের দিকে না তাকিয়ে হ্যারিকেন তুলে ট্রেনকে থামিয়ে দিল। বিপদের হাত থেকে বাঁচল অসংখ্য মানুষ। কিন্তু বলি হতে হল চন্ডীকে। ট্রেনের ধাক্কায় তার মৃত্যু হল। মানুষের মত মৃত্যু। অর্থাৎ দেখা যাচ্ছে, অন্ধ সমাজ প্রথার বিরুদ্ধে মানবতার আবেদন সমৃদ্ধ চন্ডী চরিত্রটি গল্পকারের সার্থক লেখা হয়েছে।

চ) পটভূমি ভিত্তিক

সাহিত্যের যে কোন বিভাগের ক্ষেত্রে পটভূমি রচনা সবিশেষ গুরুত্ব বহন করে। বিশেষ করে গদ্য সাহিত্যের ক্ষেত্রে, সুনিপুণ পটভূমি রচনা সাহিত্যিকদের সৃজন-দক্ষতার পরিচয় টিকে উন্মোচিত করে বলেই মনে হয়। গল্প কিংবা উপন্যাসের ক্ষেত্রে একথা অবিসংবাদিত ভাবে সত। পরিবেশ পটভূমির সুদৃঢ় ভিত্তির ওপর ভর করে গল্প-উপন্যাসের বুননটি সুবিকশিত হয়ে ওঠে। গল্প-উপন্যাসের বিশেষ বিশেষ বিষয়বস্তু স্বতন্ত্র পরিবেশ রচনার দাবি করে। পটভূমি রচনার এই স্বতন্ত্র দাবি সাহিত্য রচনার কলা-কৌশলের আভ্যন্তরীণ ব্যাপার। ভিতর থেকে গল্পের পটভূমি পরিবেশ ও গল্পের বিষয়বস্তু পরস্পর সহাবস্থানে এককেন্দ্রিক হয়ে গড়ে উঠে। তেমনটি না ঘটলে গল্প গঠনে গতি আসে না - গল্প শিল্প-সার্থকতার ক্ষেত্রে মার খায়। তাই কথাসাহিতিকরা গল্প বিষয়ের নির্মাণের সাথে সাথে গল্পের পটভূমিকে সমান গুরুত্বে মজবুত করে তোলেন। এর ফলে গল্পগুলি শিল্পগত

ঐক্যে প্রস্ফুটিত হয়। মহাশ্বেতা দেবীর অন্ত্যজ জীবনাশ্রয়ী গল্প গুলিও এই সত্যের পরিচয় বহন করে শিল্প সফলতা পেয়েছে । এই পর্যায়ের গল্পগুলির পটভূমি রচনায় তিনি
সবিশেষ নৈপুণ্যের পরিচয় দিয়েছেন ।

অন্ত্যজ জীবনের গল্পে পটভূমির গুরুত্ব যেমন অনেক খানি বৈচিত্র্যও তেমনি যথেস্ট । অন্ত্যজ জীবন র্নিভর গল্প গুলির পটভূমিকে প্রধানত দুটি ভাগে ভাগ করা যায় । যথা - গ্রামকেন্দ্রিক পটভুমি, নগরকেন্দ্রিক পটভুমি ।

গ্রামকেন্দ্রিক পটভূমি

মহাশ্বেতা দেবীর ' ধীবর ' গল্পের পটভূমি হয়েছে একটি গ্রাম্য পুকুর । রায়পাড়ার বায় বাবু দের রায়পুকুর । রায়পুকুরকে কেন্দ্র করেই এই গল্পের বিস্তার ও সমাপ্তি । গল্পের নায়ক জগৎ ধীবর রায়পুকুরে ডুবে থাকা লাশ তুলে জীবন - জীবিকা চালায় । পুলিশ থাকে পাড়ে । জগৎ পুকুর থেকে একটার পর একটা লাশ তুলে দেয় । এরই মধ্যে একদিন তার ছেলে লাশ হয় । সে খবর জেনে জগৎ ক্ষিপ্ত হলে পুলিশের উপর প্রতিশোধ নিতে থানার দারোগাকে লাশ করে দেয় । সাইকেল সুদ্ধ তাকে হত্যা করে রায়পুকুরে ডুবিয়ে দেয় গোপনে। কেউ জানতে পারে না। অথচ উপরে উপরে রায় পুকুর শান্ত নিরীহ ঃ

" জলের নিচের জগৎ শান্ত , সবুজ , রহস্যময় । "

- এই শান্ত রায়পুকুরের নিচে রহস্য । রাজনীতির । পুলিশি - অত্যাচারের । সবার উপরে জগতের প্রতিবাদী হওয়ার রহস্য। সবই রায়পুকুরকে ঘিরে। তাই পটভূমি হিসাবে রায় পুকুরের চিত্রণ এ গল্পে সার্থক হয়েছে ।

'বায়েন' (মহাশ্বেতা দেবী) গ্রাম কেন্দ্রিক পটভূমি গল্প । সোনা ডাঙা-পলাশী-দুবুলিয়া এলাকার কোন এক রেলস্টেশন ও তৎসংলগ্ন মাঠের ধারে অবস্থিত বট গাছের তলা এই গল্পের পটভূমি হয়েছে। বায়েন প্রথার নিষ্ঠুরতা ও তার বিপক্ষে কোমল মানবীয় বৃত্তির যে জয় গল্প-বিষয়ে ঘোষিত হয়েছে, তার তাৎপর্য উদ্ঘাটনে, গ্রাম্য কোমলতা ও সরলতা প্রেক্ষিতে থেকে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। আবার বায়েন প্রথার মত কু-সংস্কারাছন্ন একটি প্রথার রূপায়ণের জন্য গাম্য পটভূমি কাহিনীর দরকার ছিল। তাই বলা যায় 'বায়েন' গল্পের পটভূমিই রূপে গ্রাম সার্থক ভাবে চিত্রিত ।

মহাশ্বেতা দেবীর 'চড়ক' গল্পটির পটভূমি হয়েছে গ্রাম্য শ্মশানদহ, মন্দির সংলগ্ন বটগাছ ও চড়ক মেলার প্রাঙ্গন। চারিদিকে ধূ ধূ প্রান্তর বালির রাশি । রুক্ষ ক্ষেত্রভূমি । বঙ্কেশ্বরী নদীর বালিময় বুক, চরা । সব মিলিয়ে একটা শ্মশান সদৃশ অঞ্চলও ঃ

" এখন বঙ্কেশ্বরীর বুক ধরে উত্তর পানে হাঁটো। দেখবে, ক্রমেই নদীর বুক ফেলে উঁচু গ্রাম। মাইল কুড়ি এমন শ্মশান সদৃশ অঞ্চল ।" (চড়ক ঃ দেবী মহাশ্বেতা)

অর্থাৎ দেখা যাচ্ছে, গল্পটির পটে রয়েছে রুক্ষতা, ক্রূরতা, ভয়ঙ্করতা, হিংস্রতা। এই পটভূমির সঙ্গে মানান সই হয়েই গল্প বিষয় চিত্রিত। কেননা, বিষয়ে রয়েছে চড়কের পরবে ডোমদের বিভৎস

নাচ। মানুষের কাটা মাথা, হাত, পা নিয়ে উদ্দাম নাচ। এই নাচের আসরে সর্বশান্ত বুধিয়া প্রতিশোধাকাঙ্ক্ষী হয়ে হরিপদকে খুন করে তার ছিন্ন মস্তক হাতে ঝুলিয়ে নৃত্য করেছে । গল্পের পটভূমিতে রুক্ষতা ও ভয়াবহতা না থাকলে গল্প বিষয়ের এমন আদিমতা আর্ট-এর সঙ্গে একাত্মীভূত হতে পারত না ।

'লাইফার' গল্পের পটভূমি গ্রাম্য জঙ্গল । বন । শাল- ইউক্যালিপ্টাস ঘেরা বন । বট বাড়ির ফরেস্ট । সেই শাল ইউক্যালিপ্টাসের জঙ্গলে সাঁওতালরা কাঠ চুরি করে । এই বন জঙ্গলের পট ভূমি গল্পের নায়ক মাগনের মনের সমান্তরালে চিত্রিত । এমন কি মাগন সাঁওতাল এই বনের মধ্যেই তার নিজস্ব বৃত্তে ফিরে যাওয়ার পথ পেয়েছে । রামগিরি পাহাড়ের ঢালে যে সাঁওতালরা থাকে তাদের দেখা হয়েছে এই শাল বনেই । মাগন যা চাইছিল মনে মনে সেই সাধ্যে পৌঁছে গেল মাগন। তাই কাহিনীর পটভূমি বন-প্রান্তর এখানে গল্প- বিষয়ের সঙ্গে সংগতি রেখে শিল্পোত্তীর্ণতায় উদ্ভাসিত হয়েছে।

নগরকেন্দ্রিক পটভূমি

মহাশ্বেতা দেবীর ' উর্বশী ও জনি ' গল্পটির পটভূমি হয়েছে শহর কোলকাতা । হাজার মানুষের ভিড়ে কোলকাতা শহর সদা ব্যস্ত । শহর কাউকে গ্রহ্য করে না । কাউকে আবার মাত্রাতিরিক্ত প্রলোভনে অস্বীকার করে । শহরে ছিন্ন মূল মানুষের সমাহার । সেখানে ভীত গেড়ে বসে থাকার কোন অর্থই হয়না। গল্পের ভাবসত্যও তাই । উর্বশী ও জনি দুটোতেই যেমন একসঙ্গে সুন্দর একটি জীবন চেয়েছিল তেমটি পায়নি । শহর সবকিছু দেয়না । নিজের ইচ্ছা মত সেখানে কেউ কিচ্ছুটি করতে পারবে না । গল্পের ভাবসত্যও তাই বলছে । অর্থাৎ পটভূমি গল্পের বিষয়ের সঙ্গে একাত্মীভূত হয়ে সার্থক ।

মহাশ্বেতা দেবীর অন্ত্যজ জীবনাশ্রিত গল্প গুলির পটভূমি বৈচিত্র্যের বিশ্লেষণে আমরা একথা নিঃসন্দেহে বলতে পারি, তিনি অন্ত্যজ মানুষের জীবন চর্যা, জীবন বৈশিষ্ট্য এবং মনোভঙ্গির সঙ্গে সঙ্গতি রেখেই গল্পের পটভূমি রচনায় নিমগ্ন হয়েছেন । একাজে তাঁর শিল্প দক্ষতা নিয়ে কোন প্রকারের প্রশ্ন তোলা যায় না । কি নগরকেন্দ্রিক কি গ্রামকেন্দ্রিক উভয় প্রকার পটভূমি রচনায় তিনি বাস্তব জ্ঞানের পরিচয় রেখেছেন । গল্প বিষয়ের সঙ্গে সংগতি রেখেই পটভূমি নির্বাচন করেছেন।

ছ) আর্থ-সমাজাশ্রিত

যে কোন সমাজ -গোষ্ঠীর মানুষের জীবন চর্যার পূর্ণাঙ্গ রূপ-চিত্রাঙ্কনে আর্থ-সামাজিক অবস্থার বিচার বিশ্লেষণ সবথেকে গুরুত্ব পূর্ণ ভূমিকাটি গ্রহণ করে । সেই সমাজের বিশেষ আচার-ক্রিয়া, সমাজ-প্রথা, সংস্কার-কুসংস্কার, তাদের খাদ্য-বস্ত্র-বাসস্থান এবং তাদের জীবন-জীবিকা-অর্থনৈতিক অবস্থা সমগ্র জাতি সম্প্রদায়কে অন্যান্যদের থেকে পৃথক করে রাখে। তাই বিশেষ সমাজ গোষ্ঠীর চাল চিত্রাঙ্কনে আর্থ-সামাজিক অবস্থার আলোচনা সবিশেষ গুরুত্বের দাবি রাখে। মহাশ্বেতা দেবী

অন্ত্যজ জীবনাশ্রিত গল্প গুলিকে অন্ত্যজ জীবনের রূপ চিত্রঙ্কনে বসে বাস্তব সম্মত দৃষ্টিভঙ্গি ও সূক্ষ্ম পর্যবেক্ষণশীলতার সঙ্গে অন্ত্যজ সমাজের বাস্তব চিত্রকে ফুটিয়ে তুলেছেন।এই পর্যায়ের গল্পে অন্ত্যজ জীবনের আর্থ-সামাজিক অবস্থার একটি পূর্ণাঙ্গ পরিচয় পাওয়া যায় ।

মহাশ্বেতা দেবীর 'ধীবর' গল্পের জগৎ সাঁ ধীবর জীবনে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ধরণের পেশাকে জীবিকা হিসাবে গ্রহণ করেছে । প্রথমদিকে সে জাল ফেলে মাছ ধরত । মালিকের পুকুরে মাছ ধরার বিনিময়ে কিছু পেত ঃ

"মালিকের পুকুরে জাল ফেলে মাছ ধরত । এখন তার মালিক পুকুরে মাছ ধরে না। জগতের জালটা ঘরেই থাকে। কেউ চাইলে জগৎ ভাড়া দেয়।" (ধীবর ঃ দেবী মহাশ্বেতা)

মাছ ধরা বা জাল ভাড়া দেওয়া জগতের জীবকার মূল পেশা নয় । সে লাশ তোলে। রায় পুকুরের তলা থেকে খুন হয়ে যাওয়া লাশ তুলে সে পুলিশের কাছ থেকে টাকা পায় ঃ

এক)"জলের নিচে কাদায় চিৎ হয়ে পড়ে থাকে মানুষটা । আশেপাশে জল ভুড়ভুড়ি কাটে। জগৎ সন্তর্পণে পা ধরে টানে । কখনো হাত ধরে।"

দুই) "সযত্নে জগৎ দেহটিকে তুলে আনে ।... জগৎ তেরপলের উপর দেহটা শোয়ায়।... লাশ পিছু সাত টাকা নেয় এখন জগৎ।"

(ধীবর ঃ দেবী মহাশ্বেতা)

শুধু তাই নয়, জগতের জীবিকার অন্য পথও আছে।বাড়িতে জগতের বৌ ভামিনী হাঁস-মুরগী পোষে।তারা ডিম দেয়। জগৎ সেই ডিম বেচে ও সংসারের প্রয়োজনীয় অর্থ জোগাড় করে।

মহাশ্বেতা দেবীর 'তরাস' গল্পের ডাকাত বাগদি ক্ষেত -মজুর। গ্রামের তিন জন বড় জমির মালিক দত্ত, সেখ ও মান্নাদের জমিতে ফুরন চুক্তিতে আরো অনেকের সঙ্গে ডাকাত কাজ করে। সারা দিন পরিশ্রমের বিনিময়ে সামান্য আয় হয়। তাতে সংসার চালানোর দুস্কর। তাই ডাকাতকে মৌলা চলে যেতে হয়। ক্ষেতমজুরের কাজে। সেখানে মজুরি বেশী ছয় টাকা করে। ডাকাত যেমন জীবিকার তাড়নায় মৌলা যায় তেমনী বাড়িতে তার মা-বাবা-বৌ সাজুমণি বসে থাকেনা। ডাকাতের মা দত্ত বাড়ি ঝি-এর কাজ করে, সে দত্ত বাড়িতে তিরিশটি গরুর গোবরের ঘুঁটে দেয়। শত শত মান কচু গাছের গোড়ায় ছাই চাপা দেয়, বিনিময়ে পায় খেতে। সাজুমণি ডাকাতের বৌ। সেও বসে খায় না। সাধ্যমত চেষ্টা করে জীবিকার কিনারা করতে ঃ

" সাজুমণি এখনো আফলা বাজাঁ গাছ। দিদির ছেলেদের সে দেখে, ক্ষেত থেকে ঝরে পড়া ধান কুড়োয় হাঁস পালে ডিম বেচে। কচ, ওল, ডমুর আজ্জায় ও বেচে । শাশুড়ির সঙ্গে দত্ত বাড়ি পাট করে । ভুত গত খাটে । খেটেই ও খুশি।" (তরাস ঃ দেবী মহাশ্বেতা)

ডাকাত, কিংবা সাজুমণিরা দিনরাত খাটে। খেটে বেঁচে থাকার রসদ জোগাড় করে। বেঁচে থাকার জন্য এ তাদের পবিত্র সংগ্রাম। দুরন্ত লড়াই ।

মহাশ্বেতা দেবীর 'লাইফার' গল্পে মাগন সাঁওতালের জীবিকা হয়েছে গৃহ ভৃত্যের কাজ তথা চাকর কাজ। পেট ভাতায় এবং সেই সাথে মাসিক পাঁচ টাকা মাইনের বিনিময়ে চাপা কল থেকে জল

টানার কাজ করে মাগন ঃ

"বড় বাবু বলে, লাইফার ছাড়া কেউ পেটভাতায় জল টানবেনা। মাসে পাঁচটা টাকা দিও।"

(লাইফার ঃ দেবী মহাশ্বেতা)

মহাশ্বেতা দেবীর গল্পে অন্ত্যজ জীবনের অর্থনৈতিক পর্যালোচনায় একথা স্পষ্টরূপে প্রতীয়মান হল যে, তারা চরম অর্থনৈতিক বিপর্যের মধ্যে নিম্মজিত থেকেই বেঁচে থাকার সংগ্রাম শুরু করে। তাদের সংগ্রাম প্রাণান্তকর সংগ্রাম। বেঁচে থাকার প্রয়োজনেই তারা যে কোন প্রকার পেশাকেই অবলম্বন করে।

এক্ষেত্রে ন্যায়-অন্যায়, শুভ-অশুভ চিন্তার কোন অবকাশই তারা পায়না। তাই দেখি, অন্ত্যজ জন সমাজের বহুল সংখ্যক মানুষ যেমন সৎ পথে থেকে জীবন-জীবিকার প্রশ্নে সুন্দর ও সুকুমার সব বৃত্তি গ্রহণ করেছে, তেমনী কেউ কেউ অন্যায় পথে, হিংস্রতা ও বর্বরতার সঙ্গে দিন যাপনের রাস্তাটাকে খুঁজে নিয়েছে। উপায় যাই হোক না কেন, তাদের উদ্দেশ্য - প্রাণ ধারণের জন্য শুধু দুমুঠো অন্নের সংস্থান করা। এই ন্যূনতম আহার জোগাড়ের জন্য অন্ত্যজ মানুষ অক্লান্ত পরিশ্রম করে। লড়াই করে। আপসহীন লড়াই ।

জ) সমাজ বৈষম্যমূলক

মহাশ্বেতা দেবীর গল্পে অন্ত্যজ মানুষের আথ-সামাজিক পরিচয়-উদ্ঘাটনে নিমগ্ন হয়ে একথা প্রথমেই বলতে হয় অন্ত্যজদের সামাজিক অস্তিত্ব প্রতিকারহীন অত্যাচার-লাঞ্ছনা প্রাপ্তিতেই মুখর। মানুষের সমাজে মানুষ হয়ে বেঁচে থাকার অধিকার তাদের নেই। সেই অধিকার কেড়ে নিয়েছে এই সমাজেরই উচ্চবিত্ত ও উচ্চ বর্ণের মানুষেরা। তাই অসহায় দরিদ-নিচের তলার অন্ত্যজ মানুষের সামাজিক ইতিহাস শুধু মাত্র অত্যাচার-বঞ্চনা-লাঞ্ছনা-নিপীড়ন-শোষণে ভরা ইতিহাস। উচ্চবিত্ত ও উচ্চবর্ণের মানুষের সুকৌশলী ও সুবিধাবাদী সামাজিক বিন্যাসের চাপে সর্বহারা অন্ত্যজ মানুষেরা চিরকাল ধরেই বঞ্চিত-লাঞ্ছিত হয়ে আসছে, কখনো অন্ত্যজ মানুষ অর্থনৈতিক শোষণের শিকার, কখনো সামাজিক দিক দিয়ে অবহেলিত, কখনো আবার তারা শারীরিক দিক দিয়ে রীতিমত অত্যাচারিত ও লাঞ্ছিত হয়েছে। ইতিহাসের জন্ম লগ্ন থেকে অন্ত্যজ মানুষের উপর চলে আসা এই অত্যাচার-নিপীড়নের ধারা আজও সমানে বহমান। যুগ ও জীবনের পরিবর্তন এই ধারাকে খুব একটা প্রভাবিত করতে পারেনি। তবে বিরল ব্যতিক্রম হিসাবে দু-একটি ক্ষেত্রে অন্ত্যজ মানুষকে প্রতিবাদ-প্রতিরোধে ফুঁসে উঠতে দেখা গেলেও তা পাহাড় প্রমাণ অত্যাচারের প্রেক্ষিতে নিতান্ত নগণ্য-নিতান্ত সীমিতও সংকীর্ণ চিত্র ।

মহাশ্বেতা দেবীর বিভিন্ন গল্প বিশ্লেষণ করে অন্ত্যজ মানুষের বৈষম্যমূলক আচরণ প্রাপ্তির ইতিহাসের স্বরূপ সন্ধান করব ।

মহাশ্বেতা দেবীর 'তরাস' গল্পে দেখি, বাগদি সমাজের ক্ষেতমজুর ও সাধারণ মানুষের উপর ধনবান দত্ত , সেখ ও মান্নানরা শোষণ চালাচ্ছে । কাজে ও টাকায় ঠকিয়ে তারা বেড়ে ওঠে, মুনাফা

ভোগ করে। বাগদিদের রীতিমত তারা খাটিয়ে নেয় । কিন্তু ন্যায্য মজুরি দেয়না । তারা নতুন এক ফন্দি বের করে। দিন প্রতি মজুর হিসাবে নয় - ফুরনে কাজে লাগায় । সেখানে নিদিষ্ট মজুরী হয় অনেক কম। ডাকাত বাগদি বলে ঃ

"পদ্মো চাকো আর মৌলাই যখন সরকারী রেট দেয়না তখনও ছয় টাকা দেয়। আমাদের কপালে ভাত মুড়ি, আর দু-টাকা যেন ঘুচলো না । ঘরে এত গুলো মুখ, দু-টাকায় এককিলো চালও হয়না বর্ষায়।" (তরাস ঃ দেবী মহাশ্বেতা)

পঞ্চায়েত প্রধান দিনু সেখ, পরীক্ষিত দত্ত আর সুনীল মান্না মিলে এই শোষণের রথচক্র চালায়। তারা শ্রমিকের সঙ্গে ফুরন চুক্তি করে নেয়। এবং তাদের ক্ষেত মজুর বলে স্বীকার করে না। গোবিন্দ নস্কর ডাকাতদের সরকারী রেটে মজুরী দিতে বললে দিনু ঘোষ আইনের কথা বলে। বলে আইনে ফুরন শ্রমিক ক্ষেতমজুর হিসাবে গণ্য নয় ঃ

"... গোবিন্দ নস্কর বলে ছিল ক্ষেতমজুরকে ক্ষেতমজুরি দিতে হবে । ক্ষেত মজুর কোথায় পেলে বাপ সকল?

গ্রামে ক্ষেত মজুর নেই ?

না, ফুরন খাটে।" (তরাসঃ দেবী মহাশ্বেতা)

- অত্যাচার শোষণের এ এক অভিনব কৌশল

মহাশ্বেতা দেবীর 'সমাজবাদ ববুয়া' গল্পের সাঁওতাল জংলী বেরসা বারে বারে উঁচু তলার ধনবান মানুষদের দ্বারা অত্যাচারিত ও লাঞ্ছিত হয়েছে । শারীরিক ভাবে তাকে আহত করেছে । তার কপাল ফাটিয়ে দিয়েছে, পিঠে ক্ষতের সৃষ্টি হয়েছে, পায়ের আঙুলের হাড় ভেঙে দিয়েছে ঃ

"ওকে বেকল করে দিলাম । চিনতে পারবেন না । সনাক্ত করার চিহ্ন কপালে এক ইঞ্চি ক্ষত চিহ্ন, বাঁ পায়ের আঙুল ভাঙা, পিঠে ক্ষত সেলাইয়ের দরুণ ইংরেজী ডবলিউ আকারের দাগ।"

(সমাজবাদ ববুয়া ঃ দেবী মহাশ্বেতা)

শুধু শারীরিক লাঞ্ছনা নয় , অর্থনৈতিক শোষণের শিকার জংলী বেরসা সমেত সমস্ত শ্রমিকরা। খাল কাটার কাজে কোম্পানি প্রতি শ্রমিককে বিশ- বাইশ টাকা দিলেও ঠিকাদার খাতাদার দফাদাররা তাদের দেয় মাত্র পাঁচ টাকা ঃ

"তবে তুমি পেট ভাতায় খাটো, তুমি পেট ভাতায় খাটো । তোমার জন্যে দিন ধরো চার বা পাঁচ টাকা। বাকীটা নাকি জমছে। কাজ করছ হাজার মানুষ দিন পিছু কোম্পানি দিচ্ছে বাইশ হাজার। চার-পাঁচ হাজার খরচ, বাকীটা বুঝে দেখ মন।"

(সমাজবাদ ববুয়া ঃ দেবী মহাশ্বেতা)

এভাবেই শারীরিক ও আর্থিক - দ'দিক দিয়েই লাঞ্ছিত শোষিত হয় জংলী বেরসারা । এই অত্যাচার-বৈষম্যের শেষ কোথায় তা তারা জানে না।

মহাশ্বেতা দেবীর গল্প গুলি বিশ্লেষণের শেষে এ কথা বলা যায় যে, কারণে-অকারণে অন্ত্যজ, খেটে খাওয়া, নিচের তলার মানুষরা উচ্চ বর্ণ ও উচ্চবিত্ত মানুষের দ্বারা লঞ্ছিত হয়, অত্যাচারিত

হয়। এই লাঞ্ছনা-গঞ্জনা-শোষণ-নিপীড়নের বিরুদ্ধে অন্ত্যজ মানুষ প্রতিকার প্রতিবাদহীন থাকে, থাকতে বাধ্য হয়। সভ্য সমাজ ভদ্র সমাজ, অন্ত্যজদের মাথা তুলে বাঁচার অধিকার দেয়না। মানুষের মত মানুষ হয়ে বাঁচার ইচ্ছা যে অন্ত্যজদের জাগেনা তা নয়, কিন্তু তেমন ক্ষেত্রে সমাজ পতি উচ্চবিত্তরা পুলিশ প্রশাসন ও ভাড়াটিয়া গুন্ডাদের মদতে ও সাহায্যে অন্ত্যজ মানুষকে ধনে প্রাণে নিংষেশিত করে দেয়। এই সমাজের কাছে অন্ত্যজ মানুষদের প্রতিকারহীন অত্যচার-লাঞ্ছনার বাণী নীরবে নিভৃতে কেঁদে ফেলে। কোথাও কোন প্রতিরোধের আশ্বাস মিলেনা ।

ঝ)বিশ্বাস ও সংস্কার ভিত্তিক

সামাজিক আচার-সংস্কার-বিশ্বাস-প্রথার মধ্য দিয়ে কোন বিশেষ জাতি সম্প্রদায়ের আভ্যন্তরও বাইরের গঠনটি বিশিষ্ট হয়ে ওঠে। সমাজের বিশ্বাস-সংস্কারের চিত্রণেব মাধ্যমে সে জাতির মানস গঠনটিও প্রস্ফুট হয়। মহাশ্বেতা দেবীর অন্ত্যজ জীবনাশ্রিত ছোট গল্পে অন্ত্যজ জীবনের বিশ্বাস-সংস্কার আচার- প্রথার যে চিত্রণ রয়েছে তা থেকে স্পষ্ট রূপে সিদ্ধান্ত করা যায় যে, অন্ধ-আচার-সংস্কারে অন্ত্যজ মানুষ আষ্টে পৃষ্ঠে বাঁধা থাকে। শিক্ষা-দীক্ষার আলোক বিহীন অন্ত্যজ মানুষ যুক্তি-বুদ্ধির তোয়াক্কা না করে আধা-ভৌতিক ও অলৌকিক বিশ্বাসে মগ্ন থাকে। কতই না বিচিত্র আচার-প্রথা পালন করে অন্ত্যজ মানুষরা। তাঁর বিভিন্ন গল্প বিশ্লেষণে অন্তজ জীবনের বিশ্বাস সংস্কারের রূপ রেখা পাওয়া যায় তার স্বরূপ উদ্ঘাটনের চেষ্টা করব ।

মহাশ্বেতা দেবীর 'পিন্ডদান' গল্পে অন্ত্যজ মানুষের বিশেষ সংস্কারের পরিচয় লভ্য। মৃত্যুর পর পিন্ড পেলে তবে আত্মার মুক্তি ঘটে। -এমন বিশ্বাস গল্পের নায়ক দশরথের। সে আশা করে তার মৃত্যুর পর তার পুত্র পিন্ড দেবে। কিন্তু তার সে সাধ পূর্ণ হয়না। ছেলে রামলাল তার আগেই খুন হয়ে যায়। দশরথ তাই নিজে থেকেই নিজের পিন্ড দানের ব্যবস্থা করে দশ বোতল মদ কিনেঃ

"ই মদ লয়, আমারে আমি পিন্ড দিচ্ছি।...ক্যারেও বলতে দিবনা দশরথ অপিন্ডিয়া ছিল।" (পিন্ডদান ঃ দেবী মহাশ্বেতা)

মহাশ্বেতা দেবীর 'উর্বশী ও জনি ' গল্পে অন্ত্যজ মানুষের বিশ্বাস- সংস্কারের পরিচয় পাওয়া যায়। উর্বশীর গলাতে ক্যানসার হয়েছে কিন্তু তাদের গুনিন লেংড়ি বলে, উর্বশীকে বাণ মেরেছে ঃ

" বলে, উর্বশীকে কেউ চাই। তাই বাণ মারা করেছে।"

(উর্বশী ও জনি ঃ দেবী মহাশ্বেতা)

এই লেংড়ি তুকতাকে বিশ্বসী উর্বশীর চিকিৎসা প্রসঙ্গে তার যে রূপের পরিচয় পাওয়া যায় তা অন্ত্যজ জীবনের অন্ধ বিশ্বাস-সংস্কারের পরিচয়বাহী ঃ

" আরশি হাতে। গেঁজে থেকে আঁতুড়ে শিশুর নখ, ধনেশ পাখির ঠোঁট, মরুঞ্চে পোয়াতির মরার চুল, জেঁওচ পোয়াতির মরার সিন্দুর সব গুনে গেঁথে ও বললে ঃ কিছু হবার লয় বাপ ধন আমার। বাণ মেরেছে কোন পিশাচ ।" (উর্বশী ও জনি ঃ দেবী মহাশ্বেতা)

জনিরা এই বাণ মারার পাল্টা বাণ মারাতেও বিশ্বাসী। নিক্ষিপ্ত বাণ ঠেকানোর এটি একটি ভালো পথ বলে তারা মনে করে। গল্পে মাদুলী দেওয়ার কথা ও আছে। অলৌকিক এই সব বিশ্বাসে অন্ত্যজ জীবন বৈচিত্র্য মন্ডিত হয়ে উঠেছে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই ।

পঞ্চম অধ্যায়

সতীনাথ ভাদুড়ী ও অন্যান্য লেখক

পঞ্চম অধ্যায়

সতীনাথ ভাদুড়ী ও অন্যান্য লেখক

ক) সতীনাথ ভাদুড়ী (১৯০৬-১৯৬৫)

স্বাধীনতা প্রাপ্তীর সঙ্গে সঙ্গেই যে সব গল্প লেখক এসেছেন তাদের মধ্যে সর্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য নাম সতীনাথ ভাদুড়ী (১৯০৬-৬৫)। ১৯৪৮-১৯৬৪- এর মধ্যে তাঁর সাতটি গল্পের বই বেরিয়েছে। ষাট সত্তরটা গল্প লিখেছেন সতীনাথ। সবগুলিই অপ্রেমের গল্প এবং বেশির ভাগ গল্প অন্ত্যজ শ্রেণীর মানুষদের নিয়ে লেখা। বিষয় বৈচিত্র্য, গঠন-নৈপুণ্য, ঘটনাবিন্যাস, কাহিনী-সংস্থাপন ও ভাষা ব্যবহারে সতীনাথের গল্পগুলি যে চমৎকারিত্বের সৃষ্টি করে তাকে এড়িয়ে যাওয়া অসম্ভব। চাপা ব্যঙ্গ, তীর্যক ভঙ্গি, মনোবহনের পথে স্বচ্ছ বিচরণ, চরিত্র উদঘাটনে অনায়াস দক্ষতা ঃ সতীনাথের গল্প প্রসঙ্গে এসব কথাই বার বার মনে পড়ে। সামাজিক দায় দ্বায়িত্ব ও অভিজ্ঞতাকে, কিভাবে শিল্পরূপ দিতে হয়, তা সতীনাথ বিলক্ষণ জানতেন । বর্ণনাধর্মী ও ইতিততধর্মী- অন্তর্লীন মন্ময়তাধর্মী ও বহিরঙ্গধর্মী -সবরকম গল্পই সতীনাথ লিখেছেন। তাঁর গল্পের দর্পণে আমাদের সমাজকে দেখি। যে সমাজ শহরে ও গ্রামে সর্ব স্তরে ব্যাপ্ত।

নানা স্বাদের গল্পের পাশাপাশি অন্ত্যজ মানুষদের নিয়েও তিনি গল্প লিখেছেন। যেমন- 'ডাকাতের মা', 'আন্টা বাংলা' ও 'রথের তলে'। এই সব গল্পে অন্ত্যজ মানুষের বর্ণনা কতটা পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে করা হয়েছে, গল্পগুলি বিশ্লেষণ করলে তা আমরা বুঝতে পারব।

'ডাকাতের মা' গল্পে এক ডাকাতের মার আর্তকান্না ও মাতৃ হৃদয়ের অদম্য আকুলতা গল্প বিষয় হয়েছে। সৌখির মা ডাকাত-বধূ ও ডাকাতের মাতা। ছেলে সৌখির পাঁচ বছর জেল হয়েছে। তাই চরম দারিদ্রের মধ্যে তার দিন কাটে অর্ধাহারে-অনাহারে। পাঁচ বছর পর যেদিন ছেলে সৌখি প্রথম বাড়ি এল, সে রাতে কোনো কিছুই খেতে দিতে পারল না। সকালে উঠেই বা ছেলের সামনে কি ধরবে সৌখির মা। ঘুম থেকে উঠলেই তো আর পয়সার কথা বলা যাবে না। সৌখির মা ভাবে ঃ

"আলু, চাল, সরষের তেল সবই কিনতে হবে। অত পয়সা পাব কোথায়? ভোর উঠেই কি ছেলেকে বলা যায় যে, আগে পয়সা জোগাড় করে আন, তবে রেঁধে দেব।"

(ডাকাতের মা ঃ ভাদুড়ী সতীনাথ)

তাই বুড়ি ডাকাতের মায়ের যোগ্য কাজই করে । মাতাদিন পেশকারের বাড়ি থেকে সেদিন গভীর রাতে জলের লোটা চুরি দোকানে বেচে পয়সা জোগাড় করে সে । সেই পয়সায় বাজার করে পর দিন অতি প্রত্যুষে রান্না চড়িয়ে দেয়। কিন্তু সেই রান্না খাওয়া হয় না সৌখির। মাতাদিন পেশকার চুরির কিনারা করে পুলিশ নিয়ে সোজা বাড়িতে হাজির হয়েছে। ঘুম থেকে উঠে সৌখি সব বুঝে নিয়ে দারোগাকে জানায়, ঘটি সে নিজেই চুরি করেছে। দারোগা আবার সৌখিকে ধরে নিয়ে

যায় । পিছনে পড়ে থাকে সৌখির মা-ডাকাতের মা, তার গুমরে ওঠা কান্না। নিজ পুত্রকে শুধু তৃপ্তি ভরে দু'মুঠো খাওয়াতে না পারার জন্য মাতৃ হৃদয়ের যে ব্যাকুলতা ও যন্ত্রণা, সৌখির মার ব্যাকুলতা তার থেকে কোন অংশে নগণ্য নয়।

আবার 'আন্টা বাংলা' গল্পে সতীনাথ ভাদুড়ী এক অত্যাচার-লাঞ্ছিত ওরাওঁ পরিবারের বিপর্যয়ের মর্মান্তিক ট্রাজিক পরিণতির বর্ণনা করেছেন। গল্পে দেখি , বিরসা ওরাওঁ ও তার পুত্র বধূ নীলকর সাহেব বেঞ্জামিনের কুঠিতে কাজ করে। এক ছুটির দিনে কুঠিতে না গিয়ে নিজের ক্ষেতে কাজ করার অপরাধে সাহেব বিরসাকে মারাত্মক রকমের শাস্তি দেয় । সাহেবের বিধান ঃ আট খানা থান ইট মাথায় চাপিয়ে সূর্যের দিকে মুখ করে সারদিন দাঁড়িয়ে থাকতে হবে বিরসাকে। বৃদ্ধ বিরসা এই অত্যাচার সহ্য করতে না পেরে দিনান্তে মারা গেল। বিরসার মৃত্যু দিয়ে এই ওরাওঁ পরিবারের ট্রাজিডি শুরু। কেননা, এর পর বিরসার পুত্র বধূ বোটরার মা বেঞ্জামিন সাহেবের রক্ষিতাতে পরিণত হল। বোটরা হল টেনিস ক্লাবের বল কুড়াবার চাকর। তারপর নীলকুঠির যুগ শেষ হয়ে গেলে, কুঠি বেচে দিয়ে সাহেবরা চলে গেল। জীবিকার তাগিদে বোটরা পি.ডব্লু.ডি.-র কাজে রুলগাড়ির ড্রাইভারিতে যোগ দিল। মদ তার নিত্য সঙ্গী হোল । রুল চালায় আর পরিত্যক্ত টেনিস ক্লাব আন্টা বাংলার স্মৃতিতে ডুবে থাকে বোটরা। অতিরিক্ত মদ্যপানের ফলে একদিন ইঞ্জিনের স্টিয়ারিং এর উপর ঢলে পড়ে বোটরা মারা গেল। অত্যাচার-লাঞ্ছিত ওরাওঁ পরিবারটি বিনষ্টির অতলে তলিয়ে গেল।

সতীনাথ ভাদুড়ীর 'রথের তলে' গল্পটিতে বিহারের নাট সম্প্রদায়ের পতনের মর্মান্তিক কাহিনী গল্প বিষয় হয়েছে। নাট সমাজের সর্দার ভৈরো নাটের স্মৃতিতে গল্পের বিস্তার ও সমাপ্তি। নাটজাতের মেয়েরা গান করে। নাচে। ছেলেরা বাদ্য বাজায়। সর্দারের কড়া শাসনে চলে তাদের জীবন। দিক-বিদিক থেকে মুজরার ডাক আসে। ভারি নাম ডাক তাদের । তবুও উচ্চতর সমাজের দৃষ্টিতে তারা অবহেলিত। তাতে কী ! নাট জাতের ও বিশেষ মান-ইজ্জত আছে। সর্দারের কাজ সেই মান ইজ্জত বজায় রাখা। সর্দার নাট-সমাজের বটগাছের মত। তার নিশ্চিন্ত আশ্রয়ে বেঁচে থাকে নাট-নাট্টিনরা। সমাজের অবিমিশ্রতা এবং নাচ-গানের মিষ্টতা ও শুদ্ধতা বজায় রাখার জন্য নাট-কন্যাদের ভিন্ন সম্প্রদায়ে বিয়ে দেওয়া নিষেধ। সর্দার ভৈরোনাট এই সমাজের ইজ্জত-সম্মানের প্রশ্নে সবিশেষ কঠোর। এলাকার জমিদার শকুর খাঁ একবার নিয়ম ভেঙ্গে, মাত্র চোদ্দ বছর বয়স্ক নাট - বালিকা ভুটনী নাট্টিনকে চক-ইসমাইলপুরে হোলির উৎসবে নাচ গান করার জন্য নিয়ে যেতে চায়। কিন্তু ভৈরী সর্দার এর বিরোধিতা করে। সম্প্রদায়ের ইজ্জতকে বেনিয়মে সে নষ্ট হতে দেবে না । এই কারণে সর্দার জমিদারের গাড়ি ফিরিয়ে দেয়, ঘটনাটি জমিদারের সম্মানে আঘাত হানে। ক্ষিপ্ত হন জমিদার। ফল হিসাবে চাবুকে চাবুকে রক্তাক্ত হয় সর্দার। সমস্ত অত্যাচারকে মুখ বুজে সহ্য করে। কিন্তু অত কিছুর পরেও যখন ভুটনিকে নিয়ে যাওয়ার হুকুম দেন জমিদার, তখন শুধুমাত্র নাটজাতের ইজ্জত বাঁচানোর জন্যই সর্দার ভালার আঘাতে জমিদারকে হত্যা করে বসে। এই কারণে ভৈরো নাটের চোদ্দ বছরের জেল হয়। জেল জীবনেও সর্দার নিজের জাতের কথা ভাবে। দীর্ঘ চোদ্দটি

বছর জেলে নয় যেন তার গ্রামেই পরে থেকেছে। জেল থেকে ছাড়া যাওয়ার পর সর্দার ভৈরোনাট গ্রামের উদ্দ্যেশ্যে রওনা হয়ে কাটিহার স্টেশনে ভুটনির দেখা পায়। ভুটনির মুখ থেকেই শোনে আর্থিক অনটনের ধাক্কা সামলাতে না পেরে ধ্বংস হয়ে গেছে নাট জাত। ছন্নছাড়া হয়ে গেছে। স্বয়ং ভুটনি এক পুরুষের সাথে পালিয়েছে। সমস্ত খবর শুনে হতাশায় ভেঙ্গে পড়েছে ভৈরী সর্দার।

মনোগহনের চোরাবলিতে যাঁর স্বচ্ছন্দ পরিক্রমা, মনোলোকের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম তরঙ্গ ভঙ্গের বিশ্লেষণের যিনি অভ্রান্ত; সন্দেহ সংশয় আবেগের রূপায়ণে যিনি নির্মম নিপুণ, সেই সতীনাথ ভাদুড়ী ছোট গল্পকে মানব মনের বিশেষ করে অন্ত্যজ শ্রেণীর মানুষের মনোবিশ্লেষণের বাহন রূপেই ব্যবহার করেছেন। এই বিশ্লেষণে তিনি এত মির্মম,এত নিপুণ, যে মনে হয় কোন শল্যচিকিৎসকের হাতে অভ্রান্ত ছুরি দিয়ে মনকে চিরে চিরে দেখা হয়েছে।

খ)অমিয়ভূষণ মজুমদার (১৯১৮)

অমিয়ভূষণ মজুমদার নানা দিক দিয়ে স্বতন্ত্র ও বিছিন্ন। 'পঞ্চকন্যা' (১৯৬২) ও 'দীপিতার ঘরে রাত্রি' (১৯৬৫) সংকলনধৃত গল্পগুলি ছাড়া গত পাঁচ বছরে লেখা তাঁর এই সব গল্প সহজেই মনে পড়ে- 'অনির্বচনীয়া' , 'অহেতুক' , 'ইনফরম্যাল ডিনার','ইলেকট্রনিক্স', 'উরুন্ডী','একটি অ্যবসার্ড কলম','একটি গৃহত্যাগের গল্প' , 'একটি দহের গল্প','একটি বিপ্লবের মৃত্যু', 'এপস অ্যান্ড পিকক', 'কমিউন', 'চার্জ', 'নাথিংডুয়িং', 'বিপ্লব' 'বিস্মিতা', মিটেরী ফনটি', 'মোহিত স্যানের উপাখ্যান', 'রীতিমতো গল্প','স্বর্গ','স্বর্গ ভ্রষ্ট', 'মধুরার ফ্ল্যাট ও মিউজিয়াম','দ্য কাসেল' ।

ভাষা ব্যবহারে তাঁর অমোঘ তীক্ষ্ণতা ও অব্যর্থতা, গল্পকে অনাবশ্যক মেদবর্জিত করে অভিপ্রেত লক্ষ্যে পৌছে দেওয়ার একাগ্রতা, বহু কৌণিক জীবনকে তীর্যক দৃষ্টিতে দেখার শিল্পসামর্থ, সুতীব্র সমাজচেনার সঙ্গে জীবনের গভীর রহস্যময়তার প্রতি অনিবার্য অঙ্গুলি নির্দেশ- এই সব গুণে অমিয়ভূষণের গল্প একটি বিশিষ্ট স্বাদ বহন করে।

একটি সাক্ষাতকারে অমিয়ভূষণ বলেছেন ঃ " কাব্য উপন্যাস ছোট গল্প অথবা নাটক- সবাররই একটা উদ্দেশ্য আছে। আপাতত তাঁকে ঈসথেটিক এন্টারটেনমেন্ট বলা যেতে পারে। কিন্তু প্রকৃত উদ্দেশ্য ইমাজিনেশানের সাহায্যে নিজেকে নিজের পরিস্থিতিতে জানবার চেষ্টা করা সেই গভীরতারয় যেখানে ইনটেলিজেন্স আর দুইয়ে দুইয়ে চার করতে পারে না।"

গল্পকার অমিয়ভূষণ মজুমদারের স্বাতন্ত্র্যকে অনুধাবন করা যায় অন্ত্যজদের নিয়ে লেখা 'তাঁতী বউ' গল্পের উপসংহারে - "বর্ষণ ক্ষান্ত আকাশে ভরের পাখি ডেকে ওঠার আগে সে ফিরে এল। ঘরে তখনোও প্রদীপটি জ্বলছে, যেমন সে জ্বেলে রেখে গিয়েছিল। ছেলেটি তখনি জেগে উঠবে। তার আগে একটু বিশ্রাম করতে হবে। স্নায়ু গ্রন্থিগুলো অন্তত একটু স্নিগ্ধ করতে হবে। কিন্তু গোকুলের মুখখানি দেখবার লোভ হল তার। ঘুমটা আজ ভালোই হচ্ছে। গোকুলের কয়েকবিন্দু স্বেদ

যেন দেখা দিয়েছে, আঁচল দিয়ে মুঝে দিল 'তাঁতী বউ' । এবার আবার কান্না পাচ্ছে। কিন্তু কাঁদলেও সময় নষ্ট হবে খানিকটা । সকলেরই বিশ্রাম নেওয়ার অধিকার আছে এ পৃথিবীতে, তারো আছে।

মাটিতে শুয়ে দেখতে - দেখতে ঘুমিয়ে পড়ল।"

- এই অনিবার্য উপসংহার বিস্মিত হবার নয়।

অন্ত্যজ শ্রেণীর মানুষদের নিয়ে লেখা 'দুলারহীনদের উপকথা' গল্পটিও ভুলবার নয় - গল্পটি বিশ্লেষণ করলেই তা অনুধাবন করতে পারব। 'দুলালহীনদের উপকথা' গল্পের ভূখন চরিত্রটি চরম ট্র্যাজিক। তার জীবন না পাওয়ার হতাশায় ও উপেক্ষায় ব্যাথাভারাতুর হয়েছে। তার চরিত্রের মধ্য দিয়ে মানব জীবনের সব হারানোর ব্যাথা ও অপচয়বোধের অনুভূতির দ্যোতনা এসেছে অসাধারণভাবে। ভূখন তার সতাতো বোন দুলারহীনের জীবনের সুখ শান্তি এনে দেবার বাসনা বারে বারে নিজের জীবনকে উপেক্ষিত করেছে। এমনকি নিজের বিয়ের জন্য, তিল তিল করে সঞ্চিত অর্থে সমস্তটায় সে বোনের চিকিৎসার জন্য খরচ করেছে। এই কারণে তার মনের সমস্ত আশা-আকাঙ্ক্ষার অপমৃত্যু ঘটেছে। তার উপর বোন দুলারহিন নিজের বিয়ের জন্য ঘর ছেড়ে নিরুদ্দেশ হলে ভূখন সবকিছু ছেড়ে দুলারহিনের খোঁজে বেরিয়েছে। দুলারহিনের খোঁজে সে এক জায়গা ছেড়ে আর এক জায়গায় ঘুরে বেরিয়েছে । ঘর বাড়ি, নিজের স্বপ্ন-কামনা, সমস্ত কিছুকেই এজন্য ভূখন চরম ওদাসীন্যে পরিত্যাগ করেছে। হতাশার অন্ধকারে ডুবে গেছে সে। তার জীবনের সমস্ত উদ্দেশ্যই হারিয়ে গেছে - অর্থহীন হয়ে গেছে ঃ

" কিন্তু ভূখন এখন দুলারহিনকে খুঁজে বেড়ায় না। তবু কি খোঁজে একটা। দেশে দেশে ঘুরে বেড়ানো নেশায় দাঁড়িয়েছে । ... সন্ধ্যার অন্ধকারে কুপি জেলে কড়াইয়ে ভাত চাপিয়ে সঙ্গীরা যখন দিন জমানোর গল্প করে, দেশের গল্প করে, কোন কোন দিন সে চাটাই বিছিয়ে নীরবে অন্ধকার আকাশের দিকে চেয়ে শুয়ে থাকে।" (দুলারহীনদের উপকথা ঃ মজুমদার অমিয় ভূষণ)

ট্রাজেডির অতলান্ত গভীরে লুকিয়ে থাকা উদ্দেশ্যহীন এই জীবন যেন শূন্যতায় ভরা । যেন সব হারানোর অপচয় বোধে রিক্ত নিঃশ্ব সে । অন্ত্যজ মানুষের জীবনেও যে ট্র্যাজিটির সূক্ষ্মতা এবং বেদনা বোধের সূক্ষ্ম অনুভূতির তীক্ষ্মতা থাকে তা ভূখনের মধ্য দিয়ে গল্পকার অমিয়ভূষণ মজুমদার অনন্য সাধারণভাবে ফুটিয়েছে।

গ) সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়(১৯৩৪)

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় কবিতায় এবং নীললোহিত - ছদ্মনামে লেখা উপাখ্যানগুলিতে যতই রোমান্টিকতাকে প্রশ্রয় দিন না কেন, ছোট গল্পে তিনি বিপন্ন সময়কে তুলে ধরেছেন। বস্তুত আমাদের প্রজন্মের লেখকেরা চোখের সামনে যে সমাজকে দেখেছেন গত চল্লিশ বছরে তাতে সমাজ মনস্কতা ও সময় চেতনা কোন গল্প উপন্যাস লেখক এড়িয়ে যেতে পারেন না। স্বীকার্য, তাঁর গল্পে যৌবন প্রবলভাবে উপস্থিত । সুনীল সর্বদাই যৌবনের পক্ষে, মানসিক সম্পদে সমৃদ্ধ যুবক যুবতীর পক্ষে।

প্রবল ভাবে ভালোবাসা আর প্রবল ভাবে ঘৃণা করার পিছনে যে প্রবল জীবনাসক্তি, তা সুনীলের গল্পে উপস্থিত।

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের 'ফুল ও নারী' গল্পটির বিষয় হয়েছে এক পতিতা রমণীর অসহায় বিপর্যস্ত জীবনের কাহিনী। পার্ক স্ট্রিটের রাস্তার মোড়ে এক বাস গুমটিতে গোলাপী দাঁড়িয়ে থাকে খদ্দেরের আশায়। খদ্দের পেলে রাতের অন্ধকারে সে নেমে যায় ময়দানে সেখানে নিজের দেহটাকে তুলে দেয় কোন না কোন অচেনা পুরুষের হাতে। এই ভাবেই সংসার চলে তার। কিন্তু তার বস্তির সবাই জানে যে গোলাপী শহরের কোন এক ধনী বাড়িতে আয়ার কাজ করে। ঐ বাস গুমটিতে ফুল নিয়ে বেচতে বসে দিনু। সেও দরিদ্র-অসহায়। পৃথিবীর এই দুই নারী পুরুষের মধ্যে রয়েছে আন্তরিক সমমর্মিতা। তারা একে অপরের দুঃখ বোঝে। একটি বর্ষণ মুখর দিনেই গোলাপীর কোন খদ্দের জোটে না। দিনুর বেশিরভাগ ফুল অবিক্রিত থাকে। গভীর রাতে মুখ ভার করে বাড়ি ফেরার পথে দিনু জোর করে এক তোড়া গোলাপ গোলাপীকে দেয়। কিন্তু ফুল নিয়ে কি করবে গোলাপী! সে ভাবে বাড়ির কাছে গিয়ে ফেলে দিলেই হবে। - এখানেই গল্প শেষ হয়েছে। অসহায় দরিদ্র অন্ত্যজ মানুষ যেন গোলাপের গন্ধ থেকেও বঞ্চিত। আসলে রুটি রুজির গন্ধ থেকে যারা প্রত্যহ বঞ্চিত হয় -তারা গোলাপের গন্ধই বা পাবে কেমন করে !

আবার 'নাম নেই' গল্পে এক ক্রীত দাস ভাতুয়া পরিবারের অস্তিত্বহীনতার কথা গল্প বিষয় রূপে গৃহীত। গ্রাম মুখিয়ার ভাতুয়া গণাই। ভাতুয়া অর্থাৎ ক্রীত দাস । যারা বংশানুক্রমে মালিকের বাড়িতে ২৪ ঘন্টা কাজ করতে বাধ্য। এহেন গণাই বিবাহিত। তার স্ত্রী-পুত্র ও মালিকের বাড়ির ভাতুয়া । গল্প - কথক দুই বন্ধুর সঙ্গে বাস পাহাড়ী জঙ্গলে বেড়াতে গিয়ে ভাবে ঃ বাড়ি নেই, সংসার নেই - ভাতুয়া হয়েই আছে। মাঝে মাঝে যখন এই ভাতুয়া পরিবারের মানুষগুলোর মধ্যে দেখা হয়, তখন তাদের মধ্যে কি কথা হয় তা জানার জন্য কথকের মনে রয়েছে কৌতূহল। আসলে এমন বিপর্যস্ত পরিবারের বোধ হয় কোন কথা থাকে না । কথাহীনতার প্রথাতেই তারা চিরকাল ভাতুয়া হয়েই থাকে । অস্তিত্বহীনভাবে। দারিদ্রের মধ্যে ডুবে যেতে যেতে ।

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের অন্য একটি গল্প 'মহা পৃথিবী'গল্পের গল্প বিষয় এক দারিদ্র-লাঞ্ছিত অন্ত্যজ পরিবারের আশা-আকাঙ্ক্ষার। সুবল মাছ ব্যাপারী। নতুন গড়ে ওঠা ভি.আই.পি. রোডের ধারে সুবলের বাড়ি। মাত্র এক কাঠা ন'ছটাক জমিতে তার ঘর। চারদিক থেকে নানান কোম্পানীর লোকেরা কিনতে চাইছেন তার জমিটা । চার হাজার পর্যন্ত দাম উঠেছে। সুবল হয়তো এতদিন বেচেই দিত জমিটা। কিন্তু তার মা বগলা ভিটে মাটি বেচতে নারাজ। তাই বুড়ি না- মরা পর্যন্ত জমি বেচার ব্যাপারটা স্থগিত রাখতে হয় সুবলকে । মাছ বেচে যা দু-তিন টাকার রোজগার হয় তাতেই কোন রকমে দশ জনের সংসারটা চলে। এই চরম দারিদ্রের হাত থেকে রেহায় পাওয়ার জন্য সুবল জমিটা বেচে বড় ব্যবসা ফাঁদতে চায়। কিন্তু সুবলের মা কিংবা বৌ কেউ-ই সুবলের পক্ষে মত দেয় না। ফলে অভাবের সংসারে লেগে থাকে নিত্য অশান্তি। কিন্তু হঠাৎ করেই সমস্ত সংসারের চাল চিত্রটা পাল্টে যায়। বীমা কোম্পানী সুবল এর ঐ জমিতে মাস প্রতি পনের টাকা ভাড়ার বিনিময়ে

বিজ্ঞাপন টাঙাতে চায়। সুবল রাজী হয়। খুশি হয়ে । এমন কি ভাড়া বাবদ আগাম ত্রিশ টাকা সুবল হাতে পায়। অতর্কিত এই অর্থ প্রাপ্তির সংবাদে সংসারটাতে আনন্দের হিল্লোল বয়ে যায়। যেখানে মারামারি-গালাগালি খেয়োখেয়ি ছিল নিত্য ব্যাপার, সেই সংসারে যেন হঠাৎ এক জলক আনন্দের ঝলকানি এল কোম্পানীর দৌলতে। বিজ্ঞাপনের ছবি এই রকম ঃ মাদকতাময় নীল রঙের মধ্যেই একটা বাড়ি। উপরে উড়ন্ত একটি বিমান। বিমানকে ধরবার জন্য মোহময় গোলাপী রঙের দুটি ফুটন্ত যৌবনের যুবক - যুবতী- সাহেব- মেম । বাড়ির ছোট্ট বাচ্চারা তো বটেই সুবল স্বয়ং ছবিটাকে বারে বারে দেখে । দেখে তার ষোল বছরের সোমত্ত মেয়ে কুশীও। কুশী যখন তখন বড় রাস্তায় দাঁড়ায়। তাকে কেউ দেখতে পারে না। মার ধর ও খায় সে । আধপেটা খেতে পায়। বাড়িতে বড়ই অনাদর তার । কিন্তু তাকে ভালোবাসে সাইকেল মিস্ত্রি টাবু। বিজ্ঞাপনের কল্যাণে আজ কুশীও খুব খুশি। এই আনন্দের জেরে সেদিন সন্ধ্যায় রাস্তার ধারে ঝোপের আড়ালে টাবুর আনা চপ খেতে খেতে সে টাবু কে সমস্ত শরীরটাই দিয়ে দেয়। - বাস্তব পৃথিবীর একটি অর্থ লাঞ্ছিত পরিবার ক্ষণিকের জন্য হলেও যেন বীমা কোম্পানীর বিমানে চড়ে মহা পৃথিবীর আনন্দময় জগতের দিকে উড়ে চলে।

ঘ) শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায় ১৯৩৩-২০০২)

স্বাধীনোত্তর পর্বে শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায় তাঁর ছোট গল্পে পরিবর্তমান জীবন ও স্বৈরবৃত্ত কালের পটভূমিতে জীবন উপলব্ধির নতুন ক্ষেত্রে পাঠককে পৌঁছে দেন। শহুরে পাঠকের সামনে এক নতুন জগতের দুয়ার খুলে দেন। গ্রামের জগৎ যে এত নতুন অনুভব সমৃদ্ধ শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায় আমাদের দেখালেন। এবং তিনি এও দেখালেন যে অন্ত্যজ মানুষদের অস্পৃশ্য বলে আমরা উঁচু সম্প্রদায়ের এবং শহুরে মানুষেরা তাদের দূরে ঠেলে দিয়েছি তাদেরকে নিয়েও যে গল্প লেখা যায় আমাদের চোখে আঙুল দিয়ে তিনি দেখালেন।

তাঁর গল্পে পদে পদে পাঠকে অবাক করে। আঙ্গিকে, বিষয়ে, ভাষায়, বর্ণনা ভঙ্গীতে, জীবনবোধে আর চরিত্র প্রদর্শনে তা অভিনব। তাঁর গল্প যেমন - 'পারাপার', 'লক্ষ্মণ মিস্ত্রির জীবন ও সময়', 'বোকা ডাক্তারের দুই রুগি', 'দখল' প্রভৃতি গল্পগুলি আলোচনা করলেই তার গল্পের স্বতন্ত্রতা অনুভব করতে পারব।

'বোকা ডাক্তারের দুই রুগী' গল্পে সন্তোষটাকী ও ভদ্রেশ্বর নাপিতের বিচিত্র কৌশলে অর্থ উপার্জনের কাহিনী বর্ণিত । সন্তোষ টাকী নামী চোর। ডাকাতও । চুরি-ডাকাতিতে তার সাকরেদ হল ভদ্রেশ্বর । তবে তাদের ডাকাতি গিরির শুরুতেই রণে ভঙ্গ দিয়ে ভদ্রেশ্বর নাপিতের কাজে মন দেয়। আর ধরা পড়ে সন্তোষটাকীর জেল হয়। তিন বছর পর সে ফিরে আসে । সেই দিনই রেল স্টেশনে সন্তোষ টাকী ও ভদ্রেশ্বর একটি মজার ঘটনা শুনে ফেলে । ঘটনাটি এই রকম ঃ স্টেশনে দীনুডাক্তার বেশ বোকা। লোকে তাকে বোকা ডাক্তার বলে ডাকে। ভালোই রোজগার করে এই আধা-হোমিওপ্যাথি, আধা-অ্যালোপ্যাথি ডাক্তারটি । কিন্তু এই ডাক্তারের সঙ্গেই পুলিশের জমাদার তারপদ মালাকারের

বউ উমার অবৈধ প্রণয় সম্পর্ক বর্তমান। উমার গর্ভে রয়েছে বোকা ডাক্তারের সন্তান। - এই ঘটনাটি আড়ি পেতে শুনে ফেলে সন্তোষ ও ভদ্রেশ্বর এবং এই ঘটনা সূত্রেই তারা শুরু করে বোকা ডাক্তারকে ব্ল্যাকমেল করে অর্থ উপার্জনের নতুন ধান্দাঃ

" - সব শুনেছিস?

- সব । নাও, এক্ষুণি দশ টাকা ছাড়ো তো ।

- নেই । দু'টাকা নিয়ে যা।

-ভালো করে খুঁজে দেখ। অনেক তো ভিজিট পেলে।

দাও না দশ টাকা।

- নিয়ে যা।" (বোকা ডাক্তারের দুই রুগিঃ গঙ্গোপাধ্যায় শ্যামল)

'দখল' গল্পটি একই সাথে পরিবারের মত বাস করা তিন জন অন্ত্যজ মানুষের প্রেমজাত-কামনা - বাসনা ও জৈবিকতার নিবৃত্তির টানাপোড়েনের গল্প। বাদা অঞ্চলের ভবেন ও দাক্ষী ঘর বেঁধেছে রেল কোম্পানীর পাড়ে, বাঁধের উপর। আসলে শুধু ভবেন ও দাক্ষী বাঁধেনি সে ঘর, আধা চোর ডাকাত সন্তোষটাকী ও খড় বাঁশ চুরি করে বনে ঘর টাকে মজবুত করেছে। কোম্পানী বাঁধের যে জায়গাটায় তারা ঘর বেঁধেছে সে জায়গাটা শ্বাপদ- সঙ্কুল । সেখানে অতি দুটো পুরনো সাপ বুড়ো-বুড়ি তাদের পুরো 'ফ্যামিলি' নিয়ে বাস করে। একটু গর - সাবধান হলেই বিপদ, জীবন চলে যেতে পারে। তিন জনের উপার্জনেই তাদের সংসার চলে। দাক্ষী এখন তাদের দুজনেরই শোয়ার সাথী। পর পর দুজনে দাক্ষীর সাথে শুয়ে এসে খোলা আকাশের নিচে ঘুমিয়ে পড়ে। কখনো শোয়া নিয়ে দু ই পুরুষের সাথে ঝগড়া বাধে - যেন দুই পুরুষ সারারাত কোম্পানীর বাঁধে লড়াই করে। এরই মধ্যে প্রত্যেক বছরের মতো কোম্পানী বাঁধে এসে হাজির হয় সাপুড়ে আশু বৈদ্য। ফলে তিন জনের সংসার চারজনে গড়ায়।

আশুর কাছ থেকে তুক - মন্ত্র নিয়ে দুই পুরুষ উদ্যম দাক্ষীকে দখলের লড়াই শুরু করে গোপনে। তাদের এই লড়াই সাপের প্রতীকে অসাধারণভাবে গল্পে ফুটে উঠেছে। বুড়ো-বুড়ি দুই সাপকে ধরার জন্য তিন পুরুষ সারাদিন তাদের তাড়িয়ে বেড়ায়। সেই ফাঁকে দাক্ষী অদ্ভুত পূর্ব একটা কাজ করে সে সবার অলক্ষ্যে বুড়ো -বুড়ির বাসস্থান খুঁড়ে সর্প শিশুটিকে ধামা বন্দী করে তাদের ঘরে রাখে আর নিজে মাচার উপর পা তুলে বসে থাকে দাক্ষী। সন্ধ্যে হলে তিন পুরুষ ব্যর্থ হয়ে ফিরে এসে রান্নায় মন দেয়। গন্ধে গন্ধে বুড়ো-বুড়ি হাজির হয় দাক্ষীদের ঘরে। ধামাটা পেঁচিয়ে ধরার বাসনায় পিছলে পিছলে পড়ে যায় তারা। বারে বারে চেষ্টা করে । বারে বারে পিছলে পড়ে। মাচায় বসে সব দেখতে থাকে দাক্ষী। ওদিকে খাওয়া শেষে বন্ধ ঘরের দরজায় ধাক্কা দেয়। দাক্ষী বারণ করে তাদের। ঘরে বসে দেখে দাক্ষী ঃ

" একবার ভবেন সন্তোষকে, আরেকবার সন্তোষ ভবেনকে তেড়ে তেড়ে যাচ্ছে। সুতো পড়ানো দুটো পুতুল তেরছা চৌকো জ্যোৎস্নায় এরই ভেতর এক এক বার বন্ধ দরজার কাছে যায় আর ছিটকে পিছিয়ে আসে ।

ওরা দুজনে জানেও না - তখন দাক্ষী পা গুটিয়ে অন্ধকার মেঝের উপকার ধামাটা দুচোখে খুঁজে বেড়াচ্ছে, আর ধামা থেকে পিছলে পড়ার একটা জোড়া শব্দ প্রায়ই পাওয়া য়াচ্ছিল।"

(দখল ঃ গঙ্গ্যোপাধ্যায় শ্যামল) ।

বুড়ো-বুড়ি দুই আদিম সাপের প্রতীকে যেন দুই পুরুষের আদিম প্রেমজ কামনা-বাসনা এই গল্পে মূর্ত হয়েছে। তা স্বতন্ত্র, তা বহু মাত্রিক।

'লক্ষ্মণ মিস্ত্রির জীবন ও সময়' গল্পের বিষয় হয়েছে এক চাষী পরিবারে বিপর্যয়ের কাহিনী গল্পে দেখি, শরৎ মিস্ত্রির ছেলে লক্ষ্মণ মিস্ত্রি চাষের কাজে অত্যন্ত মনোযোগী। লক্ষ্মণের চাষের গুণে ধান - ঝিঙে- লঙ্কা- ঢেঁড়স যে চাষেই তারা যায় প্রচুর ফলন পায়। ফলে মোটা ভাত মোটা কাপড়ে তাদের সংসার চলে। আপাত দৃষ্টিতে তারা সুখী হলেও মনের নিভৃত কোণে লক্ষ্মণের ও তার বাবার কোথায় যেমন অন্যের ধরনি তেমনি তার প্রথম পক্ষের বউও অন্যের ঘরনি। এই দুজনের প্রতি লক্ষ্মণের মনে একটা গোপন টান ছিল। বাবার সঙ্গে মিলিত হয়ে সে তার ঐ মা'কে লুকিয়ে দেখতে যেত । নিজের প্রথম পক্ষের স্ত্রীকেও সে এক আধবার একাকী এমনভাবে লুকিয়ে দেখে এসেছে। এসমস্তই লক্ষ্মণের মনে গভীর চাপ সৃষ্টি করেছে। ফলে তার একটি কঠিন ব্যাধি হয়েছে। এই ব্যাধিতে তার সারা দেহ ফুলে গেছে। সেই রোগ যন্ত্রণায় ক্লিষ্ট হয়ে লক্ষ্মণ মিস্ত্রি আত্ম হত্যা করে। বলা যায় শুধু মাত্র রোগ নয়, জটিল মনস্তাত্বিক টানাপোড়েনের চাপ সহ্য করতে না পেরে লক্ষ্মণ মারা গেছে। এই মৃত্যুর - সূত্রে নেমে এসেছে বিপর্যয়।

ঙ) অসীম রায় (১৯২৭)

অসীম রায়ের গল্প গ্রন্থ ঃ 'অসীম রায়ের গল্প' (১৯৮১), 'গল্প সংকলন' (১৯৮৬)। 'লখিয়ার বাপ', 'ডনা পলা'। ডনা পলা ষোড়শ শতাব্দীর গোয়ায় পর্তুগীজ গভর্ণরের মেয়ে, অন্ত্যজ শ্রেণীর জেলে পরিবারে এক তরুণের সঙ্গে প্রেম-পিতার নিষেধ - তরুণটি নির্বাসিত, নিজ কন্যাকে পর্তুগালে ফেরত পাঠানোর ব্যবস্থা । সব ব্যবস্থা ভেঙে যায় যখন সমুদ্রের কোলে পাহাড়ের চূড়া থেকে ঝাঁপ দিয়ে আত্ম হত্যা করে পলা।

ষোড়শ শতাব্দীর প্রেমের কাহিনী 'ডনা পলা'। তাৎপর্যময় দুটি কারণে - ১) বিংশ শতাব্দীর অন্তিম পর্বের বানিজ্যিক জীবন চর্চার প্রেক্ষিতে ষোড়শ শতাব্দীর প্রেমকে তুলে ধরা। ২)প্রেমকে অন্যান্য পবিত্র আত্ম বিসর্জনের সঙ্গে যুক্ত করা।

'ডনা পলা' গল্পে ষোড়শ শতাব্দীর এক ষোড়শীর 'স্বপ্নে নোঙর করেছেন গল্পকার' । "কিন্তু এটা কোন অতীত ঘটনা নয়, এটা যেন একটা স্বপ্নের যুগ যুগান্তর ধরে বেঁচে থাকা - এই স্থির নীলের মধ্যে পবিত্র এক শিখার মতো প্রেম জ্বলছে। চারশো বছর ধরে।" গল্পকারের মমত্ব ডনার স্বপ্নে, ডনার পবিত্র আত্মবিসর্জনে । এ সেই 'অনির্দিষ্ট সম্পূর্ণ বাস্তব বিরহিত স্বপ্ন' যা সন্ত্রাসবাদীদের ফাঁসী কাঠে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার অনুপ্রেরণা যোগায়, আসন্ন পরিকল্পিত সুখ থেকে মহাশূন্যে এগিয়ে

যাওয়া উদ্দীপ্ত করে।

অসীম রায়ের 'লখিয়ার বাপ' গল্পটি বিভিন্ন কারণে গুরুত্ব পূর্ণ। সমালোচকের মতে - "গল্পটি গুরুত্ব পূর্ণ এই কারণে যে এখানে কেবল হরিজনদের অত্যাচারিত হওয়ার ঘটনা হিসেবেই নয়, একজন ষোড়শীর প্রতিবাদী কণ্ঠস্বর যে একবার শোনা গিয়েছিল, অন্তত একবার, সেটি গল্পটিতে নতুন মাত্রা যোজনা করেছে। এক ষোল বছরের মেয়ে আর এক যুবককে প্রতিরোধ করতে সুখিয়াকে কখনো গীতা, কখনো তুলসী দাসকে উদ্ধৃতি দিতে হয়। লাঠি সড়কি শটগান - সবই আনতে হয়। ভয়টা এতই প্রবল যে তাদের পৃথিবী থেকে সরিয়ে দিতে হয়।"

চ) আবুল বাশার (১৯৫১)

সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজের মত আবুল বাশার মুর্শিদাবাদ জেলার মানুষ। জীবনের একটা অংশ তিনি ঐ জেলাতেই কাটিয়েছেন। সত্তর - আশির দশকের অনেকটা সময় জুড়ে তিনি যুক্ত ছিলেন রাজনীতির সঙ্গে। কিন্তু বাশারের সাহিত্য কর্মে তা প্রেরণা স্বরূপ হয়ে উঠে নি । একথা তিনি কবুল করেছেন। ('কেন যে লিখি', 'কোরক', শারদ সংখ্যা ১৯৩৭)মুর্শিদাবাদের 'রৌরব' পত্রিকায় বাশারের প্রথম গল্প প্রকাশিত হয় । ১৯৮৮- এর জানুয়ারীতে প্রকাশিত 'রৌরব' পত্রিকার 'বারো বছরের বিশেষ সংখ্যাটি'-তে তাঁর পাঁচটি গল্প প্রকাশিত হয়। ১৯৮৮-এর মে মাসে প্রকাশিত তাঁর প্রথম সংকলন 'মাটি ছেড়ে যায়', জুন মাসে দ্বিতীয় সংকলন 'সিমার' ।

বাশারের গল্পের অন্যতম বৈশিষ্ট্য - ঐতিহ্যের প্রতি তাঁর দায়বদ্ধতা। তিনি ধর্ম বিরুপ নন, ধর্ম বিদ্বেষী তো নন ই। আবুল বাশারের 'সুখেন গুঁই ও মুথা ঘাস' একটি দারিদ্রের গল্প। সুখেন গুঁই দুটি গাভিকে সম্বল করে কোন রকমে বেঁচে আছে। প্রচন্ড খরার দিনে অন্নাভাবে ধুঁকছে মানুষ। সুখেন তার দুই গাভি কৃষ্ণা ও সরস্বতীকে নিয়ে মাঠে মাঠে ঘুড়ে বেড়ায়। চড়তে চড়তে গরু দুটি গোর আলির আম বাগানে ঢোকে। বাধ্য হয়ে সুখেনও যায় গোর আলির বাগানে । প্রচন্ড ক্ষুধার্ত - তৃষ্ণার্থ সুখেন দেখে কৃষ্ণা একটি পাকা ল্যাংড়া আম মুখের মধ্যে চিবাতে শুরু করেছে। মুহুর্তে সুখেন ঝাপিয়ে পড়ে গরুটির মুখ থেকে আম কেড়ে নেয়। তৃপ্তির সঙ্গে সেই আম খায়। আম খেতে খেতেই তার নজরে আসে বাগানের পুকুরে অবশিষ্ট সামান্য জলের পাশে জন্মেছে থোকা থোকা মুথা ঘাস। সুখেন সেই খাস কাটার জন্য জলাভূমিতে নামে। তখনই তার নজরে পড়ে পুকুর পাড়ে দাঁড়িয়ে আছে শ্যামা নাম্মী এক মেয়ে। শ্যামা একটা বাটি সুখেনের হাতে দিয়ে জল খেতে চায়। ওদিকে কৃষ্ণা ও সরস্বতী সামান্য সেই জলটুকু গোগ্রাসে গিলতে শুরু করেছে। সুখেন কোন রকমে একবাটি জল তুলে শ্যামাকে দেয়। তারপর নিজের পান করার জন্য জলার দিকে তাকিয়ে দেখে সবটুকু জল নিঃশেষিত হয়ে গেছে। সুখেনের অবস্থা দেখে শ্যামা তখন নিজের ভাগ থেকে সামান্য জল সুখেনকে খেতে দেয়। একসময় সুখেন মুথা ঘাসগুলো কেটে গরু দুটোকে নিয়ে বাড়ির পথে হাটে। কিছু সময় হাটার পর সুখেন দেখে শ্যামাও তার পিছন পিছন আসছে। শ্যামা সুখেনের কাছে ঘাস চাইলে সুখেন

ঘাসের বিনিময়ে শ্যামার দেহটা চায়। শ্যামা মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে থাকে । হো হো করে হেঁসে ওঠে সুখেন। তারপর নিজের অর্জিত বহুমূল্য ঘাসের ভাগ এমনিতেই শ্যামাকে দেয়। শ্যামা সেই ঘাস বেচে সাতদিন পর ভাত খেতে পায়।

আসলে এটি একটি দারিদ্রের গল্প । দারিদ্র যে মানুষকে কোথায় নামায় তা এই গল্পে আমরা লক্ষ্য করি। সুখেন ও শ্যামার এই দিন যাপনের, প্রাণ-ধারণের গ্লানি গল্পকার নির্মম নৈপুণ্যে 'সুখেন গুঁই ও মুথা ঘাস' গল্পে তুলে ধরেছেন। আবুল বাশারের গল্প ধর্ম ও জীবন, ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধা ও কঠোর দারিদ্রের জন্য মানুষের মমতা বারে বারে ফিরে আসে। চেনা দারিদ্র নয় অচেনা দারিদ্র আর দুঃখকে বাসার গল্পে রূপায়িত করেছেন।

ছ) প্রফুল্ল রায়

বর্তমান প্রজন্মের এক শক্তিশালী গল্পকার প্রফুল্ল রায় । তাঁর গল্প সমগ্রে (প্রথম খন্ড ১৯৯৯, দ্বিতীয় খন্ড ২০০০, তৃতীয় খন্ড ২০০১, চতুর্থ খন্ড ২০০২/দে'জ) মোট গল্প সংখ্যা ৮৫। এর মধ্যে নব্বই দশকে লেখা গল্প চার খন্ডে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। যেমন প্রথম খন্ডে - 'মেরুদন্ড', 'অনুপ্রবেশ', 'আর একবার', 'জনক', 'জাহান্নমের গাড়ি', দিতীয় খন্ডে, 'গন্তব্য', 'নরক', 'বাজী', 'মূকাভিনেতা', তৃতীয় খন্ডে, 'ভোজ', 'শিকড়', 'কোন একদিন', 'পাড়ি', ' আকাশের চাঁদ এবং একটি জানালা', 'নরকের পোকা', চতুর্থ খন্ডে, 'কাছেই আছে', 'দেশ নেই', 'বাঁচার জন্য', 'যেখানে সীমান্ত নেই', । এই সব গল্প পড়লে অনুধাবন করা যায় বঙ্গ ও বিহারের উঁচু -মাঝারি-নিচু তলার মানুষেরা তার গল্প রচনার মূল প্রেরণা ।

কেবল পরিবর্তমান সমাজের ছবি নয়, পরিবর্তমান মূল্যবোধের পরিচয় ও তাঁর গল্পে পাই। 'সাতঘরিয়া' গল্পে এক দোসাদ রমণী চাঁপিয়া দোসাদের ভাগ্য বিপর্যয়ের কথা যেমন আছে, তেমনি চাঁপিয়ার মানবিক সমমর্মিতা ও উদারতার প্রকাশ ও এই গল্পে মূর্ত হয়েছে। নিজে চরম ভাগ্য বিপর্যয়ে বিধ্বস্ত হলেও সে তারই মত বিপর্যয় - বিধ্বস্ত বৃদ্ধ গৈরীনাথকে নিজ গৃহে স্বামী বলে স্থান দেওয়ার মহানুভবতা দেখিয়েছে । বিহারের মন পথল গাঁয়ের জল - অচল অচ্ছুৎ সমাজ দোসাদদের মেয়ে, চল্লিশ বছুরে রুগ্না চাঁপিয়া সপ্তম বারের জন্য 'সাঙা' করতে কনের সাজে পাড়া ছাড়ছে। নাটোয়ার তাকে বিয়ে করতে রাজী। গত ছয় ছয় বার চাঁপিয়া স্বামী ঘর গেলেও নানা কারণে তার ঘর ভেঙে গেছে। ছ'ঘরিয়া চাঁপিয়া তাই সাতঘরিয়া হতে নাটরের পিছন সুরথ পুরার হাটে চলেছে । এই হাটে মজুর কেনা-বেচা হয় ক্ষেতির কাজের জন্য। বিগত ছ'ছবার চাঁপিয়াকে মালিক - মহাজন মু হুর্তে কিনে নিয়ে গেছে। তার বিয়েও হয়েছে। এবারেও বিয়ের সর্ত - যদি চাঁপিয়ার কাজ জোটে তবেই নাটোয়ার তাকে বিয়ে করবে। তার কাজ জুটল না । নাটোয়ার ও তাই তাকে ছেড়ে চলে গেল। কিছু সময় পরে সে দেখল সবাই চলে গেছে, হাটে শুধু পরে আছে সে নিজে ও তারই মত ভাগ্যহীন গৈরীনাথ । গৈরীনাথেরও রুগ্ন চেহেরা। কিন্তু একদা তারও দিন ছিল। কাজের জন্য

তাকেও কোন দিন বসে থাকতে হত না । কিন্তু গত কয়েক বছরের ক্ষয়রোগে তার দেহে পঞ্চাশ বছরেই বৃদ্ধত্ব এসেছে। দুই ভাগ্যহীন নরনারী এখন পরস্পর মুখোমুখি। চাঁপিয়ার তবু ফেরার মত নিজস্ব একটি ঘর আছে। গৈরীনাথ গৃহহীন। এমতাবস্থায় মানবিকতার চরম সাক্ষ্য দেয় চাঁপিয়া। সে গৈরীনাথকে নিজের ঘরে জায়গা দিতে রাজী হয়। গৈরীনাথ সমাজ - সংসারের বাধা ও নিন্দার কথা বললে, চাঁপিয়া দৃঢ় কণ্ঠে জানাই সে গৈরীনাথকে পুরুত ডেকে 'সাঙা' করে তবে ঘরে উঠবে। করলও তাই । মন পথলের দোসাদ পাড়ার সকলে দেখল, সকালে সাতঘরিয়া হওয়ার বাসনা নিয়ে চাঁপিয়া যে পুরুষের পিছনে হেঁটে ছিল, সন্ধ্যাতে অন্য একজন পুরুষের সামনে নিজ ঘরে ফিরে এল। এল সাতঘরিয়া হয়েই। দোসাদ রমণী চাঁপিয়ার মানবিকতায় উত্তরণের এই কাহিনী মহৎ ও সার্থক।

'বাঘ' গল্পে বাঘের সঙ-সাজা শিল্পী ঘুণুরামের জীবনের আত্মমর্যাদাবোধ ও প্রতিবাদ চেতনার কথা বর্ণিত । আত্ম মর্যাদা রক্ষার জন্য সে স্বেচ্ছায় সচেতনে নিজের প্রাণটিকেও বিসর্জন দিয়েছে। ঘুণুরাম প্রতি বছর মাঘ মাসে মহারাষ্ট্রের নোন পুরার গণেশ উৎসবে যায় সেখানে বাঘের সংসেজে নাচ দেখিয়ে তিন মাসের খাদ্য-খোরাকি সমেত সারা বছরের পোশাক-পরিচ্ছদ আয় করে নিতে পারে। তার উপর রয়েছে রতি - শিবল নায়েকের মেয়ে রতির প্রতি অমোঘ টান । তাই মাঘ মাসের দিকে তাকিয়ে থাকে সে সারাটা বছর। কিন্তু এবার গিয়ে অবাক হল ঘুণুরাম। তাকে কেউ ভ্রূক্ষেপ করছে না। শিল্পীর যে সম্মানজনক আসনটি এতদিন সে পেয়ে এসেছে এবার তা ধুলি লুণ্ঠিত । এমনকি রতিও তার ধারের কাছে আসছে না। নোনপুড়ার মানুষের এমন ব্যবহার তার কাছে অপ্রত্যাশিত। কেননা, প্রতি বছর সে এলে শুধু তার সঙ্গে এক দন্ড কথা বলার জন্যই মানুষের কত আকাঙ্ক্ষা দেখেছে সে । এসমস্তের কারণ অনুসন্ধান করতে গিয়ে জানতে পারল- গ্রামের উত্তরের টিলায় শম্ভা নামের এক বেদে যুবক একটি জ্যান্ত বাঘ এনে খেলা দেখাচ্ছে । সবাই সে জ্যান্ত বাঘের খেলায় দেখছে। তারা ঘুণুরামকে স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছে, নকল বাঘের খেলা আর তারা দেখবে না। একথা শুনে আত্ম সম্মানে আঘাত খেল ঘুণুরাম। শিল্পীর আত্ম মর্যদায় পেল ব্যথা। তাই শিল্পীর মর্যদাকে রক্ষার জন্য সে একটি মারাত্মক সিদ্ধান্ত নিল। পূর্ণ বাঘ - সাজে সজ্জিত হয়ে সে ঐ জীবন্ত বাঘটির সঙ্গে লড়তে চাইল। উদ্দেশ্য - ঐ জীবন্ত বাঘকে হারিয়ে নিজের মর্যদাকে পুনরুদ্ধার করা। লেখকের বর্ণনায় ঃ

"জীবনে চিরদিন বাঘের সঙই সেজেছে ঘুণুরাম। এই একবারই বাঘ হয়ে উঠতে চেয়েছিল সে।" (বাঘ ঃ রায় প্রফুল্ল)

কিন্তু পারেনি সে । বাঘের আক্রমণেই তার মৃত্যু ঘটেছে। তার এই মৃত্যু -এই পরাজয় আসলে তার পরাজয় নয়, এ তার আত্ম মর্যদা প্রাপ্তির লড়াই। তা মহৎ । তা অনবদ্য।

জ) অমর মিত্র (১৯৫১)

অমরমিত্র (১৯৫১) সরকারী চাকুরি সূত্রে গ্রাম বাঙলাকে নিবিড় পর্যবেক্ষণে ধরেছেন। বিংশ শতাব্দীর শেষ পদে পঁচিশ বছরই তিনি গল্প লিখেছেন। অমর মিত্রের 'শ্রেষ্ঠ গল্প ' সংকলনে (২০০৩) আছে এই সময়কার গল্প। তাঁর প্রথম গল্প সংকলন 'মাঠ ভাঙে কালপুরুষ' (১৯৭৮)। দ্বিতীয় সংকলন 'দান পত্র' (১৯৮৬) । তৃতীয় সংকলন 'আসন বনি' (১৯৯৩)। চতুর্থ সংকলন 'অমর মিত্রের ছোট গল্প', পঞ্চম সংকলন 'বসন্ত বিলাস',ষষ্ঠ সংকলন 'পাঁজর' (২০০০) ।

এই সব সংকলনে গ্রথিত গল্প গুলি পড়লে মনে হয় অমর মিত্র গ্রাম নিয়ে শুরু করেছেন তারপর এসেছন শহরে । গ্রামের মানুষ, শহরের মানুষ দুই-ই এসেছে তাঁর গল্পে।

'অলীক এই জীবন' শ্রেষ্ঠ গল্পের ভূমিকায় (২০০২) অমর মিত্র লিখেছেন নিজের কথা । ১৯৭৩-এ রাজ্য সিভিল সার্ভিসে যোগ দিয়ে তিনি কাজে যোগ দেন মেদিনীপুরে। এই জেলার ডেবরা থানার করন্ডা গ্রামে প্রথম পোষ্টিং । "আমি আমার জীবনের শ্রেষ্ঠ সময়টি কাটিয়েছি দূর গ্রামের পথ ভাঙতে ভাঙতে। আমার শহর বাসী বন্ধুদের সঙ্গে আমার তফাৎ ঘটে যাচ্ছে প্রতিদিন। সময় অতিবাহিত হচ্ছে চাষী বাসী মানুষের সঙ্গে। আর ছিল বই । কলকাতায় এসে নিয়ে যেতাম প্রিয় গ্রন্থগুলি, বিভূতি , মানিক, তারাশঙ্করের সঙ্গে চেখব, তলস্তয়, দস্তয়েভস্কি।

গল্পকার অমর মিত্রের এই সব কথা তাঁকে চিনিয়ে দেয়। সতের বছর এই ভাবেই গ্রামে থেকেছেন । গ্রামের মানুষকে জেনেছেন। এই জানার কথা আছে তাঁর গল্পে। "গত আটাশ বছর ধরে জীবনকে দেখার সুত্র এইটা"। ১৯৭৩ থেকে ২০০১ সাল এই আটাশ বছরের জীবন যাপনের অভিজ্ঞতা গল্প লেখককে সমৃদ্ধ করে।

'মেলার দিকে ঘর' তাঁর প্রথম গল্প। লক্ষ্মীকাঁদে, বাপ সহদেবকে বলে 'আর মেলায় যাবনি বাপ ঘরে নিই চল।' লক্ষ্মীর আর্তনাদে সহদেব নিরুত্তর। কারণ মেয়ের জন্য এক কুড়ি টাকা, মুখে গত রাতে খাওয়া অন্নের স্বাদ । অন্নহীন দেশে লক্ষ্মী বিকিয়ে যায়। 'ঢ্যামনা সাপডা মাছ ধরিছে, উঃ গা কিমন করছ্যা'। লক্ষ্মীর এই উক্তিতে সহদেব বলে - 'উ সাপ তো মাছ ধরব্যাই'। এমন সব ইঙ্গিত গল্পে ছড়িয়ে আছে। পাঠক টের পায় 'মেলার দিকে ঘর' গল্পের পরিনতি । সাপের মাছ ধরা এখানেই পেয়ে যায় প্রতীকী তাৎপর্য। সমাজ বাস্তবতা এখানে উঠে আসে। ক্ষুধার সামনে আর কোন বিবেচনায় গ্রাহ্য নয়।

নব্বই দশকে লেখা গল্পে অমর মিত্রের এই নিবিড় পর্যবেক্ষণ আর সামাজিক বাস্তবতা বোধ নতুন রূপ পায়। 'কোকিল' গল্পে অন্ত্যজ শ্রেণীর সরল গরীব মানুষ বনাম সরকারী আপিসের (মফস্‌সলী গঞ্জে) বাবু সাহেব আর কেরানী - দিদিমনির টানাপোড়েনের ছবি। গ্রামের পৌন্ড্র ক্ষত্রিয় গৌর মিদ্যে পিওন হয়ে ঢোকে সরকারী আপিসে। ই.ডি.কেরানী অচিন্ত্য বোস আর এল.ডি.কেরানী বন্দনা চ্যাটার্জি -এরাই গৌড়ের উপর ওয়ালা। তিন পুরুষের চাষা গৌড়। পিওন হয়ে ফাইল বয়, বাবু-দিদিমণির জল চা এনে দেয়। একে দিয়ে ঘুষের টাকা আনা-নেওয়া করা যাবে, অচিন্ত্য বোস ভাবে।

গৌর তাকে সোজাসুজি বলে- 'আজ্ঞে আপনি উচ্চ বংশ, বড় ঘরের লোক, খাঁটি কুলীন কায়েত, ঘুষ লবেন।' অচিন্ত্য বোস হতভম্ব হয়ে যায়। গৌরকে ট্রেনিং দেওয়া দরকার। অচিন্ত্য বন্দনা গৌড়- তিন, তিন চরিত্রের কথাবর্তায় সরকারী আপিসে ফাইল নড়ানোতেই যে ঘুষ লাগে সেই দৃশ্যটাই ফুটে ওঠে। গৌরের বুনো বাপ ফকির মিদ্যে এসেছে এই আপিসে ছেলের কাজ করা দেখতে। সে বুড়ো অচিন্ত্যকে বলে, শেষে গৌর কিনা বিনা কাজে পয়সা নেবে। বুড়োর কথা আর শেষ হয় না। তার কথায় বুবুদের সব অনাচার প্রকাশ হয়ে যায়। অচিন্ত্য থর করে কেঁপে ওঠে ।

অমর মিত্রের গল্পে সমাজের এই আসল চেহারাটা উদাম হয়ে প্রকাশ পায়। এক ভয়ঙ্কর বাস্তবতা বোধ ধারা বর্ষণে আবৃত করে দিতে চায় নিম্নবিত্ত চরিত্রগুলি।

'আত্মহনন' (১৯৯২) তেমনই এক গল্প যা নিম্ন মধ্য বিত্তকে বে-আব্রু করে দেয় নিম্নবিত্ত অন্ত্যজ শ্রেণীর মানুষদের কাছে। মাছ ওয়ালার সঙ্গে পঞ্চাশ টাকা নিয়ে তর্কাতর্কিতে নির্মল বাবু হেরে যায়। মাছ ওয়ালা হাবুল দাস তার চেয়ে অনেক সৎ আর নির্লোভ । এটা প্রমাণ হওয়ার পর নির্মল আর বাজারে হাবুল দাসের ছায়া মারায় না। মাছ ওয়ালার কাছে, স্ত্রী সুচরিতার কাছে ধরা পড়ে যাওয়া নির্মলের আত্ম গ্লানি আর যায় না। হাবুল দাসকে মিথ্যে কথা বলে সে টাকা ফেরৎ নেয়। হাবুল বলে- 'মিথ্যেবাদী অপবাদের চেয়ে আমার মরাই ভালো' । এই উক্তিতেই অন্ত্যজ শ্রেণীর মাছওয়ালা হাবুল দাসের মহানুভবতার পরিচয় পাওয়া য়ায়।

কথা বন্ধ

কথা বন্ধ

বর্তমান প্রসঙ্গটি গবেষণাকর্মের আলোচনার পেক্ষাপটের উপসংহার অংশ। কথাবন্ধ কথাটি উপসংহার হিসেবেই ধরা হয়েছে। সামগ্রিক আলোচনার প্রেক্ষাপটে অথবা মূল্যায়ণের প্রকৃত নির্যাসটুকুই এখানে প্রকাশ করা হয়েছে। স্বাধীনতা উত্তর সমকালীন ইতিহাসকে সামনে রেখে, বাংলা কথাসাহিত্যের (মূলত ঃ উপন্যাস ও ছোটগল্প) বিস্তৃত ক্ষেত্রে অন্ত্যজ সম্প্রদায়ের মানুষের জীবন পরিক্রমার শেষে গুরুত্বপূর্ণ প্রাপ্তীর একটি ধারণা এখানে বিন্যস্ত করা যেতে পারে-

ইতিহাসের সময় এবং বাংলা কথাসাহিত্যের সময় এক খাতে বয়ে না গেলেও ইতিহাসকে অস্বীকার করা যায় না। ইতিহাসের ঘটে যাওয়ার ঘটনার সঙ্গে সঙ্গে সমাজ বিবর্তন ঘটতে বাধ্য, আর অন্ত্যজদের জীবনের পালে লাগে সেই পরিবর্তনের হাওয়া; স্বাভাবিক জীবন-যাত্রায় আসে নানা সংঘাত। রাজনীতি-অর্থনীতি-সমাজ-সংস্কৃতিকে কেন্দ্র করে ঘটে যায় নানা ঘটনা ধারা।

স্বাধীনতার সমকাল বা তার আগে-পরের ইতিহাস যে ঘটনাধারাকে বহন করে নিয়ে গেছে, অন্ত্যজদের জীবনে তার প্রভাব তুলনারহিত। একে তো সমাজের পায়ের তলায় পিষ্ট,তারপর 'মরার উপর খাঁড়ার ঘা'- এর মত এই পরিবর্তনের ঝড়ঝাপটায় স্থান-কাল পাত্র-সবই বদলে যায়-টিকে থাকার জায়গা, শোষণের পদ্ধতি, প্রভুত্বের স্বরূপ সব।

অর্থনৈতিক এবং সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গির বিচারে দেখা যায় যে, বেশির ভাগ ক্ষেত্রে অন্ত্যজ মানুষ উচ্চবর্ণীয় এবং ধনবান মানুষের দ্বারা শোষিত-অত্যাচারিত। তারা লাঞ্ছিত-নিপিড়িত। অনেকক্ষেত্রে বিনা কারণে তাদের উপর অমানুষিক অত্যাচার হয়েছে। আর সে অত্যাচার করেছে সমাজের উচ্চবর্ণের মানুষেরা । সমাজের উচ্চবিত্তীয় মানুষের কাছে অন্ত্যজ মানুষের জীবনের যেন কোনো মূল্যই নেই! কখনো বিনা কারণে, কখনো অতি সামান্য কারণে, সমাজের উপরতলার মানুষের দ্বারা অন্ত্যজদের লাঞ্ছিত হতে হয়েছেই, মৃত্যুর মতো চূড়ান্ত পরিণতিও প্রায়শই ঘটেছে। পুলিশ - প্রশাসনকে হাত করে, কিংবা লেঠেল কাহিনীর সাহায্যে কিংবা প্রয়োজনবোধে উচ্চজাতের মানুষ নিজেরা সরাসরি অন্ত্যজদের উপর অত্যাচার-লাঞ্ছনা চালিয়েছে। বিপরীত দিকে অন্ত্যজ মানুষরা নীরবে, প্রতিবাদহীন ভাবে, এই সমস্ত অত্যাচার-নিপীড়ন-লাঞ্ছনাকে মেনে নিতে বাধ্য হয়েছে। উচ্চবর্ণ-শাসিত সমাজে এ ছাড়া তাদের অন্য কোনো পথ নেই বলেই তারা সব অত্যাচার সহ্য করেছে। হাজার হাজার বছর ধরে চলে আসা এই অত্যাচার-নিপীড়নকে যেন উচ্চবর্ণীয় মানুষ নিজেদের অধিকার বলে মনে করেছে।

সামাজিক-রাজনৈতিক-ধর্মীয় বিভিন্ন আন্দোলন এবং তাকে কেন্দ্র করে সামাজিক পালাবদল এক্ষেত্রে বড় রকমের কোনো পারিবর্তন আনতে পারেনি বলেই মনে হয়। ব্যতিক্রম হিসাবে দু'একটি ক্ষেত্রে অন্ত্যজ মানুষকে তাদের উপর নেমে আসা অত্যাচারের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে এবং প্রতিশোধ

নিতে দেখা গেছে মাত্র। তবে অত্যাচারিত লাঞ্ছিত এই মানুষগুলোর প্রতি কথা সাহিত্যিকদের সহানুভূতি প্রায়শই বর্ষিত। তাদের যন্ত্রণাকাতর হৃদয়ের করুণ আর্তি তাই মর্মস্পর্শী রূপ পেয়েছে। এক কথায় অন্ত্যজদের জীবনের ইতিহাস যেন, উঁচু জাতের মানুষ কর্তৃক অন্ত্যজদের উপর অত্যাচার নিপীড়নের ইতিহাস, যন্ত্রণাকাতর মানুষের যন্ত্রণা সহ্য করার ইতিহাস।

অন্ত্যজ জীবনাশ্রয়ী উপন্যাস ও ছোটগল্পগুলি বাংলা সাহিত্যের বিষয়-পরিধির বিস্তার ঘটিয়েছে এবং অজ্ঞাত অপরিচিত বহু বিচিত্র-মানব-মানবীর সঙ্গে আমাদের পরিচয় ঘটিয়েছে। বিচিত্র মতিগতির মানুষের রূপ চিত্রণের মাধ্যমে বাংলা ছোটগল্প ও উপন্যাসের চরিত্রশালা বহুল পরিমানে সমৃদ্ধ হয়েছে। সৎ ভালমানুষ থেকে শুরু করে ভন্ড- বদমাইস, সরল কিংবা জটিল রহস্যময় হৃদয়ের বহু বিচিত্র মানুষের কথায় এসব ক্ষেত্রে বাংলা কথাসাহিত্য মুখর হয়েছে।

দীর্ঘ আলোচনার পথ বেয়ে আসার সময় যে উপন্যাস ও ছোটগল্প গুলিকে চয়ন করেছি, তার মধ্যে থেকে অন্ত্যজ সম্প্রদায়ের মানুষের যে চেহারা বেরিয়ে আসে, তার বেশির ভাগটাই যেন সমাজ বিবর্তনের দমকা হাওয়ায় ভেসে যাওয়া ধূলিকনার মতো - যেভাবে ভেসে গেছে- দাশু ধান্নু, লখাইরা বা তিতাস পাড়ের মালো গোষ্ঠী বা কাহার পাড়ার কাহারেরা। পরিস্থিতির হাতের পুতুল এরা। এদের নিজস্ব কোনো চিন্তা ভাবনা যেন থাকতে পারে না, কোন অস্তিত্ব যেন এদের নেই, নেই অন্তরের 'আমির' উপস্থিতি। কারণটা এই নয় যে, ঔপন্যাসিক বা ছোটগল্পকার তাদের মনের দোরগোড়ায় পৌঁছাতে পারেননি। কারণটা এই যে, সমাজে তাদের কোনো মতে টিকে থাকতে হয়। তাদের ব্যক্তিগত ভালোলাগার মন্দলাগার ব্যাপারটি হয়ে পড়ে উপেক্ষিত - যেখানে তারা তাদের স্বাভাবিক অধিকারগুলি থেকেও বঞ্চিত। এই প্রসঙ্গে একটা দৃষ্টান্ত তুলে আনা যেতে পারে। কবি জীবনানন্দ দাশ তাঁর 'শ্রেষ্ঠ কবিতা' গ্রন্থের অন্তর্গত '১৯৪৬-৪৭' কবিতায় যখন ৪৬-এর বিপন্ন দরিদ্র মানুষগুলির কথা বলছেন, তখন একটি শব্দ ব্যবহার করেছেন- 'আধোঅধিকারিণী'। মরণের আগে এই 'আধোঅধিকারিণী'কে পেলে ভাল হত। এই 'আধোঅধিকারিণী' আপাতভাবে অর্ধাঙ্গিনীকে বোঝালেও 'আধো' কথাটির প্রয়োগ থেকে যে ব্যাঞ্জনা বেজে ওঠে, তাতে মনে হয়, এই মানুষগুলি তাদের স্বাভাবিক প্রাপ্তিটুকুও সম্পূর্ণরূপে পায় না। প্রতিটি মুহূর্তে চলে বেঁচে থাকার লড়াই। এক্ষেত্রে আলাদাভাবে পছন্দমতো জীবন যাপনের কোনো প্রশ্নই ওঠে না। পরিস্থিতির চাপে, তার আত্মা ক্ষত-বিক্ষত হওয়ায় আগেই মরে যায়। ভিতরের 'আমি'র কোনো পরিচয়ই পায় না তারা; বোঝে, সমাজের ব্যবহারের সামগ্রী তারা - হয়তো বা অজান্তেই ব্যবহৃত হয়ে যায় - যেমনভাবে ব্যবহৃত হয়েছে, রুহিতন, ঢোঁড়াইরা। সেইভাবেই একটা আপোস-মীমাংসাহীন ভাবেই তারা ব্যবহৃত হয়- মাটির ভাঁড়ের মতো। মহাকালের রথ টেনে নিয়ে যাওয়ার দ্বায়িত্বটুকুই তাদের, কিন্তু কেন রথের যাত্রা শুরু হল, রথ কেমন করে পৌঁছাবে; কোথায় পৌঁছোবে - এ জানার অধিকার তাদের নেই। নিজেদের সুখ-দুঃখের অনুভূতি তাদের আলোচনা ঠাঁই পায় না। যেখানে মানুষের ভালো মন্দকে যাঁচাই করার জন্য 'মন মহারাজ' বসে থাকেন সেই আসনটা শূন্যই থেকে যায়। ইতিহাসের স্রোতে ভেসে যায় তাদের দৈনন্দিন গৃহস্থালি । তাই বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই কথা সাহিত্যিক পৌঁছাতে পারেন

না বা পৌঁছানোর কথা ভাবেন না- সেই মানুষগুলির অন্তর মহলে, কিন্তু ভাবতে অবাক লাগে, এতকিছুর মধ্যেও কখনো কখনো কোন ফাঁক-ফোকর দিয়ে বেরিয়ে আসে তাদের অন্তর। দেখা দেয় দুই 'আমি'র ঘাত প্রতিঘাত। কখনো বা বাইরের 'আমি' অন্তরের 'আমি' আর বাইরে প্রতিকূলতার মোকাবিলায় বিধ্বস্ত । আর এই আলোড়িত মনকে ছুঁয়ে যায় কথাসাহিত্যকের অনুভূতি- তুলে আনেন সেই অশিক্ষিত অসংস্কৃত, কুসংস্কার বদ্ধ অন্ত্যজ কিছু মনের টানা পোড়নের অভিব্যক্তিকে।

পথটি বোধ হয় দেখিয়ে ছিলেন রবীন্দ্র নাথ স্বয়ং শাস্তি গল্পের ছিদাম চন্দরার অসাধারণ মনোবিশ্লেষণের মধ্যে দিয়ে। ছিদাম এবং চন্দরা যে, 'কেহ কাহাকেও পরাস্ত করিতে পারিত না।' - এই জেদ এবং মানসিক জটিলতা পরিবারে ঘটে যাওয়া দুর্ঘটনার সঙ্গে জড়িয়ে পড়ল এবং মরণের মধ্যে দিয়ে চন্দরা তার স্বামীকে যেন উপহাস করে গেল। অন্তজ মানুষের মনোবিশ্লেষণ পাই মানিক বন্দোপাধ্যায়ের 'পদ্মা নদীর মাঝি' উপন্যাসে কুবের ও কপিলার সম্পর্কের জটিলতার মধ্যে। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের নিতাই কবিয়াল ও কতই না অসম্ভব প্রতিকূলতার মধ্যে দিয়ে নিজের অস্তিত্বকে প্রমাণ করেছেন। সমাজের সমস্ত রকম বিদ্রুপকে তুচ্ছ করে আপন কবি প্রতিভায় ভাস্বর হয়েছে। শুধু তাই নয়, এই অন্ত্যজ মানুষটির জীবনে দুই নারীর (ঠাকুর ঝি ও বসন্ত) আবির্ভাবকে কেন্দ্র করে অসাধারণ মনোবিশ্লেষণ করেছেন লেখক। মনে পড়ে তারাশঙ্করের তারিণী মাঝিকে , মানুষের নিজেকে বাঁচানোর স্বাভাবিক প্রবণতায় সে তার প্রাণ প্রিয়া সুখীকে হত্যা করেছিল।

এই অভিসন্দর্ভে যে সকল কথা সাহিত্যিকের লেখনি অন্ত্যজ মানুষের অন্তরকে ছুঁয়ে যায় তার মধ্যে সমরেশ বসুর 'মহাকালের রথের ঘোড়া' উপন্যাসের কথা এই মুহূর্তে মনে পড়ে। 'মহাকালের রথের ঘোড়া'-র রুহিতন কুরমি রাজনীতির প্রত্যক্ষ যোদ্ধা হয়েও ব্যক্তি-আমিকে বিসর্জন দিতে পারে নি। কারাগারের পরিবেশে সে অন্যমনস্ক হয়েছে, স্ত্রী মঙ্গলাও সন্তান বুধুয়া আর করমার কথা ভেবে; স্মরণ করেছে বিগত দিনের কথা আর ছটফট করেছে । সে জানে, এসব ভাবনা, তাকে ভাবতে নেই, তবুও মনে পড়ে মায়ের গাওয়া গানের কলি রাজনৈতিক জীবনের কর্মশেষে তিক্ত অভিজ্ঞতা নিয়ে ফিরে আসে তার আকস্মিক পারিবারিক শান্তির আশ্রয়ে। শরীরে কুষ্ঠ ব্যাধির চিহ্ন তার স্ত্রী মেনে নিতে পারে নি। জগতে প্রয়োজনহীন অবাঞ্ছিত হয়ে বেঁচে থাকতে চাই নি রুহিতন- ছুটি নিয়েছে জীবন থেকে।

'ঢোঁড়াই চরিত মানসে'র ঢোঁড়াই যখন অবহেলায় বেড়ে উঠেছিল তখন তার মনো জগতের পরিবর্তন অসাধারণ দক্ষতায় তুলে ধরেছেন ঔপ্যাসিক সতীনাথ ভাদুড়ী। একজন অন্ত্যজ কিশোর কেমনভাবে মানসিকভাবে বদলাচ্ছে- সে 'কনৈল' খেলার 'ঘুচ্চি' কাটে না কিন্তু 'মাতুম' গানে যোগ দেয়, 'যুগীরা' নাচের দলে যোগ দেয়, 'কর্মাধর্মায়' নাচের আসরে উপস্থিত থাকে। মেয়েদের সমন্ধে তার মনে কৌতূহল জন্মায়। রামিয়ার প্রতি আকর্ষণ অনুভব করে। নির্জনে বসে ভাবে, 'ছাই রঙের ডানা ওয়ালা বক গুলিকে সাদা বকরা নিশ্চয়ই দেখতে পারে না।' সমাজের চিরাচরিত উচ্চ-নিম্ন ভেদাভেদের প্রসঙ্গটি নিয়ে সে নিজের সঙ্গে আলোচনা করে। এই ধরণের কত কথা সে ভাবে। ঢোঁড়াইয়ের পছন্দ করা ভালোবাসা রামিয়াকেই সে বিয়ে করেছিল কিন্তু রামিয়ার কাছ থেকে প্রত্যাখ্যান

লাভ করে ঢোঁড়াই পাড়ি জমায় বৃহত্তর জগতের উদ্দেশ্যে। তার প্রতিবেশ তাকে রাজনীতির দরবারে পৌঁছে দেয় সেখানে সে ব্যবহৃত হয় - আর স্বাভাবিক বুদ্ধি দিয়ে সে বুঝে নেয় জগতের ফাঁকি গুলো। নিজেকে গুটিয়ে নিয়ে রামায়ণে মনোনিবেশ করে। কিন্তু আবার বাধা পড়ে সে, অসুস্থ অ্যান্টনিকে নিজের ছেলে ভেবে নিয়ে, সেই টানেই ফিরে আসে রামিয়া সীতাকে পাওয়ার আকাঙ্ক্ষায়। সারাটা রাস্তা মনে মনে রামিয়ার সঙ্গেই মান-অভিমানের পালা চলে। কিন্তু এবারেও সে ভুল বু ঝেছে। নিঃসঙ্গ ঢোঁড়াই তার একমাত্র ভরসা স্থল রামায়ণের প্রতিও ভরসা হারায়। শুধু মনের মধ্যে থেকে যায়- হয়তো সেই বন্ধনের আকাঙ্ক্ষা-যদি সাগিয়ার সন্ধান মেলে।

তারাশঙ্করের 'হাঁসুলী বাঁকের উপকথা'র বনোয়ারী কাহার সমাজে মাতব্বর হয়ে কাহার সমাজকে ভেঙ্গে যেতে দেখেছিল, সেই সঙ্গে দেখেছিল তার ঘর ভেঙে যেতে । বনোয়ারীর মন জগতের অধিষ্ঠাত্রী দুই নারী কালশশী ও সুবাসী। একদিকে কাহার সমাজকে রক্ষা করতে গিয়ে পরাভূত, অন্যদিকে কালোশশী ঘটিত অপরাধবোধ বা সুবাসীকে কেন্দ্র করে করালীর কাছে পরাজিত হওয়ার অপমান - সবকিছু নিয়েই তার পতন ঘটেছে; মহাকাব্যের নায়কের মতো। প্রতিনিয়ত করালীর সঙ্গে সংঘাতের মধ্যে দিয়ে তার অসাধারণ মনোবিশ্লেষণ করেছেন ঔপন্যাসিক তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়। অসংস্কৃত কাহার নেতা বনয়ারীর মনোজগতের এই দিকগুলি অনুপুঙ্খভাবে উঠে এসেছে এবং তার চরম অভিব্যক্তি ঘটেছে 'অরণ্য বানরের' মত আচরণের মধ্য দিয়ে।

মধ্যযুগের পেক্ষাপটে সেই যুগ মানসিকতার এক চুয়াড় যুবকের আশ্চর্যজনক ভাবে অক্ষর পরিচয় ঘটেছিল। সেই সঙ্গে সে উপলব্ধি করেছিল, সে কবিতা লিখতে চায়। অবুঝ মনের এই চাহিদা মেটাতে সে পূর্ব পরিচয় ও নাম বদলে কবি বন্দ্য ঘটী গাঞি এই পরিচয়ে পরিচিত হতে চেয়েছিল। এর জন্য তার কোন অপরাধ বোধ ছিল না। পাঁকে জন্ম হওয়াটাতো তার কোন অপরাধ নয়। ব্রাহ্মণরা দ্বীজ হয় কি করে। 'পাখ-পক্ষী' নাগ মুক্তা এরাও দ্বীজ হয় কি করে ! তাহলে তার দ্বীজত্ব প্রাপ্তি স্বীকৃত নয় কেন ! সমাজ এত কথা শুনতে রাজি নয়। বরং এর শাস্তি হাতীর পায়ের তলায় মৃত্যু। কারাগারে নিক্ষেপ করা হয় কবিকে। প্রেমের শক্তিতে পাণিপ্রার্থী ফুল্লরার টানে, কারাগার থেকে পালিয়ে আসে ফুল্লরার কাছে কিন্তু তার প্রেম অপমানিত হয়। ব্যর্থ জীবনের শেষ আশ্রয়, জন্ম ভূমি নিদয়ার জঙ্গল । মাতৃজঠরে ঢুকে গিয়ে নিশ্চিন্ত হতে চাইলেও নিজের মনের সঙ্গে যুদ্ধ করতে করতে, অন্তর সত্তার ইচ্ছাকে সম্পূর্ণভাবে অবদমন করে, বোঝে, জঙ্গলও তাকে ত্যাগ করেছে। চুয়াড় পরিচয়কে ত্যাগ করে কবি বন্দ্যঘটী পরিচয়ে পরিচিত হওয়ার ফলে, তার পুরানো পরিচয়ের জায়গাটি হারিয়েছে, অন্যদিকে যে পরিচয় সে আন্তরিকভাবে পরিচিত হতে চেয়েছিল- (তখনকার সমাজ ব্যবস্থায় অন্ত্যজ মানুষের স্বাভাবিক ইচ্ছা যদি তাকে উপরতলার মানুষদের সমগোত্রীয় করে তুলতে চায়, যদি প্রমাণ করতে চায়, যে মানসিক গঠনগত দিক থেকে তার সঙ্গে উঁচুতলার মানুষের তেমন কোন পার্থক্য নেই) - সে অন্যায় স্পর্ধার শাস্তি মৃত্যুদন্ড। তাই কবি অনুভব করলো - 'কুথাও ক্ষমা নাই' - যুগের পরিপন্থী এক মানসিকতার শিকার হতে হয়েছে তাকে। তার ভালোলাগার মানসিক প্রবৃত্তি, তার ভালোবাসার প্রতি বিশ্বাস, তার অন্তরের প্রেরণার সৃষ্টি সম্ভারের এত

আয়োজন- তার চুয়াড়ী রক্তের দোষে নিঃশেষ হয়ে গেছে, তার সম্পূর্ণ অস্তিত্ব থেঁতলে গেছে, হাতীর পায়ের তলায়।

শরৎ চন্দ্রের 'অভাগীর স্বর্গ' গল্পে কাঙালী সমাজের উচ্চ বর্ণের শোষণের শিকার হয়েছে। বাউরির মেয়ে কাঙালীর মা ব্রাহ্মণ জমিদার গৃহিনীর অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়ার সমারোহে মুগ্ধ হয়ে নিজের জন্যও ঐরূপ চিতা সজ্জা কামনা করেছে। এই ইচ্ছাই করুণ দিবাস্বপ্নরূপে তার মনে বারবার আবর্তিত হয়েছে ও মৃত্যুকালে সে তার পুত্রকে তার জন্য উচ্চবর্ণসুলভ সৎকার-বিধি-পালনের নির্দেশ দিয়েছে। কিন্তু দরিদ্রের এই ইচ্ছা সমাজের প্রতিকূলতায় ও জমিদারী ব্যবস্থার হৃদয়হীন যান্ত্রিকতায় সার্থক হতে পারে না- প্রজ্জ্বলিত চিতার ধূমকুন্ডলী তার কল্পনা জগৎ ছেড়ে বাস্তবে রূপ পায়নি।

'তিতাস একটি নদীর নাম' উপন্যাসে কিশোর এবং তার স্ত্রী অনন্তর -মা কে ঘিরে এক জটিল সম্পর্ক গড়ে উঠেছে? উজানিগরে ফলা বাইতে যাওয়া, তরতাজা-প্রাণ কিশোর তার কিশোরী নববধূকে নিয়ে ফেরার পথে, ডাকাতের কবলে পড়ে। হৃত-সর্বস্ব কিশোর পরিস্থিতির এই চাপ সহ্য করতে না পেরে উন্মাদ হয়ে যায়। ঘটনাচক্রে কিশোরের সন্তান অনন্তকে নিয়ে কিশোরের স্ত্রী শ্বশুর বাড়ির দেশে ফিরে আসে, প্রতিবেশী কর্তৃক সাদরে গৃহীত হয়। স্বামীর প্রতি তার সদাসতর্ক দৃষ্টি থাকলেও, পরিচয় গোপন থাকে। এ এক বিচিত্র সম্পর্ক - যার একদিকে রয়েছে, এক সুস্থ-স্বাভাবিক নারী, যে পরিচয় গোপন রেখেছেন। অন্যদিকে এক উন্মাদ পুরুষ, যে ভালোবাসার তীব্রতার-জন্যই স্ত্রীকে হারানোর আঘাত সহ্য করতে না পেরে, সব স্মৃতি হারিয়েছে। অথচ, সেই ভালবাসার টানে যেদিন তার স্মৃতি ফিরে এল, স্ত্রীকে চিনতে পারল, সুস্থ হয়ে উঠল, সেদিনও তাদের পরিচয় কেউ জানল না; এক মর্মান্তিক মৃত্যু ঘটল দুজনের।

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'আরণ্যক'-এ রাজপুত দেবী সিং-এর স্ত্রী কুন্তা বাঈজীর মেয়ে বলে জাতিচ্যুত। দেবী সিং নিজেও সর্বস্বান্ত অবস্থায় মারা যায়। যে কুন্তা কিংখাবের ঝালর দেওয়া পাল্‌কি চেপে কুশী ও কলবলিয়ার সঙ্গমে স্নান করতে যেত, বিকানীর মিছরী ছাড়া জল খেত না। সেই কুন্তা টক বুনো কুল পাড়তে গিয়ে, লাক্ষার ইজারদারের চাকরের হাতে অপদস্ত হয়; ম্যানেজার বাবুর পাতের ভাত খাওয়ার জন্য সাগ্রহে অপেক্ষা করে থাকে।

সত্যচরণ এই অরণ্য জগৎ থেকেই খুঁজে পেয়েছিলেন অনার্য রাজকন্যা ভানুমতীকে আর প্রাচীন অভিজাত বংশীয়বীর, অনার্য রাজাদের বংশধর ও সাঁওতাল বিদ্রোহের নেতা দোবরুপান্না বীরবর্দীকে। এই মুকুটহীন রাজার রাজ্য না থাকলেও তাঁর জংলী প্রজাদের কাছ থেকে রাজার সম্মান পেয়ে থাকেন। কিন্তু বাইরের জগতের খবর এঁরা রাখে না, তাই বলেন- 'এই জঙ্গলেই আমরা ভাল থাকি।' তিনি শুনেছেন, কলকাতা 'বড় ভারী জায়গা' । আবার ভানুমতীকে যখন সত্যচরণ জিজ্ঞাসা করে ভানুমতী ভারতবর্ষের নাম শুনেছে কিনা, তখন ভানুমতী আশ্চর্য হয়েছে এবং ভানুমতী জিজ্ঞাসা করেছে- 'ভারতবর্ষ কোন্‌দিকে?

প্রফুল্ল রায়ের'সাতঘরিয়া' গল্পে অন্ত্যজ চাঁপিয়া চেয়েছিল ঘরবেঁধে সুখী জীবনযাপন করতে।

কিন্তু তার সেই আশা কখনই পূরণ হয়নি। সামান্য সুখ ও নির্ভরতার খোঁজে সে বারে বারে নানা মরদের সঙ্গে ঘর বেঁধেছে। বারে বারেই তার ঘর ভেঙে গেছে। কোথাও সে সামান্যতম সুখের সন্ধান পায়নি। বরং পুরুষতান্ত্রিক সমাজে বিভিন্ন সময়ে লালসার বিষাক্ত পরশে সে ভীত থেকেছে। যতদিন তার দেহে শক্তি ও লাবন্য ছিল, ততদিন পুরুষ তাকে ঘরে নিয়েছে। কিন্তু দৈহিক রুগ্নতার দিনে তাকে কেউ ঘরে নিতে চায়নি। সবার কাছে বাতিল হিসাবে গণ্য হয়ে সে চরম অবহেলায় হতাশার অতলান্তিক তলে হারিয়ে গেছে।

এতক্ষণ ধরে সুদীর্ঘ আলোচনার মাধ্যমে আমার বর্তমান গবেষণাকর্মটির সঠিক চর্চা করা হল। আমার বর্তমান গবেষণাকর্মের শিরোনামটি হল - 'স্বাধীনোত্তরপর্বে বাংলা উপন্যাস ও ছোটগল্পে অন্ত্যজ জীবন।' স্বভাবত কারণেই এই শিরোনামটিকে সামনে রেখে এবং এর বিষয় বস্তুর সঠিক মূল্যায়ণ করার চেষ্টা করেছি। প্রয়োজনবোধে যেমন বিষয় ভিত্তিক আলোচনা করেছি, আবার প্রয়োজনবোধে ব্যক্তিকেন্দ্রিক আলোচনাও করেছি। সঙ্গত কারণেই-তা বিষয়বস্তু ভিত্তিকই হোক অথবা ব্যক্তিকেন্দ্রিক ভিত্তিকই হোক - এর তত্ত্ব, তথ্য, বিশ্লেষণ, আঙ্গিক এবং নান্দনিক দৃষ্টিভঙ্গিরও আলোচনা করেছি। অতলান্ত সমুদ্রের মাঝ থেকে বিষয় বস্তুর (নামকরণের প্রেক্ষাপটে) যত মণি-মুক্তা-হীরা-জহরত-এর সন্ধান পেয়েছি, সেগুলোকে চুম্বকের আকারে গবেষণাকর্মের প্রতিটি পরিচ্ছেদের পাতায় ধরে রাখার চেষ্টা করেছি।

বিন্দু বিন্দু জলে গড়ে উঠে সমুদ্র এবং তার প্রবাহ। বর্তমান গবেষণা কর্মটির প্রতিটি ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় তত্ত্ব, তথ্য এবং নিজের ব্যক্তিগত ধারণার স্পর্শমণির সাহোয্যে গড়ে তুলেছি আমার এই গবেষণা পত্রটি।

অন্ত্যজ জীবন নিয়ে আলোচনা করা খুব একটা সহজ কাজ নয়। আমাদের এই বিশ্বসংসারে কোন কিছুরই অন্ত নেই, যা কিছু আছে তা হল পথ পরিক্রমা অথবা গতিময় জীবন; সে জীবন উচ্চশ্রেণীর অন্তর্গতই হোক আর নিম্নশ্রেণীর অন্তর্গতই হোক না কেন, - তার মূল্যায়ণ করা খুব একটা সহজ নয়। এই মহাবিশ্বের মহাকালের বুকে যদি উচ্চ শ্রেণীর অন্তর্গত জীবনের মূল্য থাকে, তাহলে অনুন্নত অথবা অন্ত্যজ জীবনের মুল্যকেও অস্বীকার করা যায় না, কেননা একে অপরের পরিপূরক - যেন চাঁদের এপিঠ আর ওপিঠ।

আলোচনা প্রসঙ্গে অন্ত্যজ শ্রেণী সম্বন্ধে তত্ত্ব এবং তথ্য ভিত্তিক আলোচনা করা হয়েছে তথা কথিত শিরোনামের প্রয়োজনে এবং স্বভাবতই সেই প্রয়োজনের তাগিদে বিভিন্ন কথা সাহিত্যিকের নাম এবং তাদের সৃষ্ট গ্রন্থের নাম উল্লেখ করেই আলোচনা পর্বটি শেষ হয়েছে। কিন্তু এই আলোচনাই শেষ নয়, ভবিষ্যৎ অথবা আগামীকাল এবং ভবীকালের বুকে হয়তো এই অন্ত্যজ জীবনের উপর আরো কত বিচিত্র ধরণের আলোচনা হবে তা বলা যায় না। কিন্তু পূর্বোক্ত আলোচনা বা উক্ত বিষয়ক গবেষণাকর্ম চলতেই থাকবে।

"সহজ কথা কইতে আমায় কহো যে,
সহজ কথা যায় না বলা সহজে"-

ঋষি কবির এই চিরসত্য বাণীটি মনে রেখেই আমি আমার গবেষণাকর্মে ধৃত প্রতিটি অধ্যায় এবং সার্বিক আলোচনাটিকে নতুনভাবে, নতুন রূপে এবং নতুন দৃষ্টিভঙ্গিতে অতি সহজভাবে আলোচনা করেছি। আত্মার সঙ্গে আত্মার মিলন যদি আত্মীয়তা হয়, তাহলে যে কোনো আলোচনাই স্নেহসিক্ত, রসোজ্জ্বল এবং গভীরতর হয়। আমার বর্তমান গবেষণাকর্মটি সেদিক দিয়ে কতখানি সার্থক হয়েছে তা বলা সম্ভব না হলেও, এই গবেষণাকর্মটি যে মৌলিক, তা দাবি করা যায়। কথাবন্ধ অথবা উপসংহারের পরিবর্তে পূর্বোক্ত ব্যাপারটিকে মনের মণিকোঠায় আবদ্ধ রেখে আলোচনা অংশ শেষ করছি।

গ্রন্থপঞ্জী ও পত্র-পত্রিকা

গ্রন্থপঞ্জী ও পত্র-পত্রিকা

গ্রন্থ

১. কায়সার শান্তনু	অদ্বৈত মল্লবর্মণ ঃ জীবন সাহিত্য ও অন্যান্য	-প্রথম প্রকাশ- ১৯৯৭।
২. ঘোষ অতীন	দলিত সমাজ ও আম্বেদকার	- প্রথমপ্রকাশ- ১৯৯৬।
৩. ঘোষ বিণয়	বাংলার সামাজিক ইতিহাসের ধারা	- প্রথম প্রকাশ- ১৯৬৮।
৪. চক্রবর্তী যুগান্তর সম্পাদিত	মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের শ্রেষ্ঠ গল্প	- নবম মুদ্রণ- ১৩৮৮।
৫. চক্রবর্তী তিমিরবরণ	বাংলা ছোট গল্প সংকলন	-প্রথম সংস্করণ- ১৯৮২।
৬. চক্রবর্তী তিমিরবরণ	প্রসঙ্গ ঃ বিভূতিভূষণের আরন্যক	-প্রথম সংস্করণ-১৯৮৩।
৭. চট্টোপাধ্যায় পার্থ ও ভদ্র গৌতম সম্পাদিত	নিম্ন বর্গের ইতিহাস	- প্রথম সং- ১৯৯৮ ।
৮. চট্টোপাধ্যায় দেবব্রত	বিংশ শতাব্দীর সমাজ বিবর্তন ঃ বাংলা উপন্যাস	- প্রথম প্রকাশ২০০২।
৯. চট্টোপাধ্যায় বঙ্কিম চন্দ্র	বিবিধ প্রবন্ধ	- ২য় সংস্করণ ১৯৭৮ ।
১০. চট্টোপাধ্যায় শরৎচন্দ্র	শরৎ রচনাবলী (২য় ও ৩য় খন্ড)	-১৩৯৫ ।
১১. চক্রবর্তী রজনীকান্ত	গৌড়ের ইতিহাস	- ১ম প্রকাশ- ১৯৯৯ ।
১২. চৌধুরী রামপদ	উপন্যাস সমগ্র (৪)	১ম সংস্করণ - ১৯৯৩ ।
১৩. চৌধুরী রমাপদ	গল্প সমগ্র	- আনন্দ পাবলিশার্স ।
১৪. চৌধুরী কমল সম্পাদিত	স্বাধীনতা ৫০ পেরিয়ে	- প্রথম প্রকাশ- ১৯৯৯ ।
১৫. চৌধুরী নাজমা জেসমিন	বাংলা উপন্যাস ও রাজনীতি চিরায়ত প্রকাশন	১ম প্রকাশ ১৩৮৭
১৬. ঠাকুর রবীন্দ্রনাথ	গল্প গুচ্ছ - এশীয় পাবলিশিং কোম্পানী	প্রথম সং - ২০০২ ।
১৭. দাস নির্মল	চর্যাগীতি পরিক্রমা	- ১ম সংস্করণ ১৯৯৭ ।
১৮. দাস অমরেশ	রবীন্দ্রনাথের চিন্তায় সমাজতন্ত্র	-১ম প্রকাশ ১৩৯৪ ।
১৯. দাস কাশীরাম	মহাভারত	- ৩য় সং, দে'জ পাবলিশিং- ১৯৯৫ ।
২০.বন্দ্যোপাধ্যায় রুমা	স্বাধীনতা-উত্তর বাংলা উপন্যাসে নিম্নবর্গের অবস্থান	-প্রথম প্রকাশ ২০০৫।
২১.বন্দ্যোপাধ্যায় অসিত কুমার	বাংলা সাহিত্যের সম্পূর্ণ ইতিবৃত্ত	- নতুন সংস্করণ-২০০৬-০৭ ।
২২.বন্দ্যোপাধ্যায় অসিত কুমার	ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ ও বাংলা সাহিত্য,	২য় সং-১৯৬৫ ।

২৩.বন্দ্যোপাধ্যায় অসিত কুমার বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত - ২য় খন্ড পঞ্চম মুদ্রণ-২০০০।
২৪.বন্দ্যোপাধ্যায় অসিত কুমার বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত - ৩য় খন্ড ১ম পর্ব - ২০০২।
২৫.বন্দ্যোপাধ্যায় অসিত কুমার বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত - ২য় পর্ব- ২০০১।
২৬.বন্দ্যোপাধ্যায় অসিত কুমার বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত - ৪ খন্ড ২য় সং - ১৯৮৫।
২৭.বন্দ্যোপাধ্যায় কালী প্রসন্ন মধ্যযুগের বাঙ্গলা দে'জ সংস্করণ- ২০০২।
২৮. বন্দ্যোপাধ্যায় তারাশংকর কবি - বিংশ মুদ্রণ- ১৪০৩।
২৯. বন্দ্যোপাধ্যায় তারাশঙ্কর তারাশঙ্কর স্মৃতিকথা - ১ম খন্ড, প্রথম সংস্করণ - ১৩৮৭।
৩০. বন্দ্যোপাধ্যায় তারাশঙ্কর তারাশঙ্করের গল্প গুচ্ছ - সাহিত্য সংসদ।
৩১. বন্দ্যোপাধ্যায় তারাশঙ্কর হাঁসুলীবাঁকের উপকথা -১৩শ সংস্করণ।
৩২. বন্দ্যোপাধ্যায় তারাশঙ্কর তারাশংকর রচনাবলী -৮ম পর্ব - মিত্র ও ঘোষ প্রকাশনী।
৩৩. বন্দ্যোপাধ্যায় মানিক মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় রচনাবলী - প্রথম প্রকাশ - ১৯৯৮।
৩৪. বন্দ্যোপাধ্যায় বিভূতিভূষণ অরণ্যক - একাদশ মুদ্রণ- ১৩৮৩।
৩৫. বন্দ্যোপাধ্যায় বিভূতিভূষণ বিভূতি রচনাবলী - ১ম খন্ড মিত্র ও ঘোষ ৮ম মুদ্রণ - ১৩৯৯।
৩৬.বন্দ্যোপাধ্যায় বিভূতিভূষণ বিভূতি রচনাবলী - ৫ম খন্ড মিত্র ও ঘোষ ৮ম মুদ্রণ - ১৪০২।
৩৭.বন্দ্যোপাধ্যায় বিভূতিভূষণ বিভূতি রচনাবলী - ১২ম খন্ড মিত্র ও ঘোষ ৬ম মুদ্রণ - ১৪০৩।
৩৮.বন্দ্যোপাধ্যায় শ্রীকুমার ও চৌধুরী বিশ্বপতি সম্পাদিত কবি কঙ্কন চন্ডী - কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৯৭।
৩৯.বন্দ্যোপাধ্যায় শ্রী কুমার বঙ্গ সাহিত্যে উপন্যাসের ধারা - পূণর্মুদ্রণ - ১৯৯৭-৯৮।
৪০.বন্দ্যোপাধ্যায় শেখর ও দাশগুপ্ত অভিজিৎ সম্পাদিত জাতি, বর্ণ ও বাঙালী সমাজ - ১ম প্রকাশ -১৯৯৮।
৪১. বন্দ্যোপাধ্যায় সরোজ বাংলা উপন্যাসের কালান্তর -পরিবর্ধিত দে'জ সংস্করণ-১৯৮০।
৪২. বন্দ্যোপাধ্যায় সরোজ সম্পাদিত সমরেশ রচনাবলী -(১) -১ম সং - ১৯৯৭।
৪৩.বন্দ্যোপাধ্যায় সরোজ সম্পাদিত সমরেশ রচনাবলী -(২) -২য় সং - ২০০০।
৪৪.বন্দ্যোপাধ্যায় সরোজ সম্পাদিত সমরেশ রচনাবলী -(৪) -১ম প্রকাশ - ১৯৯৯।
৪৫. বিশ্বাস অচিন্ত্য অদ্বৈত মল্লবর্মণ ও তিতাস একটি নদীর নাম -১ম প্রকাশ- ১৯৯৮।
৪৬. বসু গোপেন্দ্র কৃষ্ণ বাংলার লৌকিক দেবতা -দে'জ ২য় সংস্করণ - ১৯৮৭।
৪৭. বসু নিতাই কালকূট সমরেশ - ১ম প্রকাশ - ১৯৮৬।
৪৮. বিশ্বাস নীতিশ সম্পাদিত দলিত সাহিত্য - ২য় সংস্করণ - ২০০১।
৪৯.বসু শ্যামাপ্রসাদ সংগ্রামী জাতীয়তাবাদী ঃ মেদিনীপুর ও মানভূমি (১৯০০-৪৭) -১ম প্রকাশ - ২০০৩।

৫০. বসু যগেন্দ্র নাথ সম্পাদিত বিশ্বকোষ ।
৫১. বিবেকানন্দ স্বামী বর্তমান ভারত - ২২ শ প্রকাশ - ১৪০৩।
৫২. ভট্টাচার্য বিশ্ববন্ধু ছোটগল্পে ত্রয়ী ঃ তারাশংকর বিভূতিভূষণ মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়।
৫৩. ভট্টাচার্য আশুতোষ বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস - ১০ম পুনর্মুদ্রণ - ২০০২।
৫৪. ভট্টাচার্য জগদীশ সম্পাদিত তারাশংকরের শ্রেষ্ঠ গল্প -১১ম মুদ্রণ বেঙ্গল প্রাঃ লিঃ।
৫৫. ভট্টাচার্য শকুন্তলা রুক্ষমাটির করিয়াল -তারাশংকর পরিষদ কর্তৃক প্রকাশিত- ১৯৯৮।
৫৬. ভাদুড়ী সতীনাথ সতীনাথ রচনাবলী।
৫৭. ভট্টাচার্য মহাশ্বেতা মহাশ্বেতা দেবী রচনা সমগ্র (৬,৯,১০,১২,১৪) - দে'জ পাবলিশিং।
৫৮. মিত্র সরোজমোহন শরৎসাহিত্য সমাজ চেতনা।
৫৯. মল্লিক সমরেন্দ্র নাথ তারাশংকর জীবন ও সাহিত্য - ১ম প্রকাশ - ১৯৮৯।
৬০. মুখোপাধ্যায় অরুণকুমার কালের পুত্তলিকা - দে'জ সংস্করণ- ৩য় সং- ২০০৪।
৬১. মুখোপাধ্যায় অরুণকুমার কালের প্রতিমা -দে'জ সংস্করণ- ১৯৯১।
৬২. মুখোপাধ্যায় অরুণকুমার মহাহ্ন থেকে সায়াহ্নে - দে'জ সংস্করণ- ১৯৯৪।
৬৩. মুখোপাধ্যায় পরিতোষ বাংলা সাহিত্যের অনগ্রসর শ্রেণী - ১ম সংস্করণ- ১৯৯৭।
৬৪. রায় দেবেশ উপন্যাস নিয়ে - ১ম প্রকাশ - ১৯৯১।
৬৫. রায় দেবেশ দেবেশ রচনাবলী।
৬৬. রায় দেবেশ দলিত - ১ম প্রকাশ সাহিত্য একাডেমি, ১৯৯৭।
৬৭. রায় নীহাররঞ্জন বাঙালীর ইতিহাস (আদিপর্ব) - ১ম দে'জ সংস্করণ- ১৪০০।
৬৮. রায় চৌধুরী গোপিকানাথ দুই বিশ্বযুদ্ধের মধ্যকালীন বাংলা কথাসাহিত্য - ১ম দে'জ সংস্করণ - ১৯৮৬।
৬৯. লাহা প্রবীর কুমার ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের কালপঞ্জী (১৯৫৭-১৯৪৭) - ১ম প্রকাশ - ২০০০।
৭০. শর্মা রামশরণ প্রাচীন ভারতে শূদ্র -পুর্ণমুদ্রণ - ১৯৯৯।
৭১. সিকদার অশ্রুকুমার আধুনিকতা ও বাংলা উপন্যাস - ২য় পরিমার্জিত সংস্করণ- ১৯৯৩।
৭২. সেন সুকুমার বাঙ্গলা সাহিত্যের ইতিহাস (১,৩,৫ খন্ড) - আনন্দ পাবলিশার্স।

পত্র-পত্রিকা

১) রূপান্তর

২) পরিচয়

৩) অতএব

৪) অচলপত্র

৫) কালি ও কলম

৬) পরিবর্তন

৭) আলোকপাত

৮) সাহিত্য সমালোচনা

৯) আজকাল

১০) আনন্দবাজার

১১) এক্ষণ

১২) ঐকতান

১৩) দেশ

১৪) বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা

১৫) সংবাদ প্রতিদিন

সূত্র নির্দেশিকা

সূত্র নির্দেশিকা

১) দাস জ্ঞানেন্দ্র মোহন,বঙ্গলা ভাষার অভিধান, ১ম খন্ড, ২য় সংস্করণ, পৃঃ -১৯৩।

২) গোস্বামী বিজন বিহারী,অথর্ববেদ সংহিতা, হরফ প্রকাশনী - অনুবাদ ও সম্পাদনা, অক্টোবর, ১৯৭৮।

৩) সেন সুকুমার, বাঙ্গলা সাহিত্যের ইতিহাস , প্রথম খন্ড, আনন্দ সং - ১৯৯১, পৃঃ - ১০।

৪) দাস জ্ঞানেন্দ্র মোহন,বাঙ্গলা ভাষার অভিধান, ২য় খন্ড, ২য় সং - ১৯৩৭, পৃঃ - ১৬৫৮।

৫) ৩ নং সূত্র নির্দেশিকা দ্রষ্টব্য, পৃঃ - ৬।

৬) Majumdar Ramesh Chandra History of Bengal, Chapter- XII, PP. - 207.

৭) চক্রবর্তী জাহ্নবী কুমার, চর্যাগানে জনজীবন, আনন্দবাজার পত্রিকা,বার্ষিক সংখ্যা-১৩৮১, পৃঃ - ২২।

৮) চন্ডী মঙ্গল কাব্য- বঙ্গবাসী, রবীন্দ্রনাথ কর্তৃক টীকা-টিপ্পনী, পৃঃ- ৩২।

৯) ৭ নং সূত্র নির্দেশিকা দ্রষ্টব্য, পৃঃ - ২২ ।

১০) দাস বৃন্দাবন, শ্রী চৈতন্য ভাগবত- , পৃঃ - ৪৮।

১১) বন্দ্যোপাধ্যায় শ্রীকুমার ও চৌধুরী বিশ্বপতি, মুকুন্দরামের চন্ডী মঙ্গল, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, পৃঃ- ২৯২।

১২) মুখোপাধ্যায় সুশোভন, প্রাক-আধুনিক বাংলা সাহিত্যে অন্ত্যজ জীবন, ১ম প্রকাশ ১৪১৩, পৃঃ- ২০।

১৩) সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায়, সুকুমার সেন ও প্রবোধ চন্দ্র বাগচী প্রমুখদের মতে সিদ্ধাচার্যাদিগের রচিত চর্যাগীতি রচনার কাল ৯৫০ খ্রীঃ থেকে ১২০০ খ্রীঃ, (প্রাক আধুনিক বাংলা সাহিত্যের অন্ত্যজ জীবন, ডঃ সুশোভন মুখোপাধ্যায়, পৃঃ - ৪০)।

১৪) চর্যাগীতি তত্ত্ব পরিচয়ে মনীন্দ্রমোহন বসুর 'চর্যাপদ' (ভূমিকা) ও ডঃ শশীভূষণ দাশগুপ্তের 'ভারতীয় সাধনার ঐক্য' বিশ্বভারতী গ্রন্থের সাহায্য নেওয়া হয়েছে।

১৫) দাশগুপ্ত শশীভূষণ, বৌদ্ধ ও চর্যাগীতি, প্রথম প্রকাশ- ১৩৬৪, পৃঃ - ১১৫-১১৬।

১৬) সেন সুকুমার, বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, প্রথম খন্ড,আনন্দ সংস্করণ-এ উদ্ধৃত পদ ও বঙ্গানুবাদ।

১৭) রায় নীহার রঞ্জন, প্রাচীন বাংলার দৈনন্দিন জীবন, আশ্বিন, ১৩৫৬ বিশ্বভারতী, পৃঃ- ৩।

১৮) ১৫ নং সূত্র নির্দেশিকা দ্রষ্টব্য, পৃঃ-১০৭।

১৯) ৩ নং সূত্র নির্দেশিকা দ্রষ্টব্য, পৃঃ- ৮২-৮৩।

২০) দে সুশীল কুমার বাংলা প্রবাদ (২য় সংস্করণ)। ।

২১) সেন দীনেশ চন্দ্র, বঙ্গভাষা ও সাহিত্য, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য শিক্ষা পর্ষদ, প্রথম খন্ড, পৃঃ-৯২।

২২) তদেব, পৃঃ- ৯২।
২৩) ১২নং সূত্র নির্দেশিকা দ্রষ্টব্য, পৃঃ-৬৭।
২৪) ভট্টাচার্য অমিত্রসূদন, বড়ু চন্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তন, প্রথম সংস্করণ, ১৩৭৩, পৃঃ- ১৮।
২৫) রায় বসন্তরঞ্জন, বড়ু চন্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তন - সম্পাদিত, জন্ম খন্ড, তৃতীয় সংস্করণ, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, পৃঃ- ১০।
২৬) মজুমদার রমেশ চন্দ্র ,বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস - (মধ্যযুগ) তৃতীয় সংস্করণ, আশ্বিন ১৩৮৫, পৃঃ- ২৮৮।
২৭) ২০ নং সূত্র নির্দেশিকা দ্রষ্টব্য।
২৮) বন্দোপাধ্যায় অসিত কুমার , বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত, প্রথম খন্ড, প্রথম সংস্করণ, পৃঃ-৩১৯।
২৯) তদেব, পৃঃ- ৩২০।
৩০) জানা, শ্রী কৃষ্ণকীর্তন চর্চা - প্রথম সংস্করণ, ১৯৯৩, পৃঃ-১৮৪।
৩১) মুখোপাধ্যায় পরিতোষ , বাংলা সাহিত্যের অনগ্রসর শ্রেণী (সূচনা থেকে অষ্টাদশ খ্রীঃ) প্রথম খন্ড এপ্রিল ১৯৯৭, পৃঃ- ১৪২।
৩২) ওঝা কৃত্তিবাস, কৃত্তিবাসী রামায়ণ, আদিকান্ড, দেব সাহিত্য কুটির সংস্করণ, পৃঃ- ৮৮।
৩৩) তদেব, পৃঃ- ৮৮।
৩৪) দাস কাশীরাম, মহাভারত, আদি পর্ব তৃতীয় দে'জ সংস্করণ, জানুয়ারী, ১৯৯৫, পৃঃ-৭৭।
৩৫) বন্দ্যোপাধ্যায় অসিত কুমার, বাংলা সাহিত্যের সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত, মডার্ন বুক এজেন্সী, পঞ্চম মুদ্রন- ২০০০, পৃঃ- ১৯২।
৩৬) ১১ নং সূত্র নির্দেশিকা দ্রষ্টব্য, পৃঃ- ২৯০।
৩৭) ১১ নং সূত্র নির্দেশিকা দ্রষ্টব্য, পৃঃ- ৩৬৭।
৩৮) ১১ নং সূত্র নির্দেশিকা দ্রষ্টব্য, পৃঃ-৩৩৫।
৩৯) বন্দ্যোপাধ্যায় অসিত কুমার, বাংলা সাহিত্যের সম্পূর্ণ ইতিবৃত্ত, সপ্তম সংস্করণ, মডার্ন বুক এজেন্সী । পৃঃ- ১৫০
৪০) ভট্টাচার্য্য আশুতোষ, বাংলা মঙ্গল কাব্যের ইতিহাস, দশম সংস্করণ, পুনর্মুদ্রণ এপ্রিল,২০০২, পৃঃ- ৬২৭-৬২৮।
৪১) তদেব পৃঃ- ৭৮৬।
৪২) বন্দ্যোপাধ্যায় অসিত কুমার, বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত, ২য় খন্ড, মডার্ন বুক এজেন্সী, ৫ম মুদ্রণ ২০০০, পৃঃ- ১৯২।
৪৩) রায় চৌধুরী গোপিনাথ, দুই বিশ্ব যুদ্ধের মধ্যকালীন বাংলা কথা সাহিত্য, দে'জ পাবলিশিং, ১৯৮৬, পৃঃ- ২২০।
৪৪) চক্রবর্তী যুগান্তর সম্পাদিত, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের শ্রেষ্ঠ গল্প, বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রাইভেট লিঃ, ১৩৮৮, পৃঃ- ২।

৪৫) তদেব পৃঃ- ৯ ।

৪৬) বন্দ্যোপাধ্যায় মানিক, পদ্মা নদীর মাঝি, নতুন বিংশ মুদ্রণ, বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, পৃঃ- ৫ ।

৪৭) তদেব- পৃঃ- ৯ ।

৪৮) তদেব পৃঃ- ১০-১ ।

৪৯) চৌধুরী প্রমথ, 'ভূমিকাংশ ' তারাশংকরের রচনাবলী, ১ম খন্ড, মিত্র ও ঘোষ, ৭ম মুদ্রণ, ১৪০৪, পৃঃ- ৯ ।

৫০) তদেব- পৃঃ- ১৭৬ ।

৫১) তদেব- পৃঃ- ১৭৬ ।

৫২) বন্দ্যোপাধ্যায় বিভূতি ভূষণ, বিভূতিভূষণ রচনাবলী, স্মৃতির রেখা ৩০শে মে, নভেম্বর ১৯২৭ ইসলামপুর, মাল, ১৩৯৯, পৃঃ- ৩৮৩-৮৪

৫৩) বন্দ্যোপাধ্যায় বিভূতি ভূষণ, আরণ্যক,বিভূতিভূষণ, রচনাবলী, ৫ম খন্ড, ৮ম মুদ্রণ, পৌষ- ১৪০২ পৃঃ- ৬৩-৬৪ ।

৫৪) তদেব- পৃঃ- ৩২ ।

৫৫) ৫২নং সূত্র নির্দেশিকা দ্রষ্টব্য , পৃঃ- ১০৮ ।

৫৬) বন্দ্যোপাধ্যায় শ্রীকুমার, বঙ্গ সাহিত্যে উপন্যাসের ধারা, মডার্ন বুক এজেন্সী, পুনর্মুদ্রণ,১৯৯৭- ৯৮, পৃঃ- ৫৬৪-৬৫ ।

৫৭) মুখোপাধ্যায় অরুণ কুমার , মধ্যাহ্ন থেকে সায়াহ্নে, দে'জ পাবলিশিং, ১ম সং ১৯৯৪, পৃঃ-৪৮ ।

৫৮) বন্দ্যোপাধ্যায় তারাশংকর, হাঁসুলী বাঁকের উককথা, গ্রন্থ প্রকাশ, ত্রয়োদশ সং, পৃঃ- ১৯ ।

৫৯) তদেব- পৃঃ- ২০ ।

৬০) তদেব- পৃঃ- ১৩ ।

৬১) তদেব- পৃঃ- ১ ।

৬২) তদেব- পৃঃ- ১১৩ ।

৬৩) তদেব- পৃঃ- ৭৮ ।

৬৪) তদেব- পৃঃ- ৭৮ ।

৬৫) ৫৭নং সূত্র নির্দেশিকা দ্রষ্টব্য , পৃঃ- ৫০ ।

৬৬) ৫৮ নং সুত্র নির্দেশিকা দ্রষ্টব্য, পৃঃ-১১ ।

৬৭) ৫৮ নং সুত্র নির্দেশিকা দ্রষ্টব্য, পৃঃ- ১১ ।

৬৮) বন্দ্যোপাধ্যায় তারাশংকর, কৈশোর স্মৃতি, তারাশংকর স্মৃতি কথা, ১ম খন্ড, পৃঃ- ১৮১ ।

৬৯) বন্দ্যোপাধ্যায় তারাশংকর, আমার কালের কথা, তারাশংকরের স্মৃতি কথা, ১ম খন্ড, পৃঃ-৪০ ।

৭০) ৫৭নং সূত্র নির্দেশিকা দ্রষ্টব্য , পৃঃ- ৫৯।

৭১) ৫৮নং সূত্র নির্দেশিকা দ্রষ্টব্য , পৃঃ- ১৫৬।

৭২) ৫৮নং সূত্র নির্দেশিকা দ্রষ্টব্য , পৃঃ- ১৭৬।

৭৩) সিকদার অশ্রুকুমার , আধুনিকতা ও বাংলা উপন্যাস, ২য় সংস্করণ- ১৯১৩, পৃঃ- ১৪১।

৭৪) ৫৬ নং সূত্র নির্দেশিকা দ্রষ্টব্য- পৃঃ- ৫৬৫।

৭৫) ৬৯ নং সূত্র নির্দেশিকা দ্রষ্টব্য- পৃঃ- ২৪-২৫।

৭৬) তদেব- পৃঃ- ২৬-২৭।

৭৭) বন্দ্যোপাধ্যায় তারাশংকর, হাঁসুলী বাঁকের উপকথা, ১৩য় সং, পৃঃ- ৪৫১।

৭৮) বন্দ্যোপাধ্যায় তারাশংকর, হাঁসুলী বাঁকের উপকথা, ২য় সং, পৃঃ- ৪৫১।

৭৯) তদেব- পৃঃ- ৪৫১।

৮০) তদেব- পৃঃ- ৪৫২।

৮১) তদেব- পৃঃ- ৪৫৩।

৮২) তদেব- পৃঃ- ৪৫৩।

৮৩) বন্দ্যোপাধ্যায় তারাশংকর, হাঁসুলী বাঁকের উপকথা, ১৩য় সং, পৃঃ- ৩১২।

৮৪) তদেব- পৃঃ- ৩১২।

৮৫) তদেব- পৃঃ- ২১৯।

৮৬) তদেব- পৃঃ- ১৫৫।

৮৭) তদেব- পৃঃ- ১৫৫।

৮৮) তদেব- পৃঃ- ১৫৫।

৮৯) তদেব- পৃঃ- ১৯৪।

৯০) তদেব- পৃঃ- ১৫০।

৯১) তদেব- পৃঃ- ১৫০-৫১।

৯২) তদেব- পৃঃ- ১৬০।

৯৩) ৭৩ নং সূত্র নির্দেশিকা দ্রষ্টব্য- পৃঃ- ১৪১।

৯৪) ৫৬ নং সূত্র নির্দেশিকা দ্রষ্টব্য- পৃঃ- ৫৬৬।

৯৫) বন্দ্যোপাধ্যায় তারাশংকর- হাসুলী বাঁকের উপকথা, ১৩সং, পৃঃ- ২৪১।

৯৬) বন্দ্যোপাধ্যায় তারশংকর - আমার কালের কথা, তারাশংকর স্মৃতি কথা, ১ম খন্ড,১ম সং, ১৩৮৭, পৃঃ- ৭৫।

৯৭) ৭৩ নং সূত্র নির্দেশিকা দ্রষ্টব্য- পৃঃ- ১৪২।

৯৮) ৫৬ নং সূত্র নির্দেশিকা দ্রষ্টব্য- পৃঃ- ৫৬৭-৫৬৮।

৯৯) ভট্টাচার্য্য সুকুন্তলা, রুক্ষমাটির কবিয়াল, তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায়ের জীবন ও সাহিত্যের বিশ্লেষণ, তারাশংকর পরিষদ কর্তৃক প্রকাশিত, ১৯৯৮, পৃঃ- ২০৪।

১০০) তদেব- পৃঃ- ২১০।

১০১) তদেব- পৃঃ- ২১২।

১০২) বন্দ্যোপাধ্যায় তারাশংকর, আমার সাহিত্য জীবন, তারাশংকর স্মৃতি, ১ম খন্ড, পৃঃ- ৩০৯-৩১১।

১০৩) তদেব- পৃঃ- ৩৯০-৩৯১।

১০৪) বন্দ্যোপাধ্যায় তারাশংকর, তারাশংকর রচনাবলী, ৮ম খন্ড, মিত্র ও ঘোষ, গ্রন্থ পরিচয় অংশ, পৃঃ- ৪১৫।

১০৫) ৫৬ নং সূত্র নির্দেশিকা দ্রষ্টব্য- পৃঃ- ৫৭৮।

১০৬) ভট্টচার্য্য জগদীশ সম্পাদিন 'বেদিনী' তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায়ের শ্রেষ্ট গল্প, বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ১১শ মুদ্রণ, পৃঃ- ১০৮।

১০৭) সেন সুকুমার সম্পাদিত, বিপ্রদাসের মনসা বিজয়, এশিয়াটিক সোসাইটি, প্রথম পালা, পৃঃ- ২।

১০৮) ৫৬ নং সূত্র নির্দেশিকা দ্রষ্টব্য- পৃঃ- ৫৭৮।

১০৯) তদেব- পৃঃ- ৫৮০।

১১০) ৯৯ নং সূত্র নির্দেশিকা দ্রষ্টব্য- পৃঃ- ২২৬।

১১১) ৫৬ নং সূত্র নির্দেশিকা দ্রষ্টব্য- পৃঃ- ৫৭৮।

১১২) বন্দ্যোপাধ্যায় তারাশংকর, আমার সাহিত্য জীবন, ২য় পর্ব, পৃঃ- ১৫২।

১১৩) বন্দ্যোপাধ্যায় তারাশংকর, আমার কালের কথা, তারাশংকর স্মৃতি কথা, ১ম খন্ড, ১ম সং, ১৩৮৭, পৃঃ- ৭৫।

১১৪) ৯৯ নং সূত্র নির্দেশিকা দ্রষ্টব্য- পৃঃ- ২২০।

১১৫) বন্দ্যোপাধ্যায় তারাশংকর, তারাশংকর রচনাবলী, ৮ম পর্ব , মিত্র ও ঘোষ, ভূমিকাংশ- পৃঃ- ২।

১১৬) ঘোষ বিনয়, বাংলার সামাজিক ইতিহাসের ধারা, ১৮০০-১৯০০ 'সাময়িক পত্রে বাংলার সমাজ চিত্র', গ্রন্থ মালার শেষ (৫ম খন্ড), পরিবেশ ঃ পাঠ ভবন, ১ম প্রকাশ ১৩৬৮, পৃঃ- ৩১।

১১৭) তদেব- পৃঃ- ৩৭।

১১৮) বন্দ্যোপাধ্যায় বিভূতিভূষণ, স্মতির রেখা, বিভূতি ভূষণ রচনাবলী প্রথম খন্ড, মিত্র ও ঘোষ, ৮ম মুদ্রণ, ১৩৯৯, পৃঃ- ৪০৮।

১১৯) তদেব- পৃঃ- ৩৪৬।

১২০) বন্দ্যোপাধ্যায় বিভূতিভূষণ,'ইছামতী', বিভূতিভূষণ রচনাবলী, ১২খন্ড, ৬ষ্ট মুদ্রণ, পৃঃ-১৭৪-৭৫।

১২১) তদেব- পৃঃ- ১৭৭।

১২২) বসু নিতাই, কালকূট সমরেশ ঃ সামাজিক দায়বদ্ধতার শর্তে, ১ম প্রকাশ, ১৯৮৬, পৃঃ-১৭৪।

১২৩) তদেব- পৃঃ- ১৭২।

১২৪) তদেব- পৃঃ- ১৭৩।

১২৫) বন্দ্যোপাধ্যায় সরোজ সম্পাদনা, সমরেশ বসু রচনাবলী-২, আনন্দ পাবিশার্স প্রাঃ লিঃ , ২য় মুদ্রণ, জুন ২০০০,পৃঃ- ২৩০-৩১।

১২৬) বসু সমরেশ, 'গঙ্গা' মৌসুমী প্রকাশনী, ১ম প্রকাশ ১৩৮১, পৃঃ-৯।

১২৭) তদেব- পৃঃ- ১০।

১২৮) তদেব- পৃঃ- ৩৩।

১২৯) বন্দ্যোপাধ্যায় সরোজ সম্পাদনা, সমরেশ বসু রচনাবলী-২, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ২য় মুদ্রণ, জুন ২০০০, পৃঃ-২১৯।

১৩০) তদেব- পৃঃ- ২১৯।

১৩১) তদেব- পৃঃ- ২১৯-২২০।

১৩২) ৫৬ নং সূত্র নির্দেশিকা দ্রষ্টব্য- পৃঃ- ৭৬৮।

১৩৩) মৈত্র আশিষ, সেন রঞ্জন, ঘটক অর্নব সমপাদনা, সুদীর্ঘ সংগ্রামের একটি উৎকৃষ্ট ফসল - জঙ্গল ঃকান সান্যাল, ১ম প্রকাশ ১৫ই জানুয়ারী ১৮৮৯, পৃঃ- ১-৩।(২৪.১২.৮৮ কলিকাতায় ত্রিপুরা হিত সাধনী হলে প্রয়াত নকশাল নেতা জঙ্গল সাওতাল নেতাকে নিয়ে অনুষ্ঠিত স্মরণ সভায় প্রধান বক্তা কানু স্যান্যালের বক্তব্য, পরিবেশনায় অনুষ্টুপ) ।

১৩৪) বসু নিতাই রাজনীতি ঃ নিঃসঙ্গতার আর্তি , কালকূট সমরেশ, ১ম প্রকাশ ১৯৮৬, পৃঃ- ১৯৯-২০০।

১৩৫) তদেব- পৃঃ- ২০১।

১৩৬) মুখোপাধ্যায় অরুণ কুমার, কালের প্রতিমা, দে'জ পাবলিশিং ১ম প্রকাশ এপ্রিল ১৯৭১, পৃঃ- ২৮৭।

১৩৭) বন্দ্যোপাধ্যায় অসিত কুমার - বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত, ২য় খন্ড, ৫ম মুদ্রণ, ২০০০ মডার্ণ বুক এজেন্সী, ভূমিকা, পৃঃ-৩।

১৩৮) তদেব-পৃঃ- ১।

১৩৯) দেবী মহাশ্বেতা কবি বন্দ্যঘটী গাঞির জীবন ও মৃত্যু, লেখকের কথা।

১৪০) তদেব ।

১৪১) বন্দ্যোপাধ্যায় শ্রী কুমার ও চৌধুরী বিশ্বপতি সম্পাদিত 'কালকেতুর ধন প্রাপ্তী', কবি কঙ্কন চন্ডী ১ম ভাগ নতুন সংস্করণ, পুনর্মুদ্রিত ১৯৯৬, পৃঃ-২৯০।

১৪২) মুখোপাধ্যায় অরুণ কুমার, কালের প্রতিমা, দে'জ পাবলিশিং ১ম প্রকাশ এপ্রিল ১৯৭১, পৃঃ- ১৮৬।

১৪৩) দেবী মহাশ্বেতা, অরণ্যের অধিকার, করুনা প্রকাশনী, ১১মুদ্রণ, ভূমিকাংশ।
১৪৪) তদেব ।
১৪৫) তদেব ।
১৪৬) তদেব ।
১৪৭) তদেব ।
১৪৮) মল্লবর্মণ অদ্বৈত, তিতাস একটি নদীর নাম , ১ম প্রকাশ শ্রাবণ ১৪০৩, পৃঃ-১৩-১৪।
১৪৯) তদেব পৃঃ-২৬।
১৫০) কায়সার শান্তনু, অদ্বৈত মল্লবর্মন ঃ জীবন সাহিত্য ও অনান্য, নয়া উদ্যোগ, ১ম প্রকাশ জানুয়ারী ১৯৯৮,পৃঃ-১১-১২।
১৫১) তিতাস একটি নদীর নাম, দশম প্রকাশ- ১৪০৩ পুঁথি ঘর, ভূমিকাংশ পৃঃ-৩।
১৫২) ৭৩ নং সূত্র নির্দেশিকা দ্রষ্টব্য-পৃঃ-২৫২।
১৫৩) ভাদুড়ী সতীনাথ, 'ঢোঁড়াই চরিত মানস, নব সংস্করণ, পৃঃ-১৪০।
১৫৪) তদেব পৃঃ- ২৮।
১৫৫) তদেব পৃঃ- ৫৬।
১৫৬) তদেব পৃঃ- ৫৬।
১৫৭) তদেব পৃঃ- ৬৫।
১৫৮) তদেব পৃঃ- ১১৪।
১৫৯) তদেব পৃঃ- ১১৩।
১৬০) তদেব পৃঃ- ১১৭।
১৬১) তদেব পৃঃ- ১১৭।
১৬২) ভাদুড়ী সতীনাথ, সতীনাথ গ্রন্থাবলী- ২, গ্রন্থ প্রসঙ্গ, পৃঃ- ৪৯২-৪৯৪।
১৬৩) তদেব পৃঃ- ৪৯৬-৪৯৭।
১৬৪) তদেব পৃঃ- ৪৯৫।
১৬৫) তদেব পৃঃ- ৪৯৮।
১৬৬) বসু সমরেশ, নিজেকে জানার জন্য গল্প সংগ্রহ -১, ১৯৭৮, পৃঃ- ১৩।
১৬৭) বসু সমরেশ, 'দেশ', ২২শে নভেম্বর ১৯৮৬, বসু সমরেশ।

শ্রী অশ্বিনী কুমার দাস

তাং- ০৩/০৬/২০০৯

শ্রী অশ্বিনী কুমার দাস

প্রয়োজনীয় চিঠিপত্র

প্রয়োজনীয় চিঠিপত্র

* গবেষণাকর্মের ক্ষেত্র সমীক্ষণ পর্বে যে সমস্ত গ্রন্থাগার এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে ব্যবহার করেছি, তার স্বীকৃতি পত্র

১) জাতীয় গ্রন্থাগার, কোলকাতা।

২) বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, কোলকাতা।

৩) সাহিত্য একাডেমি, নতুন দিল্লী।

৪) কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার, দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়, নতুন দিল্লী।

৫) প্রদ্যোৎ ঘোষ মহাশয়ের নিজস্ব গ্রন্থাগার, মালদা।

৬) মালদা কলেজ গ্রন্থাগার, মালদা।

৭) মানিকচক শহর গ্রন্থাগার, মালদা।

By Hand

NL/MRR/Atten.Cert/ 35
Government of India
National Library
Belvedere
.....

Kolkata-27Th.

TO WHOM IT MAY CONCERN :

This is to certify that Sri,Ashwini Kumar Das ,Research Scholar, (in Bengali) Department of Modern Indian Language, Aligarh Muslim University ,Aligarh, attended this library for his research work from 26/08/2008 to 27/08/08.

Dey. 27.08.08
(Smt. Lalita Dey)
Asstt. Library & Information Officer
राष्ट्रीय पुस्तकालय एवं सूचना अधिकारी
Asstt. Library & Information Officer
वाचनालय / Reading Room
राष्ट्रीय पुस्तकालय / National Library
कलकाता / Kolkata

To
Shri Ashwini Kumar Das,
Research Scholar, (in Bengali)
Department of Modern Indian Language ,
Aligarh Muslim University, Aligarh

স্থাপিত—১৮৯৩

ফ : ২৩৫০-৩৭৪৩

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ

২৪৩/১, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড, কলকাতা-৭০০ ০০৬

১৮৬০ খ্রিস্টাব্দের ইন্ডিয়ান সোসাইটিজ রেজিস্ট্রেশন অ্যাক্ট অনুসারে রেজিস্ট্রিকৃত :

রেজিঃ নং এস/১৪৫০/১৮৯৯-১৯০০

সূত্র :

তারিখ : ২৬/০৮/২০০৮

প্রশংসা পত্র

অগ্নিমিনী কুমার দাস 'আধুনিক ভারতীয় ভাষা বিভাগ' আলিগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়, আলিগড় এ বাংলা ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ে গবেষণারত। গবেষণার প্রয়োজনে তিনি ২৬/০৮/২০০৮ তারিখে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের গ্রন্থাগারে বসেছেন এবং গবেষণার স্বার্থে তিনি গ্রন্থাগার ব্যবহার করেছেন।

পারমিতা গোস্বামী
[পারমিতা গোস্বামী]
সহ-গ্রন্থাগারিক

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ
২৪৩/১, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড
কোলকাতা-৭০০০০৬

साहित्य अकादेमी
रवीन्द्र भवन, 35 फीरोज़शाह मार्ग, नई दिल्ली-110 001
तार : साहित्यकार, दूरभाष : 2338 6626-28
फैक्स : 091-11-2338 2428

Sahitya Akademi
(National Academy of Letters)
Rabindra Bhavan, 35 Ferozeshah Road, New Delhi-110 001
Gram : Sahityakar, Phone : 2338 6626-28
Fax : 091-11-2338 2428
E-mail : secy@ndb.vsnl.net in
website : http://www.sahitya-akademi.gov.in

SA/65

May 8, 2008

TO WHOM IT MAY CONCERN

This is to certify that Mr. Ashwini Kumar Das, Research scholar in Bengali language, Dept. of Modern Indian Languages, Aligarh University, Aligarh, has visited the Sahitya Akademi Library on May 8, 2008.

M. Vijayalakshmi
Librarian

Professor Nandita Basu

Department of MIL &LS
University of Delhi
Delhi – 110007
Phone: 011-27666626
Res: 011-22726074

No. FA / MILLS / 2008/ 3591

Dated: 12th May 2008

TO WHOM IT MAY CONCERN

This is to certify that Shri. Ashwini Kumar Das, Research Scholar in Bengali Language and Literature, from Department of Modern Indian Languages, Aligarh Muslim University , Aligarh had consulted Delhi University Arts Library for two days i.e. 10-05-2008 and 12-05-2008.

Nandita Basu

(Nandita Basu)

Professor in Bengali

Department of Modern Indian Languages & Literary Studies
University of Delhi
Delhi-110007

Dr. Prodyot Ghosh M A , Ph D (Cal), D Litt (K U)

Reader in Bengali Malda College, Malda-732101& Vidyasagar College, Calcutta-700006 (Rtd)

Founder-Director	Institute of Folk Culture (Govt Regd), Malda (Museum and Research Centre)
Secretary	Shilpayan Artists Society, Calcutta-700026
	Kavisekhar Kalidas Roy Memorial Committee, Calcutta-700033
	Benoy Sarkar Institute of Culture (Govt Regd)
	Gour Historical and Cultural Research Centre
Member	Malda District Health & Family Welfare Sanuty, Govt of W B
Advisor	Family Counselling Centre (Deptt of Human Resource, Govt of India)
	Malda District Council for Child Welfare
	Malda District Forum for Consumers' Protection, Malda
	Vivekananda Academy [A Govt Regd Educational Institute], Malda
Formerly President	Pirojpur Bullet Club (Govt Regd), Malda
	Pirojpur Blind Relief Society (Govt Regd), Malda
Formerly Vice-Chairman	District AIDS Resource Centre, Malda
	St John Ambulance Association, Malda District
Formerly Hon y Secy	Indian Red Cross Society, Malda District Branch

Residence:
Pirojpur, Malda-732101
West Bengal
Phone (03512) 252829

11/6/2008

Certified that Sri Ashwini Kumar Das, a Research scholar in Bengali language and literature, Dept of Modern Indian Languages, Aligarh Muslim University, Aligarh, working under the supervision of Dr. T.B.Chakraborty , Chairman of the Modern Indian languages consulted some books and periodicals from my ~~journal~~ Personal library during his stay at Malda from 03.06.2008 to 10.06.2008.

I wish him all success,

11/6/2008

Dr. Prodyot Ghosh M.A.,Ph.D (cal), D. Litt (K.U)
Formerly Reader, Malda College (Govt. Sponsored) & Vidyasagar College (Evn)
Calcutta-700009.

বঙ্গভাষা ও সাহিত্য বিভাগ
মালদা কলেজ
ডাকঘর ও জেলা মালদা
পিন নং-৭৩২১০১

অফিস : ০৩৫১২-২২০৮০৭
ফ্যাক্স : ০৩৫১২-২২০৫১৬

পত্র নং ..... তাং ০৯/০৬/২০০৮

প্রশংসাপত্র

শ্রীমতী কুমার দাস 'আধুনিক ভারতীয় ভাষা বিভাগ', আলিগড় মুসলিম-বিশ্ববিদ্যালয়, আলিগড়-এ বাংলা ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ে গবেষণারত। গবেষণার প্রয়োজনে সে আমার ব্যক্তিগত গ্রন্থাগার ও মহাবিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারে বিগত ০৪/০৬/০৮ থেকে ১০/০৬/০৮ পর্যন্ত লেখাপড়ার কাজ করেছে। এই কয়েকদিনে তার গবেষণার প্রয়োজনীয় তথ্যাবলী সংগ্রহ করেছে। তার গবেষণার সাফল্য কামনা করি।

স্বাক্ষর
নারায়ণ চন্দ্র সাউ
অধ্যাপক,
মালদা কলেজ
মালদা।
বাংলা ভাষা ও সাহিত্য বিভাগ
মালদা কলেজ, মালদা

সম্পাদক/গ্রন্থাগারিক,

(০৩৫১২)
৭২৩২৮

মানিকচক শহর গ্রন্থাগার

পশ্চিমবঙ্গ সরকার অনুমোদিত

পোঃ মানিকচক, জেলা মালদহ।

নির্দেশ নং ..... তারিখ ২৮.০১.২০০৮

শ্রীঅশ্বিনী কুমার দাস, গবেষক (বাংলা ভাষা ও সাহিত্য), আধুনিক ভারতীয় ভাষা বিভাগ, অসমীয়া মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়, অসমীয়া, গত ২১.০১.২০০৮ হইতে ২৮.০১.২০০৮ পর্যন্ত মোঁ নিয়মিত মানিকচক শহর গ্রন্থাগার গবেষণা কার্যের জন্য ব্যবহার করেছেন।

H. Mala 28/1/08
Secretary/Librarian,
Manikchak Town Library
P.O. Manikchak, Malda.

প্রয়োজনীয় তথ্য
ও মূল্যবান চিত্রাবলী

প্রয়োজনীয় তথ্য

184 05 243 20 MHO

বেদেনী

শ্রীতারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

5184.
16.6.45

মিত্রালয়
১০, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

ক) 'বেদেনী' গল্পের প্রাচীন সংস্করণের একটি দুর্লভ আখ্যাপত্রের ফটোকপি। (সৌজন্য : জাতীয় গ্রন্থাগার কোলকাতা)

পদ্মানদীর মাঝি

লেখকের চতুর্থ উপন্যাস। প্রথম প্রকাশ ২৮ মে ১৯৩৬। প্রকাশক গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় অ্যাণ্ড সন্স। পৃষ্ঠা সংখ্যা ২০৮।

বর্তমানে প্রচলিত সংস্করণের প্রকাশক বেঙ্গল পাবলিশার্স; ত্রয়োদশ মুদ্রণ, জ্যৈষ্ঠ ১৩৭৭।

গ্রন্থাকারে প্রকাশের পূর্বে উপন্যাসটির কিছু অংশ ১৯৩৪ খৃষ্টাব্দে স্বর্গত সঞ্জয় ভট্টাচার্য-সম্পাদিত 'পূর্বাশা' মাসিক পত্রিকার কয়েক সংখ্যায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়।

আধুনিক ভারতীয় সাহিত্যে 'পদ্মানদীর মাঝি'ই সম্ভবত বিদেশী ভাষায় সর্বাধিক অনূদিত গ্রন্থ। এযাবৎকাল পর্যন্ত বিদেশী ভাষাসমূহের মধ্যে ইংরেজী, রুশ, চীনা, চেক, হাঙ্গেরিয়ান, লিথুয়ানিয়ান, নরওয়েয়ান ও সুইডিশ ভাষায় এই উপন্যাসের অনুবাদ প্রকাশিত হয়েছে। Boatman of the Padma নামে উপন্যাসটির ইংরেজী অনুবাদ প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯৪৮ সালে। অনুবাদক অধ্যাপক হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়; প্রকাশক কুতুব পাবলিশার্স, বোম্বাই। নূতন আরেকটি ইংরেজী অনুবাদ অস্ট্রেলিয়া, ইংলণ্ড ও আমেরিকার বিভিন্ন প্রকাশক কর্তৃক প্রকাশের পথে। বিভিন্ন ভাষায় স্বতন্ত্র অনুবাদ ছাড়াও, স্টকহোম থেকে ১৯৬৪ সালে প্রকাশিত O"ver Gra"nserna, Del 2 নামক একটি বিদ্যালয়পাঠ্য গ্রন্থে 'পদ্মানদীর মাঝি'র একটি দীর্ঘ অনূদিত অংশ সংকলিত হয়েছে; পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের সাহিত্য থেকে মানুষ ও তার পরিবেশের ভৌগলিক, সামাজিক ও ঐতিহাসিক বিবরণ সম্বলিত এই সচিত্র গ্রন্থে আধুনিক ভারতবর্ষ ও তার সাহিত্যের পরিচয় হিসেবে একমাত্র 'পদ্মানদীর মাঝি'কেই গ্রহণ করা হয়েছে।

খ) 'পদ্মা নদীর মাঝি' সম্বন্ধে একটি মূল্যবান তথ্যের ফটোকপি।
(সৌজন্য · আধুনিক ভারতীয় ভাষা বিভাগ, আলিগড় মুসলীম বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার)

মূল্যবান চিত্রাবলী

ক) 'হাঁসুলী বাঁকের উপকথা'-র একটি মূল্যবান তথা দুর্লভ চিত্রের ফটোকপি।
(সৌজন্য:বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ গ্রন্থাগার, কোলকাতা)

খ) অন্ত্যজ শ্রেণীর মানুষের লোকজীবন ধারার উৎসব ও আনন্দ প্রকাশের একটি মূল্যবান ছবি ধরা পড়েছে 'মহাশ্বেতা দেবী'-র গল্পে। বর্তমান ফটোকপিটি 'বায়েন' গল্প থেকে উদ্ধৃত। (সৌজন্য : জাতীয় গ্রন্থাগার কোলকাতা)

গ) মহাশ্বেতা দেবীর 'অগ্নিগর্ভ' ও 'নীল ছবি' গল্পের অদ্বৈত প্রকাশের অপূর্ব চিত্রপট। (সৌজন্য : জাতীয় গ্রন্থাগার কোলকাতা)

ঘ) মহাশ্বেতা দেবীর গল্পের অন্তর্গত অন্ত্যজ শ্রেণীর মানুষের হাতে তৈরী লোকশিল্প কর্মের নমুনা।
(সৌজন্য : জাতীয় গ্রন্থাগার কোলকাতা)

ঙ) মহাশ্বেতা দেবীর 'ছোট গল্প সংকলনের' মূল গ্রন্থের প্রচ্ছদপট অংশের ফটোকপি।
(সৌজন্য : জাতীয় গ্রন্থাগার কোলকাতা)

চ) এ'হাতের প্রতিচ্ছবি কার? –অন্ত্যজ, না দলিতের? মহাশ্বেতা দেবীর গল্পাংশের অর্ন্তগত একটি মূল্যবান ছবির ফটোকপি।
(সৌজন্য : জাতীয় গ্রন্থাগার কোলকাতা)

ছ) মহাশ্বেতা দেবীর গল্পের অর্ন্তগত দলিত স্ত্রীর দলিত সন্তান। স্ত্রী লোকের মুখে কিসের ভাষা? চোখের চাহুনিতে কিসের জিজ্ঞাসা?
(সৌজন্য : জাতীয় গ্রন্থাগার কোলকাতা)

জ) মহাশ্বেতা দেবীর গল্পের অর্ন্তগত উপজাতি সমাজের 'লৌকিক উৎসবের' প্রকৃষ্ট আলোকচিত্রের ফটোকপি।
(সৌজন্য : জাতীয় গ্রন্থাগার কোলকাতা)

ঝ) মহাশ্বেতা দেবীর 'তরাস' গল্পের একটি অনবদ্য চিত্রপটের ফটোকপি।
(সৌজন্য : জাতীয় গ্রন্থাগার কোলকাতা)